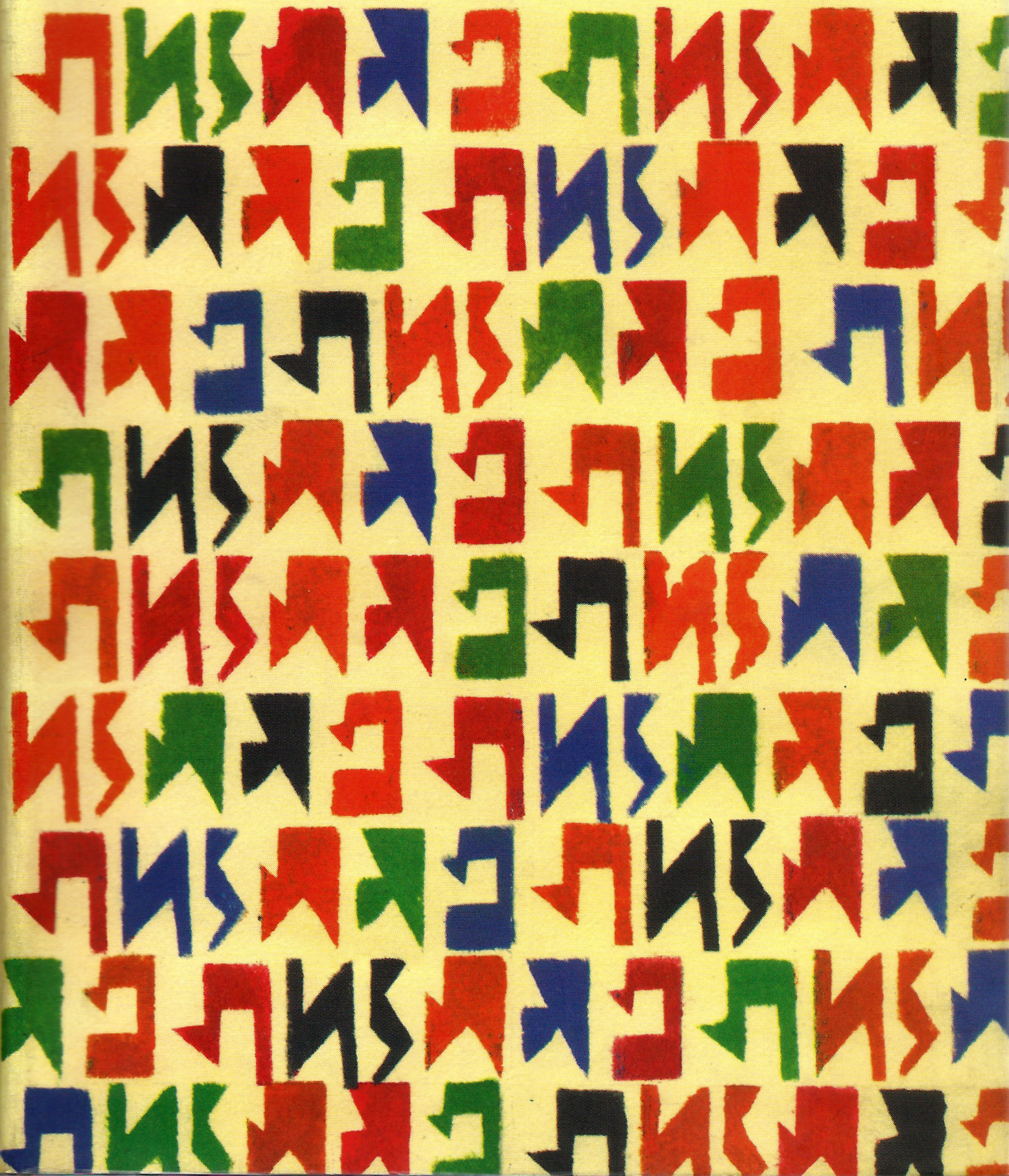
গদ্যসমগ্র

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



গদ্যসমগ্র ১ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর, অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে।

বাবা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মা প্রফুল্লনলিনী দেবী। প্রথম যৌবনেই ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর কবিখ্যাতি। *কলকাতার যীশু*, *উলঙ্গরাজা*, *পাগলা ঘন্টি*-র মতো কবিতার বইগুলি বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস হয়ে আছে, নিয়মিত লিখেছেন কাব্যতত্ত্ব ও ছন্দ নিয়ে। আত্মজীবনীও লিখেছেন *নীরবিন্দু* নামে। বাগ্মিতায় যশস্বী। স্মৃতি থেকে নিরবধি উচ্চারণ করতে পারেন রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার সমেত অনেকগুলি পুরস্কার অর্জন করেছেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অর্পণ করেছেন সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধি। এখন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন আর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার উদ্যোগ নিয়েছেন।

গদ্যসমগ্র ১

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

গদ্যসমগ্র ১

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

Collection of Essays

by Nirendranath Chakravarti

প্রথম প্রকাশ

মাঘ ১৪১৪ জানুয়ারি ২০০৮

ISBN - 978-81-7751-156-7

প্রকাশক

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড

কলকাতা ৭০০ ০২০

প্রচ্ছদ

কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুদ্রক

গীতা প্রিন্টার্স

৫১এ ঝামাপুকুর লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : ১২৫ টাকা

নিবেদন

তিনটি গদ্যের বই গ্রন্থিত করে প্রকাশিত হল কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর *গদ্যসমগ্র*-র প্রথম খণ্ড। *গদ্যসমগ্র* হলেও বিষয় জুড়ে বয়ে গেছে পদ্যই। সংকলনের প্রথম ও তৃতীয় গ্রন্থ *কবিতার ক্লাস* এবং *কবিতার কী ও কেন*, শীর্ষনাম থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পূর্ণতই পদ্য নিয়ে। মধ্যবর্তী গ্রন্থটি *কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা*, শীর্ষনাম যেমন বলে দিচ্ছে, কবিতার পাশে ভিন্নতর প্রসঙ্গকেও জায়গা করে দিয়েছে। তাদের অধিকাংশই সাহিত্য-সংলগ্ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র মতো প্রসঙ্গের পাশে কিছু ব্যক্তিগত গদ্য রচনাও এই গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এই সব গদ্য শুধু এই সময়ের অন্যতম এক প্রধান কবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় না, আলাপ করিয়ে দেয় একই সঙ্গে সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে অনুক্ষণ অনুসন্ধিৎসু এক প্রাজ্ঞজনের সঙ্গে।

কবিতা কী, কেন, কোথায়, কবিতা থেকে প্রাপ্তিই বা কী—এমন নিরন্তর প্রশ্ন তোলার মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থের গদ্যসম্ভার কবিতার ভুবনে প্রবেশের জন্যে বাঙালি পাঠককে যোগ্য থেকে যোগ্যতর করে তোলে। ফলে এই সব গদ্য আসলে কবিতার শিল্প, সত্তা, কারিগরি নিয়ে প্রশিক্ষিত হওয়ারই এক অনন্য আয়োজন।

গ্রন্থগুলি ইতিমধ্যেই কাব্যতত্ত্ব, ছন্দ বিষয়ে কৃতবিদ্যজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। সমগ্র আকারে প্রকাশের পর সেগুলি নিশ্চয় মননশীল পাঠক, কবি, কবিতাভাবুকের জন্যে আরও উপযোগী ও কার্যকর হয়ে উঠবে। লিখনগুলির বিবর্তন ও পারম্পর্য যেমন তাঁরা অনুভব করতে পারবেন তেমনই কবিতা বিষয়ে জ্ঞানচর্চার সামগ্রিকতার সমীপে পারবেন এগিয়ে যেতে। ফলে এ গ্রন্থ দীর্ঘস্থায়ী পাঠকসমাদর লাভ করবে, এমন প্রত্যয় প্রকাশ করা যেতেই পারে।

জানুয়ারি ২০০৮

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

লেখকের কথা

অনধিক একটিইমাত্র কাজে মগ্ন থেকে কারও পক্ষেই সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন ও জীবনযাপন যেহেতু সম্ভব নয়, সংসারী সব মানুষকেই তাই হরেক কাজে নিয়ত নিযুক্ত থাকতে হয়। তারই মধ্যে যে-কাজে যার সর্বাধিক সময় ও উদ্যম ব্যয়িত হয়, ধরে নেওয়া যায় যে, সেটাই তার মূল কাজ। সেই হিসেবে আমার মূল কাজ অবশ্যই লেখালিখি। অথচ লেখার মাধ্যমটা যা-ই হোক, গদ্য অথবা পদ্য, এই মূল কাজটাতেই আমি যে-পরিমাণ অস্বস্তি বোধ করি, এমন আর অন্য কোনো কাজে নয়। তারই মধ্যে আবার কবিতা লেখার কাজে আমার যতটা অস্বস্তি, গদ্য রচনায় অস্বস্তি তার চতুর্গুণ। অস্বস্তি আর অস্বাচ্ছন্দ্য। সত্যি বলতে কী, যখনই কোনও প্রবন্ধ লিখতে বসি, তখনই আমার মনে হতে থাকে, এ যেন অন্যের ভাষা ধার করে আমাকে কাজ চালাতে হচ্ছে। সম্ভবত সেই কারণেই আমার কোনও এক গদ্যরচনায়, ঘোর বিরক্তিভরে, এমন কথাও একদা আমি বলেছিলুম যে, গদ্য আমার মাতৃভাষা নয়। মুশকিল এই যে, 'কিছু-কিছু ভাবনা যেহেতু—তাদের প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গদ্যবন্ধই দাবি করে, তাই—মাঝেমধ্যে এই বি-ভাষার শরণ না-নিয়ে আমার গত্যন্তর থাকে না।'

গদ্য লিখতে—বিশেষত প্রবন্ধ লিখতে—সত্যিই আমার ইচ্ছা করে না। এদিকে আশি পেরিয়ে এখন দেখতে পাচ্ছি যে, সেই অনিচ্ছাকৃত কাজের পরিমাণও নেহাত কম নয়। একদিকে যেমন ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছে আমার বেশ-কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ, অন্যদিকে তেমনি হরেক পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে আছে লঘুগুরু এমন বেশকিছু গদ্যরচনা, যা এখনও গ্রন্থবন্ধ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্বাস, আর কালক্ষেপ না-করে আমার তাবৎ গদ্যরচনাকে এবারে একই গ্রন্থে সংকলিত করে রাখলে ভালো হয়। *গদ্যসমগ্র*র পরিকল্পনা তাঁরই।

*গদ্যসমগ্র*র এই প্রথম খণ্ডে আমার প্রথম তিনটি গদ্যগ্রন্থকে ধরিয়ে দেওয়া গেল। *কবিতার ক্লাস*, *কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা* এবং *কবিতার কী ও কেন* । এর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে বাংলা ছন্দ ও কাব্যতত্ত্ব। দ্বিতীয়

গ্রন্থটির বিষয়ে বলি, কবিতা সেখানেও অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু বটে, তবে কথাসাহিত্য-সম্পর্কিত কিছু আলোচনার সঙ্গো দুটি ভ্রমণকাহিনি, গুটিকয় রম্যরচনা ও প্রয়াত কয়েকজন লেখকের স্মৃতিতর্পণও সেখানে সংকলিত হয়েছে।

যাঁদের নিরলস প্রযত্নে এই গ্রন্থটি এত সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে উঠতে পারল, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম।

কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা ১০৯
কবিতার কী ও কেন ২৭৩

গ্রন্থসূচি

সূ চি

১. কবিতার ক্লাস

২. কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা

৩. কবিতার কী ও কেন

কবিতার ক্লাস

কেউ কেউ কবি নয়, সকলেই কবি

এই বইয়ের নাম দিয়েছি ‘কবিতার ক্লাস’। এতে চমকাবার কিছু নেই। অনেকে মনে করেন যে, কবিতা একটি অপার্থিব দিব্য বস্তু, এবং তাকে আয়ত্ত করবার জন্যে, মুনিঋষিদের মতো, নির্জন পাহাড়ে-পর্বতে কিংবা বনে-জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করতে হয়। আমি তা মনে করি না। আমার বিশ্বাস, জাতে যদিও একটু আলাদা, তবু কবিতা-ও আসলে সাংসারিক বিষয় ছাড়া আর-কিছুই নয়, আমাদের এই সাংসারিক জীবনের মধ্যেই তার বিস্তর উপাদান ছড়িয়ে পড়ে আছে, এবং ইস্কুল খুলে, ক্লাস নিয়ে, রুটিনমাফিক আমরা যেভাবে ইতিহাস কি ধারাপাত কি অঙ্ক শেখাই, ঠিক তেমনি করেই কবিতা লেখার কায়দাগুলো শিখিয়ে দেওয়া যায়। ‘কায়দা’ না-বলে অনেকে বলবেন ‘কলাকৌশল’, তা বলুন, কথাটা তার ফলে আর-একটু সম্ভ্রান্ত শোনাবে ঠিকই, কিন্তু মূল বক্তব্যের তাতে কোনও ইতরবিশেষ হবে না। বিশ্বাস করুন চাই না-করুন, কবিতা লেখা সত্যিই খুবু কঠিন কাণ্ড নয়।

সেই তুলনায় পদ্য লেখা আরও সহজ। শুধু কায়দাগুলো রপ্ত করা চাই, ঘাঁতঘোঁত জেনে নেওয়া চাই। কবিতা আর পদ্যের তফাত কোথায়, এক্ষুনি সেই তর্কে ঢুকে ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তুলতে চাই না। তার চাইতে বরং জিজ্ঞেস করি, আপনার বয়স যখন অল্প ছিল, তখন ছোটোপিসি কি ন-মাসি কি সেজদির বিয়ের সময়ে কি আপনার একখানা উপহার লিখবার ইচ্ছে হয়নি? হয়তো হয়েছিল। হয়তো ভেবেছিলেন, “বাঃ কী মজা, বাঃ কী মজা, খাব লুচি মন্ডা গজা” ইত্যাদি সব উপাদেয় খাবারদাবারের কথা দিয়ে লাইন-কয় লিখে তারপর “বিভুপদে এ-মিনতি—” জানাবেন যে, নবদম্পতি যেন চিরকাল সুখে থাকে।

কিন্তু হায়, শেষপর্যন্ত আর হয়তো লেখা হয়নি। হবে কী করে? ‘মজা’র সঙ্গে ‘গজা’র মিলটাই তখন মনে পড়েনি যে। আর তাই, কড়িকাঠের দিকে ঘণ্টাখানেক তাকিয়ে থেকে, এবং নতুন-কেনা মেড-ইন-ব্যাভেরিয়া পেনসিলের গোড়াটাকে চিবিয়ে ছাতু করে, শেষপর্যন্ত হয়তো ‘ধুত্তোর’ বলে আপনি উঠে পড়েছিলেন। মনে-মনে খুব সম্ভব বলেছিলেন, “ওসব উপহার-টুপহার লেখার চাইতে বরং মুদির দোকানের খাতা লেখা অনেক সহজ।”

মুদির দোকানের প্রসঙ্গে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ল। বছর পঞ্চাশেক আগেকার ঘটনা। আমার বয়স তখন বছর-দশেক। সেইসময়ে আঁক কষতে-কষতে শেলেটের উপরে আমি একটা পদ্য লিখেছিলুম। তার আরম্ভটা এইরকম—

আজ বড়ো আনন্দ হইয়াছে।
দেখিয়াছি, রান্নাঘরে কই আছে।

অর্থাৎ আমি বলতে চেয়েছিলুম যে, মা যখন কইমাছ রান্না করছেন, তখন দুপুরের ভোজনপর্বটা বেশ জমাট হবে, সুতরাং আজ আমার বড়োই আনন্দের দিন। আনন্দ অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না; এক জ্যাঠতুতো দাদা এসে চুলের মুঠি ধরে আমাকে শূন্যে তুলে ফেললেন, তারপর বাঁ হাতে আমাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে ডান হাতে একটা চড় কষালেন, তারপর বললেন, "হতচ্ছাড়া, তোমাকে আঁক কষতে দেওয়া হয়েছে, আর তুমি কিনা বসে-বসে কাব্যি করছ? এই আমি বলে রাখলুম, পরে তোমাকে মুদির দোকানের খাতা লিখে পেট চালাতে হবে।"

বাজে কথা। যে-ছেলে আঁক কষতে ভয় পায়, তার পক্ষে মুদির দোকানের খাতা লেখা সম্ভব নয়। চাল-ডাল-গোলমরিচ-জিরে-হলুদ-পাঁচফোড়নের হিসেব রাখা কি চাট্টিখানি ব্যাপার? সে-কাজ সকলে পারে না। তার জন্যে সাফ মাথা চাই। সেই তুলনায় বরং কবিতা লেখা অনেক সহজ। কবিতা লেখবার জন্যে, আর যা-কিছুরই দরকার থাক, মাথাটাকে সাফ রাখবার কোনও দরকার নেই। বরং, সত্যি বলতে কী, মাথার মধ্যে একটু গোলমাল থাকলেই ভালো। কিন্তু না, মাথার প্রসঙ্গে এইখানেই ছেদ টানা যাক, কেন-না বিশুদ্ধ আগমার্কা কবিরা হয়তো এইটুকু শুনেই চোখ রাঙাতে শুরু করেছেন, বাকিটুকু শুনলে তাঁরা আমাকে আস্ত রাখবেন না। তার চাইতে বরং যে-কথা বলছিলুম, তা-ই বলি।

আমার বলবার কথাটা এই যে, অল্প একটু চেষ্টা করলে যে-কেউ কবিতা লিখতে পারে। আমার মাসতুতো ভাইয়ের ছোটোছেলেটির কথাই ধরুন। গুণধর ছেলে। টুকলিফাই করেছে, পরীক্ষার হলে বোমা ফাটিয়েছে, গার্ডকে 'জান খেয়ে নেব' বলে শাসিয়েছে, উপরন্তু চাঁদা তুলে, মাইক বাজিয়ে, সরস্বতী পুজো করে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তুষ্ট করেছে, তবু— এতরকম কাণ্ড করেও— স্কুল-ফাইনালের পাঁচিলটা সে টপকাতে পারেনি। তিন বার পরীক্ষা দিয়েছিল। তিন বারই ফেল। এখন সে আমাদের হাটবাজার করে দেয়, হরিণঘাটার ডিপো থেকে দুধ আনে, পঞ্চাশ রকমের ফাইফরমাশ খাটে, এখানে-ওখানে ভুল-ইংরেজিতে চাকরির দরখাস্ত পাঠায়, এবং—

এবং কবিতা লেখে। তা সে-ও যদি কবি হতে পারে, তবে আপনি পারবেন না কেন?

আমার গিন্নির খুড়তুতো ভাই এক সওদাগরি আপিসের বড়োবাবু। আগে সে-ও কবিতা লিখত, কিন্তু আপিসে তাই নিয়ে হাসাহাসি হওয়ায় এবং বড়োসাহেব তাকে একদিন চোখ পাকিয়ে "হোয়াট্'স্ দিস্ আয়া'ম্ হিয়ারিং অ্যাবাউট ইউ" বলায়, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে সে এখন গোয়েন্দা-গল্পের ভক্ত হয়েছে। তার কাছে সেদিন একটা ইংরেজি বই দেখলুম। বইয়ের নাম *বুচার্ বেকার্ মার্ডার মেকার্*। অর্থ অতি পরিষ্কার। যে-কেউ খুন করতে পারে। নৃশংস কসাইও পারে, আবার নিরীহ রুটিওয়ালাও পারে। খুন করবার জন্যে যে একটা আলাদা রকমের লোক হওয়া চাই, তা নয়।

তুলনাটা হয়তো একটু অস্বস্তিকর হয়ে যাচ্ছে, তবু বলি কবিতার ব্যাপারেও তা-ই। কবিতা লিখবার জন্যে আলাদা রকমের মানুষ হবার দরকার নেই। রামা শ্যামা যদু মধু প্রত্যেকেই (ইচ্ছে করলে এবং কায়দাগুলোকে একটু খেটেখুটে রপ্ত করে নিলে) ছন্দ ঠিক রেখে, লাইনের পর লাইন মিলিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে।

তার জন্যে, বলাই বাহুল্য, কিছু জিনিস চাই, এবং কিছু জিনিস চাই না।

আগে বলি কী কী চাই না—

১) কবি হবার জন্যে লম্বা-লম্বা চুল রাখবার দরকার নেই। ওটা হিপি হবার শর্ত হতে পারে, কিন্তু কবি হবার শর্ত নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, চুল খুব ছোটো করে ছেঁটেও কিংবা মাথা একেবারে ন্যাড়া করে ফেলেও কবিতা লেখা যায়। চুলের সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, কবিতার নেই।

২) সর্বক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাটির দিকে তাকিয়েও কবিতা লেখা যায়। সবচাইতে ভালো হয়, যদি অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে শুধু খাতার দিকে চোখ রাখেন।

৩) কখন চাঁদ উঠবে, কিংবা মলয় সমীর বইবে, তার প্রতীক্ষায় থাকবার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অমাবস্যার রাত্রেও কবিতা লেখা যায়, এবং মলয় সমীরের বদলে ফ্যানের হাওয়ায় কবিতা লিখলে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

৪) ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি পরবার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, স্যানডো গেঞ্জি গায়ে দিয়েও, কিংবা একেবারে আদুর গায়েও, কবিতা লেখা সম্ভব।

এইবার বলি, কবিতা লিখতে হলে কী কী চাই।

বিশেষ-কিছু চাই না। দরকার শুধু—

১) কিছু কাগজ (লাইন-টানা হলেও চলে, না-হলেও চলে)।

২) একটি কলম (যে-কোনও শস্তা কলম হলেও চলবে) অথবা একটি পেনসিল এবং—

৩) কিছু সময়।

কিন্তু এতসব কথা আমি বলছি কেন? কবিতার কৌশলগুলিকে সর্বজনের হাতের মুঠোয় এনে না-দিয়ে কি আমার তৃপ্তি নেই? সত্যিই নেই। ইংরেজিতে 'পোয়েট্রি ফর দি কমন ম্যান' বলে একটা কথা আছে। আমার ইচ্ছে, কমন ম্যানদেরও আমি পোয়েট বানিয়ে ছাড়ব। পরশুরামের কথা মনে পড়ছে। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, পৃথিবীকে একেবারে নিঃক্ষত্রিয় করে ছাড়বেন। কিন্তু, না-পারবার হেতুটা যা-ই হোক, কাজটা তিনি পারতে-পারতেও পারেননি। বিশ্বসংসারকে যাঁরা নিষ্কবি করে ছাড়তে চান (অনেকেই চান), তাঁরাও সম্ভবত শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবেন না।

আমার প্রতিজ্ঞাটা অন্য রকমের। আমি ঠিক করেছি, বাংলা দেশে সব্বাইকে আমি কবি বানাব। দেখি পারি কি না।

কবিতা লিখবার জন্যে কী কী চাই, তা তো একটু আগেই বলেছি। চাই কাগজ, চাই কলম (কিংবা পেনসিল), চাই সময়। তা আশা করি কাগজ-কলম আপনারা জোগাড় করতে পেরেছেন। বাকি রইল সময়। তা-ও নিশ্চয়ই আপনাদের আছে। রেশনের দোকানে লাইন না-লাগিয়ে, এই যে আপনারা গুটিগুটি 'কবিতার ক্লাস'-এ এসে হাজির হয়েছেন, এতেই বুঝতে পারছি যে, সময়ের বিশেষ অভাব আপনাদের নেই।

সুতরাং 'দুর্গা দুর্গা' বলে শুরু করা যাক। *অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু*।

আগেই বলি, কবিতার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকা চাই। কাব্যগুণ, ছন্দ, মিল।

বিনা ডিমে যেমন ওমলেট হয় না, তেমনই কাব্যগুণ না থাকলে কবিতা হয় না। তার প্রমাণ হিসেবে, আসুন, আমার সেই মাসতুতো ভাইয়ের ছোটোছেলের লেখা চারটে লাইন শোনাই :

সূর্য ব্যাটা বুর্জোয়া যে,
দুর্যোধনের ভাই।
গর্জনে তার তূর্য বাজে,
তর্জনে ভয় পাই।

বলা বাহুল্য, এটা কবিতা হয়নি। তার কারণ, ছন্দ আর মিলের দিকটা ঠিকঠাক আছে বটে, কিন্তু কাব্যগুণ এখানে আদপেই নেই। এবং কাব্যগুণ না-থাকায় দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা নেহাতই বাক্যের ব্যায়াম হয়ে উঠেছে।

এবারে মিলের কথায় আসা যাক। মিল না-রেখে যে কবিতা লেখা যায় না, তা অবশ্য নয়, তবু যে আমি মিলের উপরে এত জোর দিচ্ছি তার কারণ :

১) প্রথমেই যদি আপনি মিল-ছাড়া কবিতা লিখতে শুরু করেন, তাহলে

অনেকেই সন্দেহ করবে যে, মিল-এ সুবিধে হয়নি বলেই আপনি অ-মিলের লাইনে এসেছেন। সেটা খুবই অপমানের ব্যাপার।

২) মিল জিনিসটাকে প্রথম অবস্থায় বেশ ভালো করে দখল করা চাই। তবেই সেটাকে ছেড়ে দিয়েও পরে ভালো কবিতা লেখা সম্ভব হবে। যেমন বড়ো-বড়ো লিখিয়েদের মধ্যে অনেকেই অনেকসময়ে ব্যাকরণের গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়েও চমৎকার লেখেন, এ-ও ঠিক তেমনই। ব্যাকরণ বস্তুটাকে প্রথমে বেশ ভালো করে মান্য করা চাই, তবেই পরে সেটাকে দরকারমতো অমান্য করা যায়। ঠিক তেমনি, পরে যাতে মিলের বেড়া ভাঙা সহজ হয়, তারই জন্যে প্রথম দিকে মিলটাকে বেশ আচ্ছা করে রপ্ত করতে হবে।

ছন্দ কিন্তু সবসময়েই চাই। আগেও চাই, পরেও চাই। আসলে আমার ক্লাসে আমি ছন্দের কথাই বলব। সেই বিচারে 'কবিতার ক্লাস' না-বলে একে 'ছন্দের ক্লাস'ও বলা যেতে পারত। তাতে কিছু ক্ষতি ছিল না।

শিল্পকলায়, চলায়, বলায় সবকিছুতেই ছন্দ

আমরা বলেছি যে, কবিতায় মিল থাক আর না-ই থাক, ছন্দ সর্বদা চাই। আগেও চাই, পরেও চাই। এখন কথা হচ্ছে, ছন্দবস্তুটা কী। ওটা আর কিছুই নয়, কবিতার শরীরে দোলা লাগাবার কায়দা। তা নানান দোলায় কবিতার শরীরকে দোলানো যায়। ছন্দ তাই নানা রকমের।

কিন্তু 'কবিতার ছন্দ' নিয়ে আলোচনার আগে বরং মোটামুটিভাবে ছন্দ জিনিসটা নিয়েই কিছু বলা যাক।

ছন্দ বস্তুটা কী? আমরা যখন বলি, কমলের চেহারায় না আছে ছিরি না আছে ছাঁদ, তখন তার দ্বারা আমরা কী বোঝাতে চাই? এইটেই তো বোঝাতে চাই যে, কমলের চেহারা একে বিচ্ছিরি তায় বেঢপ। তাই না? (ছাঁদ কথাটা ছন্দ থেকেই এসেছে।) তাহলেই দেখা যাচ্ছে, যেমন কবিতার চেহারায়, তেমনি মানুষের চেহারাতেও ছন্দ থাকা চাই।

মজা এই যে, ছন্দ না-থাকাটাও এক রকমের ছন্দ। কবিতায় না হোক, অন্য সব ব্যাপারে।

বড়ো রাস্তা দিয়ে ভীমবেগে এইমাত্র একটা লরি চলে গেল। তার ওই ভীমবেগে যাবার একটা ছন্দ আছে। লরি আসছে দেখবামাত্র দুটি লোক রাস্তা থেকে লম্ফ দিয়ে ফুটপাতে উঠে পড়লেন। তাঁদের ওই লম্ফ দিয়ে ফুটপাতে উঠবারও একটা ছন্দ আছে। ফুটপাথে উঠে তাঁদের এক জন, যেন কিছুই হয়নি এইভাবে, একটা বিড়ি ধরালেন। তার একটা ছন্দ আছে। অন্যজন, তখনও তাঁর ভয় কাটেনি, ঝাড়া তিন মিনিট চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারও একটা ছন্দ আছে।

ছন্দ আছে সবকিছুতেই। নাতিবিখ্যাত কিন্তু অতিশক্তিমান এক বাঙালি প্রাবন্ধিকের লেখায় দুই ভদ্রলোকের প্রাতঃকালীন ভ্রমণের বর্ণনা দেখেছি। একজন মোটা, অন্যজন রোগা। একজন ঘোঁতঘোঁত করে হাঁটেন, অন্যজন পন্‌পন্‌ করে হাঁটেন। এই দুই রকমের হাঁটারই ছন্দ আছে।

আলোচনাকে এবারে কিছুটা উচ্চস্তরে উঠিয়ে আনি। রবীন্দ্রকাব্যের নায়িকা মাকে জিজ্ঞেস করছেন, "কী ছাঁদে কবরী বাঁধি লব আজ"। কেউ জানে না, শেষ

পর্যন্ত তিনি কোন্ কায়দায় খোঁপা বেঁধেছিলেন। কিন্তু যে-কায়দাতেই বাঁধুন, তাতে ছন্দ নিশ্চয়ই ছিল। ছন্দ যেমন টান-খোঁপাতে আছে, তেমনি এলো-খোঁপাতেও আছে। চুড়ো-খোঁপাতেও আছে, আবার লতানে খোঁপাতেও আছে।

ছন্দ আছে সর্বত্র। কুঁড়েঘরেও আছে, আবার আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকাতেও আছে। গৃহিণীর চাঁদপানা মুখেও আছে, আবার পাওনাদারের হাঁড়িপানা মুখেও আছে। চেয়ারে বসে ফাইল সই করাতেও আছে, আবার ঘাম ঝরিয়ে মোট বওয়াতেও আছে। আজ সকাল থেকে এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। এর একটা ছন্দ আছে। আবার হাওয়া যখন মরে যাবে, এবং গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়বে না, তখন তারও একটা ছন্দ থাকবে। চোখের সামনে আমরা যা-কিছু দেখি, যা-কিছু শুনি, তার সবকিছুতেই— সমস্ত চলায়, সমস্ত বলায়, সব রকমের কাজে কিংবা অকাজে— ছন্দ রয়েছে। ছন্দ মানে এখানে ঢং কিংবা ডৌল কিংবা রীতি। সেটা কোথায় নেই?

এ-বাড়ির গিন্নি বলেন, ও-বাড়ির নতুন বউয়ের চলনে নেই। কিন্তু সেটা রাগের কথা। আসলে ও-বাড়ির নতুন বউয়ের চলনেও একটা ছন্দ আছে ঠিকই, তবে কিনা এ-বাড়ির গিন্নির সেটা ভালো ঠেকছে না।

যা বলছিলুম। গাড়ি, বাড়ি, চলা, বলা, মাঠ, নদী, মেঘ, পাহাড়— সবকিছুরই একটা-না-একটা ছন্দ আছে। আছে কবিতারও। কিন্তু কবিতার ছন্দ বলতে যে-কোনও রকমের একটা ছাঁদ বোঝায় না। সে-ও এক রকমের ছাঁদই, তবে কিনা তার নিজস্ব কতকগুলি নিয়মকানুন থাকে। মুখে আমরা যেসব কথা বলি, তাকে যদি সেই নিয়মকানুনের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পারতুম, মুখের কথাও তাহলে কবিতা হয়ে উঠত।

বেঁধে ফেলার প্রস্তাব শুনেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ছন্দ এক রকমের বন্ধন। কথাকে যা কিনা নিয়মের মধ্যে বাঁধে। কিন্তু আর-এক দিক থেকে দেখতে গেলে, ঠিক বন্ধনও এটা নয়। রবীন্দ্রনাথ একে সেই দিক থেকেই দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ।"

শুনে অনেকের ধাঁধা লাগতে পারে। বন্ধন কীভাবে মুক্তির পথ খুলে দেয়, সেই জটিল তত্ত্বটাকে সহজে বুঝিয়ে বলবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাই সেতারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সুরকে ভালোভাবে মুক্তি দেবার জন্যেই তো সেতারের তারগুলিকে টান করে বেঁধে নিতে হয়। এ-ও সেই ব্যাপার। কথাকে যদি না ছন্দে বাঁধি, তার অন্তরের সুর তাহলে ভালো করে মুক্তি পায় না।

ছন্দ আসলে কথার মধ্যে গতির তাড়া জাগিয়ে দেয়। আর এই গতির তাড়া জেগে উঠলেই আমরা দেখতে পাব যে, এমনিতে যাকে হয়তো খুব সহজ কথা

বলে মনে হয়, তারও চেহারা কেমন পালটে গিয়েছে; আমাদের আটপৌরে কথাগুলিও তখন আশ্চর্য এক রহস্যের ছোঁয়ায় কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই।

ধরা যাক, আমাদের বলবার কথাটা এই যে, সারাটা দিন যা হোক কোনওক্রমে কেটে গেছে, কিন্তু বিকেলটা আর কাটতে চাইছে না। এমন কথা তো আমরা কতদিনই বলি। বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা ফুরিয়েও যায়। কিন্ত এই কথাটাকেই রবীন্দ্রনাথ যখন ছন্দে বেঁধে বলেছেন, তখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, বলবার পরেও তার রেশ ফুরিয়ে যাচ্ছে না। সামান্য ওই কয়েকটি কথার মধ্যেই উদাস একটি বেদনার গতি এমন আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে যে, শব্দগুলিকে সেই গতিই যেন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্রোতার অন্তরে বারবার গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে একটি শব্দমালা :

"সকল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।"

রবীন্দ্রনাথ, বলাই বাহুল্য, গদ্যেও এই কথাগুলিকে খুবই মর্মগ্রাহী করে বলতে পারতেন। কিন্তু ছন্দের বাঁধনে এইভাবে না বাঁধলে, কথাগুলির মধ্যে একটি বেদনার গতিকে হয়তো এতটাই মোক্ষমভাবে জাগিয়ে তোলা যেত না। এ যেন কথার নেপথ্য থেকে একটি দীর্ঘশ্বাসও বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া গেল।

শুধু বেদনার কথা কেন, ফুর্তির কথাকেও ছন্দে বেঁধে চঞ্চল করে তোলা যায়। শুনে, শ্রোতার মনও হঠাৎ কেমন চনমন করে ওঠে।

কথা এই যে, ছন্দ এক রকমের নয়। আবার একই ছন্দের মূল কাঠামোর মধ্যে নানান রকমের বৈচিত্র্যের খেলা দেখানো যেতে পারে। সেটা অবশ্য পরের কথা। তার আগে মূল ছন্দগুলির পরিচয় জানা চাই।

বাংলা কবিতার তিন ছন্দ

রবিবার সকাল। আপিসের তাড়া নেই। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে, চোখ বুজে, তাই ছন্দ-ভাবনায় মগ্ন হয়ে ছিলুম। ভাবছিলুম যে, বাংলা কবিতা মোটামুটি তিন রকমের ছন্দে লেখা হয় :

১) অক্ষরবৃত্ত ২) মাত্রাবৃত্ত ৩) স্বরবৃত্ত।

বাংলা ছন্দের এই নাম নিয়ে অবশ্য আপত্তি উঠেছে। আপত্তির যে কারণ নেই, তা-ও নয়। কিন্তু...

চিন্তায় বাধা পড়ল। অন্নচিন্তা চমৎকারা। সুতরাং চক্ষু বুজে কাব্যচিন্তায় মগ্ন হওয়া অসম্ভব। (আমি আগেই আভাস দিয়েছি যে, আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকেই কবি। ইস্তক আমার ভৃত্যটিও, কাজ না করুক, চমৎকার ছড়া মেলায়।) কানের কাছে হঠাৎ ঝংকার উঠল :

কর্মের বেলায় ঢুঢু, শুধু নিদ্রা দাও!
ওঠো বাবু কুম্ভকর্ণ, বাজারেতে যাও।

গৃহিণীর কণ্ঠ! আমি যে ছন্দ নিয়ে চিন্তা করছি, তা তিনি বুঝতে পারেননি। ভেবেছেন, স্রেফ ফাঁকি দেবার জন্যে মটকা মেরে শুয়ে আছি। বলা বাহুল্য, তাঁর বাক্যের মধ্যে যে একটা গঞ্জনার ব্যঞ্জনা ছিল, সেটা আমার আদপেই ভালো লাগেনি; 'কুম্ভকর্ণ' সম্বোধনটা তো রীতিমতো আপত্তিকর মনে হল। তবু গুণগ্রাহী মানুষ বললেই তাঁর সহজাত কাব্যপ্রতিভায় আমি মুগ্ধ হলুম।

বিছানা ছেড়ে তক্ষুনি অবশ্য উঠলুম না। কিন্তু শুয়ে থাকবারই-বা উপায় কী। খানিক বাদেই আমার আট বছরের নাতিটি এসে চেঁচাতে লাগল :

সক্কলে ডেকে ডেকে হদ্দ হল যে,
এক্ষুনি ওঠো, যাও খাদ্যের খোঁজে।

এর পরে আর শুয়ে থাকা চলে না। থলি নিয়ে বাজারের পথে রওনা হতে হল। ফিরতি পথে একবার মুদির দোকানে যাবার দরকার ছিল। কিন্তু যাওয়া হল না। না-যাবার হেতুটা অতিশয় প্রাঞ্জল। গত মাসের বিল অদ্যাবধি শোধ করা হয়নি,

এবং আমি শ্রীকবিকঙ্কণ সরখেল যে একজন পুরোদস্তুর কবি, এই কথাটি বিলক্ষণ জানা সত্ত্বেও গতকাল মুদি আমাকে ধারে এক কিলো বাদামতেল দিতে আপত্তি করেছিল। শুধু তা-ই নয়, তার বিল আপাতত মেটানো হবে না শুনেই সর্বসমক্ষে সে আমার তেলের বোয়মটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "যান যান মশাই, কবিকে তেল দেওয়া আমার কম্ম নয়।"

কথাটা মনে পড়ে যেতেই মুদির দোকানের সান্নিধ্য বর্জন করে আমি অন্য পথে বাড়ি ফিরলুম। ফিরেই বুঝলুম, বাড়িতে তেল না থাক, ঘি আছে, এবং প্রাতরাশের জন্যে লুচি ভাজবার আয়োজন হচ্ছে। রাঁধুনি বামনিকে তো আমার কন্যার উদ্দেশে স্পষ্টই বলতে শোনা গেল :

দিদি আসুন, ময়দা ঠাসুন,
আজকে রবিবার।
মোহনভোগের সঙ্গে লুচি,
জমবে চমৎকার।

শুনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হলুম। তার কারণ নেহাত এই নয় যে, বাড়িতে লুচি হলে আমিও তার ভাগ পাব। বলা বাহুল্য, সেটাও একটা কারণ বটে, তবে আমার আনন্দের প্রধান কারণটা এই যে, আজ সকালে ঘুম ভাঙবার পর, মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই, বাংলা কবিতার প্রধান তিনটি ছন্দের নমুনা আমি পেয়ে গিয়েছি।

এখন দেখা যাক, একই কথাকে নানান রকমের ছন্দে আমরা বাঁধতে পারি কিনা।

না না, আর ওই হাট-বাজার-তেল-ঘি-কয়লা-কেরোসিন নয়; আসুন, কবিদের যা কিনা খুবই প্রিয় প্রসঙ্গ, সেই পূর্ণিমার চাঁদ নিয়ে কিছু লিখি। ধরা যাক, আমাদের বলবার কথাটা এই যে, শ্রাবণ মাসের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, আর সেই গোল চাঁদকে একটা সোনার থালার মতো দেখাচ্ছে। এখন এই কথাগুলিকে যদি ছন্দে বেঁধে বলতে হয়, তো আমরা কীভাবে বলব? প্রথমত এইভাবে বলতে পারি :

দ্যাখো ওই পূর্ণচন্দ্র শ্রাবণ-আকাশে,
স্বর্ণের পাত্রটি যেন শূন্য 'পরে ভাসে।

এ হল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ (পরবর্তীকালে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এর নাম দিয়েছেন 'মিশ্রকলাবৃত্ত'। আর শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ছন্দকে বলেন 'তানপ্রধান'।) শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণচন্দ্র আদৌ দেখা সম্ভব কি না, এক্ষুনি সেই কূটকচালে তর্ক তুলে লাভ নেই; তার চাইতে বরং ভাবা যাক, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে আমাদের বক্তব্যের সুর কি ঠিকমতো বেজে উঠল? যদি মনে হয়, বাজেনি, তো এই একই বক্তব্যকে আমরা অন্য ছাঁদেও বাঁধতে পারি। ছন্দ পালটে লিখতে পারি :

আকাশে ছড়ায় পূর্ণচাঁদের বাণী
শ্রাবণ-রাত্রি হাসে ;
দেখে মনে হয়, স্বর্ণপাত্রখানি
নীল সমুদ্রে ভাসে।

এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। (শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এর নতুন নাম দিয়েছেন 'কলাবৃত্ত'। আর শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একেই বলেন 'ধ্বনিপ্রধান' ছন্দ।) লাইনগুলি আর-এক বার পড়ে দেখুন; ঠিক বুঝতে পারবেন যে, এর দোলাটা একেবারে অন্য রকমের। এতক্ষণ যেন শান্ত জলে নৌকো চলছিল, এবার ঢেউয়ের দোলায় উঠছে-নামছে। এই দোলাটা কি ভালো লাগছে আপনাদের? নাকি মনে হচ্ছে যে, এ-ও যেন ঠিক মনের মতো হল না? বেশ তো, তাহলে আসুন, আমাদের কথাগুলিকে এবারে আর-এক রকমের ছন্দে দুলিয়ে দেওয়া যাক। লেখা যাক :

দ্যাখো দ্যাখো আজকে যেন
শ্রাবণ-পূর্ণিমায়
সোনার থালা আটকে আছে
নীল আকাশের গায়।

এ হল স্বরবৃত্ত ছন্দ। (শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এই ছন্দকে এখন 'দলবৃত্ত' বলেন। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন 'শ্বাসাঘাতপ্রধান' ছন্দ।)

দেখা যাচ্ছে, একই কথাকে আমরা তিন রকমের ছন্দে বাঁধলুম। নমুনা তিনটিকে এবারে পাশাপাশি মিলিয়ে নিন, তাহলেই এদের পার্থক্যটা বেশ স্পষ্ট করে ধরা পড়বে। পার্থক্য এদের মাত্রায়, পার্থক্য এদের ঝোঁকে, পার্থক্য এদের পর্ব-বিন্যাসে। মাত্রা, ঝোঁক, পর্ব—এসব কথা নতুন ঠেকছে তো? ভয় নেই, ছন্দের আলোচনা আর-একটু এগোলেই এসব জল হয়ে যাবে।

অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ

আপনারা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছেন যে, বাংলা কবিতার ছন্দ মোটামুটি তিন রকমের। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত। শুধু যে তাদের নামই আপনারা জেনেছেন তা নয়, চেহারাও দেখেছেন। কিন্তু সে-দেখা নেহাতই এক লহমার। তার উপরে নির্ভর করে কি আর কবিতা লিখতে বসে যাওয়া যায়? তা ছাড়া আমরা সেকেলে মানুষ। আমরা পাত্রী দেখতুম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মেয়ের দাঁত উঁচু কি না, খড়ম-পা কি না, হাত কাঠি-কাঠি কি না, খোঁপা খুলে দিলে চুলের ঢাল কোমর ছাড়িয়ে নীচে নামে কি না, হাসলে পরে মুক্তো না ঝরুক, গালে টোল পড়ে কি না, সব দিকে আমাদের নজর থাকত। এমনকি, 'একবার হাঁটো তো মা', বলে এক বারের জায়গায় পাঁচবার হাঁটিয়ে নিয়ে তার চলনের ভঙ্গিটিও আমরা দেখে নিতুম। সুতরাং ছন্দকেই বা আমরা অল্পে ছাড়ব কেন? আসুন, সেকালে যেভাবে পাত্রী দেখা হত, ছন্দকেও সেইভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখা যাক।

প্রথমেই দেখব অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে। শুধু যে দেখব তা নয়, তার কুলশীলগাঁঞি-গোত্রমেল ইত্যাদিরও একটু-আধটু খোঁজ নেব। এসব ব্যাপারে অল্পে তুষ্ট হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়।

নাম-পরিচয়ের প্রসঙ্গে বলি, যাকে আমরা অক্ষরবৃত্ত বলছি, তার আরও কিছু নাম আছে। যথা, অক্ষরমাত্রিক, বর্ণমাত্রিক ইত্যাদি। অক্ষরবৃত্ত নামটা শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া। তা ছাড়া তিনি একে যৌগিক ছন্দও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একে কখনও বলেছেন সাধু ছন্দ, কখনও বলেছেন পয়ারজাতীয়। আর শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একে বলেন তানপ্রধান ছন্দ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনও মনে করেন যে, অক্ষরবৃত্ত নামের মধ্যে এই ছন্দের চরিত্র-পরিচয় ঠিক ধরা পড়েনি। সেই কারণেই পরবর্তীকালে অক্ষরবৃত্ত নামটি তিনি বর্জন করেছেন, এবং এর নতুন নাম দিয়েছেন মিশ্রকলাবৃত্ত। কিন্তু নামাবলি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। নামের মূল্য নামমাত্র। আর তা ছাড়া, মহাকবি শেকসপিয়র তো বলেই দিয়েছেন, গোলাপকে যে-নামেই ডাকো, তার গন্ধের তাতে তারতম্য ঘটবে না। সব ব্যাপারেই তা-ই। আর তাই, অন্যান্য নামের গন্ডগোলে না ঢুকে আপাতত ওই অক্ষরবৃত্ত নামটাই ব্যবহার করা যাক। তাতে কাজের অনেক সুবিধে হবে।

এইখানে বলে রাখি, বয়সের বিচারে অক্ষরবৃত্ত খুবই বনেদি ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত, এমনকি রবীন্দ্রকাব্যেরও সূচনাপর্বে, বাংলা কবিতা প্রধানত অক্ষরবৃত্তেই লেখা হয়েছে। কিন্তু এর থেকে আবার এমন কথা কেউ যেন ভেবে না বসেন যে, অক্ষরবৃত্ত নেহাতই সাবেক-কালের ছন্দ, একালে আর তার চলন কিংবা কদর নেই। না, তা নয়। বরং সত্যি বলতে কী, হাল আমলের কবিতায় দেখছি অক্ষরবৃত্ত আবার নতুন করে আসর জাঁকিয়ে বসেছে।

অক্ষরবৃত্তের লক্ষণ কী? লক্ষণ মোটামুটি এই যে, এ-ছন্দে যত অক্ষর বা বর্ণ, তত মাত্রা। অর্থাৎ কিনা প্রতিটি অক্ষরই এখানে একটি মাত্রার মর্যাদা পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

১) গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর
২) দ্যাখো চারু যুগ্মভুরু ললাট প্রসর
৩) শ্যামল সুন্দর প্রভু কমললোচন
৪) গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়
৫) নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
৬) পোড়া প্রণয়ের বুঝি জরামৃত্যু নাই
৭) কাঁপে তারা কাঁপে উরু গুরুগুরু করি
৮) চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
৯) ওষ্ঠাধরে বিম্বফল লজ্জা নাহি পায়
১০) বঙ্গভূমি পদে দলে তুরস্ক সোয়ার।

বাংলা কাব্যের মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে, যেমন-যেমন হাতে মিলল, দশ-দশটি পঙ্‌ক্তি তুলে নিয়ে এলুম। এদের প্রত্যেকের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে অক্ষরের সংখ্যাও যেমন চোদ্দো, মাত্রার সংখ্যাও তেমনি চোদ্দো। তার মানে এই নয় যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতার এক-একটি পঙ্‌ক্তিতে ঠিক চোদ্দোটা অক্ষরই থাকতে হবে। না, তা নয়। তবে, অক্ষরের সংখ্যা বাড়লে কিংবা কমে গেলে মাত্রার সংখ্যাও সেইসঙ্গে বাড়বে কিংবা কমে যাবে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, পঙ্‌ক্তির মাপ বাড়ুক, কিংবা কমুক, অক্ষর আর মাত্রার সংখ্যা সমান-সমানই রইল।

কথা এই যে, অক্ষরবৃত্তের পঙ্‌ক্তিকে বাড়ানো-কমানো যায় ঠিকই, কিন্তু নেহাতই খেয়ালখুশিমতো বাড়ানো-কমানো যায় না। অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধির একটা কানুন আছে, সেই কানুন মেনে তবেই লাইনটাকে বাড়ানো-কমানো চলে। কিন্তু সে-কথায় একটু বাদে ঢুকব। তার আগে জানা দরকার, এত যে মাত্রা-মাত্রা করছি, সেই মাত্রা জিনিসটা কী?

আমরা কথায় বলি, অমুক লোকটার মাত্রাজ্ঞান আছে, তমুক লোকটার নেই। ইংরেজিতে একেই বলে সেন্‌স্‌ অব প্রোপোরশান। প্রোপোরশানের বাংলা অর্থ অনুপাত। মাত্রা বলতে কি তাহলে অনুপাত বুঝব?

না, মহাশয়, কবিতায় ঠিক এই অর্থে 'মাত্রা' কথাটার ব্যবহার হয় না। তবে কোন্‌ অর্থে হয়?

জানি, আমার কপালে দুঃখ আছে, ছান্দসিকদের কাছে ধমক আমাকে খেতেই হবে। কিন্তু উপায় কী, বিজ্ঞজনেরা যতই চোখ রাঙিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করুন, মাত্রা বোঝাতে গিয়ে কোনও গুরুগম্ভীর জটিল ব্যাখ্যার অবতারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার ক্লাস খুলেছি নতুন পড়ুয়াদের নিয়ে, 'ব্যাঘ্র মানে শার্দুল' শুনলেই তাঁরা ঘাবড়ে গিয়ে ক্লাস ছেড়ে পালাবেন। তাই, কিছুটা ত্রুটির ঝুঁকি নিয়েও, খুব সহজ করে ব্যাপারটা তাঁদের বুঝিয়ে দিতে চাই। আপাতত, প্রবোধচন্দ্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এইটুকু বুঝলেই তাঁদের কাজ চলবে যে, "যার দ্বারা কোনো-কিছুর পরিমাপ করা যায়", তাকেই আমরা মাত্রা বলে থাকি। প্রবোধচন্দ্র বলেছেন, "মাত্রা মানে পরিমাপক", অর্থাৎ ইউনিট অব মেজার। এখন, বলা বাহুল্য, বস্তুভেদে ওই পরিমাপের ইউনিটও আলাদা হতে পারে, হয়ে থাকে। জল মাপবার ইউনিট যদি ফোঁটা, তো কাপড় মাপবার ইউনিট হয়তো মিটার কিংবা গজ। ইউনিটের এই বিভিন্নতার ব্যাপারটা প্রবোধচন্দ্র নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, ছন্দের রীতিভেদেও মাত্রা বিভিন্ন হয়। যাই হোক, আমার পড়ুয়ারা মোটামুটি এইটুকু জেনে রাখুন যে, কবিতার এক-একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে যে ধ্বনিপ্রবাহ থাকে, এবং তাকে উচ্চারণ করার জন্য মোট যে-সময় আমরা নিয়ে থাকি, সেই উচ্চারণকালের ক্ষুদ্রতম এক-একটা অংশই হল মাত্রা। প্রবোধচন্দ্র তারই নাম দিয়েছেন 'কলা'। 'কলা' মানে এখানে অংশ। যেমন ষোলো-কলায় চাঁদ পূর্ণ হয়, তেমনি কলা কিংবা মাত্রার সমষ্টি দিয়ে তৈরি হয় পূর্ণ এক-একটি পঙ্‌ক্তির উচ্চারণকাল।

ব্যাপারটাকে এবারে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখা যাক। 'গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর'— এই লাইনটিকে একবার চেঁচিয়ে উচ্চারণ করুন তো। করেছেন? করতে যে-সময় লাগল, সেই উচ্চারণকাল মোট চোদ্দোটি মাত্রার সমষ্টি। অর্থাৎ এই মাত্রাগুলি হচ্ছে লাইনটির উচ্চারণকালের ক্ষুদ্রতম এক-একটি অংশ। মোট মাত্রা এখানে চোদ্দো! আবার লাইনটির মোট অক্ষরের সংখ্যাও তা-ই।

কিন্তু অক্ষর আর মাত্রাকে এইভাবে তুল্যমূল্য করে দেখার একটা বিপদ আছে। যথা 'ঐ' দৃশ্যত একটিই অক্ষর বটে, কিন্তু তাকে ভেঙে 'ওই' লিখলেই অক্ষরের সংখ্যা দুয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। অথচ 'ঐ' আর 'ওই'য়ের উচ্চারণ তো একই। ফলে, অক্ষরবৃত্তে কেউ যদি 'ঐ' লিখে ওই একাক্ষর দিয়ে দু-মাত্রার কাজ চালান, তাঁকে

দোষ দেওয়া যাবে না। 'বউ' আর 'বৌ'য়ের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। 'হাওয়া', 'পাওয়া', 'খাওয়া', ইত্যাদির বেলাতেও অক্ষর আর মাত্রাকে সংখ্যার ব্যাপারে তুল্যমূল্য করে দেখবার উপায় নেই। ওসব শব্দের 'ওয়া'-অংশে যদিও দুটি অক্ষর, কার্যত সেই অক্ষর দুটি কিন্তু এক মাত্রার বেশি দাম পায় না।

তা ছাড়া আমরা চার-অক্ষরের সমবায়ে লিখি 'তোমারই' 'আমারই', কিন্তু উচ্চারণ করি 'তোমারি' 'আমারি'; তিন-অক্ষরের সমবায়ে লিখি 'সবই', কিন্তু উচ্চারণ করি 'সবি'— ধ্বনির আয়তনের বিচারে দু-অক্ষরের 'ছবি'র সঙ্গে তার ফারাক থাকে না। পরে আমরা দেখিয়ে দেব যে, অক্ষর দেখে মাত্রা গুনতে গেলে আরও নানা বিপদ ঘটতে পারে। আপাতত এইটুকু জেনে রাখুন যে, ছন্দের ব্যাপারে আসলে ধ্বনিটাই প্রধান কথা, অক্ষরটা নয়। তবু ছন্দশিক্ষার প্রাথমিক পর্বে (অর্থাৎ মাত্রা ইত্যাদির সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটেনি, তখন) অক্ষরের ভিত্তিতে ছন্দ চেনাবার চেষ্টা করেছি এই জন্যে যে, নতুন পড়ুয়ার তাতে সুবিধে হয়। সেই প্রাথমিক পর্ব তো চুকেছে; এখন বলি, অক্ষরের উপর চোখ না-রেখে ধ্বনির দিকে কান রাখুন। ছন্দনির্ণয় আর মাত্রা-বিচার তাতেই নির্ভুল হবে।

এবারে তাহলে লাইনের দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধির প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা দিতে গিয়ে ইতিপূর্বে আমি যেসব লাইন তুলে দিয়েছিলুম, তার প্রত্যেকটিই চোদ্দো মাত্রার লাইন। এবারে বলি, এ-ছন্দে ছ-মাত্রার লাইন লেখা যায়, দশ মাত্রার লাইন লেখা যায়, চোদ্দো মাত্রার লাইন লেখা যায়, আঠারো মাত্রার লাইন লেখা যায়, বাইশ মাত্রার লাইন লেখা যায়, ছাব্বিশ মাত্রার লাইন লেখা যায়— এমন কী, তিরিশ মাত্রার লাইনও আমি দেখেছি। তার বেশি বাড়াতে হলে চৌত্রিশ মাত্রায় যেতে হয়। কেউ গিয়েছেন বলে আমি জানিনে।

হ্রাসবৃদ্ধির কানুনটা তাহলে কী? এখনও সেটা বুঝতে পারেননি? ছয়, দশ, চোদ্দো, আঠারো, বাইশ— মাত্রার সংখ্যা কীভাবে বাড়ছে দেখুন। লোকে বলে চড় চড় করে বেড়ে যাওয়া, এখানে চারচার করে বাড়ছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের চাল আসলে চার মাত্রার চাল। মূলে রয়েছে চার। তার সঙ্গে, কিংবা চারের যে-কোনও গুণিতকের সঙ্গে (অর্থাৎ চার-দুগুণে আটের সঙ্গে, কিংবা তিন-চারে বারোর সঙ্গে, কিংবা চার-চারে ষোলোর সঙ্গে, কিংবা চার-পাঁচে কুড়ির সঙ্গে) দুই যোগ করলে যে-সংখ্যাটা মিলবে, তত সংখ্যার মাত্রা দিয়েই অক্ষরবৃত্তের লাইন তৈরি করা যায়।

দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

লক্ষ ঢাকঢোল
বাজিছে হোথায়।

চক্ষু হয় গোল,
লোকে মূর্ছা যায়।

এ হল ৪+২=৬ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। এত ছোটো মাপে যদি মন না ওঠে, তো এর সঙ্গে আরও চার মাত্রা জুড়ে দিয়ে ৪+৪+২=১০ মাত্রার লাইনও আমরা বানাতে পারি। ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে এই রকমের দাঁড়াবে :

ওই শোনো প্রচণ্ড দাপটে
লক্ষ ঢাকঢোল বেজে যায়।
ভক্তের আসর জমে ওঠে
ঘন-ঘন-পতনে মূর্ছায়।

আরও বাড়াতে চান? বেশ তো বাড়ান না, ফি-লাইনে আরও চারটি করে মাত্রা জুড়ে দিন। দিলে হয়তো এই রকমের একটা চেহারা মিলতে পারে :

ওই শোনো সাড়ম্বরে প্রচণ্ড দাপটে
মহোল্লাসে লক্ষ লক্ষ ঢোল বেজে যায়।
গর্জনে-হুংকারে ওই সভা জমে ওঠে
ভক্তদের ঘন-ঘন পতনে মূর্ছায়।

এ হল ৪+৪+৪+২=১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত।

ঠিক এইভাবেই আমরা আরও চারটি মাত্রা বাড়াতে পারি, এবং চোদ্দোর জায়গায় আঠারো-মাত্রার (৪+৪+৪+৪+২=১৮) লাইন বানাতে পারি। কিন্তু তার আর দরকার কী?

কথা হচ্ছে, যে-ছন্দের চাল মূলত চার মাত্রার, তার ফি-লাইনে ওই বাড়তি দু-মাত্রা যোগ করতে হয় কেন? বলি।

কবিতা পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে একটু দম ফেলবার অবকাশ চাই। একটানা তো ছোটো যায় না; ছুটতে-ছুটতে খানিক-খানিক দাঁড়িয়ে নেওয়া চাই। ওই দু-মাত্রা সেই ক্ষণিক-বিরতির ব্যবস্থা করেছে। ওদের যদি না জুড়ে দেওয়া হত, লাইনের শেষে তাহলে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যেত না। প্রথম লাইন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় লাইনের উপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হত, দ্বিতীয় লাইন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তৃতীয় লাইনের উপরে। এবং এইরকমই চলত, গোটা কবিতাটা যতক্ষণ না একেবারে ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তেমনভাবে তো আমরা কবিতা পড়তে পারিনে। পড়িমরি ছুট লাগিয়ে কবিতা পড়া যায় না; আর-কিছু না হোক, দম ফেলবার ফুরসতটুকু চাই। সেই ফুরসতটুকুই মিলিয়ে দিচ্ছে ফি-লাইনের শেষে জুড়ে-দেওয়া ওই মাত্রা দুটি। ওরা যদি না-থাকত, কবিতা পড়া তাহলে যে কী ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার হত, নীচের কয়েকটি লাইন পড়লেই তা বুঝতে পারবেন :

বাজে লক্ষ ঢাকঢোল
চতুর্দিকে হট্টগোল
আর সহ্য হয় কত,
প্রাণ হল ওষ্ঠাগত।
ভক্তেরা বিষম খান,
দলে-দলে মূর্ছা যান।

বুঝতেই পারছেন, কী হুলুস্থুলু ব্যাপার! বাড়তি দু মাত্রাকে ছেঁটে দিয়ে শুধুই চারের চালের উপরে নির্ভর করে এই ছত্র-কটি দাঁড়িয়ে আছে। তার ফল হয়েছে এই যে, দাঁড়ি-কমা থাকা সত্ত্বেও লাইনের শেষে দাঁড়ানো যাচ্ছে না; ছন্দের তাড়না এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, পাঠককে সে লাইন থেকে লাইনে ছুটিয়ে মারছে। এই ঘোড়দৌড়কে ঠেকাবার জন্যেই লাইনে-লাইনে বাড়তি দুটি মাত্রা জুড়ে দেওয়া দরকার।

কবিতার আলোচনায় ঘোড়দৌড় কথাটা যদি আপত্তিকর মনে হয়, তবে না-হয় পাখির উপমা দেব। বাড়তি দু-মাত্রা যখন থাকে না, পাখিকে তখন ক্রমাগত উড়তে হয়। আর লাইনের শেষে ওই দু-মাত্রা আশ্রয় থাকলে সেইটেকে ধরে সে একটুক্ষণের জন্যে জিরিয়ে নিতে পারে। কিংবা বলি, চারের চালের কবিতা যেন একটা বহতা নদী। ফি-লাইনের শেষের ওই দু-মাত্রা তাতে বয়ার মতন ভাসছে। সাঁতার কাটতে-কাটতে আমরা ওই বয়াকে গিয়ে ধরছি— ব্যাপারটা অনেকটা এই রকমের।

মজা এই যে, লাইনটাকে যখন একসঙ্গে দেখি, তখন গোটা লাইনের বিন্যাসের মধ্যে ওই বাড়তি মাত্রা দুটি এমন চমৎকারভাবে নিজেদের ঢেকে রাখে যে, ওরা যে আলাদা, তা ঠিক ধরাও পড়ে না। বিশেষ করে, ছয় কি দশের বৃত্ত ছাড়িয়ে আমরা যখন চোদ্দো মাত্রায় গিয়ে পৌঁছোই, অতিরিক্ত ওই দু-মাত্রাকে তখন ছন্দের মূল চালেরই অঙ্গ বলে মনে হয়। তার হেতুটা আর কিছুই নয়, লাইনের টুকরো-টুকরো অংশের যেমন ছোটো মাপের চাল থাকে, তেমনি গোটা লাইনটারও আবার একটা বড়ো মাপের চাল থাকে। ছোটো মাপের চালের দিকে যখন তাকাই, বাড়তি দু-মাত্রাকে তখন আলাদা করে দেখতে পাই; কিন্তু বড়ো মাপের চালের দিকে তাকালে আর দেখতে পাইনে। তার কারণ এই যে, ছোটো চালটা বাড়তি দু-মাত্রাকে দূরে ঠেলে দেয়; বড়ো চাল তাকে নিজের মধ্যে টেনে আনে। হাতেকলমে বুঝিয়ে দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে—

ওই শোনো সাড়ম্বরে প্রচণ্ড দাপটে
মহোল্লাসে লক্ষ লক্ষ ঢোল বেজে যায়।

এই-যে দুটি লাইন, ছোটো চালের হিসেব মেনে যদি এদের ভাগ করে ফেলি, ব্যাপারটা তাহলে এইরকম দাঁড়াবে—

ওই শোনো/সাড়ম্বরে/প্রচণ্ড দা/পটে
মহোল্লাসে/লক্ষ লক্ষ/ঢোল বেজে/যায়।

এইভাবে ভাগ করে দেখতে পাচ্ছি, ফি-লাইনের এক-এক অংশে (এই অংশেরই অন্য নাম 'পর্ব') চারটি করে মাত্রা পড়ছে, আর লাইনের প্রান্তে পড়ে থাকছে সেই বাড়তি দু-মাত্রা।

কিন্তু কবিতা পড়বার সময়ে তো ঠিক এই রকমের ছোটো চালে পা ফেলে আমরা পড়িনে। আর-একটু লম্বা চালে এইরকমে পড়ি—

ওই শোনো সাড়ম্বরে/প্রচণ্ড দাপটে
মহোল্লাসে লক্ষ লক্ষ/ঢোল বেজে যায়।

তখন মনে হয়, লাইনগুলি যেন দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আট মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে ছ-মাত্রা।

অক্ষরবৃত্তের আঠারো মাত্রার লাইনকেও এই বড়ো চালে ভাঙা যায়। ভাঙলে তার প্রথম ভাগে পড়বে আট মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে দশ মাত্রা।

মোটকথা, বড়ো চালে যখন চলি, লাইনের শেষের বাড়তি দু-মাত্রাকে তখন আর আলাদা করে ধরতে পারিনে। বাইরের লোক হয়েও সে তখন ছন্দের ভিতরে এসে ঢুকে পড়ে; বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে না থেকে অন্দরমহলে এসে আপনার লোক হয়ে যায়।

অক্ষরবৃত্তের চেহারা দেখলুম, চরিত্রের খোঁজখবর নিলুম, চালচলনেরও একটা আন্দাজ পাওয়া গেল। কিন্তু মোদ্দা কথাটা বোঝা গেল কি?

আলোচনার সুবিধের জন্যে আবার চলুন ধ্বনিকে ছেড়ে অক্ষরের কাছে ফিরে যাই। আমি বলেছি, এ-ছন্দের এক-এক লাইনে অক্ষর যত, মাত্রাও তত। এইটেই সাধারণ নিয়ম। এর যে ব্যতিক্রম হয় না, তা নয়। বিস্তর হয়। তার কারণ, ধ্বনি সর্বদা অক্ষরের আঁচল ধরে চলে না। কিন্তু ব্যতিক্রমের কথা এখুনি বলতে চাইনে। পরে বলব। অক্ষরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও অনেকসময়ে ধ্বনির পরিসর কেন বাড়ে না, এবং মাত্রার যোগফলও তার দরুন একটা নির্দিষ্ট হিসেবের মধ্যেই থেকে গিয়ে কীভাবে লাইনের ভারসাম্যকে ধরে রাখে, তা-ও বলব। আপাতত শুধু সাধারণ নিয়ম নিয়েই আলোচনা করা যাক।

সাধারণ নিয়মটা এই যে, অক্ষর আর মাত্রার সংখ্যা এতে সমান-সমান। তার চাইতেও জরুরি কথা, অক্ষর আর যুক্তাক্ষর এ-ছন্দে তুল্যমূল্য; অক্ষরবৃত্তের লাইনে যদি যুক্তাক্ষর-সংবলিত শব্দ ঠেসেও বসান, মাত্রা-সংখ্যার তবু ইতরবিশেষ হবে না।

লাইনের ওজন তাতে বাড়বে বটে, কিন্তু দৈর্ঘ্য তার ফলে মাত্রার সীমা ছাড়াবে না। অর্থাৎ ছন্দও বে-লাইন হবে না।

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রথমে আসুন দশ-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখি।

নিশীথিনী ভোর হয়ে আসে
আলো ফোটে পুবের আকাশে।

দশ-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে লেখা এই যে দুটি লাইন, এর মধ্যে যুক্তাক্ষর একটিও দেওয়া হয়নি। দিয়ে দেখা যাক কী হয়।

অমারাত্রি ভোর হয়ে আসে
আলো ফোটে পূর্বের আকাশে।

কী হল? কিছুই হল না। এক-এক লাইনে একটি করে যুক্তাক্ষর ঢোকালুম, কিন্ত অক্ষরবৃত্ত তাকে দিব্যি গিলে নিল। দশ-মাত্রা দশ-মাত্রাই আছে, এগারো হয়ে গিয়ে ছন্দপতন ঘটায়নি।

আরও কিছু ভার তাহলে চাপানো যাক :

অন্ধকার সাঙ্গ হয়ে আসে
রক্ত-আভা পূর্বের আকাশে।

এক-এক লাইনে এবারে দু-দুটো করে যুক্তাক্ষর বসালুম। কিন্ত তাতেই-বা কী হল? মাত্রা সেই দশেই আটকে আছে।

ভার তাহলে আরও বাড়িয়ে দেখি।

কৃষ্ণরাত্রি সাঙ্গ হয়ে আসে
রক্তচ্ছটা পূর্বের আকাশে।

কিন্তু তাতেও কিছু ইতরবিশেষ হল না। ফি-লাইনে তিন-তিনটে যুক্তাক্ষরকে অক্লেশে গিলে নিয়ে দশ-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত সেই দশ মাত্রাতেই দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে।

দশ মাত্রায় যদি মন না ওঠে তো চোদ্দো-মাত্রার লাইন নিয়ে পরীক্ষা করুন।

'চলো ভাই মাঠে যাই বেড়াইয়া আসি'

বাল্যে-পাঠ্য একটি বিখ্যাত কবিতার এটি প্রথম লাইন। এর ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। অক্ষরের সংখ্যা এখানে চোদ্দো, মাত্রার সংখ্যাও তা-ই। যুক্তাক্ষর এতে একটিও নেই। কিন্তু থাকলেও তার ফলে মাত্রার সংখ্যা বেড়ে যেত না। প্রমাণ দিচ্ছি :

চলো বন্ধু মাঠে যাই বেড়াইয়া আসি

ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা বন্ধুকে এনে ঘরে ঢোকালুম। ফলে একটি যুক্তাক্ষরও এল। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু চোদ্দো-ই। এবার দেখুন :

চলো বন্ধু মুক্ত-মাঠে বেড়াইয়া আসি।

দু-দুটি যুক্তাক্ষর ঢুকেছে। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু বাড়েনি। অতঃপর :

চলো বন্ধু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মাঠে যাই।

অর্থাৎ তিন-তিনটে যুক্তাক্ষর ঢুকল। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু সেই চোদ্দোই, তার বেশি নয়। কিংবা :

সাঙ্গোপাঙ্গা সঙ্গো নিয়ে মুক্ত-মাঠে চলো

এবারে চার-চারটে যুক্তাক্ষর। কিন্ত লাইনের মাত্রাসংখ্যা তবু সেই চোদ্দোতেই ঠেকে আছে, এক ক্রান্তিও বাড়েনি।

যুক্তাক্ষরের সংখ্যা এইভাবে আরও বাড়ানো যায়। কত যে বাড়ানো যায়, সেটা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'

যুক্তাক্ষর এখানে গিসগিস করছে। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু সেই চোদ্দো তো চোদ্দোই, ওজনে-ভারী এতগুলি যুক্তাক্ষরকে বক্ষে ধারণ করেও অক্ষরবৃত্তের এই লাইনটি তবু সেই চোদ্দো-মাত্রাতেই ঠেকে আছে।

অক্ষরবৃত্ত যেন সর্বংসহা বসুন্ধরার মতো। তার উপরে যতই-না কেন ভার চাপানো হোক, মুখ বুজে সে সহ্য করবে। তার জন্যে সে বাড়তি-মাত্রার মাশুল চাইবে না; যেমন অন্যান্য অক্ষরকে, তেমনি যুক্তাক্ষরকেও সে মাত্র এক-মাত্রার মূল্যেই বহন করে। তার দৃষ্টান্তও আমরা দিয়েছি।

কথা এই যে, দুটি অক্ষর যদি দৃশ্যত পরস্পরের সঙ্গো যুক্ত না-হয়েও শ্রবণের বিচারে পরস্পরের সঙ্গো জুড়ে যায়, তো অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় সেই অক্ষরদুটিকে— দৃশ্যত তারা যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও— মাত্র একমাত্রার মাশুল দিয়েই তরিয়ে দেওয়া যায় কি? যায় না, এমন কথা কেমন করে বলব? কবিরা অনেক ক্ষেত্রে দিব্যি তরিয়ে দেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

কর্পূর-সুবাসে জল ভরপুর হয়েছে

এই যে লাইনটি, এর মধ্যে 'কর্পূর' শব্দটি যে তিন-মাত্রা, তাতে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, 'ভরপুর'ও কি তা-ই?

হ্যাঁ, তা-ই। তার কারণ, 'ভরপুর'-এর 'রপু' দৃশ্যত যুক্ত নয় বটে, কিন্তু শ্রবণের বিচারে যুক্ত। কান তাকে 'ভর্পুর' হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এবং ছন্দবিচারে চোখ নয়, কানই যে হাকিম, তা কে না জানে!

অক্ষরের চাইতে ধ্বনি বড়ো। অক্ষর তো আর-কিছুই নয়, ধ্বনিরই একটা দৃশ্যরূপ মাত্র। আসলে যা ধর্তব্য, তা হচ্ছে ধ্বনি। তাই, চোখের নয়, কানের রায়ই শিরোধার্য। আর তাই, অক্ষরবৃত্তের লাইনে চার অক্ষরের শব্দ 'কলকাতা'কে অক্লেশে তিন-মাত্রা হিসেবে চালানো যায় (কেন-না কান তাকে 'কল্কাতা' বলে জানে), পাঁচ-অক্ষরের শব্দ 'খিদিরপুর'কে চালানো যায় চার-মাত্রা হিসেবে (কেন-না কানের কাছে সে 'খিদির্পুর'), ছ-অক্ষরের শব্দ 'কারমাইকেল'কে তরিয়ে দেওয়া যায় পাঁচ-মাত্রার মাশুল দিয়ে (কেন-না কর্ণে তিনি 'কার্মাইকেল')। অক্ষরবৃত্ত

ছন্দের এই একটা মস্ত সুবিধে। যেখানে সম্ভব, শব্দকে সেখানে অক্ষরের তুলনায় কম-মাত্রার মাশুল দিয়ে তরানো যায়, ছন্দের ভারসাম্য তাতে নষ্ট হয় না। আবার তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

চারজন হাড়গিলে-ছোকরা ঘুরবার বাতিকে
কাতরাতে কাতরাতে চলল হাতরাসের দিকে।

লক্ষ করে দেখুন, এই লাইন দুটির প্রত্যেকটিতেই অক্ষরের সংখ্যা আঠারো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা চোদ্দো মাত্রার লাইন হিসেবে চলতে পারে। তার কারণ, চক্ষু এদের যে-চেহারাই দেখুক, কানের কাছে সংকুচিত হয়ে গিয়ে এরা এই রকমের চেহারা নেয় :

চার্জন হার্গিলে ছোক্রা ঘুর্বার বাতিকে
কাত্রাতে কাত্রাতে চল্ল হাত্রাসের দিকে।

আবার বলি, ছন্দের ব্যাপারে অক্ষর-বস্তুটা কিছু নয়, সে ধ্বনির-প্রতীক মাত্র, এবং ধ্বনিটাই হচ্ছে একমাত্র ধর্তব্য বিষয়। পরে তার আরও অজস্র প্রমাণ মিলবে।

বুদ্ধিমান পড়ুয়া আশা করি ইতিমধ্যেই একটা জরুরি কথা বুঝে নিয়েছেন। সেটা এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সংকোচনকে প্রশ্রয় দেয়, আর তাই হসন্ত অক্ষরমাত্রেই সেখানে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গো জুড়ে গিয়ে তার আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিশেষত, যুক্ত হবার বিধি যেখানে আছেই, সেখানে— দৃশ্যত আলাদা থাকলেও— শ্রবণের বিচারে যুক্ত হতে তাদের কিছুমাত্র আটকায় না। 'ল'য়ে 'ক'য়ে মিলন প্রথাসম্মত বলেই 'কলকাতা' আমাদের শ্রবণে 'কল্কাতা' হয়, 'ত'য়ে 'ত'য়ে মিলন রীতিসিদ্ধ বলেই 'পাততাড়ি' গুটিয়ে গিয়ে হয় 'পাত্তাড়ি'।

কিন্তু মিলন যেখানে রীতিসিদ্ধ নয়, শ্রবণ কি সেখানেও অসবর্ণ বিবাহে অনুমোদন দেয়? তা-ও দেয়। এবং আমি যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম, শ্রবণের অনুমোদন নিয়ে, সেই অসবর্ণ মিলন ঘটাতে সাহসী হয়েছিলেন। 'আকবর বাদশার সঙ্গো হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই'— 'বাঁশি' কবিতার এই লাইনটির সঙ্গো সকলেই পরিচিত। ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। তার প্রশ্রয়ে 'আকবর' হয়েছে তিন-মাত্রা; 'বাদশা'র শব্দটিও তা-ই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, 'ক'য়ে 'ব'য়ে মিলন রীতিবিরুদ্ধ নয় বটে, কিন্তু সেই 'ব'-ফলায় ইংরেজি 'বি'-অক্ষরের ধ্বনি আসে না (দৃষ্টান্ত : পক্ব, নিক্বণ), এক্ষেত্রে কিন্তু সেই ধ্বনিকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়েই কবি তাকে 'ক'য়ের সঙ্গো জুড়েছেন। 'বাদশা'র ব্যাপারটাও সমান চমকপ্রদ। 'দ'য়ে 'শ'য়ে যুক্ত হবার রীতি নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তবু অসম সাহসে তাদের মিলিয়ে দিয়েছেন।*

---

* 'পরিশিষ্ট' -অংশে জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার চিঠি দেখুন।

একালের কবিতায় অবশ্য এমন অসবর্ণ মিলন আকছার ঘটতে দেখি। কিন্তু ভুলে না যাই যে, রবীন্দ্রনাথই এই দুঃসাহসিক মিলনের প্রথম পুরোহিত। অক্ষরবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের ক্লাসে এযাবৎ যেসব কথাবার্তা হল, তার থেকে ছেঁকে নিয়ে মোদ্দা কথাটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে :

১) ৪ কিংবা তার গুণিতকের সঙ্গে ২ যোগ করলে যে-সংখ্যাটা পাওয়া যায়, সেই সংখ্যার মাত্রা দিয়েই তৈরি করা যায় অক্ষরবৃত্ত কবিতার লাইন।

২) এ-ছন্দ শব্দের সংকোচনকে প্রশ্রয় দেয়; তাই শব্দের ভিতরকার হসন্ত অক্ষর এ-ছন্দে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। দৃশ্যত যেখানে তারা যুক্ত হয় না, সেখানেও তারা শ্রবণে যুক্ত হয়; ফলে দৃশ্যত তারা পৃথক থাকে বটে, কিন্তু শ্রবণে তারা মিলিত হয়ে দুয়ে মিলে একটিমাত্র মাত্রার মর্যাদা পায়।

৩) দুটি অক্ষরের মিলন যেখানে রীতিসিদ্ধ, সেখানে তো শ্রবণের অনুমোদন নিয়ে মিলিত হয়ই (খিদিরপুর = খিদির্পুর = ৪ মাত্রা),— মিলন যেখানে রীতিসিদ্ধ নয়, সেখানেও অনেকসময়ে শ্রবণের ঔদার্যে তাদের অসবর্ণ বিবাহ ঘটে, এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দ তাতেও বেজার হয় না (বাদশা = ২ মাত্রা)।

অক্ষরবৃত্তে এই অসবর্ণ মিলনের সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতা থেকে তুলে দিয়েছি। এবারে দেখা যাক, আমরা নিজেরাও এইভাবে অক্ষরে-অক্ষরে অসবর্ণ বিবাহ ঘটাতে পারি কি না।

বাজনা বাজে পূজার প্রাঙ্গণে;
ফোটেনি সজনের কুঁড়িগুলি।
খাজনার আতঙ্ক জাগে মনে,
শস্য খেয়ে গিয়েছে বুলবুলি।

এ-ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই কবিতা। এর ফি-লাইনে অক্ষরের সংখ্যা এগারো বটে, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা দশ। তার কারণ আর-কিছুই নয়, ফি-লাইনে এমন এক-একটা শব্দ আছে, ভিতরে হসন্ত অক্ষর থাকায় শ্রবণে যা সংকুচিত হয়ে যায়। প্রথম লাইনে সেই শব্দটি হচ্ছে 'বাজনা' (শ্রবণে গুটিয়ে গিয়ে সে দু-মাত্রার মর্যাদা পায়), দ্বিতীয় লাইনে সেই শব্দটি হচ্ছে 'সজনের' (শ্রবণে গুটিয়ে গিয়ে সে তিন-মাত্রায় দাঁড়াচ্ছে), তৃতীয় লাইনে সেই শব্দটি হচ্ছে 'খাজনার' (শ্রবণে সে-ও গুটিয়ে গিয়ে হচ্ছে তিন-মাত্রার শব্দ), আর চতুর্থ লাইনের সেই শব্দটি হচ্ছে 'বুলবুলি' (কানের কাছে যার সংকুচিত শরীরের মূল্য মাত্র তিন-মাত্রা)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে শব্দের মধ্যবর্তী হসন্ত অক্ষরের মিলন এখানে অসবর্ণ। (প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে 'জ'য়ে 'ন'য়ে মিলন ঘটেছে, যা রীতিবিরুদ্ধ। চতুর্থ ক্ষেত্রে মিলন ঘটেছে 'ল'য়ে আর ইংরেজি 'বি' অক্ষরের ধ্বনিসম্পন্ন 'ব'য়ে; তা-ও

রীতিসিদ্ধ নয়। চোখের বিচারে তারা অবশ্য আলাদাই রইল, শুধু কানের বিচারেই তারা মিলিত।)

এখন একটা মজার কথা বলি। অক্ষরের এই মিলন-লীলা যে নেহাতই ঘরোয়া, অর্থাৎ একই শব্দের গণ্ডির মধ্যে যে এই মিলন চলে, তা কিন্তু নয়। এতক্ষণ অবশ্য শুধু ঘরোয়া মিলনেরই দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এইবার বলি, এক বাড়ির মেয়ে যেমন অন্য বাড়ির ছেলের প্রেমে পড়ে, তেমনি এক-শব্দের অক্ষর অনেকসময়ে আর-এক শব্দের অক্ষরের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। সেসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, শব্দের প্রান্তবর্তী হসন্ত অক্ষরটি পরবর্তী শব্দের আদ্যক্ষরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

কালকা মেলে টিকিট কেটে সে
কাল্ গিয়েছে পাহাড়ের দেশে

এর মধ্যে, অক্ষর-সংখ্যা যা-ই হোক, 'কালকা মেলে' শব্দ দুটির মোট মাত্রা-সংখ্যা ৪; 'কাল গিয়েছে'র মাত্রা-সংখ্যাও তা-ই। কানের কাছে এদের প্রথমটির চেহারা 'কাল্কা মেলে'; দ্বিতীয়টির চেহারা 'কাল্গিয়েছে'। অক্ষরে-অক্ষরে মিলন ঘটেছে দুটি ক্ষেত্রেই। কিন্ত প্রথম ক্ষেত্রে সে-মিলন ঘরোয়া ('কালকা' শব্দটার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ) আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিলন ঘটেছে এক শব্দের ('কাল') শেষ অক্ষরের (যা কিনা হসন্ত) সঙ্গে তার পরবর্তী শব্দের ('গিয়েছে') প্রথম অক্ষরের।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। অক্ষরে-অক্ষরে মিলন ঘটিয়ে, যুক্তাক্ষরের মায়া সৃষ্টি করে, মাত্রা কমাতে মজা লাগে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু মজা লাগে বলেই যে প্রতি পদে এইভাবে মিলন ঘটাতে হবে, তা কিন্তু ঠিক নয়। এসব সেয়ানা কৌশল বারবার খাটালে এর চমকটাই আর থাকে না, পাঠকও বিরক্ত বোধ করেন। আর তা ছাড়া, কবিতার মধ্যে এই ধরনের মিলনের বাড়াবাড়ি ঘটলে ছন্দ-অনুসরণেও তাঁর অসুবিধে ঘটে। লক্ষ রাখতে হবে, কবিতার ছন্দের মধ্যে পাঠক যেন বেশ স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারেন; তারপর ভিতরে ঢুকে যখন কিনা বেশ অনায়াসে তিনি চলাফেরা করে বেড়াচ্ছেন, তখন বরং এই ধরনের এক-আধটা চমক লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে, সেটা তাঁর ভালোই লাগবে।

আর-একটা কথা এই যে, লাইনের যে-কোনও জায়গায় কিন্তু এইভাবে অক্ষরে-অক্ষরে মিলন ঘটানো সম্ভবও নয়। অক্ষরবৃত্তের যে একটা চার-মাত্রার ছোটো চাল আছে, সেহ চালের পর্বের মধ্যেই মিলনটাকে ঘটিয়ে দেওয়া ভালো। মিলন ঘটাতে গিয়ে যদি পর্বেব বেড়া ডিঙিয়ে যাই, তাতে বিপদ ঘটতে পারে। ঘটেও।

এবারে একটা জরুরি কথা বলি। কবিতা লিখতে গিয়ে লক্ষ রাখতে হবে, শব্দের উচ্চারণ আর ছন্দের চাল, এ দুয়ের মধ্যে যেন ঠিকঠাক সমন্বয় ঘটে। অর্থাৎ ছন্দের

চাল ঠিক রেখে কবিতা পড়তে গিয়ে যেন দেখতে না পাই যে, ছন্দের খাতিরে শব্দের শরীরকে এমন-এমন জায়গায় ভাঙতে হচ্ছে, যেখানে তাদের ভাঙা যায় না। আবার শব্দের সঠিক উচ্চারণের খাতিরে ছন্দের চাল যেন বেঠিক জায়গায় না ভাঙে। বেঠিক জায়গায় চাল ভাঙলে ছন্দের নাভিশ্বাস উঠবে। এই বিভ্রাট যদি এড়াতে হয় তাহলে ছন্দের চাল আর শব্দের উচ্চারণ, এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা চাই। উপমা দিয়ে বলি, ছন্দের চাল আর শব্দ যেন একই-গাড়িতে-জুতে-দেওয়া দুই ঘোড়ার মতন। লক্ষ রাখতে হবে, সেই ঘোড়া দুটি যেন পরস্পরের বিপরীত দিকে ছুটতে না চায়। গাড়ি তাহলে এক-পাও এগোবে না। গাড়ি যাতে ঠিকমতো এগোয়, তারই জন্যে চাই ঘোড়া দুটির মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক।

এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে, অঙ্কের নিয়মে সবকিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও, বিপদ কীভাবে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, একটু বুঝিয়ে বললেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ধরা যাক, আমরা চোদ্দো-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দু-লাইন কবিতা লিখতে চাই। তার বিষয়টা এই যে, উঁচুনিচু রুক্ষ পথে হেঁটে-হেঁটে যাত্রীদের জীবন কেটে গেল। তা কথাটাকে যদি এইভাবে বলি :

অসমতল অমসৃণ পন্থায় হেঁটে
যাত্রীদের গিয়েছে সারা জীবন কেটে

তাহলে কি ঠিক হবে?

না, হবে না। অঙ্কের হিসেবে অবশ্য সবকিছু এখানে ঠিকঠাক আছে, ফি-লাইনে চোদ্দো মাত্রার বরাদ্দ চাপাতে কোনও ত্রুটি ঘটেনি; তবু কান বলছে, ঠিক হল না। তার কারণ ঘোড়া দুটো এখানে দু-দিকে ছুট লাগিয়েছে; ছন্দের চাল আর শব্দের উচ্চারণে বিরোধ ঘটছে পদে-পদে। ছন্দের চাল ঠিক রেখে এই লাইন দুটিকে যদি পড়তে যাই, তো এইভাবে পড়তে হয় :

অসমত/ল অমসৃ/ণ পন্থায়/হেঁটে
যাত্রীদের/গিয়েছে সা/রা জীবন/কেটে

অর্থাৎ, শব্দগুলিকে বেজায়গায় ভাঙতে হয়। কিন্তু শব্দকে তো আমরা তেমনভাবে ভাঙতে পারিনে। বলা বাহুল্য, ছন্দের খাতিরে শব্দকে অনেকসময়ে ভেঙে পড়তে হয়, কিন্তু সেই ভাঙারও একটা নিয়ম আছে, খেয়ালখুশিমতো যে-কোনও জায়গায় তাকে ভাঙা চলে না। শব্দ যদি ভাঙতেই হয়, তো নিয়ম মেনে এমনভাবে ভাঙতে হবে, যাতে কানের সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং, হয় শব্দকে আদৌ না-ভেঙে লাইন দুটিকে আমরা এইভাবে লিখব :

অমসৃণ/অতিরুক্ষ/পথে-পথে/হেঁটে
যাত্রীদের/জীবনের/দিন গেল/কেটে

আর নয়তো ভাঙতে হলেও, কানের সমর্থন নিয়ে, এইরকমভাবে শব্দ ভাঙব :

বন্ধুর দা/রুণ রুক্ষ/পথে-পথে/হেঁটে
যাত্রী-জীব/নের দিন/রাত্রি গেল/কেটে

এই রকমে যদি শব্দ ভাঙি, তাহলে অক্ষরবৃত্তের ছোটো চালে (অর্থাৎ চার-মাত্রার চালে) যদি-বা ভাঙাটা চোখে পড়ে, বড়ো চালে (অর্থাৎ ৮+৬ মাত্রার চালে) সেটা আদৌ ধরা পড়ে না। ব্যাপারটা তখন এইরকম দাঁড়ায় :

বন্ধুর দারুণ রুক্ষ/পথে পথে হেঁটে
যাত্রী-জীবনের দিন/রাত্রি গেল কেটে

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, ছন্দবিভ্রাট এড়াতে হলে লাইনে-লাইনে মাত্রার সংখ্যা ঠিক রাখাটাই যথেষ্ট নয়, শব্দগুলিকে সাজিয়ে বসাবার ব্যাপারেও নিয়ম রক্ষা করা চাই। নিয়মের সারকথাটা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই বলে গিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ : "বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।" অর্থাৎ কিনা বিজোড়-শব্দের পিঠে বিজোড়-শব্দ বসাতে হবে, জোড়-শব্দের পিঠে জোড়। শব্দের ব্যাপারে জোড়-বিজোড় কাকে বলে, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। যে-শব্দের অক্ষরসংখ্যা বিজোড়, সেটা বিজোড়-শব্দ। যে-শব্দের অক্ষরসংখ্যা জোড়, সেটা জোড়-শব্দ। মোদ্দা কথাটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, দুই কিংবা চার অক্ষরের শব্দের পিঠে জোড়-শব্দ বসাতে হবে; এক কিংবা তিন অক্ষরের শব্দের পিঠে বিজোড়-শব্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের চাল ঠিক রাখবার ব্যাপারে এইটেই হচ্ছে সবচাইতে নিরাপদ নিয়ম।

*

এখন আমাদের আলোচনাকে একটু পিছিয়ে নিতে চাই। তার কারণ, অক্ষরে-অক্ষরে মিল ঘটিয়ে যুক্তাক্ষরের মায়া সৃষ্টি করে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা চুরি করা সম্পর্কে এর আগে যেসব কথা বলেছি, একটা জরুরি কথাই তাতে বাদ পড়ে গিয়েছিল। আমার মাসতুতো ভাইয়ের সেই পদ্য-লিখিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র সেটা মনে করিয়ে দিল। বুড়ো হয়েছি, সব কথা সর্বদা মনে থাকে না, চিন্তার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে, পরের কথাটা অনেকসময়ে আগেই বলে বসি, আগের কথার খেই হারিয়ে যায়, এগিয়ে গিয়েও মাঝে-মাঝে তাই পিছনে তাকাবার প্রয়োজন ঘটে। তাকিয়ে বুঝতে পারছি, জরুরি সেই কথাটা এবারে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার, নয়তো পরে আবার হয়তো ভুলে যাব।

কথাটা সংক্ষেপে এই :

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 'কলকাতা' যে সহজেই 'কল্কাতা' (অর্থাৎ ৩ মাত্রা) হয়ে যায়, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অক্ষরবৃত্তে কবিতা লিখতে গিয়ে 'কলকাতা'কে আমরা ৪-মাত্রার শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না। আসলে, শব্দটাকে আমরা কীভাবে উচ্চারণ করব, তারই উপর নির্ভর করছে সে ক-মাত্রার মর্যাদা পাবে। গোটানো উচ্চারণে সে ৩-মাত্রার শব্দ বটে, কিন্তু ছড়ানো উচ্চারণে সহজেই সে আবার চার মাত্রা দাবি করতে পারে। নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন :

উচ্চারণভেদে হয় মাত্রাভেদ ভ্রাতা,
না হলে কলকাতা কেন হবে কলকাতা?

বুঝতেই পারছেন, দ্বিতীয় লাইনে 'কলকাতা' শব্দটিকে দু-বারে দু-রকমে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম বারে সে গোটানো উচ্চারণে ৩-মাত্রা (কল্কাতা); দ্বিতীয় বারে সে ছড়ানো উচ্চারণে ৪-মাত্রা।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে, এইভাবে, উচ্চারণের তারতম্য অনুযায়ী, 'খিদিরপুর'কে ৪-মাত্রাও করা যায়, ৫-মাত্রাও করা যায়। 'হলকা'কে ২-মাত্রাও করা যায়, ৩-মাত্রাও করা যায়। 'শরবত'কে করা যায় কখনও ৩-মাত্রা কখনও ৪-মাত্রা। কয়েকটি লাইন দেখুন :

শহরের দক্ষিণেতে 'খিদিরপুরে'তে
গিয়ে যদি খিদে পায়, কিছু হবে খেতে।
যদি দ্যাখো 'খিদিরপুরে' খাদ্যের দোকান
বন্ধ, তবে খেয়ে নিয়ো এক খিলি পান।
দ্বিপ্রহরে বাতাসের তপ্ত 'হলকা'য়
রাজপথে যদি বাছা মাথা ঘুরে যায়,
তদুপরি পেটে যদি ক্ষুধার 'হলকা'-ও
চলে, তবে পান ছাড়া অন্য কিছু খাও।
কলেরার ভয় যদি না-ই থাকে প্রাণে,
'শরবত' খেতে পারো পানের দোকানে।
যদি নাড়ি ছাড়ে, তবু মনে রেখো প্রিয়,
ঘোলের 'শরবত' অতি উত্তম পানীয়।

বলাই বহুল্য, কবিতায় যা-ই লিখি না কেন, 'কলেরার সুঁই' যদি না-নিয়ে থাকেন, তবে আর যা-ই করুন, যত্রতত্র শরবত খাবেন না। কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, 'খিদিরপুর'কে এখানে প্রথম বারে ৫-মাত্রা ও দ্বিতীয় বারে ৪-মাত্রা, 'হলকা'কে এখানে প্রথম বারে ৩-মাত্রা ও দ্বিতীয় বারে ২-মাত্রা, এবং 'শরবত'কে এখানে প্রথমবারে ৪-মাত্রা ও দ্বিতীয় বারে

৩-মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের শব্দ আসলে গোটানো ও ছড়ানো দ্বিবিধ উচ্চারণের শাসনই মেনে চলে, এবং উচ্চারণ অনুযায়ী এদের মাত্রাসংখ্যারও তারতম্য হয়।

তবে একটা কথা। এখানে ব্যবহার করেছি বটে, কিন্তু এই ধরনের শব্দকে একই কবিতার দুই স্থানে দু-রকম মাত্রার মর্যাদা দিয়ে ব্যবহার করাটা ঠিক নয়। কবিতার মধ্যে এসব শব্দকে একবার যদি গোটানো উচ্চারণের শাসনে আনি, তো অন্তত সেই কবিতায় তাদের আর ছড়ানো উচ্চারণের স্বাধীনতা না দেওয়াই ভালো। দিলে তাতে মহাকাব্য অশুদ্ধ না হোক, পাঠককে অসুবিধেয় ফেলা হয়। ডাব্‌ল স্ট্যান্‌ডার্‌ড জিনিসটা কোনও ক্ষেত্রেই ভালো নয়। কবিতাতেও তাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত।

সুতরাং অক্ষরবৃত্তে কবিতা লিখতে বসে আগেভাগেই স্থির করে নিন, যেসব শব্দ দ্বিবিধ উচ্চারণকেই মান্য করে, ঠিক কীবিধ উচ্চারণে আপনি তাদের বাঁধবেন। একবার যদি তাদের কাউকে গোটানো উচ্চারণে শক্ত করে বাঁধেন, তো অন্তত সেই কবিতায় অন্যত্র তার বাঁধনে আর ঢিল দেওয়া ঠিক নয়। 'কলকাতা' আপনার কবিতায় যদি একবার গোটানো উচ্চারণে ৩-মাত্রার মূল্য পায়, তবে সেই কবিতাতেই পরে আর তাকে (কিংবা সেই রকমের অন্য কোনও শব্দকে) ছড়ানো উচ্চারণে বেশিমাত্রার মর্যাদা দেওয়া অনুচিত হবে। উপমা দিয়ে বলতে পারি, ব্যাপারটা হচ্ছে গান গাইবার আগে 'স্কেল' ঠিক করে নেবার মতো। গান গাইতে-গাইতে মাঝপথে যেমন স্কেল পালটানো চলে না, কবিতা লিখতে-লিখতে তেমনি মাঝপথে উচ্চারণের বাঁধুনি পালটানো চলে না। কোন্ রকমের বাঁধুনি আপনার মনঃপূত, সেটা আগেই ঠিক করে নিন; মাঝপথে রীতিবদল না করাই ভালো।

সকলে এ-ব্যাপারে একমত নন, আমি জানি। সবাইকে আমার দলে টানতে পারব, এমন আশাও আমি করিনে। তবু আমি, শ্রীকবিকঙ্কণ সরখেল, যে-রীতিকে উচিত বলে মানি, অকপটে তা নিবেদন করলুম। অক্ষরবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এখনকার মতো এইখানেই শেষ হল।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, এত যে কথা হল, পয়ারের প্রসঙ্গ এখনও উঠল না কেন। ওঠেনি, তার কারণ, পয়ার আসলে আলাদা কোনও ছন্দ নয়, ছন্দের বাঁধুনিরই সে একটা রকমফের মাত্র। মূল তিনটি ছন্দের মোটামুটি পরিচয় আগে বিবৃত করি, তারপর পয়ারের প্রসঙ্গে ঢোকা যাবে।

মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

অক্ষরবৃত্তের পরিচয় মোটামুটি মিলেছে, এবার শুরু হবে মাত্রাবৃত্তের কথা। মাত্রাবৃত্ত নামটাও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ একে সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ বলতেন। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সেক্ষেত্রে এর নাম দিয়েছেন ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। যেমন অক্ষরবৃত্ত তেমনি মাত্রাবৃত্ত নামটিকেও প্রবোধচন্দ্র পরে বর্জন করেন; এবং এর নতুন নাম দেন কলাবৃত্ত। তাঁর আলোচনায় এখন এই নতুন নামটিই চালু। আমাদের আলোচনায় অবশ্য মাত্রাবৃত্ত নামটিই ব্যবহৃত হবে।

এবারে আসল কথায় আসি। গোড়ার দিকে যখন তিন-ছন্দের পার্থক্য একবার দেখিয়ে দিয়েছিলুম, তখন মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তও এক-আধটা দেওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য, আলাদা আলাদা ছন্দের দৃষ্টান্ত যদি পাশাপাশি তুলে ধরা যায়, তাদের চরিত্রের পার্থক্য তাহলে সহজে ধরা পড়ে; বুঝতে পারা যায়, একটার সঙ্গে আর-একটার অমিল কোন্‌খানে, চালচলনে ঠিক কোথায় তারা আলাদা।

দৃষ্টান্ত দিয়ে-দিয়ে পার্থক্য ধরিয়ে দেবার সেই কাজটা এবার আর-একটু বিশদভাবে করা যেতে পারে। তার কারণ অক্ষরবৃত্তকে আপনারা চিনে গিয়েছেন। এখন তারই পাশে যদি মাত্রাবৃত্তকে তুলে ধরি, তাদের পার্থক্য তাহলে চট করে ধরা পড়বে; বুঝতে পারা যাবে, কোন্ ছন্দ কীভাবে হাঁটছে, এবং দুজনে দুভাবে হাঁটছেই বা কেন।

ধরা যাক, সময়টা কার্তিক মাস, এবং বাতাসের দাঁত খানিকটা ধারালো হয়ে উঠেছে, এই খবরটাকে আমরা পদ্যে পরিবেশন করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি :

> কার্তিক-নিশীথে আজ পাচ্ছি বেশ টের
> দন্তের আভাসটুকু প্রথম-শীতের।

তা এই লাইন দুটি যে কোন্ ছন্দে লেখা হয়েছে, তা বুঝবার জন্যে এখন আর আপনাদের মাস্টারমশাইয়ের সাহায্য নেবার দরকার করে না। একবারমাত্র শুনেই এখন আপনারা বলে দিতে পারেন যে, এটা অক্ষরবৃত্ত। এ-ছন্দের চাল আপনারা চিনে গেছেন। কান যদি খোলা থাকে, তাহলে চোখ বুজেও এখন একে আপনারা

শনাক্ত করতে পারেন। তাই না? এবারে আসুন, প্রথম-শীতের এই সংবাদটাকে অন্য ছন্দে পরিবেশন করা যাক। লেখা যাক :

এবারে এসেছে কার্তিক ; তার
উত্তুরে বাতাসের
বরফে-ডোবানো দন্তের ধার
রাত্তিরে পাই টের।

বুঝতেই পারছেন, যে, সংবাদটার মধ্যে একটু অতিরঞ্জন আছে। কেন-না কার্তিক মাসে শীত কিছুটা পড়ে ঠিকই, কিন্তু বাতাসের দাঁত তাই বলে এমন-কিছু ধারালো হয়ে ওঠে না। অন্তত তখনই এমন মনে হয় না যে, সে-দাঁত বরফে-ডোবানো। তা সে যা-ই হোক, সংবাদ নিয়ে আমরা এখানে মাথা ঘামাচ্ছিনে, আমরা শুধু ছন্দের পার্থক্যটা দেখে নিতে চাই, এবং এখানে যে-ছন্দে এই খবরটাকে আমরা বেঁধেছি, তা যে অক্ষরবৃত্ত নয়, চালের পার্থক্য থেকেই তা আমরা বুঝতে পারছি।

এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে একে একবার মিলিয়ে নিন। মেলাতে গেলেই অমিলটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পাশাপাশি এই দুই ছন্দের চেহারা দেখতে দেখতে এদের অমিলটা যখন একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখনই শুরু হবে মাত্রাবৃত্তের চরিত্রবিচার। আগেই যদি চরিত্রবিচার করতে বসি, ব্যাপারটা তাহলে অত সহজে পরিষ্কার হবে না। কার চরিত্র কী রকমের সেটা বক্তৃতা দিয়ে বোঝানো শক্ত; দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে সে-কাজ অনেক সহজে সম্পন্ন হয়। যার পিঠে কখনও কিল পড়েনি, তাকে যদি বলি "কিল বলিতে বদ্ধমুষ্টির সাহায্যে প্রদত্ত এক প্রকারের আঘাত বুঝায়"—তবে আর তার কতটুকুই-বা সে বুঝবে? তার চাইতে বরং গুম করে তার পিঠের উপরে একটা কিল বসিয়ে দেওয়া ভালো।

সুতরাং আসুন, মাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য কী, হাতে-কলমে সেটা বুঝে নিই। অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তের পাশাপাশি আরও কয়েক বার তার চেহারাটা বেশ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করি, এবং বুঝবার চেষ্টা করি, অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে তার তফাতটা ঠিক কোথায়।

ধরা যাক, আমরা রেলগাড়ি নিয়ে দু-লাইন পদ্য বানাব। গর্জন করে ট্রেন ছুটছে, এবং সেই গর্জন শুনে মাঠের গোরু দিগন্তের দিকে দৌড় লাগাচ্ছে, এই হবে তার বিষয়বস্তু।

লাইন দুটিকে প্রথমে আমরা অক্ষরবৃত্তে লিখব। তা এইভাবে তাকে লেখা যেতে পারে :

গর্জনে কম্পিত বিশ্ব, ট্রেন ছুটে যায়;
আতঙ্কে গোরুর দল দিগন্তে পালায়।

এবারে এই কথাগুলিকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বেঁধে ফেলা যাক। এইভাবে বাঁধা যেতে পারে :

গর্জনে কাঁপে মাটি, ট্রেন ছুটে যায়।
আতঙ্কে গোরুগুলি দিগন্তে ধায়।

কানের কাছে তফাতটা আশা করি ধরা পড়েছে। এবার আসুন, আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে কী নিয়ে পদ্য লিখব? প্রেম নিয়ে? ভালো ভালো, পদ্য রচনার পক্ষে প্রেম অতি চমৎকার বিষয়বস্তু। তা ধরা যাক, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলছে যে, সে (অর্থাৎ প্রেমিক) যদি তাকে (অর্থাৎ প্রেমিকাকে) পাশে পায়, তাহলে দৈত্যের সঙ্গেও সে (অর্থাৎ প্রেমিক) লড়তে রাজি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এই কথাগুলিকে এইভাবে বাঁধা যায় :

তুমি যদি সারাক্ষণ পার্শ্বে থাকো নারী,
দৈত্যকেও তবে আমি যুদ্ধ দিতে পারি।

অনেকে হয়তো বলবেন যে, প্রেমিকের উক্তিটা এক্ষেত্রে একেবারেই যাত্রা-প্যাটার্নের হয়ে গেল। তা হোক, এ তো আর একালের আটাশ-ইঞ্চি-বুকের-ছাতি লিকপিকে প্রেমিক নয় যে, মিনমিনে গলায় কথা বলবে আর কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছতে-মুছতে ঘন-ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে। এ হচ্ছে সেকালের বীরপুরুষ প্রেমিক। সেকালে প্রেমিকেরা বনবন করে তলোয়ার ঘোরাত এবং ঘ্যাচাং করে দৈত্যদানোর মুণ্ডু কেটে ফেলত। সুতরাং তাদের উক্তিতে যদি একটু বীরত্বের বড়াই থাকে, তবে তা নিয়ে এত আপত্তির কী আছে! আর তা ছাড়া উক্তি নিয়ে আমরা এখানে মাথা ঘামাচ্ছিনে, আমরা ছন্দের পার্থক্য বুঝতে চাই। সুতরাং পার্থক্যটাকে বুঝে নেবার জন্য, আর কথা না বাড়িয়ে, এই উক্তিটিকে এবারে আমরা মাত্রাবৃত্তে বাঁধব। এইভাবে বাঁধা যাক :

তোমাকে যদি পার্শ্বে পাই,
তাহলে আমি, নারী,
দৈত্যকেও অকুতোভয়ে
যুদ্ধ দিতে পারি।

পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন? নিশ্চয়ই পারছেন। তবু আসুন, আরও একটা দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক।

এবারে আমরা কী নিয়ে লিখব? প্রেম নিয়ে তো লিখলুম, এবারে বিরহ নিয়ে লেখা যেতে পারে। অক্ষরবৃত্তে আমাদের বিরহী নায়কের উক্তিটা এই রকমের চেহারা নিচ্ছে :

যে নেই সম্মুখে, কানে কণ্ঠ তার বাজে;
দিন চলে যায়, তবু রাত্রি যায় না যে।

আবার মাত্রাবৃত্তে এই একই কথাকে আমরা এইরকমে বাঁধতে পারি :

সম্মুখে নেই, তবু কানে কানে
কণ্ঠ তাহারি বাজে;
দিন চলে যায়, দিবা অবসানে
নিশীথিনী যায় না যে।

আর নয়। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছি। অক্ষরবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলিকে এবারে উত্তমরূপে আর-একবার মিলিয়ে নিন। তাদের পার্থক্য বুঝতে তাহলে আর এতটুকু অসুবিধে হবে না।

কথা এই যে, পার্থক্য যেমন অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের মধ্যে আছে, তেমনি আবার মাত্রাবৃত্তের আপন এলাকাতেও আছে। অর্থাৎ এক-ধরনের মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে অন্য-ধরনের মাত্রাবৃত্তের আছে। মাত্রাবৃত্তের ধরন মাত্র একটি নয়, অনেক। পার্থক্য তাদের নিজেদের মধ্যেও আছে বটে, কিন্তু সেই ঘরোয়া পার্থক্যের প্রকৃতিও পৃথক।

সে কথা পরে। মাত্রাবৃত্তের মধ্যেকার ঘরোয়া পার্থক্যের কথা পরে বোঝা যাবে। তার আগে অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের মৌলিক পার্থক্যটা বুঝে নেওয়া চাই।

অক্ষরবৃত্তের মোটামুটি নিয়মটা আশা করি ইতিমধ্যে আপনারা ভুলে যাননি। 'মোটামুটি' কথাটা ব্যবহার করলুম এইজন্যে যে, নিয়মের ব্যতিক্রমও নেহাত কম নয়। কিছু কিছু ব্যতিক্রমের হদিসও আমরা পেয়েছি। তা সে যা-ই হোক, ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে, মোটামুটি যে-নিয়মটা পাওয়া যায়, সেটা এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অক্ষর আর মাত্রার সংখ্যা সাধারণত সমান সমান; অর্থাৎ এর এক-এক লাইনে যত অক্ষর তত মাত্রা। শুধু তা-ই নয়, যুক্তাক্ষর যদিও শব্দের ওজন বাড়ায়, তবু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গণনাপদ্ধতি এতই সমদর্শী যে, যুক্তাক্ষরকে সে একমাত্রার বেশি মর্যাদা দেয় না।

মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের প্রধান পার্থক্যটা এইখানেই।

মাত্রাবৃত্তের বেলায় যে-নিয়মে আমরা এক-একটা লাইনের ধ্বনিপ্রবাহকে ভাগ করে মাত্রা গণনা করি, তাতে প্রতিটি অক্ষর তো এক-মাত্রার মূল্য পায়-ই, যুক্তাক্ষর পায় দু-মাত্রার মূল্য। (বলা বাহুল্য, সেই যুক্তাক্ষরটি শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকা চাই, এবং সেই যুক্তাক্ষরের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণটি হস্‌বর্ণ না-হওয়া চাই*; শব্দের

* শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকা সত্ত্বেও যুক্তাক্ষর দু-মাত্রার মূল্য পায় না, যদি সেই যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী বর্ণটি হয় হস্‌বর্ণ। দৃষ্টান্ত : ট্রানস্লেশন। এক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরটি শব্দের মধ্যবর্তী হওয়া সত্ত্বেও— যেহেতু তার পূর্ববর্তী বর্ণটি হস্‌বর্ণ, তাই— দু-মাত্রার মূল্য পাচ্ছে না। মাত্রাবৃত্তেও না।

আদিতে যুক্তাক্ষর থাকলে তার মাত্রাগত মূল্য বাড়ে না, সে তখন ধ্বনিগত ওজনের বিচারে আর পাঁচটা সাধারণ অক্ষরের তুল্যমূল্য। যুক্তস্বর 'ঐ' আর 'ঔ' -এর দাপট অবশ্য আরও কিছু বেশি। শব্দের আদি-মধ্য-অন্ত যেখানেই থাক, মাত্রাবৃত্তে তারা দু-মাত্রা আদায় করবেই।)

আসলে কথাটা এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে উচ্চারণকে সংকুচিত ক'রে মাত্রার যোগফলে গোল না-ঘটিয়েও শব্দের ওজন বাড়িয়ে নেবার যে-সুবিধেটা পাওয়া যায়, মাত্রাবৃত্তে সেটা মেলে না। মাত্রাবৃত্তে যদি যুক্তাক্ষর ঢোকাই, তবে দু-মাত্রার মূল্য সে ঠিকই আদায় করে ছাড়বে। (অবশ্য— আবার বলি— সে যদি শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকে এবং তার পূর্ববর্তী বর্ণটি যদি হস্‌বর্ণ না হয়।) মাত্রার মাশুল ফাঁকি দিয়ে শব্দের ওজন বাড়াবার কোনও উপায়ই এক্ষেত্রে নেই। নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন :

আকাশে হঠাৎ দেখে একফালি চাঁদ
ছন্দের কামড়ে কবি হলেন উন্মাদ।

বলাই বাহুল্য, এই লাইন দুটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা। এর প্রথম লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট চোদ্দো, যুক্তাক্ষর একটিও নেই, এবং মাত্রার সংখ্যাও মোট চোদ্দো। দ্বিতীয় লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট চোদ্দো, তার মধ্যে দু-দুটি যুক্তাক্ষর, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু চোদ্দো তো চোদ্দোই, তার এক কাচ্চাও বেশি নয়। অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের জন্য সেখানে বাড়তি মাত্রার মাশুল গুনতে হয়নি।

মাত্রাবৃত্ত হলে কিন্তু এমনটি হতে পারত না। সেখানে যুক্তাক্ষর ঢোকালেই সে দু-মাত্রা মাশুল আদায় করে ছাড়ত। নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন।

যেই তিনি দেখেছেন একফালি চাঁদ
কবিবর হয়েছেন ঘোর উন্মাদ।

এ-দুটি লাইন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। প্রথম লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট চোদ্দো, যুক্তাক্ষর একটিও নেই, এবং মাত্রার সংখ্যা মোট চোদ্দো। দ্বিতীয় লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট তেরো, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু চোদ্দো, তার কারণ তেরোটি অক্ষরের মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তাক্ষর, এবং সেই যুক্তাক্ষরটি দু-মাত্রা আদায় করে ছেড়েছে। হিসেবটা সুতরাং এই রকমের দাঁড়াল। বারোটি সাধারণ অক্ষর = ১২ মাত্রা; তৎসহ একটি যুক্তাক্ষর = ২ মাত্রা; মোট ১৪ মাত্রা। বাস্‌।

প্রশ্ন এই যে, যুক্তাক্ষরকে এখানে আমরা দু-মাত্রা দিচ্ছি কেন। উত্তর : দিতে বাধ্য হচ্ছি; ছন্দের চাল নইলে ঠিক থাকে না। ছন্দের চাল ঠিক রাখবার জন্যেই যুক্তাক্ষরকে এখানে আমরা বিশ্লিষ্ট করছি; তাকে ভেঙে দুটি পৃথক অক্ষর হিসেবে পড়ছি। এবং সেইজন্যেই (অর্থাৎ তাকে ভেঙে দুটি পৃথক অক্ষর হিসেবে পড়ছি বলেই) তাকে দু-দুটি মাত্রা দিতে হচ্ছে।

অক্ষরবৃত্ত আশ্লেষে স্ফূর্তি পায়, মাত্রাবৃত্ত বিশ্লেষে। অক্ষরবৃত্ত জোড়া দিতে চায়, মাত্রাবৃত্ত ভাঙতে। অক্ষরবৃত্তে শব্দের মধ্যবর্তী বিযুক্ত হস্‌বর্ণও অনেকসময়ে, দৃশ্যত না হোক, শ্রবণের ঔদার্যে তার পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়। যথা চার জন= চার্জন। মাত্রাবৃত্তে তার উলটো নিয়ম। সেখানে যুক্তাক্ষরকেও আমরা বিযুক্ত করে পড়ি। যথা সার্জন= সারজন। অক্ষরবৃত্তে পোস্ট অফিসের চতুরক্ষর 'ডাকতার'-বাবুটিকেও প্রয়োজনবোধে কানের কাছে ত্রিবর্ণ 'ডাক্তার' হিসেবে চালিয়ে দিয়ে ১-মাত্রা গাপ করা যায়। মাত্রাবৃত্তে কিন্তু খাঁটি ত্রিবর্ণ 'ডাক্তার'বাবুটিও ৪-মাত্রার কম ফি নেন না। কানের কাছে তিনিই তখনই চতুরক্ষর 'ডাক্‌তার'বাবু। অক্ষরবৃত্তে 'খাঁকতি'র খাঁই, দরকার হলে, ২-মাত্রার মূল্য দিয়েই মেটাতে পারি (কানের কাছে তিনি তখন খাঁক্তি); মাত্রাবৃত্তে 'ভক্তি'র মতো বিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তিও 'ভক্‌তি' হিসেবে শক্ত হাতে পুরো তিন মাত্রা আদায় করে ছাড়ে।

মাত্রাবৃত্তের এইটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। যুক্তাক্ষরকে সে যুক্ত থাকতে দেয় না, তাকে সে ভেঙে দেয়। এই জন্যেই এককালে একে যুক্তাক্ষর-ভাঙা ছন্দ বলা হত।

বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরকে এইভাবে ভেঙে পড়বার কোনও সুনির্দিষ্ট রীতি আগে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন রীতির প্রবর্তক। প্রবর্তনা ঘটল তাঁর *মানসী*-পর্বের কবিতায়। তার আগে যে তিনি কিংবা আর-কেউ যুক্তাক্ষরকে কদাচ ভেঙে ব্যবহার করেননি, এমন বলতে পারিনে, তবে ভাঙলেও সেটা আকস্মিক ঘটনা, তখনও সেই ভাঙাটা কোনও নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তের জানলা দিয়ে মাত্রাবৃত্ত তখন এক-আধ বার এসে উঁকি দিয়ে যেত মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। *মানসী*-তেই প্রথম দেখতে পাওয়া গেল যে, যুক্তাক্ষরকে ভেঙে ব্যবহার করবার প্রবণতা একটা নির্দিষ্ট, পরিকল্পিত নিয়মের বাঁধনে এসে ধরা দিয়েছে। সেই হিসেবে *মানসী*-তেই এই নতুন ছন্দের— মাত্রাবৃত্তের— সূচনা।

দেখতে পেলুম, মাত্রাবৃত্তের বেলায় আমরা যুক্তাক্ষরগুলিকে ভেঙে ভেঙে পড়ি। ছন্দের চাল নইলে ঠিক থাকে না। চালটাকে ঠিক রাখবার জন্যেই এক্ষেত্রে শব্দের ভিতরকার কিংবা শেষের যুক্তাক্ষরকে ভেঙে দুটি আলাদা-আলাদা অক্ষর হিসেবে গণ্য করতে হয়, এবং আলাদা-আলাদাভাবেই তাদের মাত্রার মাশুল চুকিয়ে দিতে হয়। (যুক্তস্বর ঐ কিংবা ঔ অবশ্য শব্দের আদিতে থাকলেও মাত্রাবৃত্তে দু-মাত্রার মর্যাদা পায়। সে-কথা আমরা আগেও বলেছি।) আমরা লিখি বটে 'শব্দ', কিন্তু মাত্রার মূল্য দিতে গিয়ে তাকে 'শব্‌দ'রূপে গণ্য করি। আমরা দেখি বটে 'অক্ষর', কিন্তু মাত্রার মাশুল দেবার বেলায় তাকেই 'অক্‌খর' হিসেবে দেখতে হয় (বিদ্বজ্জন অবশ্য 'অক্‌ষর' শুনলে আরও বেশি খুশি হবেন। কিন্তু আমরা তো আর বিদ্বজ্জন

নই, তাই 'অক্‌খর' শুনেই তুষ্ট থাকব।) আমরা 'ছন্দ'বিচার করতে গিয়ে মাত্রাবৃত্তের বেলায় তাকে 'ছন্‌দ' হিসেবে বিচার না করে পারি না।

অর্থাৎ চোদ্দো মাত্রায় লাইন সাজিয়ে আমরা যখন লিখি :

ছন্দের গুঁতো খেয়ে পোড়োদের হায়
চোখ থেকে অবিরল অশ্রু গড়ায়।
কহে কবিকঙ্কণ, 'কান্না থামাও,
ক্লাস থেকে মানে-মানে চম্পট দাও।'

তখন যুক্তাক্ষরগুলিকে একে-একে ভেঙে-ভেঙে আমরা মাত্রার মাশুল চুকিয়ে দিই; ফলে লাইনগুলির চেহারা বস্তুত এই রকমের দাঁড়ায় :

ছন্‌দের গুঁতো খেয়ে পোড়োদের হায়
চোখ থেকে অবিরল অশ্‌রু গড়ায়।
কহে কবিকংকণ, 'কান্‌না থামাও,
ক্লাস থেকে মানে-মানে চম্‌পট দাও।'

লক্ষ করুন, সর্বক্ষেত্রেই আমরা যুক্তাক্ষরকে ভেঙে দিয়েছি, ফলে ফি-লাইনে এখন চোদ্দোটি করে অক্ষর পাচ্ছি, এবং সেই চোদ্দো অক্ষরের প্রত্যেকেই এক-একটি করে মাত্রা-মূল্য পাচ্ছে (ভাঙিনি শুধু একটি যুক্তাক্ষরকে ; চতুর্থ লাইনের 'ক্লাস' শব্দের 'ক্ল'-কে। এই ব্যতিক্রমের কারণ আপনারা আগেই জেনেছেন। যুক্তাক্ষরটি এক্ষেত্রে শব্দের প্রথমেই রয়েছে; ফলে তাকে ভাঙা সম্ভব নয়। শব্দের প্রথমে আছে বলে মাত্রাবৃত্তেও সে এক-মাত্রার বেশি দাবি করবে না।)

আসলে ব্যাপারটা এই যে, মাত্রাবৃত্তের বেলায় হস্‌বর্ণগুলিকেও একটি করে মাত্রার মূল্য দিয়ে দিতে হয়। অক্ষরবৃত্তের ক্ষেত্রে শুধু বিযুক্ত হস্‌বর্ণগুলিকেই আমরা মাত্রার মূল্য দিই (অনেকসময়ে তা-ও দিই না, বিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের মাত্রা আমরা দরকার হলেই গাপ করি); মাত্রাবৃত্তের বেলায় সেক্ষেত্রে বিযুক্ত হস্‌বর্ণগুলি তো মাত্রার মূল্য পায়ই, তদুপরি যেসব হস্‌বর্ণ যুক্তাক্ষরের মধ্যে লুকোনো, মাত্রাবৃত্ত তাদেরও যুক্তাক্ষরের ভিতর থেকে টেনে বার করে আনে, এবং তাদের হাতেও একটি করে মাত্রার মূল্য ধরিয়ে দেয়। অক্ষরবৃত্তের 'কষ্ট' (২-মাত্রা) তাই মাত্রাবৃত্তের কাছে 'কষ্‌ট' (৩-মাত্রা), অক্ষরবৃত্তের 'আনন্দ' (৩-মাত্রা) তাই মাত্রাবৃত্তের কাছে 'আনন্‌দ' (৪-মাত্রা); অক্ষরবৃত্তের 'মহোল্লাস' (৪-মাত্রা) তাই মাত্রাবৃত্তের কাছে 'মহোল্‌লাস' (৫-মাত্রা)। এবং এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, অক্ষরবৃত্তের 'রাস্তা' আর মাত্রাবৃত্তের 'রাস্‌তা' মোটেই এক নয়। আর তাই মাত্রাবৃত্তকে আসলে মাত্‌-রাবৃত্‌ত লিখলেই ঠিক হত; ছান্‌দসিকেরা তাতে নিশ্চয় বিন্‌দুমাত্‌র অসন্‌তুষ্‌ট হতেন না।

আমরা বলেছি, মাত্রাবৃত্তের সূচনা *মানসী* পর্বের কবিতায়। *মানসী*-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি।" পূর্ণ মূল্য দেওয়ার অর্থ দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া। বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরকে ইতিপূর্বে দুই-মাত্রার মূল্য দেবার সুনির্দিষ্ট রীতি ছিল না। এখন যুক্তাক্ষরকে ভেঙে তাকে দুই-মাত্রার মূল্য দিয়ে দেখা গেল, ছন্দের চালই একেবারে পালটে গেছে। ঘাড়ের উপর থেকে বাড়তি বোঝা নামিয়ে দেওয়ায় তার গতি অনেক বেড়ে গেছে; সে আর গজেন্দ্রগমনে চলতে চাইছে না।

উপমা দিয়ে বলতে পারি, অক্ষরবৃত্তের চাল যেন হাতির চাল; পিঠের উপরে যুক্তাক্ষরের বাড়তি বোঝা নিয়ে সে ধীরপায়ে এগোয়। আর মাত্রাবৃত্ত যেন তেজি ঘোড়ার মতো; সংকেত পেলেই সে যুক্তাক্ষরের শিকল ছিঁড়ে ঘাড় বেঁকিয়ে পায়ের খুরে হস্‌বর্ণের খটাখট ধ্বনি বাজিয়ে ছুটতে থাকে।

মানসী-র দ্বিতীয় কবিতা 'ভুল ভাঙা'। তার প্রথম স্তবকেই দেখছি :

"বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।"

'বন্ধন'কে ভেঙে এখানে চার-মাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে। ছান্দসিক বলছেন, শুধু বাহুলতার বন্ধন কেন, বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরের বন্ধনও এই একই সঙ্গে ভেঙে গেল।

*

অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের চাল যে একেবারে আলাদা, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। কেন আলাদা তা-ও বুঝলুম। এখন, মাত্রাবৃত্তের আপন এলাকার মধ্যে যেসব আলাদা আলাদা চাল রয়েছে, তার খবর নিতে হবে।

মাত্রাবৃত্তের চাল সাকুল্যে চার রকমের। ৪-মাত্রার চাল, ৫-মাত্রার চাল, ৬-মাত্রার চাল, আর ৭-মাত্রার চাল। অনেকে আবার ৮-মাত্রার চালের কথা বলেন। কিন্তু ৮-মাত্রার চাল যে একটা আলাদা জাতের চাল, এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাকে আলাদা জাতের চাল বলে মেনে নেননি। আসলে, হঠাৎ দেখলে যাকে ৮-মাত্রার চাল বলে মনে হয়, পর্ব ভাঙলে বুঝতে পারি যে, সেটা ৪-মাত্রারই একটা রকমফেরমাত্র, তাকে আলাদা একটা চাল বলাটা ঠিক নয়।

মূল কথায় ফিরে আসি। লাইনের এক-একটা অংশ কিংবা পর্বে মাত্রা-সংখ্যা কত, তারই হিসেব নিয়ে আমরা বলি, এটা অত-মাত্রার চাল, সেটা তত-মাত্রার। এবারে আসুন, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এমনকিছু পদ্য বানাই, যার প্রতিটি পর্বের মাত্রা-সংখ্যা হচ্ছে চার।

কী নিয়ে পদ্য বানাব? সন্দেশ নিয়ে? বেশ, তা-ই হোক। ওই মহার্ঘ বস্তু মুখে তোলা যে জনসাধারণের পক্ষে কোনওকালেই খুব সহজ ছিল, এমন বলতে পারিনে, তবে চোখে অন্তত দেখা যেত। কিছুকাল আগে ছানার মিষ্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় তা-ও যাচ্ছিল না। সেইসময়কার পটভূমিকায় সন্দেশ-বিষয়ক একটি পদ্য বানানো যাক। তা আমাদের তৎকালীন বেদনার কথাটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি :

সন্দেশ চেখে দেখা ছিল সুকঠিন ;
চোখে দেখা, তা-ও হল নিষিদ্ধ, তাই
চক্ষুতে আসে জল, তাই রাতদিন
সন্দেশ নিয়ে শুধু পদ্য বানাই।

পদ্যটা বিশেষ জুতের হল না। না হোক, চালটা ঠিকই বুঝতে পারা যাবে। আরও ভালো করে বুঝবার জন্যে এই লাইন-কটিকে পর্বে পর্বে ভাগ করে ফেলা যাক। ভাগ করলে এর চেহারাটা এই রকমের দাঁড়ায়—

সন্দেশ/চেখে দেখা/ছিল সুক/ঠিন;
চোখে দেখা,/তা-ও হল/নিষিদ্ধ,/তাই
চক্ষুতে/আসে জল,/তাই রাত/দিন
সন্দেশ/নিয়ে শুধু/পদ্য বা/নাই।

দেখা যাচ্ছে, পদ্যটির এক-এক লাইনে আমরা তিনটি করে পর্ব (এবং সেইসঙ্গে লাইনের প্রান্তে একটি ভাঙা-পর্ব) পাচ্ছি, এবং প্রতি পর্বে পাচ্ছি চারটি মাত্রা। মাত্রাবৃত্তের ফ্যামিলিতে এ হল ৪-মাত্রার চাল।

*

ফি-লাইনে যে তিনটি করেই পর্ব রাখতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। পর্বের সংখ্যা আমরা ইচ্ছে করলেই কমাতে কিংবা বাড়াতে পারি। কিন্তু চার-মাত্রার চালটা তাতে পালটাবে না। আর ফি-লাইনের শেষে যে ওই ভাঙা-পর্বটি পাচ্ছি, ওর যে কী কাজ, তা আশা করি আর নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হবে না। অক্ষরবৃত্ত নিয়ে আলোচনার সময়েই ভাঙা-পর্বের কাজের কথাটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তবু, বাহুল্য হলেও আর-এক বার বলি যে, ওর কাজ আর-কিছুই নয়, এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যাবার আগে পাঠককে ও একটু দাঁড় করিয়ে রাখে, তাকে একটু দম ফেলবার ফুরসত দেয়। তা সে যাই হোক, ভাঙা-পর্বটি এক্ষেত্রে ২-মাত্রার। ইচ্ছে করলে আমরা ১-মাত্রা কিংবা ৩-মাত্রার ভাঙা-পর্বও ব্যবহার করতে পারতুম।

৪-মাত্রার চালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে যে-পদ্য বানাব, তার

ফি-লাইনে থাকবে ৪-মাত্রার দুটি করে পর্ব আর সেইসঙ্গে ১-মাত্রার একটি ভাঙা-পর্ব।

সাতপাঁচ ভাবছটা কী,
কাজে লেগে যাও বাবুজি।
ভেবে ভেবে কূল পায় কে,
অকারণে ভ্রান্তি বাড়ে।
ভাবনার কোটি হাত-পা,
লাখো মাথা, প্রকাণ্ড হাঁ।
থই পাবে, কই তার জো,
চিন্তার শেষ নেই তো।
চিন্তার নেই সীমানা,
সুতরাং চিন্তা না; না।

পর্ব ভাগ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, আমরা কথার খেলাপ করিনি; যে-নিয়মে লাইনে বাঁধব বলেছিলুম, ঠিক সেই নিয়মেই বেঁধেছি/ভাগ করে দেখালে আমাদের লাইনগুলির চেহারা এই রকমের দাঁড়ায় :

সাতপাঁচ/ভাবছটা/কী,
কাজে লেগে/যাও বাবু/জি।
ভেবে ভেবে/কূল পায়/কে,
অকারণে/ভ্রান্তি বা/ড়ে।
ভাবনার/কোটি হাত-/পা,
লাখো মাথা/প্রকাণ্ড/হাঁ।
থই পাবে,/কই তার/জো,
চিন্তার/শেষ নেই/তো।
চিন্তার/নেই সীমা/না,
সুতরাং/চিন্তা না;/না।

গুনে দেখুন, এর ফি-লাইনে ৪-মাত্রার দুটি করে পর্ব আছে; আর সেইসঙ্গে আছে ১-মাত্রার একটি ভাঙা-পর্ব।

৪-মাত্রার চালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে আমাদের ফি-লাইনে থাকবে তিনটি করে পর্ব; আর ভাঙা-পর্বটি হবে ৩-মাত্রার। বিষয় : সূর্যগ্রহণ। পদ্যটিকে আমরা এইরকমে সাজাতে পারি :

দিবাকর আজ বড়ো করুণার পাত্র,
চক্ষু নিবেছে তার, আলো নেই আকাশে।

নিশানাথ-সাথে নেই ভেদ লেশমাত্র,
সকালের পাগড়িতে যেন চাঁদ বাঁকা সে।

পর্ব ভেঙে দেখলে এই লাইনগুলির চেহারা এই রকমের দাঁড়ায় :

দিবাকর/আজ বড়ো/করুণার/পাত্র,
চক্ষুনি/বেছে তার,/আলো নেই/আকাশে।
নিশানাথ/সাথে নেই/ভেদ লেশ/মাত্র,
সকালের/পাগড়িতে/যেন চাঁদ/বাঁকা সে।

অর্থাৎ ফি-লাইনে এখানে পর্ব আছে তিনটি করে। ভাঙা-পর্ব একটি। পর্বগুলি ৪-মাত্রার। ভাঙা-পর্বগুলিকে আমরা ৩-মাত্রার রেখেছি।

আর নয়। মাত্রাবৃত্তের এলাকায় ৪-মাত্রার চাল আমরা অনেক দেখলুম। এর পরে ৫-মাত্রার চাল দেখব। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ভাঙা-পর্বের বৈচিত্র্য আর দেখতে চাইনে। ছন্দের মূল চাল তো আর ভাঙা-পর্বের হ্রাসবৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে না। সুতরাং তার উপরে জোর দিয়ে লাভ নেই।

* * *

পাঁচ মাত্রার চালের মাত্রাবৃত্তের প্রতি পর্বে থাকে পাঁচটি করে মাত্রা। তবে কান পাতলেই ধরা পড়বে যে, আমরা যাকে ৫ বলছি, বস্তুত সে ৩ + ২। অর্থাৎ ৫-মাত্রার পর্ব আসলে ৩-মাত্রা আর ২-মাত্রার সমষ্টি; বিজোড়-জোড়ে তার শরীর গড়া। ৪-মাত্রার ছন্দ এগোয় খটাখট-খটাখট চালে; ৫-মাত্রার ছন্দ সেক্ষেত্রে খটাস-খট খটাস-খট ধ্বনি জাগিয়ে চলতে থাকে। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :

আসতে-যেতে এখনো তুলি চোখ,
রেলিঙে আর দেখি না নীল শাড়ি।
কোথায় যেন জমেছে কিছু শোক,
ভেঙেছ খেলা সহসা দিয়ে আড়ি।
এখন সব স্তব্ধ নিরালোক;
অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে বাড়ি।

এ হল ৫-মাত্রার চাল। এর প্রতি লাইনে আছে দুটি করে পর্ব (ইচ্ছে করলেই পর্ব আরও বাড়ানো যেত); আর সেইসঙ্গে একটি ভাঙা-পর্ব। পর্বগুলি ৫-মাত্রায় গড়া; ভাঙা-পর্বটি ২-মাত্রার। ভেঙে দেখলে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকম দাঁড়ায় :

আসতে-যেতে/এখনো তুলি/চোখ,
রেলিঙে আর/দেখি না নীল/শাড়ি।
কোথায় যেন/জমেছে কিছু/শোক,
ভেঙেছ খেলা/সহসা দিয়ে/আড়ি।

এখন সব/স্তব্ধ নিরা/লোক,
অন্ধকারে/ঘুমিয়ে আছে/বাড়ি।

৫-মাত্রার চালকে যে কেন ৩ + ২ মাত্রার চাল বলেছি, এখন আর সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। এ হল বিজোড় + জোড়, বিজোড় + জোড় চাল। মাত্রার হিসেবে শব্দগুলিকে যদি সেইভাবে (অর্থাৎ বিজোড় + জোড়, বিজোড় + জোড় করে) সাজানো হয়, তবে তো কথাই নেই, ছন্দের নৌকো একেবারে তরতর করে চলবে; তবে মাঝে-মাঝে তার অন্যথা ঘটলেও (অর্থাৎ বিজোড়-মাত্রার শব্দের পরে জোড়-মাত্রার শব্দ না-বসিয়ে তার বদলে জোড়-মাত্রার শব্দের পরে বিজোড়-মাত্রার শব্দ বসালেও) তাতে কোনও ক্ষতি হয় না। কেন-না, জোড়-মাত্রার শব্দটি প্রথমে বসলেও, ছন্দের চালের তাড়নায়, সে পরবর্তী শব্দের প্রথম মাত্রাটিকে নিজের শরীরের মধ্যে টেনে আনে। (অর্থাৎ জোড় + বিজোড় তখন জোড়বি + জোড় হয়ে যায়।) দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :

দুপুর গেল, বিকেল হল সারা,
গোপনে ফোটে একটি-দুটি তারা,
বাতাসে যেন চাপা বেদনা লাগে।
বেদনা কার, কথাটা তার কী,
পৃথিবী তার কিছুই বোঝেনি;
আকাশে বাঁকা চন্দ্রকলা জাগে।

পর্ব ভেঙে দেখালে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকম দাঁড়ায়।

দুপুর গেল,/বিকেল হল/সারা,
গোপনে ফোটে/একটি-দুটি/তারা,
বাতাসে যেন/চাপা বেদনা/লাগে।
বেদনা কার,/কথাটা তার/কী,
পৃথিবী তার/কিছুই বোঝে/নি;
আকাশে বাঁকা/চন্দ্রকলা/জাগে।

এখানে প্রতিটি পর্বেই ৫-মাত্রা গড়া হয়েছে বিজোড় + জোড় বিজোড় + জোড় দিয়ে। শুধু একটি ক্ষেত্রে— তৃতীয় লাইনের 'চাপা বেদনা'য়— তার ব্যতিক্রম দেখছি। 'চাপা বেদনা' বিজোড় + জোড় নয়, জোড় + বিজোড়। কিন্তু তাতেও কিছু অসুবিধের সৃষ্টি হচ্ছে না। কেন না, বিজোড় + জোড় এই ছন্দের তাড়নাই তাকে 'চাপাবে দনা' বানিয়ে ছাড়ছে।

আর-একটা ব্যাপারও লক্ষ করুন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আর ষষ্ঠ লাইনের অন্তে

যে ভাঙা-পর্ব রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ২-মাত্রা দিয়ে গড়া। ব্যতিক্রম ঘটেছে চতুর্থ আর পঞ্চম লাইনের প্রান্তবর্তী ভাঙা-পর্বে। ও-দুটি পর্ব ১-মাত্রার। দেখা যাচ্ছে, একই কবিতার মধ্যে এক-এক জায়গায় আমরা এক-এক রকমের ভাঙা-পর্ব গড়লুম, কিন্তু কানের তাতে আপত্তি নেই। আসলে, জায়গা বুঝে এইভাবে ব্যতিক্রম ঘটালে কান যেমন আপত্তি তোলে না, তেমনি কবিতার শরীরে কিছুটা বৈচিত্র্যও আনা যায়। (বলেছিলুম, ভাঙা-পর্বের উপরে জোর দেব না। তবু যে একটু কারিকুরি করলুম, তার হেতুটা আর কিছুই নয়, লোভ। কারিকুরির সুযোগ পেয়ে আর ছাড়া গেল না।)

৫-মাত্রার চালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। লাইনের বিন্যাস এবারে একটু পালটে দেব। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :

কিছুটা ছিল অন্ধকার
কিছুটা ছিল আলো;
কিছুটা ছিল শুভ্র, আর
কিছুটা ছিল কালো।
জীবনভোর জ্বলেছ যার বিষে
ওষ্ঠে তার সুধাও ছিল মিশে।
এবারে তবে স্মরণে তার
নয়নে ক্ষমা জ্বালো—
কিছুটা ছিল মন্দ যার,
বাকিটা ছিল ভালো।

এবারে আর পর্ব ভেঙে দেখাচ্ছিনে। কষ্ট করে নিজেরাই ভেঙে নিন। তাহলে দেখতে পাবেন, এর পর্বগুলি ৫-মাত্রার। কোনও লাইনে দুটি করে পর্ব আছে, কোনও লাইনে একটি করে। কোথাও ভাঙা-পর্ব আছে, কোথাও নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা প্যাটার্ন ঠিকই তৈরি হয়েছে।

৫-মাত্রার চাল দেখানো এখানেই শেষ হল।

* * *

পাঁচের পরে ছয়। মাত্রাবৃত্তের সংসারে এবারে ৬-মাত্রার চাল দেখবার পালা। এই চালে যদি চলতে হয়, তবে পর্বে-পর্বে ছটি করে মাত্রার বরাদ্দ চাপাতে হবে। লাইনের শেষের ভাঙা-পর্বটি আমরা যেমন-খুশি গড়তে পারি।

ধরা যাক, আমরা অঘ্রানের শীত নিয়ে দু-চার ছত্র লিখতে চাই। হঠাৎ বিষম ঠান্ডা পড়েছে, লেজ গুটিয়ে বাঘ পালাচ্ছে (ঈশ্বর জানেন পালায় কি না, কিন্তু কথাটা শোনাচ্ছে ভালো), খালবিল জমে কুলপি বরফ হয়ে যাচ্ছে (বলা বাহুল্য,

বাংলা দেশে জমে না, কিন্তু লিখলে ক্ষতি কী, কবিতায় তো শুনতে পাই সাতখুন মাফ), গাছের ডালে একটা পাখি বসে থরথর করে কাঁপছে, কবিরা এই হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে হাটেমাঠে মিল খুঁজে বেড়াক, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে এখন জানালা-দরোজা বেশ উত্তমরূপে এঁটে রাখা দরকার— এই হবে আমাদের বিষয়বস্তু। তা ৬-মাত্রার চালে এই কথাগুলিকে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি :

অঘ্রান মাসে পড়েছে ঠান্ডা বড়ো,
ব্যাঘ্র পালায়, জমে যায় খালবিল ;
বৃক্ষশাখায় বসে কাঁপে থরোথরো
সঙ্গবিহীন বৃদ্ধ একটি চিল।
কবি, তুমি যাও, হাটেমাঠে খুঁজে মরো
দু-চারটে মন-মজানো কথার মিল;
গৃহস্থ, তুমি জানালা বন্ধ করো,
দরোজায় বেশ ভালো করে আঁটো খিল।

এ-ও মাত্রাবৃত্ত, কিন্তু, পড়লেই বুঝতে পারবেন, ৪-মাত্রা কিংবা ৫-মাত্রার চালের সঙ্গে এর মিল নেই। এর চাল হচ্ছে ৬-মাত্রার। কানে শুনেও যদি কেউ তা না-বুঝে থাকেন, তবে পর্ব ভাঙলেই ব্যাপারটা তিনি চাক্ষুষ উপলব্ধি করতে পারবেন। পর্ব ভাঙলে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকম দাঁড়ায় :

অঘ্রান মাসে/পড়েছে, ঠান্ডা/বড়ো,
ব্যাঘ্র পালায়,/জমে যায় খাল/বিল ;
বৃক্ষশাখায়/বসে কাঁপে থরো/থরো
সঙ্গবিহীন/বৃদ্ধ একটি/চিল।
কবি, তুমি যাও,/হাটেমাঠে খুঁজে/মরো
দু-চারটে মন-/মজানো কথার/মিল;
গৃহস্থ তুমি/জানালা বন্ধ/করো,
দরোজায় বেশ/ভাল করে আঁটো/খিল।

দেখতেই পাচ্ছেন, এর প্রতি লাইনে আছে দুটি করে পর্ব। (সেইসঙ্গে লাইনের প্রান্তে একটি করে ভাঙা-পর্ব রয়েছে) আর প্রতি পর্বে আছে ছটি করে মাত্রা (ভাঙা পর্বগুলি দু-মাত্রার)। বলা বাহুল্য, পর্বের সংখ্যা আমরা ইচ্ছে করলেই আরও বাড়াতে পারতুম।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরা যাক, এবারে আমরা মাছ নিয়ে লিখব। তা বঙ্গদেশে আজ মাছ নিয়ে কিছু লেখা মানেই মাছ-না-থাকার কথা লেখা। মীনাভাবে

হীন হয়ে আছি; না আছে ইলিশ, না আছে পাকা রুই; বাজারে ঢুকলে যেন কান্না পায়; নিষ্পাদপ ভূখণ্ডে বাঁটকুল এরণ্ডও যেমন দ্রুমের সম্মান পায়, 'নির্মীন' বঙ্গদেশে টিলাপিয়া তেমনি আজ ফাঁকতালে আসর জমাচ্ছে। তা এই কথাগুলিকে আমরা ৬-মাত্রার চালে এমননিভাবে সাজাতে পারি :

ইলিশ, তোমাকে দেখি না, শুধুই
তোমার স্বপ্ন দেখে
সপ্তাহ-মাস-বৎসর যায়,
দুঃখে বিদরে হিয়া।
সান্ত্বনা দিতে নেই পাকা রুই,
সেও বহুকাল থেকে
নিখোঁজ, এখন বাজার জমায়
রাশি রাশি টিলাপিয়া।

লাইন আর মিলের বিন্যাসটা একটু অন্য রকমের বটে, কিন্তু এ-ও সেই ৬-মাত্রারই চাল। পর্ব ভাঙলে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকমের দাঁড়াবে :

ইলিশ, তোমাকে/দেখি না, শুধুই/
তোমার স্বপ্ন/দেখে
সপ্তাহ-মাস-/বৎসর যায়,/
দুঃখে বিদরে/হিয়া।
সান্ত্বনা দিতে/নেই পাকা রুই,/
সেও বহুকাল/থেকে
নিখোঁজ, এখন/বাজার জমায়/
রাশি রাশি টিলা/পিয়া।

দেখা যাচ্ছে, এর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম আর সপ্তম লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব নেই বলেই সেখানে থেমে থাকা যাচ্ছে না, দ্রুত গিয়ে পরবর্তী লাইনে ঢুকতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ আর— বলাই বাহুল্য— শেষ লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব আছে বলে সেখানে আমরা দাঁড়াতে পারি। আসলে ব্যাপারটা এই যে, প্রথম লাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনকে, তৃতীয় লাইনের সঙ্গে চতুর্থ লাইনকে, পঞ্চম লাইনের সঙ্গে ষষ্ঠ লাইনকে, এবং সপ্তম লাইনের সঙ্গে অষ্টম লাইনকে আমরা অনায়াসেই জুড়ে দিতে পারতুম; পাঠের ব্যাপারে তাতে এতটুকু ইতরবিশেষ হত না।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে আমাদের বক্তব্যকে আর-একটু উচ্চস্তরে উঠিয়ে আনব। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :

যন্ত্রণা থেকে আনন্দ জেগে ওঠে
শোক সান্ত্বনা হয়;
কাঁটার ঊর্ধ্বে গোলাপের মতো ফোটে
সমস্ত পরাজয়।

এটাও যে ৬-মাত্রার চাল, সেটা বোঝাবার জন্য আশা করি আর পর্ব ভেঙে দেখাতে হবে না।

* * *

চার, পাঁচ আর ছয়ের চাল আমরা দেখেছি। এবারে ৭-মাত্রার চাল দেখবার পালা। মাত্রাবৃত্তের ঘরে এইটিই আপাতত চূড়ান্ত চাল। বাংলা কাব্যে এর দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। চার, পাঁচ আর ছয়ের তুলনায় ৭-মাত্রার চালে লেখা কবিতার সংখ্যা যে অনেক কম, তাতে সন্দেহ করিনে। ৭-মাত্রার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রকাব্যে কিছু আছে; রবীন্দ্রনাথের পরেও অনেকে মাত্রাবৃত্তের এই চালে কবিতা লিখেছেন; হাল-আমলের কবিরাও যে এ-চালে চলেন না, এমন নয়; তবে তার দৃষ্টান্ত খুব বেশি চোখে পড়ে না।

দেখা যাক, আমরা এ-চালে চলতে পারি কি না। নীচের এই লাইনগুলি লক্ষ করুন :

ছিল না উদ্যত জটিল জিজ্ঞাসা,
মুক্ত অবারিত চিত্তে ছিল আশা।
নদীর কলতানে
পাখির গানে-গানে
বিশ্ব ভরা ছিল, মধুর ছিল ভাষা,
তখন বুকে ছিল গভীর ভালোবাসা।

জানি না, ঠিক-চালে এই লাইনগুলিকে আপনারা পড়তে পেরেছেন কি না। না-পারলে তাতে লজ্জার কিছু নেই, বিস্ময়েরও না। কেন-না হুট করে একটা নতুন চালে পা ফেলা খুবই শক্ত ব্যাপার; যেমন ছয়ে-চারে তেমনি সাতে-পাঁচে অনেকেরই গন্ডগোল বেধে যায়। পা যেখানে পড়বার কথা, তার কিছুটা আগে পড়লেই মুশকিল, সাতকে তখন পাঁচ বলে মনে হতে পারে। দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দেবার জন্যে প্রথমে এই লাইনগুলিকে পর্বে পর্বে ভাগ করে দেখানো যাক :

ছিল না উদ্যত/জটিল জিজ্ঞাসা,/
মুক্ত অবারিত / চিত্তে ছিল আশা।/
নদীর কলতানে/
পাখির গানে-গানে/

বিশ্ব ভরা ছিল/মধুর ছিল ভাষা,/
তখন বুকে ছিল/গভীর ভালোবাসা।/

দেখতেই পাচ্ছেন, প্রথম দ্বিতীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইনের প্রত্যেকটিতে আছে দুটি করে পর্ব; তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে আমরা একটি করে পর্ব রেখেছি; লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব রাখিনি (ইচ্ছে করলেই রাখতে পারতুম); প্রতিটি পর্বই ৭-মাত্রায় গড়া। মুশকিল এই যে, ৭-মাত্রার এই পর্বগুলিকে যদি ৫+২ হিসেবে পড়েন, তাহলেই ধন্ধ লাগবে, মনে হবে এ-ও (একটি পর্ব ও একটি ভাঙা-পর্ব সংবলিত) ৫-মাত্রার চাল। ধন্ধ এড়াবার জন্য একে ৩+৪ হিসাবে পড়া দরকার। পর্বের প্রথমাংশ (অর্থাৎ ৩-মাত্রাকে) একসঙ্গে পড়ুন, অতঃপর দ্বিতীয়াংশ (অর্থাৎ বাকি ৪-মাত্রাকে) একসঙ্গে পড়ুন। দ্বিতীয়াংশের প্রথমে যেন একটু জোর পড়ে। তাহলে আর ভাবনা নেই; সাতে-পাঁচে গুলিয়ে না-ফেলে তখন স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, অন্যান্য চালের সঙ্গে এর তফাতটা কোথায়। ফি-মাত্রাকে যদি একটি পদক্ষেপ বলে গণ্য করি, তো ৭-মাত্রার এই চালকে 'সপ্তপদী চাল' বললে কি অন্যায় হবে?

কে যেন বারে বারে তার
পুরোনো নাম ধরে ডাকে;
বেড়ায় পায়ে-পায়ে, আর
কাঁধের পরে হাত রাখে।
অথচ খাঁখাঁ চারিধার,
ঠান্ডা চাঁদ চেয়ে থাকে;
ও-হাতখানি তবে কার,
কে তবে ডাক দিল তাকে?

৭-মাত্রার চালটাকে ধরতে পারা যাতে আরও সহজ হয়, তার জন্যে আর-একটু বিশদ করে, অর্থাৎ ৭-মাত্রাকে তিনে + চারে ভাগ করে, এবারে পর্ব ভাঙছি। শুধু তা-ই নয়, শব্দগুলিকে কোথাও জুড়ে দিয়ে, কোথাও ভেঙে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, ছন্দের চাল ঠিক রাখবার জন্যে আমাদের উচ্চারণ কীরকম দাঁড়াবে :

কেযেন+ বারেবারে/ তার
পুরনো+নামধরে/ডাকে;
বেড়ায়+ পায়েপায়ে,/আর
কাঁধের+পরেহাত/রাখে।
অথচ+খাঁখাঁচারি/ধার,
ঠান্ডা+চাঁদচেয়ে/থাকে,

ওহাত+খানিতবে/কার,

কেতবে+ডাকদিল/তাকে?

বলা বাহুল্য, পর্বের শারীরিক গঠনটাকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যেই এই অদ্ভুত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। কবিতা পড়বার সময়ে এতটাই কসরত করবার দরকার নেই। করতে গেলে শুধু ছন্দই পড়া হবে, কবিতা পড়া হবে না। সে-কথা থাক। এবারে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, ৭-মাত্রার চাল আসলে তিন+চারের যোগফল। এখানে ফি-লাইনে আছে ৭-মাত্রার একটি করে পর্ব ও তৎসহ দু-মাত্রার একটি করে ভাঙা-পর্ব। আশা করি, এর পরে আর ৭-মাত্রার চাল নিয়ে কারও ধন্ধ লাগবে না।

আরও একটি দৃষ্টান্ত তবু দিচ্ছি :

রাস্তা উঁচুনিচু, চলেছি সাবধানে,
বিশেষ নেই পুঁজিপাটা।
বিপদ চারিদিকে, বিঘ্ন সবখানে,
পথের সবখানে কাঁটা।

এবারে আর পর্ব ভেঙে দেখাব না। নিজেরাই ভেঙে নিন।

মাত্রাবৃত্তের আলোচনা, আপাতত, এখানেই শেষ হল। এ-ছন্দের নিয়মগুলি আপনারা জেনে নিয়েছেন। নিয়মের ব্যতিক্রমও নেহাত কম নেই। একটি ব্যতিক্রমের কথা এখানে বলি।

আমরা জেনেছি এবং দেখেছি যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বেলায় শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে অবস্থিত যুক্তাক্ষর দু-মাত্রার মূল্য পায়। (যদি না সেই যুক্তাক্ষরের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণটি হয় হস্‌বর্ণ।) যুক্তস্বর (ঐ, ঔ) অবশ্য— শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকলে তো বটেই— আদিতে থাকলেও দু-মাত্রার মূল্য পেয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, শব্দের আদিতে যেখানে যুক্তস্বর, সেখানে সেই যুক্তস্বরের পাশে একটি যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তারা দুয়ে মিলে ২+২=৪ মাত্রার মূল্য আদায় করতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

দৈন্যকে কেন আর সৈন্যে সাজাও,
চৈত্রে মৈত্রী চায় পাষণ্ডেরাও।

এখন, এই যে আমরা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে দু-লাইন লিখলুম, মাত্রাবৃত্তের নিয়ম অনুযায়ী 'দৈন্য' 'সৈন্যে' 'চৈত্রে' আর 'মৈত্রী'— এই শব্দ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেরই তো এখানে চার-মাত্রার মূল্য পাবার কথা, কিন্তু তা তারা কেউ পাচ্ছে কি? কেউই পাচ্ছে না। প্রত্যেকেই পাচ্ছে তিন-মাত্রার মূল্য। প্রত্যেকেরই আদিতে আছে

যুক্তস্বরের দাপট ও সেই যুক্তস্বরের ঠিক পাশেই আছে যুক্তব্যঞ্জনের দাবি। এবং এই দুয়ের সংঘর্ষে প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে একটি করে মাত্রা মারা পড়ছে। 'বৌদ্ধ' 'ঔদ্ধত্য' ইত্যাদি শব্দের বেলাতেও মাত্রাবৃত্তে একটি করে মাত্রা লোপ পেয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, লোপ পেয়ে যায় কার হিস্‌সা থেকে? অর্থাৎ সংঘর্ষের ফলে কার শক্তিক্ষয় ঘটে? শব্দের আদিতে অবস্থিত যুক্তস্বরের, না তার পাশে বসা যুক্তব্যঞ্জনের? অনেকে বলবেন, আদির ওই যুক্তস্বরই এসব ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে ও তার মাত্রামূল্য কমে যায়। আবার অনেকে হয়তো বলবেন, না, সংঘর্ষের ফলে মার খাচ্ছে ওই পাশে-বসা যুক্তাক্ষরটিই। সেক্ষেত্রে কেউ-কেউ আবার এমনও বলতে পারেন যে, একটু-একটু মার খাচ্ছে দুজনেই। এই তিন অভিমতের কোন্‌টা ঠিক, সেটা ধ্বনিতাত্ত্বিকের বিচার্য।*

কিন্তু না, আর নয়, মাত্রাবৃত্তের সীমানা পেরিয়ে এসেছি, এবারে আমরা স্বরবৃত্তের রাজ্যে ঢুকব।

---

* 'পরিশিষ্ট' -অংশে কবি শ্রীশঙ্খ ঘোষের চিঠি দেখুন।

স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ

যেমন অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের ব্যাপারে নিয়েছি, তেমনি স্বরবৃত্তের ব্যাপারেও নাম-পরিচয়টা আগেই স্পষ্ট করে জেনে নেওয়া যাক। স্বরবৃত্ত নামটিও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনেরই উদ্‌ভাবিত। তবে লৌকিক ছন্দ নামেও তিনি একেই বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে এই ছন্দকে বলতেন 'বাংলা প্রাকৃত'। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। স্বরবৃত্ত নামটি পরে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। তিনি এর নতুন নাম রাখেন দলবৃত্ত। তবে পুরনো নামটা যখন প্রসিদ্ধি পেয়েই গেছে, তখন আমরা তাকে ছাড়ছিনে, এই আলোচনায় স্বরবৃত্ত নামটাই আমরা ব্যবহার করব।

এবারে সেই স্বরবৃত্তের রাজ্যে ঢোকার পালা। বলা বাহুল্য, মাত্রাবৃত্তের এলাকায় আমরা যেভাবে ঢুকেছিলুম, স্বরবৃত্তের এলাকাতেও ঠিক সেইভাবেই ঢুকব। অর্থাৎ কিনা গোত্তা মেরে দুম করে ঢুকব না। তার চাইতে বরং দূরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণের জন্য তার চালচলন বেশ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করব; বুঝে নেব, অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে তার গতিভঙ্গিমার তফাত কোথায়। সেটা যদি ভালো করে বুঝতে হয়, তাহলে অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের পাশাপশি রেখে তাকে দেখা দরকার। তাতে তুলনা করবার সুবিধা মেলে; বুঝতে পারি, কে কোনভাবে পা ফেলে হাঁটছে। ছন্দবিচারে অবশ্য দেখার মূল্য যৎসামান্য, শোনার মূল্যই বেশি। যার চলন দেখতে চাই, আসলে তাকে বাজিয়ে দেখতে হবে। আসুন, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তকে তাহলে পাশাপাশি বাজিয়ে দেখা যাক।

ধরা যাক, আমরা ভোজনপর্ব নিয়ে কিছু লিখতে চাই। দিনকাল যা পড়েছে, তাতে সত্যি তো আর ভোজনের সাধ মেটাবার উপায় নেই, এখন শুধু পদ্য বেঁধেই শখ মেটাতে হবে। তা কথা এই যে, শখটা তিন রকমের ছন্দেই মেটাতে পারি। প্রথমত লিখতে পারি :

দক্ষিণহস্তের ক্রিয়া জমে পরিপাটি
পলান্নের সঙ্গে পেলে কোর্মা এক বাটি।

বুঝতেই পারছেন, এ হল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। ছন্দ পালটে এবারে আর-এক রকমের দোলা লাগিয়ে এই কথাগুলিকে প্রকাশ করা যাক। লেখা যাক :

দাও যদি পলান্ন, সাথে এক বাটি
কোর্মা দিলেই
ভোজনের পর্বটা জমে পরিপাটি—
সন্দেহ নেই।

এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। (চালটা এক্ষেত্রে ৪-মাত্রার।) এবারে পুনশ্চ ছন্দ পাল্‌টে এই কথাগুলিতে আমরা আর-এক রকমের দোলা লাগাব। লিখব :

আহার জমে পরিপাটি
সত্যি বলি ভাই
পলান্ন আর একটি বাটি
কোর্মা যদি পাই।

এ হল স্বরবৃত্ত। অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের পাশাপাশি একে পড়ুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, এর চলন একেবারে আলাদা।

আবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এবারে কী নিয়ে লিখব? ফুর্তির কথা তো লিখলুম, এবারে অন্য-কিছু লেখা যাক। বক্তব্যকে আর-একটু উঁচুতে উঠিয়ে এনে, আসুন, হৃদয়ঘটিত কিছু লিখি। পর-পর তিন রকমের ছন্দে সে-কথা লেখা হবে।

(১) অক্ষরবৃত্ত

ঘৃণায় বিঁধেছ যাকে, দিয়েছ ধিক্কার
আহ্বান জানালে তাকে মিথ্যে কেন আর?

(২) মাত্রাবৃত্ত (৫-মাত্রা)

ঘৃণাতে যাকে বিঁধেছ, যাকে
বলেছ শুধু ছি-ছি,
সহসা কেন এখানে তাকে
ডেকেছ মিছিমিছি?

(৩) স্বরবৃত্ত

ঘৃণা করো যে লোকটাকে
শুধুই বলো ছি-ছি,
আবার তুমি কেন তাকে
ডাকলে মিছিমিছি?

দেখতেই পাচ্ছেন, মোটামুটি একই কথাকে আমরা তিন রকমের ছন্দে বাঁধলুম। পাশাপাশি এদের বারকয়েক পড়ে দেখুন। পড়তে গেলেই বুঝতে পারবেন, তৃতীয় ছন্দটির অর্থাৎ স্বরবৃত্তের চাল আগের দুটির কোনওটির সঙ্গেই মেলে না। এর পা ফেলবার ভঙ্গি একেবারেই আলাদা।

আবার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। উদর থেকে যখন হৃদয়ে একবার প্রোমোশন পেয়েছি, তখন বক্তব্য নির্বাচনে আর সহসা আমরা লঘুচিত্ততার পরিচয় দিচ্ছিনে। ধরা যাক, কোনও-এক খণ্ডিতা নায়িকার নিরুদ্ধ বেদনার কথাকে আমরা প্রকাশ করতে চাই। তা তিন রকমের ছন্দেই সে-কথা প্রকাশ করা চলে। যদি অক্ষরবৃত্তে প্রকাশ করতে হয়, তো আমরা লিখব :

মুখে তার কথা নেই, শয্যার উপরে
সমস্ত না-বলা কথা অশ্রু হয়ে ঝরে।

চাল পালটে যদি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই কথাগুলি জানাতে হয়, তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি :

মুখে কথা নেই ভীরু নায়িকার,
বিনিদ্র বিছানায়
না-বলা কথার যন্ত্রণা তার
অশ্রুতে ঝরে যায়।

এ হল ছয়ের চালের মাত্রাবৃত্ত। আবার এই একই কথাকে আমরা স্বরবৃত্তের সুতোতেও গেঁথে তুলতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা লিখব :

একটি কথা নেই মুখে তার
সঙ্গিবিহীন ঘরে
রুদ্ধ কথার যন্ত্রণাভার
অশ্রু হয়ে ঝরে।

অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের চাল যে সম্পূর্ণ পৃথক, আশা করি সেটা ইতিমধ্যে নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়েছেন। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে এদের নিজস্ব গঠনরীতি। তাকে বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে, এদের চলন কেন আলাদা।

অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের গঠনরীতি ইতিপূর্বেই আমরা বিশ্লেষণ করেছি। করে একটা মোটামুটি নিয়মের হদিস পেয়েছি। সেটা এই যে, ১) অক্ষরবৃত্তে সাধারণত প্রতিটি অক্ষর একটি করে মাত্রার মূল্য পায়, এবং ২) মাত্রাবৃত্তে প্রতিটি অক্ষর তো একটি করে মাত্রার মূল্য পায়ই, প্রতিটি যুক্তাক্ষর (যদি সেই যুক্তাক্ষর শব্দের আদিতে না থাকে, কিংবা শব্দের মধ্যে অথবা অন্তে থাকলেও তার পূর্ববর্তী বর্ণটি যদি হস্‌বর্ণ না হয়) পায় দু-মাত্রার মূল্য।

স্বরবৃত্তে সেক্ষেত্রে প্রতিটি সিলেব্‌ল্‌কে একটি করে মাত্রার মূল্য চুকিয়ে দিতে হয়।

সিলেব্‌ল্‌-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী করব? সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করেছিলেন ‘শব্দ-পাপড়ি’, কালিদাস রায় করেছেন ‘পদাংশ’; প্রবোধচন্দ্র ‘দল’-এর পক্ষপাতী।

'পাপড়ি' আর 'দল'-এর অর্থ একই। অনুমান করতে পারি, সত্যেন্দ্রনাথ আর প্রবোধচন্দ্র শব্দকে পুষ্প হিসেবে দেখেছেন; সিলেব্‌ল্ তার পাপড়ি কিংবা দল। (কট্টর নৈয়ায়িকেরা সম্ভবত এইটুকু শুনেই ভ্রূকুটি করে বলে বসবেন যে, শব্দকোশে সেক্ষেত্রে আর যে-পুষ্পেরই থাক, শতদলের দৃষ্টান্ত মিলবে না, কেন-না, একশ-সিলেব্‌ল্ দিয়ে যার অঙ্গ গড়া, এমন শব্দ *ন ভূতো ন ভবিষ্যতি*।)

কিন্তু সে-কথা পরে। সিলেব্‌ল্ই বলি, কিংবা পাপড়ি অথবা দলই বলি, বস্তুটা আসলে কী, আগে সেটা বোঝা চাই।

এক কথায় বলতে পারি, কোনও-কিছু উচ্চারণ করতে গিয়ে ন্যূনতম চেষ্টায় যেটুকু আমরা বলতে পারি, তা-ই হচ্ছে একটি সিলেব্‌ল্। সেই দিক থেকে এক-একটি সিলেব্‌ল্ হচ্ছে আমাদের উচ্চারণের এক-একটি ইউনিট কিংবা একক। এই এককগুলির সমবায়েই আমাদের উচ্চারণের শরীর গড়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি :

ধরা যাক, 'কবিকঙ্কণ' শব্দটাকে আমরা উচ্চারণ করতে চাই। করলুম। করে দেখতে পাচ্ছি, চারটি এককে তার অঙ্গ গড়া। আলাদা করে সেগুলিকে এইভাবে দেখানো যায় :

ক+বি+কং+কণ্

অর্থাৎ 'কবিকঙ্কণ' শব্দটি মোট চারটি সিলেব্‌ল্-এর সমবায়ে গড়ে উঠেছে।

এই হিসেবে 'ছন্দ' শব্দটিতে আছে দুটি সিলেব্‌ল্ (ছন্ + দ); আবার— অক্ষরের সংখ্যা যদিও বাড়ল— 'বন্ধন' শব্দটিতে দুটির বেশি সিলেব্‌ল্ নেই (বন্ + ধন্)।

এই পর্যন্ত যা বলেছি, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সিলেব্‌ল্ দু-রকমের হতে পারে। ইংরেজিতে বলে 'ওপ্‌ন্ সিলেব্‌ল্' ও 'ক্লোজ্‌ড্ সিলেব্‌ল্'। প্রবোধচন্দ্র তো সিলেব্‌ল্ শব্দটার বাংলা করেছেন 'দল', সেই হিসেবে 'ওপ্‌ন্ সিলেব্‌ল্' ও 'ক্লোজ্‌ড্ সিলেব্‌ল্'কে তিনি 'মুক্তদল' ও 'রুদ্ধদল' বলেন। 'কবিকঙ্কণ' শব্দটার মধ্যে 'ক' আর 'বি' হচ্ছে মুক্ত সিলেব্‌ল্; অন্য দিকে 'কং' আর 'কণ্' হচ্ছে রুদ্ধ। 'রুদ্ধ' বলছি এইজন্যে যে, 'ক' আর 'বি'-র মতো এ-দুটি সিলেব্‌ল্-এর উচ্চারণকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। 'ভাই' 'বউ' 'যাও' ইত্যাদিও রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এর দৃষ্টান্ত। এসব 'সিলেব্‌ল্-এর শেষে যদিও স্বরবর্ণ আছে, তবু— উচ্চারণ যেহেতু তন্মুহূর্তেই ফুরিয়ে যায়, তাই— কার্যত সেই স্বরবর্ণগুলি হসন্ত বর্ণেরই সামিল, ফলে এরাও রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ বলে গণ্য হয়। ('যায়', 'হায়' ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো সেই এক কথা বটেই, 'যাঃ' 'বাঃ' ইত্যাদিও রুদ্ধ সিলেব্‌ল্।)

ইতিপূর্বে বলেছি, স্বরবৃত্ত ছন্দে সিলেব্‌ল্-এর হিসেবে মাত্রার মূল্য চুকিয়ে দিতে

হয়; ফি সিলেব্‌ল্‌কে দিতে হয় একটি করে মাত্রার মূল্য। সেক্ষেত্রে এই রীতিতে দেখা যাচ্ছে মাত্রা-সংখ্যার দিক থেকে 'ছন্দ' আর 'বন্ধন' তুল্যমূল্য শব্দ; কেন-না অক্ষর-সংখ্যায় পৃথক হয়েও সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যায় তারা সমান, তাদের দুজনেরই শরীর দুটি করে সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে গঠিত হয়েছে।

অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের প্রধান পার্থক্য এইখানেই। ধ্বনিটাই অবশ্য প্রধান কথা, অক্ষর নেহাতই গৌণ ব্যাপার। সে-কথা আগেও অনেক বার বলেছি, তবু, প্রথম দুটি ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষরও একেবারে ন-গণ্য নয়। ব্যতিক্রমের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে অক্ষরের ভিত্তিতেও মাত্রার একটা মোটামুটি হিসেব সেখানে রাখা চলে। স্বরবৃত্তে সেটা একেবারেই চলে না। একই শব্দ যে এই তিন রকমের ছন্দে কীভাবে তিন রকমের মাত্রামূল্য পায়, কবিকঙ্কণের 'কঙ্কণ' দিয়েই সেটা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

১) অক্ষরবৃত্তে সাধারণত প্রতিটি অক্ষরই একটি করে মাত্রার মূল্য পায়। সুতরাং 'কঙ্কণ' সেখানে ৩-মাত্রার শব্দ।

২) মাত্রাবৃত্তে আমরা সাধারণত প্রতিটি অক্ষরকে একটি করে মাত্রার মূল্য দিই কিন্তু শব্দের মধ্যস্থ কিংবা প্রান্তবর্তী যুক্তাক্ষরকে (যদি না সেই যুক্তাক্ষরের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণটি হয় হস্‌বর্ণ) দিই ২-মাত্রার মূল্য। সুতরাং 'কঙ্কণ' সেখানে ৪-মাত্রার শব্দ।

৩) স্বরবৃত্তে আমরা প্রতিটি সিলেব্‌ল্‌কে একটি করে মাত্রার মূল্য দিই, এবং 'কঙ্কণ' শব্দটিতে মোট দুটি সিলেব্‌ল্‌ (কং+কণ্‌) পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং 'কঙ্কণ' সেখানে ২-মাত্রার শব্দ।

অর্থাৎ কিনা একই শব্দ তিন রকমের ছন্দে তিন রকমের মাত্রামূল্য পাচ্ছে।

পদ্যের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হবে। পরপর তিন রকমের ছন্দে আমরা মোটামুটি একই বক্তব্যকে এখানে উপস্থিত করছি :

১) অক্ষরবৃত্ত

অঙ্কের দাপটে কাব্য নাভিশ্বাস ছাড়ে,
আনন্দের লেশ নেই ছন্দের বিচারে।

২) মাত্রাবৃত্ত (৬-মাত্রা)

অঙ্কের চোখ-রাঙানিতে হায়,
    নাড়ি ছাড়ে কাব্যের,
ছন্দ-বিচারে বলো কেবা পায়
    স্পর্শ আনন্দের?

৩) স্বরবৃত্ত

অঙ্ক কষে কিচ্ছু পেলে?
কাব্য গেল মরে।
আনন্দের কি পরশ মেলে
ছন্দ-বিচার করে?

কথাটা সত্যি নয়। ছন্দ-বিচারেও আনন্দ মেলে বইকি। আপাতত লক্ষ করে দেখুন, 'আনন্দের' শব্দটি তিনটি দৃষ্টান্তেই আছে। কিন্তু তিন জায়গায় তার মাত্রামূল্য সমান নয়। প্রথম দৃষ্টান্তে (অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তে) সে পাচ্ছে ৪-মাত্রার মূল্য ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে (অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তে) সে পাচ্ছে ৫-মাত্রার মূল্য; আবার তৃতীয় দৃষ্টান্তে (অর্থাৎ স্বরবৃত্তে) সে মাত্র ৩-মাত্রার মূল্য পেয়েই খুশি থাকছে।

স্বরবৃত্তে সে মাত্র ৩-মাত্রার মূল্য পাচ্ছে কেন? কারণটা আগেই বলেছি। পাচ্ছে, তার কারণ, স্বরবৃত্তে মাত্রার মূল্য দেওয়া হয় সিলেব্‌ল্ অনুযায়ী, এবং 'আনন্দের' শব্দটিতে (আ+নন্+দের্) তিনটির বেশি সিলেব্‌ল্ নেই।

এবারে আমরা স্বরবৃত্তের পর্ব-বিভাগ করে দেখাব। সিলেব্‌ল্ অনুযায়ী মাত্রার মূল্য দেবার ব্যাপারটা তাতে আরও স্পষ্ট হবে। কিন্তু পর্ব ভেঙে দেখাবার জন্যে একটা পদ্য চাই। হাতের কাছে পদ্যের বই পাচ্ছিনে; তাই, আসুন, স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা লাইন-কয়েকের একটা টুকরো পদ্য নিজেরাই বানিয়ে নেওয়া যাক। ভয় পাবার কিছু নেই, অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্ত ছন্দে তো আর আমরা কম পদ্য বানাইনি, কান যদি ঠিক থাকে তো স্বরবৃত্তেও কয়েকটা লাইন আমরা ঠিকই খাড়া করে ফেলতে পারব।

ধরা যাক, আমাদের বক্তব্য এই হবে যে, রেলের কামরায় অকস্মাৎ এক পুরোনো বন্ধুর (কিংবা বান্ধবীর) সঙ্গে দেখা হয়েছে, খানিক বাদেই আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, দুজনে দু-পথে চলে যাব, কিন্তু সেই বিচ্ছেদের ভাবনাকে আমরা আমল দিতে চাইনে, বরং দু-দণ্ডের এই হঠাৎ-মিলনকে গল্পে-গল্পে ভরিয়ে তুলতে চাই। তা স্বরবৃত্তে সেই কথাটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি :

পথের মধ্যে হঠাৎ দেখা,
ট্রেনের মধ্যে আলাপচারি;
স্টেশন এলেই আবার একা
অন্য পথে দেব পাড়ি।
সেটা সত্যি, কিন্তু অত
ভেবে দেখলে কষ্ট বড়ো;
বরং এসো, আপাতত
হালকা কিছু গল্প করো।

যাক, লাইনগুলি মোটামুটি খাড়া হয়েছে। এবারে একে পর্বে-পর্বে ভাগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে এর চেহারা দাঁড়াবে এইরকম :

পথের মধ্যে/হঠাৎ দেখা,/
ট্রেনের মধ্যে/আলাপচারি;/
স্টেশন এলেই/আবার একা/
অন্য পথে/দেব পাড়ি।/
সেটা সত্যি,/কিন্তু অত/
ভেবে দেখলে/কষ্ট বড়ো;/
বরং এসো,/আপাতত/
হালকা কিছু/গল্প করো।/

দেখতে পাচ্ছি, এখানে ফি-লাইনে আছে দুটি করে পর্ব (সংখ্যাটাকে ইচ্ছে করলেই বাড়ানো যেত); লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব নেই (ইচ্ছে করলেই রাখা যেত)।

লাইন তো ভাঙলুম। এখন পর্বকেও যদি ভেঙে দেখি, তাহলে তার মধ্যে চারটি করে সিলেব্‌ল্-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথম লাইনের প্রথম পর্বটিকে ভেঙে দেখছি, প + থের্ + মধ্ + ধে— এই চারটি সিলেব্‌ল্-এ তার শরীর গড়া। অন্য ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হবে না, যে-কোনও পর্ব এখানে ভাঙি না কেন, মোট চারটি করে সিলেব্‌ল্ই তাতে মিলবে।

এবং আপনারা আগেই জেনেছেন যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতিটি সিলেব্‌ল্ একটি করে মাত্রার মূল্য পায়। সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, স্বরবৃত্তের চাল ৪-মাত্রার। মাত্রাবৃত্ত অনেক চালে চলে। কিন্তু স্বরবৃত্তের এই একটিই চাল। চারের চাল ছাড়া সে চলে না।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে আমাদের বিষয়বস্তু হবে ভালোবাসা। একটি মেয়ের চাউনিতে আলো জ্বলেছে, হাসিতে রং ধরেছে, অথচ ভঙ্গিটি সলজ্জ। তার বুকের মধ্যে জেগেছে অসম্ভবকে জয় করবার আশা; অন্য দিকে, দ্বিধা আর ভয়ের শিকলটাকেও সে ছিঁড়তে পারছে না। অর্থাৎ কিনা সে প্রেমে পড়েছে। তা তার এই অবস্থাটাকে আমরা, স্বরবৃত্ত ছন্দে এইভাবে প্রকাশ করতে পারি :

দুটি চোখে কে ওই আলো জ্বালে,
ঠোঁটে লাগায় হাসি?
ভঙ্গিতে কে অমন করে ঢালে
লজ্জা রাশিরাশি?
বুকের মধ্যে বাজায় গুরুগুরু

অসম্ভবের আশা;
ভয়ে তবু কাঁপে যে তার ভুরু,
সেই তো ভালোবাসা।

ঈশ্বর জানেন, প্রথম-প্রেমের এই বর্ণনাটা সকলের মনঃপূত হল কি না। তবে এ-ও যে স্বরবৃত্তই, তাতে সন্দেহ নেই। পর্ব ভেঙে দেখালে এর চেহারা হবে এইরকম :

দুটি চোখে/কে ওই আলো/জ্বালে,
ঠোঁটে লাগায়/হাসি?
ভঙ্গিতে কে/অমন করে/ঢালে
লজ্জা রাশি/রাশি?
বুকের মধ্যে/বাজায় গুরু/গুরু
অসম্ভবের/আশা;
ভয়ে তবু/কাঁপে যে তার/ভুরু,
সেই তো ভালো/বাসা।

দেখতে পাচ্ছি, এর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম আর সপ্তম লাইনে আছে দুটি করে পর্ব ; দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ আর অষ্টম লাইনে সেক্ষেত্রে একটি করে পর্ব আছে। ফি-লাইনের শেষে আমরা ভাঙা-পর্ব রেখেছি। প্রতিটি পর্বই ৪-মাত্রায় গড়া (অর্থাৎ প্রতিটি পর্বেই চারটি করে সিলেব্‌ল্‌ আছে)। ভাঙা-পর্বগুলি ২-মাত্রার।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এবারে আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা। প্রেম-ভালাবাসা-প্রকৃতির কথা তো অনেক বললুম, এবারে জীবনের অন্ধকার দিকটার দিকেও একবার তাকানো যাক। যুগপৎ অকৃতজ্ঞ ও নির্বোধ এমন মানুষের কথা বলা যাক, নিজের ক্ষমতার দৌড় না-বুঝেই যে কিনা উপকারীকে দংশন করতে উদ্যত :

চেহারাটা আজকে তোমার
এক মুহূর্তে পড়ল ধরা।
হাঁড়ির মধ্যে আটকা ছিলে,
যেই না খুলে দিলুম সরা—
অমনি তুমি আমার দেহেই
সমস্ত বিষ ঢালতে চাচ্ছ,
সাপের মতোই ফণা তুলে
দিব্যি তুমি ফোঁসফোঁসাচ্ছ।
কৃতজ্ঞতা কিচ্ছু নেই কি?

বুদ্ধি? তা-ও না? আরে ছি-ছি।
বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে
ভয় দেখাচ্ছ মিছিমিছি।
সাপের ওষুধ আছে আমার,
কোরো না তাই বাড়াবাড়ি।
তোমার মতন হাজার সাপকে
হাঁড়িতে ফের পুরতে পারি।

এবারে আর পর্ব ভেঙে দেখাচ্ছিনে। নিজেরাই ভেঙে নিন। ভাঙলে দেখতে পাবেন, এর ফি-লাইনে দুটি করে পর্ব আছে (লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব নেই)। প্রতি পর্বে, যথারীতি, আছে চারটি করে সিলেব্‌ল্‌।

কথা এই যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে ৪-সিলেব্‌ল্‌-এর পর্বটাই নিয়ম বটে, তবে মাঝে-মাঝে তার ব্যতিক্রমও ঘটে যায়। আমরা তিনটি মুক্ত ও একটি বুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌-এর সমবায়ে পর্ব গড়তে পারি (দৃষ্টান্ত : "দিনের আলো" = দি/নের/আ/লো), কিংবা চারটি মুক্ত সিলেব্‌ল্‌-এর সমবায়ে পর্ব গড়তে পারি (দৃষ্টান্ত : "নিভে এলো"= নি/ভে/এ/লো), কিংবা দুটি মুক্ত ও দুটি বুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌-এর সমবায়েও পর্ব গড়তে পারি (দৃষ্টান্ত : "বাইরে কেবল" = বাই/রে/কে/বল্‌)। এই সবই চার-সিলেব্‌ল্‌-সম্পন্ন পর্বের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সবগুলি সিলেব্‌ল্‌কেই যদি বুদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করি, তাহলে পর্বের মধ্যে সাকুল্যে তিনটির বেশি সিলেব্‌ল্‌ ঢোকাতে গেলে আমাদের ঘাম ছুটে যাবে। (দৃষ্টান্ত দেবার জন্যে এক্ষুনি একটা লাইন বানিয়ে নেওয়া যাক্‌। "শন্‌ শন্‌ শন্‌ বাতাস বইছে"— এই যে লাইনটি, এর মধ্যে দুটি পর্ব আছে। "শন্‌ শন্‌ শন্‌" আর "বাতাস বইছে"। তার মধ্যে প্রথম পর্ব অর্থাৎ "শন্‌ শন্‌ শন্‌"-এর সব কটি সিলেব্‌ল্‌ই যেহেতু বুদ্ধ তাই সেই পর্বের মধ্যে সাকুল্যে তিনটির বেশি সিলেব্‌ল্‌-এর জায়গা মেলেনি; মেলানো শক্ত।) তাহলেই দেখা যাচ্ছে: ৪-মাত্রার নিয়মটা সর্বদা বজায় থাকে না; সিলেব্‌ল্‌-এর চরিত্র অনুযায়ী মাত্রার সংখ্যা বাড়ে কমে। এখানে যে-দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তা ছাড়া অন্য প্রকারের ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও এই ছন্দে বিস্তর মেলে। যেমন মাত্রাহ্রাস, তেমনি মাত্রাবৃদ্ধির দৃষ্টান্তও প্রচুর। স্বরবৃত্তের আর-এক নাম ছড়ার ছন্দ। তা চোখ বুলোলেই ধরা পড়বে যে, সেকাল আর একালের অনেক ছড়ারই অনেক পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্‌ নেই। কোথাও বেশি আছে, কোথাও কম।

স্বরবৃত্ত ছন্দে একালেও কিছু কম কবিতা লেখা হয়নি। কিন্তু একালের কবিরাই যে পর্বে-পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্‌-এর বরাদ্দ চাপাবার কানুন সর্বদা মান্য

করছেন, এমনও বলতে পারিনে। ব্যতিক্রম বিস্তর চোখে পড়ে। আকছার দেখতে পাই, পর্বে কোথাও সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারের বেশি, কোথাও কম। সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা যখন বাড়ে, তখন পাঁচে, এমনকি এক-আধ ক্ষেত্রে ছয়েও গিয়ে পৌঁছোয়। (প্রাচীন ছড়ায় ছয়-সিলেব্‌ল্‌যুক্ত পর্বের দৃষ্টান্ত : কাজিফুল 'কুড়োতে কুড়োতে' পেয়ে গেলাম মালা।) যখন কমে, তখন সাধারণত তিনে এসে নামে।

ওঠানামার ব্যাপারটা কি কবিদের ইচ্ছাকৃত? অর্থাৎ চার-সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে স্বরবৃত্তের পর্ব গড়বার যে একটি অলিখিত বিধান রয়েছে, সেইটেকে লঙ্ঘন করবার জন্যেই কি তাঁরা মাঝে-মাঝে সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা বাড়ান কিংবা কমান? উত্তরটা কবিরাই দিতে পারবেন। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, নিয়ম লঙ্ঘন করলেও তাঁরা সাধারণত এক-পায়ের বেশি লঙ্ঘন করেন না। চারের সীমানা ছাড়িয়ে যখন তাঁরা ওপরে ওঠেন, তখন বড়োজোর এক পা ওঠেন। এবং যখন নামেন, তখন সাধারণত এক পা-ই নামেন। (নামতে নামতে দুয়ে নামবার দৃষ্টান্তও কিছু আছে।)

সীমানা ছাড়িয়ে ওপরে উঠবার দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া যাক। বিখ্যাত কিছু পদ্য কিংবা ছড়া থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (হাতের কাছে বই না থাকায় মিলিয়ে নেবার উপায় নেই। উদ্ধৃতিতে যদি একটু-আধটু ভুল ঘটে যায়, সহৃদয় পাঠক আশা করি ক্ষমা করবেন।) নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুণ।

> "রাত পোহাল, ফরসা হল, ফুটল কত ফুল;
> কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা জুটল অলিকুল।"

এখানে ফি-লাইনে আছে তিনটি করে পর্ব। লাইনের শেষে ভাঙা-পর্বও আছে। প্রতিটি পর্বে চারটি করে সিলেবল্‌ থাকবার কথা। আছেও। শুধু দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পর্বে ব্যতিক্রম ঘটেছে। পর্বটি হল 'কাঁপিয়ে পাখা'। হিসেব করে দেখুন, সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা এক্ষেত্রে চার নয়, পাঁচ।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

> "জাদুর গুণের বালাই নিয়ে মরে যেন সে কাল!"

এটিও আপনাদের চেনা লাইন। এতেও আছে তিনটি পর্ব আর একটি ভাঙা-পর্ব। কিন্তু তৃতীয় পর্বে ('মরে যেন সে') সিলেব্‌ল্‌ রয়েছে চারের বদলে পাঁচটি।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় :

> "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।"

—এ-লাইনটিও আপনারা অনেক বার শুনেছেন। কিন্তু এর প্রথম পর্বে

('যমুনাবতী') যে পাঁচটি সিলেব্‌ল্ রয়েছে, তা হয়তো সবাই খেয়াল করে দেখেননি। ঠিক তেমনি, 'পূজাবাটীতে জোর কাঠিতে' যখন ঢাক বাজে, তখনও অনেকেই খেয়াল করে দেখেন না যে, 'পূজাবাটীতে' পুরো পাঁচটি সিলেব্‌ল্ গিয়ে ঢুকেছে।

ইতিপূর্বে আমরা স্বরবৃত্তের যেসব দৃষ্টান্ত নিজেরা তৈরি করে নিয়েছিলুম, তাতে অবশ্য কুত্রাপি কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু থাকলেই কি তাতে স্বরবৃত্তের পবিত্রতা নষ্ট হত? ট্রেনের মধ্যে হঠাৎ-দেখতে-পাওয়া বন্ধুটির সঙ্গো খানিকবাদেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, এই কথাটা জানিয়ে আমরা লিখেছিলুম :

সেটা সত্যি, কিন্তু অত
ভেবে দেখলে কষ্ট বড়ো।

সেক্ষেত্রে ভেবে না-দেখে আমরা যদি তলিয়ে দেখতুম, এবং লিখতুম :

সেটা সত্যি, কিন্তু অত
তলিয়ে দেখলে কষ্ট বড়ো।

তাহলেই ব্যতিক্রম ঘটত, এবং দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পর্বে ('তলিয়ে দেখলে') পাঁচটি সিলেব্‌ল্ ঢুকে পড়ত। কিন্তু স্বরবৃত্তের চাল যে তাই বলে নষ্ট হত, এমন মনে হয় না।

নষ্ট হয় না সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যা কমে গেলেও। ঊর্ধ্বগতির কথা তো বললুম। নিম্নগতির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। চারের বদলে তিন সিলেব্‌ল্ দিয়েও মাঝে-মাঝে স্বরবৃত্তের পর্ব গড়া হয়েছে, কিন্তু ছন্দের রেলগাড়ি তাতে বেলাইন হয়নি। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

"আজ রামের অধিবাস কাল রামের বিয়ে।"

এটিও একটি সুপরিচিত লাইন, এবং এ-ও স্বরবৃত্তই। লাইনটিতে মোট তিনটি পর্ব, আর তৎসহ একটি ভাঙা-পর্ব রয়েছে। কিন্তু তিনটি পর্বের প্রত্যেকটিই এখানে তিন-সিলেব্‌ল্ দিয়ে গড়া (আজ রামের/অধিবাস/কাল রামের)।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

"গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।"

এটিও একটি পরিচিত ছড়ার লাইন। এরও দ্বিতীয় পর্বে ('ভাই আমার') আর তৃতীয় পর্বে ('মন কেমন') আছে তিনটি করে সিলেব্‌ল্।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে দু-লাইন নিজেরাই বানিয়ে নিচ্ছি :

রাতদিন তুই ছাইভস্ম কী যে
কথা বলিস নিজের সঙ্গো নিজে।

লাইন দুটির প্রত্যেকটিতে আছে দুটি করে পর্ব আর একটি করে ভাঙা-পর্ব। লক্ষ

করে দেখুন, প্রথম লাইনের দুটি পর্বই (রাতদিন তুই/ছাইভস্ম) গড়া হয়েছে তিনটি করে সিলেব্‌ল্ দিয়ে।* কিন্তু ছন্দ তাতে বেচাল হয়নি।

কেন হয় না? সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যা চারের জায়গায় বেড়ে গিয়ে পাঁচ, কিংবা কমে গিয়ে তিন, হওয়া সত্ত্বেও কী করে ছন্দের চাল ঠিক থাকে?

ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছান্দসিকেরা বলেন, চাল নষ্ট হয় না আমাদের উচ্চারণের গুণে। (বললুম 'গুণ', কিন্তু ব্যাপারটা আসলে উচ্চারণের 'দোষ' ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে সেটা দোষ হৈয়াও গুণ হচ্ছে বটে!) আমরা লিখি বটে 'কাঁপিয়ে পাখা', কিন্তু উচ্চারণে সেটা 'কাঁপ্‌য়ে পাখা' হয়ে দাঁড়ায়, 'তলিয়ে দেখলে' হয় 'তল্‌য়ে দেখলে'। ফলে সিলেব্‌ল্‌ও একটি করে কমে যায়। 'কাঁপিয়ে পাখা'য় যেক্ষেত্রে পাঁচটি সিলেব্‌ল্ পাচ্ছি (কাঁ+পি+য়ে পা+খা), 'কাঁপ্‌য়ে পাখা'য় সেক্ষেত্রে চারটি সিলেব্‌ল্ মিলবে (কাঁপ্+য়ে পা+ খা)। 'তলিয়ে দেখলে' যেক্ষেত্রে পাঁচটি সিলেব্‌ল্ দিয়ে গড়া (ত+লি+য়ে দেখ্+লে), 'তল্‌য়ে দেখলে'র সিলেব্‌ল্ সংখ্যা সেক্ষেত্রে চারের বেশি নয়। (তল্+য়ে দেখ্+লে)।

কিন্তু 'যমুনাবতী'র ব্যাখ্যা কী? ছান্দসিকেরা এক্ষেত্রেও সম্ভবত বলবেন যে, তাড়াতাড়ি বলবার সময়ে আমরা 'যমুনাবতী' বলি না, বলি 'যোম্‌নাবতী'; ফলে সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যা এক্ষেত্রেও চারে এসে দাঁড়ায় (যোম্+না+ব+তী)। এই নিয়ম অনুযায়ী 'মরে যেন সে' আর 'পূজাবাটীতে'র ক্ষেত্রেও সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যা কমে গিয়ে চারে এসে দাঁড়াবার একটা-কিছু ব্যাখ্যা নিশ্চয় মিলবে।

ব্যাখ্যা মেলে সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যা যেখানে চারের কম, সেখানেও। ছান্দসিক বলবেন, তিন সিলেব্‌ল্‌কেই আমরা সেখানে টেনে উচ্চারণ করে চারে এনে দাঁড় করাই। 'আজ রামের/অধিবাস/কাল রামের/বিয়ে' এই লাইনটিকে টেনে বলি 'আ-জ রামের/অধি-বাস/কা-ল রামের/বিয়ে'। 'গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে'র ক্ষেত্রে প্রথম পর্বটিতে চারটি সিলেব্‌ল্ থাকায় টেনে পড়বার দরকার হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে আর তৃতীয় পর্বে সিলেব্‌ল্-এর ঘাটতি থাকায় টেনে পড়তে হয়। ঘাটতি মেটাবার জন্যে বলতে হয়, 'ভা-ই আমার/ম-ন কেমন'।

সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যা, আমরা আগেই আভাস দিয়েছি, তিনে নেমেই সর্বদা ক্ষান্ত হয় না। মাঝে-মাঝে, নামবার ঝোঁকে, সে দুয়ে গিয়েও নামে। প্রবোধচন্দ্র তাঁর *ছন্দ-পরিক্রমা* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

---

*'রাতদিন তুই'-পর্বটির তিনটি সিলেব্‌ল্ই রুদ্ধ, সুতরাং ইচ্ছে করলেও ওখানে অতিরিক্ত কোনও সিলেব্‌ল্ ঢোকানো শক্ত হত। 'ছাইভস্ম' পর্বটি সম্পর্কে কিন্তু সে-কথা খাটে না। ওখানে আছে দুটি রুদ্ধ ও একটি মুক্ত সিলেব্‌ল্ (ছাই+ভস্+স)। সুতরাং আর-একটি সিলেব্‌ল্ ওখানে ঢোকানো যেত। কিন্তু তা না-ঢোকানো সত্ত্বেও যে ছন্দ বেচাল হয়নি, এটুকু অবশ্যই লক্ষণীয়।

"বাইরে কেবল/জলের শব্দ/ঝুপ ঝুপ/ঝুপ
দস্যি ছেলে/গল্প শোনে/একেবারে/চুপ।"

এখানে দুটি লাইনেই আছে তিনটি করে পর্ব ও একটি করে ভাঙা-পর্ব। প্রতি পর্বে আছে চারটি করে সিলেব্‌ল্‌। ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধু প্রথম লাইনের তৃতীয় পর্বে। সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা সেখানে শুধু যে কমেছে তা নয়, কমে একেবারে দুয়ে এসে ঠেকেছে। ছন্দের চাল তবু যে নষ্ট হয়নি, তার ব্যাখ্যা কী? ব্যাখ্যা অবশ্যই এই যে, 'ঝুপ ঝুপ'কে এক্ষেত্রে আমরা টেনে 'ঝুউপ-ঝুউপ' করে উচ্চারণ করি; ফলে চারের হিসেবটাও মিলে যায় (ঝু+উপ্‌+ঝু+উপ্‌), ছন্দের চালও নষ্ট হয় না।

* * *

স্বরবৃত্ত ছন্দের নিয়ম কী, আমরা জেনেছি। নিয়মের ব্যতিক্রমের কথাও জানলুম। ব্যতিক্রম ঘটা সত্ত্বেও ছন্দের চাল কেন নষ্ট হয় না, সেই ব্যাখ্যাটাও পাওয়া গেল। ব্যাখ্যা যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা প্রবীণ ছান্দসিক। ছন্দশাস্ত্রে তাঁরা পারদ্রষ্টা। তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত; ধ্বনি ও উচ্চারণের হাড়হদ্দ তাঁরা জানেন। তাঁদের কথার প্রতিবাদ করব, এত বড়ো ধৃষ্টতা আমাদের নেই।

কিন্তু নিজেদের কথাটাকে জানাবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বক্তব্য আমরা এখানে পেশ করলুম।

১) 'কাঁপিয়ে পাখা', 'তলিয়ে দেখলে', 'যমুনাবতী', 'মরে যেন সে', 'পুজাবাটীতে'-জাতীয় পাঁচ সিলেব্‌ল্‌-সংবলিত পর্বের ক্ষেত্রে উচ্চারণকে কিছুমাত্র বিকৃত কিংবা সংকুচিত না করে (অর্থাৎ প্রতিটি শব্দকেই যথাবিধি উচ্চারণ করে) দেখেছি, স্বরবৃত্তের চাল তাতেও নষ্ট হয় না। ঠিকই থাকে।

২) তৎসত্ত্বেও যদি ছান্দসিকেরা বলেন যে, না, চাল ঠিক থাকে না, এবং ঠিক রাখবার জন্যেই উচ্চারণকে কোথাও (পর্বে যেখানে সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারের বেশি) গুটিয়ে আনতে হবে, আবার কোথাও (পর্বে যেখানে সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারের কম) ছড়িয়ে দিতে হবে, এবং পর্বের দৈর্ঘ্যে এইভাবে সমতা বিধান করতে হবে, তাহলে আমরা বিনীতভাবে প্রশ্ন করব যে, উচ্চারণের এইভাবে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাবার রীতি তো গানের ব্যাপারে চলে, ও-রীতি কি কবিতাতেও চলা উচিত?

কথাটা যখন উঠলই, তখন আরও মূলে গিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। জিজ্ঞেস করা যায়, স্বরবৃত্ত ছন্দে উচ্চারণকে প্রয়োজনবোধে কোথাও গুটিয়ে আনা এবং কোথাও ছড়িয়ে দেওয়া (এবং এইভাবে পর্বের দৈর্ঘ্যে সাম্যবিধান করা) যদি অত্যাবশ্যক হয়ই, তবে স্বরবৃত্তকে মূলত কবিতার ছন্দ বলে গণ্য করা চলে কি না।*

---

*'পরিশিষ্ট' অংশে ড. ভবতোষ দত্তের চিঠি দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নটা অকারণ নয়। আমরা সকলেই জানি, সেকালের অনেক ছড়াই গানের সগোত্র। ঘুমপাড়ানি ছড়া তো বটেই। 'খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে'— কোলের উপরে ছেলেকে শুইয়ে একালের জননীরাও যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করেন তখন অজান্তেই এই কথাগুলিতে কিছুটা সুরের দোলানি লেগে যায়। (প্রসঙ্গত বলি, 'খোকা ঘুমোল' আর 'পাড়া জুড়োল'তেও সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারের বেশি।) লাগে আরও অনেক ছড়াতেই। তখন মনে হয়, এই ছড়াগুলি আসলে কবিতা নয়, গান— যা সুর সহযোগে গেয়। কথার ভূমিকা সেখানে যৎসামান্য, সুরই সেখানে ছন্দ ঠিক রাখে। (সেই সুর হয়তো খুবই এলিমেন্‌টারি, কিন্তু তা সুরই।) আর তা-ই যদি হয়, ছড়ার কথাগুলিকে তবে কবিতার ছন্দের কড়া-ইস্ত্রি নিয়মকানুনের ফ্রেমে আঁটাবার চেষ্টা কি কিছুটা অর্থহীন হয়ে পড়ে না? কাব্যছন্দের ব্যাকরণ দিয়ে তো গীতিকা-র শরীরকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারিনে।

ছান্দসিকেরা এ-সম্পর্কে কী বলবেন, আমাদের জানা নেই। তবে স্বরবৃত্তের চালচলন দেখে সন্দেহ না-হয়েই পারে না যে, এই ছন্দ মূলত গানেরই ছন্দ, পরবর্তী কালে কবিতাতেও যার সার্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

সব ছন্দই কি সিলেবিক্

যা বলবার বলেছি। এখন ছন্দের এই ব্যাপারটাকে আর-এক দিক থেকে দেখা যাক। তিন ছন্দের শারীরিক নির্মাণের উপরে নজর রেখে ভাবা যাক যে, এদের মাত্রা বিচারের কোনও সামান্য কৌশল আছে কি না। সামান্য বলতে এখানে তুচ্ছ কিংবা নগণ্য বোঝানো হচ্ছে না। ইংরেজিতে যাকে বলে 'কমন্', সামান্য এখানে তা-ই। (দৃষ্টান্ত : ইংরেজদের মধ্যে কেউ রোগা, কেউ মোটা, কেউ ঢ্যাঙা, কেউ বেঁটে, কিন্তু এসব বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও তাদের যে একটা 'কমন্ ফ্যাকটর' বা 'সামান্য লক্ষণ' সকলের চোখে পড়ে, সেটা এই যে, তারা সবাই দিব্যি গৌরবরন।) এবং 'সামান্য কৌশল' বলতেও আমরা সেই কৌশলকে বোঝাচ্ছি, তিনটি ছন্দের মাত্রাবিচারেই যা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কিংবা 'সামান্য কৌশল' না-বলে আমরা 'মাস্টার কী'ও বলতে পারি। স্বর্গত দীনেন্দ্রকুমার রায় ইংরেজি এই 'মাস্টার কী'র ভারী সুন্দর একটি বাংলা করে দিয়েছিলেন। 'সবখোল্ চাবি'। কথা হচ্ছে, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত, এই তিন তালাকেই যা খুলতে পারে, এমন কোনও সবখোল্ চাবির আশা কি নেহাতই দুরাশা?

মোটেই নয়। সবখোল্ সেই চাবি আমাদের সামনেই রয়েছে। একটু লক্ষ করলেই আমরা দেখতে পাব যে, স্রেফ সিলেব্‌ল্-এর চাবি ঘুরিয়েই আমরা তিন ছন্দের তালা খুলে তাদের মাত্রা-রহস্যের একেবারে মর্মস্থলে গিয়ে ঢুকতে পারি।

মাত্রার ব্যাপারে, শুধু স্বরবৃত্ত নয়, তিনটি ছন্দই আসলে সিলেব্‌ল্-এর উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে তারা পরস্পরের সগোত্র। অন্যদিকে, তাদের অমিলটা এইখানে যে, তাদের তিন জনের নির্ভরশীলতা তিন রকমের। যথা, স্বরবৃত্তে যেক্ষেত্রে সিলেব্‌ল্‌মাত্রেই অনধিক একটি মাত্রার মূল্য পেয়েই খুশি, মাত্রাবৃত্তে সে-ক্ষেত্রে মুক্ত সিলেব্‌ল এক মাত্রার মূল্য পেলেও রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ মূল্য পায় দু-মাত্রার। আবার অক্ষরবৃত্তেও (ঠিক ওই স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তেরই মতো) প্রতিটি মুক্ত সিলেব্‌ল্‌কে আমরা এক-মাত্রার মূল্য দিই বটে, কিন্তু রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এর ক্ষেত্রে আরও-একটু ব্যতিক্রম ঘটে যায়।

স্বরবৃত্তে কী মুক্ত, কী রুদ্ধ, কোনও সিলেব্‌ল্‌ই এক-মাত্রার বেশি মূল্য দাবি করে না; মাত্রাবৃত্তে সেক্ষেত্রে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌ সর্বত্র দু-মাত্রা দাবি করে; আর অক্ষরবৃত্তে সেক্ষেত্রে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌ কোথাও এক-মাত্রা দাবি করে, কোথাও দু-মাত্রা।

প্রশ্ন : অক্ষরবৃত্তে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌ কোথায় এক-মাত্রা দাবি করে এবং কোথায় তাকে দু-মাত্রার মূল্য দিতে হয়?

উত্তর : রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌ যেক্ষেত্রে শব্দের আদিতে কিংবা মধ্যে যুক্তাক্ষরের আশ্রয় নিয়ে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, সেক্ষেত্রে সে এক-মাত্রার বেশি মূল্য দাবি করে না; কিন্তু যুক্তাক্ষরের আশ্রয় নিয়েও যেক্ষেত্রে সে শব্দের অন্তে অবস্থিত, কিংবা শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত হয়েও যেক্ষেত্রে সে যুক্তাক্ষরের আশ্রিত নয়, সেক্ষেত্রে সে দু-মাত্রার মূল্য চায়।

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'উদ্বন্ধন' শব্দটি তিনটি রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে গড়া। উদ্‌+বন্‌+ধন্‌। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌ (উদ্‌, বন্‌) যেহেতু যুক্তাক্ষরের আশ্রিত, এবং যেহেতু তাদের প্রথম জনের (উদ্‌) অবস্থান শব্দের আদিতে ও দ্বিতীয় জনের (বন্‌) অবস্থান শব্দের মধ্যে, অতএব অক্ষরবৃত্তে তাদের কেউই এক-মাত্রার বেশি মূল্য চায় না। তৃতীয় জন (ধন্‌) সেক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরের আশ্রিত হয়েও শব্দের অন্তে রয়েছে। ফলত অক্ষরবৃত্তে সে দু-মাত্রার মূল্য দাবি করবে। এবং সব মিলিয়ে 'উদ্বন্ধন' শব্দটি অক্ষরবৃত্তে পাবে চার-মাত্রার মূল্য (১+১+২)।

যাই হোক, মাত্রা-বিচারের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে সব ছন্দেই সিলেব্‌ল্‌ নামক ব্যাপারটার ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই বলেই কি দুম করে আমরা বলে বসব যে, সব ছন্দই আসলে সিলেবিক্‌? না, তা নিশ্চয় বলব না। শুধু বলব যে, সিলেবিক্‌ ছন্দে অর্থাৎ স্বরবৃত্তে তো সিলেব্‌ল্‌কে ভুলে থাকবার কথাই ওঠে না, উপরন্তু ছন্দটা যেখানে স্বরবৃত্ত নয়, সেখানেও সিলেব্‌ল্‌কে ভুলে থাকবার উপায় নেই।

পয়ার ও মহাপয়ার

ছন্দ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে লক্ষ করেছি, ‘পয়ার’ শব্দটিকে তাদের কেউ কেউ খুব শিথিলভাবে প্রয়োগ করেন। বস্তুত, তাঁদের কাছে ‘পয়ার’ ও ‘অক্ষরবৃত্ত’ সমার্থক শব্দ; যখন তাঁরা বলেন যে, অমুক কবির হাতে পয়ার খুব ভালো খোলে, তখন আসলে তাঁরা বলতে চান যে, সেই কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে খুব দক্ষ। পয়ার ও অক্ষরবৃত্তে তাঁরা এইভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন কেন, সেটা বোঝা অবশ্য শক্ত নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় ইতিপূর্বে আমি বলেছি, “রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত, এমনকি রবীন্দ্রকাব্যেরও সূচনাপর্বে, বাংলা কবিতা প্রধানত অক্ষরবৃত্তে লেখা হয়েছে।” এখন বলি, অক্ষরবৃত্তে রচিত সেইসব কবিতার একটি মস্ত বড়ো অংশই পয়ারবন্ধে বাঁধা। খুবসম্ভব তারই ফলে অক্ষরবৃত্ত বলতে অনেকে পয়ার বোঝেন, এবং পয়ার বলতে অক্ষরবৃত্ত। কিন্তু পয়ার বলতে সত্যিই কোনও ছন্দ বোঝায় না, পয়ার আসলে একটা বন্ধমাত্র (অর্থাৎ কবিতার পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের বিশেষ একটা পদ্ধতি), এবং সেই বন্ধে যেমন অক্ষরবৃত্ত, তেমনই মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের পঙ্‌ক্তিকে বাঁধা যেতে পারে। অনেকেই বেঁধেছেন।

কী সেই বন্ধের চেহারা? উত্তরটা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন। তিনিও অবশ্য পয়ার বলতে আলাদা একটা ছন্দই বুঝতেন (“পয়ার জান না? তুমি যে ছন্দে লিখেছ একেই বলে পয়ার”—‘ছন্দসরস্বতী’), কিন্তু তা হোক, ওই যে তিনি পয়ারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন “আট-ছয় আট-ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়”, ওইটেই হচ্ছে পয়ার-বন্ধের সঠিক বর্ণনা। আট-ছয় বলতে এখানে আট-ছয় মাত্রার বিন্যাস বুঝতে হবে। অর্থাৎ যে-সব পঙ্‌ক্তি আমাদের পড়বার ঝোঁক অনুযায়ী দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায় (‘অংশ’ না বলে ‘পদ’ বলাই রীতিসম্মত, কিন্তু পড়ুয়াদের বোঝাবার সুবিধার জন্য আপাতত আমি ‘অংশ’ বলাই শ্রেয় মনে করছি, পদ-এর প্রসঙ্গ এর পরের পরিচ্ছেদে আসছে) এবং যার প্রথমাংশে পাওয়া যায় আটটি মাত্রা ও দ্বিতীয়াংশে ছটি, তাদেরই আমরা বলি পয়ার-বন্ধে বাঁধা পঙ্‌ক্তি। এখন এই অংশভাগের কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, পাঠকের দম নেবার সুবিধের জন্যে পঙ্‌ক্তির শেষে একটা ভাঙা-পর্ব

রাখা হয়, এবং সেই ভাঙা-পর্ব অনেকসময়ে দু-মাত্রার হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে আলোচনার সময়ে আমি এ-ও বলেছিলুম যে, কবিতার "লাইনটাকে যখন একসঙ্গে দেখি, তখন গোটা লাইনের বিন্যাসের মধ্যে ওই বাড়তি মাত্রা দুটি এমন চমৎকারভাবে নিজেদের ঢেকে রাখে যে, ওরা যে আলাদা, তা ঠিক ধরাও পড়ে না। বিশেষ করে ছয় কিংবা দশের বৃত্ত ছাড়িয়ে আমরা যখন চোদ্দো মাত্রায় গিয়ে পৌঁছই, অতিরিক্ত ওই দু-মাত্রাকে তখন ছন্দের মূল চালেরই অঙ্গ বলে মনে হয়।" অর্থাৎ চোদ্দ মাত্রার লাইনটা তখন আর ছোটো মাপের বিচার অনুযায়ী ৪+৪+৪+২ থাকে না, বড়ো মাপের চালে সেটা ৮+৬ হয়ে ওঠে। এটা যেমন অক্ষরবৃত্তের পক্ষে সত্য, তেমনিই ৪-মাত্রার মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের পক্ষেও সত্য। যা ছিল ছোটো-ছোটো অংশের সমষ্টি, তা দুটি বড়ো মাপের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এই যে দুই অংশে বিন্যস্ত পঙ্ক্তির আট-ছয় বন্ধ, একেই বলে পয়ার-বন্ধ। এই বন্ধে বাংলায় যেমন সেকালে ও একালে অক্ষরবৃত্তের কবিতা প্রচুর লেখা হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ নিজে ও তাঁর পরবর্তী কবিরা এই বন্ধে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তেও কম কবিতা লেখেননি।

আসুন, আমরা নিজেরাই এবারে এই বন্ধে দু-লাইন লিখে ফেলি :

নিম্নে আদিগন্ত শুধু / সমুদ্র সুনীল
ঊর্ধ্বাকাশে উড়ে যায় / দুটি গাংচিল

এ হল পয়ারে-বাঁধা অক্ষরবৃত্তের নমুনা। তেমনি—

নীচে আদিগন্ত-যে / সিন্ধু সুনীল
ঊর্ধ্বে মেলেছে ডানা / দুটি গাংচিল

এ হল পয়ারে-বাঁধা মাত্রাবৃত্ত। ঠিক তেমনি—

যোজন-যোজন নীলের খেলা / সমুদ্দুরের জলে
ঊর্ধ্বাকাশে শুভ্র দুটি / সারস উড়ে চলে

এ হল পয়ারে-বাঁধা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত। (ছন্দ ঠিক রেখে চটপট ছড়া বানাতে গিয়ে চিলকে সারস করে দিলুম, তার জন্যে চিলের কাছে তো বটেই, পড়ুয়াদের কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা করি।) বলা বাহুল্য, যেহেতু ছন্দটা এখানে স্বরবৃত্ত, তাই সিলেব্‌ল্-এর হিসেবে এখানে মাত্রাসংখ্যা ধরতে হবে।

পয়ার-বন্ধের কথা তো বলা গেল, এবারে খুব সংক্ষেপে মহাপয়ারের কথা বলা যাক। মহাপয়ারের নামেই প্রমাণ, ওটি আর-কিছু নয়, পয়ারেরই একটা বড় সংস্করণ। পয়ার যে-ক্ষেত্রে আট-ছয়ের বন্ধ, মহাপয়ার সে-ক্ষেত্রে আট-দশের। অর্থাৎ মহাপয়ারের বেলায় পঙ্ক্তির প্রথমাংশে — পয়ারের মতোই— আট মাত্রা থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ আরও বড়ো চালে দশ মাত্রায় ছড়িয়ে যায়। দৃষ্টান্ত দিয়ে

বোঝানো যাক। পয়ারের বেলায় যে-দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তারই বক্তব্যকে এখানে মহাপয়ারে বাঁধব।

নিম্নে সারাদিন দেখি / আদিগন্ত সমুদ্র সুনীল
ঊর্ধ্বে শ্বেতবিন্দুসম / উড়ে যায় দুটি গাংচিল

এ হল মহাপয়ারে-বাঁধা অক্ষরবৃত্তের নমুনা। আবার—

নীচে আদিগন্ত-যে / চঞ্চল সিন্ধু সুনীল
ঊর্ধ্বে মেলেছে ডানা / সুন্দর দুটি গাংচিল

এ হল মহাপয়ারে-বাঁধা মাত্রাবৃত্ত। আবার—

যোজন-যোজন দেখছি শুধু / নীলের খেলা সমুদ্দুরের জলে
ঊর্ধ্বাকাশে পাল্লা দিয়ে / শুভ্র দুটি সারস উড়ে চলে

এ হল মহাপয়ারে-বাঁধা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত। (হায় চিল, ছন্দের খাতিরে আবার তোমাকে সারস বানালুম!)

পয়ার-মহাপয়ার প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হল। এর পরে আসছে পদ, যতি ও যতিলোপের কথা।

পদ, যতি ও যতিলোপ

এবারে আমরা পদ-প্রসঙ্গে ঢুকব। পদ কারে কয়? পয়ার নিয়ে আলোচনার সময়ে তার কিছুটা আভাস দিয়েছিলুম। এবারে আর-একটু বিস্তারিতভাবে তার সুলুকসন্ধান নেওয়া দরকার।

সনেট তো চোদ্দো পঙ্‌ক্তির কবিতা। বাংলায় তাকে আমরা চতুর্দশপদী কবিতা বলি। সেই বিচারে 'পদ' কথাটার অর্থ দাঁড়ায় পঙ্‌ক্তি। শব্দকোশেও অন্যান্য অর্থের সঙ্গে, এই অর্থটা দেওয়া আছে বটে। কিন্তু এখানে আমরা 'পদ' বলতে যা বোঝাতে চাইছি, তাতে এই অর্থটা পরিত্যাজ্য। কেন-না, একটু বাদেই আমরা দেখব যে, কবিতার পঙ্‌ক্তিতে অনেকসময়ে একাধিক পদ থাকে। সেক্ষেত্রে, 'পদ' বলতে যদি আমরা 'পঙ্‌ক্তি' বুঝি, তাহলে 'দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি' কথাটার অর্থ দাঁড়াবে 'দ্বি-পঙ্‌ক্তিক পঙ্‌ক্তি', এবং ব্যাপারটা তখন খুবই ধোঁয়াটে হয়ে দাঁড়াবে।

তার চেয়ে বরং 'পদ' বলতে 'পদক্ষেপ' বোঝাই ভালো। বস্তুত, প্রতি পদক্ষেপে যেখানে বিপদের আশঙ্কা কিংবা আনন্দের আশ্বাস রয়েছে, সেখানে তো আমরা 'পদে-পদে বিপদ' কিংবা 'পদে-পদে আনন্দ'-এর কথাই বলে থাকি। (উদাহরণ : "নিবিড় ব্যথার সাথে পদে-পদে পরম সুন্দর"— রবীন্দ্রনাথ।)

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলিকে তো আমরা একটানা পড়ে যাই না, একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব, আমরা যখন কবিতা পড়ি, তখন সেই কবিতার এক-একটি পঙ্‌ক্তি একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এটা হয় ছন্দের চালের জন্য। তা যেমন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, তেমনই পয়ার-বন্ধের আলোচনার সময়ে আমরা দু-রকম চালের কথা জেনেছিলুম। ছোটো-মাপের চাল আর বড়ো-মাপের চাল। চাল না-বলে একে চলন কিংবা পদক্ষেপও বলতে পারি। সত্যি, এ যেন দু-রকমের পদক্ষেপ। ছোটো-মাপের ও বড়ো-মাপের। এই দুই-মাপের পদক্ষেপ, আসলে, কবিতার পঙ্‌ক্তির ভিতরকার দুই-মাপের দুটি অংশকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। আমরা যখন ছোটো পদক্ষেপে চলি, তখন ছোটো-মাপের অংশটাকে ধরতে পারি। আর বড়ো-পদক্ষেপে চললে সন্ধান পাই বড়ো-মাপের অংশের। ছোটো-মাপের অংশকে আমরা বলি 'পর্ব'। বড়ো-মাপের অংশকে বলি 'পদ'।

পদক্ষেপ-এর কথাটা যখন বলেইছি, তখন আর-একটু বিশদ করে বলা যাক।

পদক্ষেপ করতে-করতে এগোনো মানে বারবার পা-ফেলা ও পা-তোলা। এই পা-ফেলা ও পা-তোলার মধ্যে একটু বিরতি ঘটে। এ যেন চলার মধ্যেই একটু থেমে থাকার ব্যাপার। আমরা যখন কবিতা পড়ি, তখন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর, প্রায় আমাদের অগোচরে, এই থেমে-থাকার ব্যাপারটা ঘটতে থাকে। আমরা একটু চলি, একটু থামি, একটু চলি, একটু থামি— এই রকমের ব্যাপার আর কী। কবিতায় এই থেমে-থাকার ব্যাপারটাকেই বলি 'যতি'।

'যতি' আছে তিন রকমের। ছোটো যতি, মাঝারি যতি আর বড়ো যতি। ছান্দসিক এর নাম দিয়েছেন লঘুযতি, অর্ধযতি আর পূর্ণযতি। কবিতার পঙ্ক্তির মধ্যে পর্ব যেহেতু সবচেয়ে ছোটো অংশ, তাই তার পরে আসে লঘুযতি; আর পদের মাপ যেহেতু পর্বের চেয়ে বড়ো, তাই তার পরে আসে অর্ধযতি। পঙ্ক্তির মাপ আরও বড়ো। তাই পূর্ণযতি আসে পঙ্ক্তির শেষে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই।

নতমুখে বলেছিলে, চিত্তে রেখো আশা,
আঁধারেও দীপ্তি যেন পায় ভালোবাসা।

এই যে অক্ষরবৃত্ত-ছন্দে-লেখা দুটি পঙ্ক্তি, ছোটো-পদক্ষেপে চললে— ছন্দের চাল অনুযায়ী— এরা পর্বে-পর্বে এইভাবে ভাগ হয়ে যাবে :

নতমুখে/বলেছিলে/চিত্তে রেখো/আশা,
আঁধারেও/দীপ্তি যেন/পায় ভালো/বাসা।

সেক্ষেত্রে প্রতি পর্বের শেষে আমরা একটুক্ষণের জন্য থেমে দাঁড়াব, এবং এই যে একটুক্ষণের জন্য থেমে দাঁড়ানো, এটাই হচ্ছে লঘুযতি।

বড়ো-পদক্ষেপে চললে কিন্তু পর্বে-পর্বে বিভক্ত না-হয়ে এই পঙ্ক্তি দুটি আর একটু বড়ো-মাপে অর্থাৎ পদে-পদে ভাগ হয়ে যাবে। তখন ভাগটা হবে এইরকম :

নতমুখে বলেছিলে,/চিত্তে রেখো আশা,
আঁধারেও দীপ্তি যেন/পায় ভালোবাসা।

তখন দেখতে পাব যে, দুটি পঙ্ক্তির প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে দুটি করে পদ; অর্থাৎ এই পঙ্ক্তি দুটি হচ্ছে দ্বিপদী পঙ্ক্তি। (প্রথম পদ আট-মাত্রার; দ্বিতীয় পদ ছ-মাত্রার।) সেইসঙ্গে আর-একটা জিনিসও দেখা যাবে। সেটা এই যে, ছোটো-পদক্ষেপে চললে পর্বশেষে আমরা যেটুকু সময়ের জন্যে থেমে দাঁড়াচ্ছিলুম, বড়ো-পদক্ষেপে চলার ফলে পদশেষে তার চাইতে আর-একটু বেশি সময়ের জন্যে আমাদের থামতে হচ্ছে। আর দ্বিতীয় পদের সঙ্গে-সঙ্গে এক্ষেত্রে যেহেতু পঙ্ক্তির সীমানাও শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই সেখানে থামতে হচ্ছে আরও-একটু বেশি সময়ের জন্যে। পদশেষে আর পঙ্ক্তি শেষে এই যে থেমে দাঁড়ানো, যথাক্রমে এরাই হচ্ছে অর্ধযতি আর পূর্ণযতি।

অক্ষরবৃত্তের বদলে এবারে দ্বিপদী এই পঙ্‌ক্তি দুটিকে আমরা মাত্রাবৃত্তে ঢালাই করব। যদি ৬-মাত্রার মাত্রাবৃত্তে ঢালাই করি, তাহলে এদের চেহারা দাঁড়াবে এইরকম :

নতমুখে তুমি বলেছিলে যেন চিত্তে খানিক আশা
জেগে থাকে আর আঁধারেও যেন জ্বলে ওঠে ভালোবাসা।

এ-দুটিও দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি। পদে-পদে ভাগ করলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াবে :

নতমুখে তুমি বলেছিলে যেন / চিত্তে খানিক আশা
জেগে থাকে আর আঁধারেও যেন / জ্বলে ওঠে ভালোবাসা।

পঙ্‌ক্তি দুটিকে আমরা স্বরবৃত্তেও ঢালাই করতে পারি। লিখতে পারি :

শান্ত গলায় বলেছিলে, চিত্তে রাখো আশা,
অন্ধকারের বুকে জ্বালাও গভীর ভালোবাসা।

এ-ও দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি। এর পদবিভক্তি হবে এইরকম :

শান্ত গলায় বলেছিলে / চিত্তে রাখো আশা,
অন্ধকারের বুকে জ্বালাও / গভীর ভালোবাসা।

এবারে ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দিই :

অবশ্যই তার চেয়ে আছে আরও ভাল মেয়ে, কিন্তু হে ঘটক,
আগে তারই কথা কও, অন্যথা বিদায় হও, সম্মুখে ফটক।

এর পদ-বিভাজন হবে এই রকম :

অবশ্যই তার চেয়ে / আছে আরও ভালো মেয়ে,/কিন্তু হে ঘটক,
আগে তারই কথা কও,/অন্যথা বিদায় হও,/ সম্মুখে ফটক।

শব্দগুলিকে, ছন্দের চাল অনুযায়ী, এখানে দুই পঙ্‌ক্তিতে সাজানো হয়েছে। আগেকার দিন হলে অবশ্য অন্য-বিন্যাসে এদের সাজানো হত। বিন্যাসটা হত এই-রকম :

অবশ্যই তার চেয়ে   আছে আরও ভালো মেয়ে
কিন্তু হে ঘটক,
আগে তারই কথা কও,   অন্যথা বিদায় হও,
সম্মুখে ফটক।

বলা বাহুল্য, ঘটক-মহাশয়ের প্রতি নিবেদিত এই শব্দাবলিকে এখানে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, মাত্রাবৃত্ত কিংবা স্বরবৃত্তেও একে বিন্যস্ত করা যেত। কিন্তু আমরা তো এখানে ছন্দের পার্থক্য বুঝতে বসিনি, পদ-পরিচয়টাই শুধু পেতে চাইছি। আশা করি, সেই পরিচয় ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে।

এবারে একটু যতির কথায় ফিরব। যতির পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। কিন্তু

একটা জরুরি কথা তখন জানা হয়নি। সেটা এই যে, লঘুযতি ও অর্ধযতি মাঝে-মাঝে লোপ পেয়ে যায়। অর্থাৎ পর্ব কিংবা পদের শেষে তখন আর থেমে দাঁড়াবার উপায় থাকে না। পুরোনো সেই উদাহরণটির উপরে আর-এক বার চোখ রাখা যাক :

নতমুখে বলেছিলে, চিত্তে রেখো আশা,
আঁধারেও দীপ্তি যেন পায় ভালোবাসা।

পর্বের হিসেব করলে দেখা যাবে যে, অক্ষরবৃত্তে-লেখা এই পঙ্‌ক্তি দুটির প্রতিটিতে আছে তিনটি করে পর্ব ও একটি করে ভাঙা-পর্ব। আবার, পদের হিসেব নিলে দেখতে পাব যে, এই পঙ্‌ক্তি দুটির প্রতিটিতে আছে দুটি করে পদ। এখন কথা হচ্ছে, পর্ব ও পদের সীমানা এখানে এতই স্পষ্ট যে, পর্বশেষের লঘুযতি ও পদশেষের অর্ধযতির ব্যাপারটাকে বুঝে নিতে এক্ষেত্রে আমাদের কিচ্ছু অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আমরা যখন কবিতা লিখি, তখন পর্ব ও পদের সীমানা কি সর্বত্র এমন স্পষ্টভাবে টেনে দেওয়া যায়? যায় না। (পর্বের সীমানা তো মাঝে-মাঝেই অস্পষ্ট থেকে যায়।) কেন? কারণটা আর-কিছুই নয়, পর্ব অথবা পদের সঙ্গে শব্দের বিরোধ। পর্ব অথবা পদের সীমানা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যখন শব্দের সীমানা শেষ হয় না, তখন অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, (শব্দটাকে না ভেঙে) গোটা শব্দটাকে একসঙ্গে উচ্চারণ করবার প্রয়োজনে আমরা পর্ব অথবা পদের শেষে থেমে দাঁড়াতে পারছি না। আর তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, লঘুযতি ও অর্ধযতি এক্ষেত্রে লোপ পেয়ে গেল।

আগের উদাহরণের সামান্য-কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে এবারে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া যাক। লেখা যাক :

অস্ফুট বলেছ, যেন চিত্তে থাকে আশা,
আঁধারে অম্লান যেন জ্বলে ভালোবাসা।

বলা বাহুল্য, এইভাবে লিখলেও পঙ্‌ক্তি দুটির ছন্দ একই থাকবে, কিন্তু দুটি পঙ্‌ক্তির কোনওটিরই প্রথম পর্বের সীমানাকে এক্ষেত্রে আর স্পষ্ট করে দেখানো যাবে না। ফলে প্রথম পর্বের শেষে আর আমরা থেমে দাঁড়াতেও পারব না। পঙ্‌ক্তি দুটির পর্ব বিভাজন এক্ষেত্রে এইরকম হবে :

অস্ফুট ব : লেছ, যেন / চিত্তে থাকে / আশা,
আঁধারে অ : ম্লান যেন / জ্বলে ভালো / বাসা।

পর্বশেষের লঘুযতি কীভাবে লোপ পায় আমরা তা দেখলুম। এতে ছন্দের কোনও হানি হয় না, বরং তার বিন্যাসে বেশ-একটা বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগে।

পর্বান্তিক লঘুযতির মতো পদান্তিক অর্ধযতিও অনেকক্ষেত্রে লোপ পায়। কীভাবে পায়, আগের ওই উদারণটিকেই আরও-একটু ঘুরিয়ে সাজালে সেটা বোঝা যাবে। যেমন, ধরা যাক, আমরা যদি লিখি :

নতমুখে বলেছ, হৃদয়ে রাখো আশা,
অন্ধকারে অম্লান জ্বলুক ভালোবাসা।

তাহলে এই পঙ্‌ক্তি দুটির প্রথম পদ ও দ্বিতীয় পদের মধ্যবর্তী সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটবে কি? ফুটবে না। পদ-বিভাজন সে-ক্ষেত্রে এই রকম হবে :

নতমুখে বলেছ, হৃ : দয়ে রাখো আশা,
অন্ধকারে অম্লান জ্ব : লুক ভালবাসা।

অর্থাৎ প্রথম পঙ্‌ক্তির 'হৃদয়ে' ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'জ্বলুক' শব্দকে না ভেঙে আমরা একটানা উচ্চারণ করতে চাইব (কেন-না, সেটাই স্বাভাবিক উচ্চারণ), এবং তারই ফলে, প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম পদের শেষে আমরা থেমে দাঁড়াতে পারব না। তখন আমরা বুঝে নেব যে পদান্তিক অর্ধযতি এক্ষেত্রে লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু লঘুযতির বিলোপ যদিও পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের কোনও ক্ষতি করে না, অর্ধযতির বিলোপ তাকে বেশ-খানিকটা ধাক্কা দেয়। কবিতার বিন্যাসে যাঁরা আদ্যন্ত মসৃণতার পক্ষপাতী, তাঁদের পক্ষে তাই অর্ধযতিকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করাই ভালো।

প্রসঙ্গত, একটা কথা বলি। লঘুযতি ও অর্ধযতি কীভাবে লোপ পায়, সেটা বোঝাবার জন্য আমরা এখানে যেসব উদাহরণের সাহায্য নিয়েছি, সেগুলি অক্ষরবৃত্তে লেখা। সেক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তে লেখা পঙ্‌ক্তির সাহায্যেও যতিলোপের ব্যাপারটা অবশ্যই বুঝিয়ে বলা যেত। কিন্তু তার আর কোনও দরকার আছে কি? নেই নিশ্চয়?

কবিতার ক্লাসে তাহলে এখানেই আমি ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলুম। এবারে পড়ুয়াদের মধ্যে উপাধিপত্র বিতরণের পালা। এই উপলক্ষে আমি পদ্যে একটি ভাষণ দিতে চাই।

উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে কবিকঙ্কণের ভাষণ

কবিতার ক্লাস অদ্য হৈল সমাপন,
কিছু উপদেশ দিব, শুন ছাত্রগণ।
বহুবিধ কর্ম আছে জগৎসংসারে,
তেমতি কর্মীও আছে হাজারে-হাজারে।
কেহ তেজারতি করে, কেহ-বা মোক্তারি,
কেহ-বা দালালি করে, কেহ ঠিকাদারি।
কেহ-বা সাজায় যত্নে ইষ্টকের পাঁজা,
কেহ-বা পিষ্টক গড়ে, কেহ তেলেভাজা।
কেহ-বা পড়ায় ছাত্র, বিদ্যালয়ে যায়,
রাস্তার উপরে কেহ বান্দর নাচায়।
কেহ কৃষিকর্ম করে, কেহ ধান ভানে,
কেহ-বা চালায় টেম্পো, কেহ রিকশা টানে।
পানের বোঁটাটি হস্তে, নাহি-ক সময়,
চলেছে দপ্তরে কেহ, ব্যস্ত অতিশয়।
কেহ-বা ডাক্তারি করে, বত্রিশ টাকার
ভিজিটে ছত্রিশ-তলা বাড়ি ওঠে তার।
কেহ করে রাজনীতি, অন্যের মাথায়
কৌশলে কাঁঠাল ভেঙে মহানন্দে খায়।
কেহ তৈল বেচে, কেহ তেলা মস্তকের
উপরেই তৈল ঢেলে গুছায় আখের।
কেহ করে জনসেবা, ধন্য হয় দেশ;
কেহ-বা কাজের মধ্যে উলটায় গণেশ।
এইমতো নানা লোকে নানা কর্ম করে,
কর্মী নামে খ্যাত হয় বিশ্ব-চরাচরে।

কর্মযোগী কর্মবীর নানা আখ্যা পায়,
কর্মের জাঁতাটি তারা অক্লেশে ঘুরায়।
তেমতি কবিতা লেখা কর্ম যদি হয়,
কবিকেও লোকে কর্মী বলিত নিশ্চয়।
কিন্তু যে কবিতা লেখে,— শিশু বৃদ্ধ নারী
সকলেই বলে তাকে 'অকর্মার ধাড়ি'।
অশান্তিতে জ্বলে সদা কবির সংসার,
ভাই বন্ধু সকলেই নিন্দা করে তার।
মাতৃদেবী কান্দে তার, পিতৃদেব হাঁকে:
"এইবারে ত্যাজ্যপুত্র করিব ব্যাটাকে।"
জায়াও সর্বদা কয় মুখ করি কালো,
"ইহাপেক্ষা ডাকাতের হাতে পড়া ভালো।"
বাড়িওলা শোনে যদি, নূতন ভাড়াটে
পদ্য লেখে, তবে তার ভয়ে দিন কাটে।
ইদানীং মুদিরাও হয়েছে সেয়ানা,
কবিকে বাকিতে তারা কিচ্ছুই দেয় না।
অধিক কব কী, কোনো কাবুলিওলাও
কবিকে দেয় না কর্জ; বলে, "ভাগ্ যাও।"
এইসব ভেবেচিন্তে ছাত্রগণ সবে
ঠিক করো, কবি কিংবা কর্মবীর হবে।
পিতার ধমক, মুদি যাদবের তাড়া,
বন্ধুদের ব্যঙ্গ, গৃহিণীর মুখনাড়া,
কোনোদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাহি হেনে,
সবকিছু 'ললাটস্য লিখনং' জেনে
তবু পদ্য লিখিবার ইচ্ছা যদি হয়,
মাঝে-মাঝে দুই ছত্র লিখিবা নিশ্চয়।
নিত্যও লিখিতে পারো, তবে কথা এই,
যত কবি বঙ্গে, তত পাঠক তো নেই।
আর যদি পাঠকের না করো পরোয়া,
তাহলে উত্তম কথা, সে তো বারো পোয়া।
সকালে লিখিয়ো তবে, দুপুরে লিখিয়ো,
বিকালে লিখিয়ো, শুধু রাত্রে ঘুম দিয়ো।

লিখিবার অন্ধিসন্ধি জেনেছ সবাই,
কবিতার ক্লাসে, তাই চিন্তা আর নাই।
শিখেছ ছন্দের রীতি, বাক্যের কায়দা,
এইবারে তাহাতেই উঠিবে ফায়দা।
স্নাতক-উপাধি আমি দিলাম সকলে।
(জানি না কী ধুন্ধুমার হবে তার ফলে।)
কবিকঙ্কণের কথা শেষ হৈল, আর
কথা নাই কিছু, যাও, সকলে এবার
তত পদ্য লেখো বাছা, যত ইচ্ছা হয়,
শুধু এক অনুরোধ, রাখিবা নিশ্চয়।
দৈনিক কাগজে পদ্য নাহি যায় ছাপা—
নিতান্ত সহজ কথা, মনে রেখো বাপা।
সুতরাং লেখো পদ্য হাজারে হাজারে,
কিন্তু তাহা পাঠিয়ো না 'আনন্দবাজারে'।

সংযোজন ১ : গৈরিশ ছন্দ

গিরিশচন্দ্র যেসব নাটক লিখেছিলেন, তার সবই যে ছান্দোবন্ধ, তা নয়। যেসমস্ত নাটক পৌরাণিক আখ্যানের ভিত্তিতে লেখা, কিংবা গোত্রবিচারে যা রোমান্টিক, শুধু তারই সংলাপকে তিনি ছন্দে বেঁধেছিলেন। আবার সেখানেও যে তাঁর সমস্ত চরিত্রের সংলাপ একই ছন্দে বাঁধা, তা-ও নয়। একাধিক রকমের ছন্দের দোলা সেখানে আমরা দেখতে পাই। তার মধ্যে যেটা প্রধান ছন্দ, তাকেই আমরা 'গৈরিশ ছন্দ' বলে থাকি। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

"অভেদ কোরো না ভেদ, সতি!
জেনো মাতা,
ভাগীরথী পার্বতী, অভেদ।
বামদেব বাম
ভাবিলে, মা, অন্তর শিহরে!
কুমার আবদ্ধ বুঝি ভৈরবী মায়ায়!
বাক্য ধরো, অনুরোধ রক্ষা করো, মাতা।
শিবরানি সদয়া না-হলে
রুষ্ট শিব তুষ্ট নাহি হবে....।"

গিরিশচন্দ্রের *জনা* নাটক থেকে অগ্নির সংলাপের একটা অংশ এখানে তুলে দিলুম। যে-ছন্দে এই সংলাপ বাঁধা, তাকে একটা আলাদা রকমের ছন্দ বলে ভাবতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। কী ছন্দ? না, গৈরিশ ছন্দ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গৈরিশ ছন্দ কি সত্যিই একটা আলাদা রকমের ছন্দ? তা কিন্তু নয়। পয়ার যেমন আলাদা কোনও ছন্দ নয়, ত্রিবিধ ছন্দের একটা বিশেষ রকমের বাঁধনমাত্র, গৈরিশ ছন্দও আসলে তা-ই। মূল ছন্দ এখানে অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত। গিরিশচন্দ্র সেই মূল ছন্দকে একটা বিশেষ বাঁধনে বেঁধেছিলেন, এবং সেই বাঁধন বা বিন্যাসটাই গৈরিশ ছন্দ বলে প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

লক্ষণীয় যে, অক্ষরবৃত্ত এখানে অমিল বা অমিত্রাক্ষর। পঙ্‌ক্তিশেষে মিল রাখবার ব্যবস্থা এখানে নেই। কিন্তু সেটাও কোনও নতুন ব্যাপার নয়। এমনকি, নাটক-রচনার ক্ষেত্রেও নয়। একথা এইজন্যে বলছি যে, মাইকেল মধুসূদনের *পদ্মাবতী* নাটকের বেশ-কিছু সংলাপ ইতিপূর্বে এই অমিল অক্ষরবৃত্তেই রচিত হয়েছিল।

নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত ছন্দের ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রকে, অন্তত সেই বিচারে, কোনও নতুন পথের স্রষ্টা আমরা বলতে পারি না। পথিকৃৎ এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র নন, মাইকেল।

তবে কি গিরিশচন্দ্র এক্ষেত্রে মাইকেলের অনুসারীমাত্র? না, তা নয়। মাইকেলের হাতে যার প্রবর্তনা, সেই অমিল অক্ষরবৃত্তের বিন্যাসে একটা মস্ত পরিবর্তন তিনি ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। মাইকেলের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁর পার্থক্যটা এইখানে যে, গিরিশচন্দ্র তাঁর অক্ষরবৃত্তে-রচিত সংলাপের পঙ্‌ক্তিগুলিকে একই মাপের রাখেননি; পঙ্‌ক্তি থেকে ভাঙা পর্বকে ইচ্ছেমতো বাদ দিয়েছেন; তা ছাড়া, যত্রতত্র যতির ব্যবস্থা না-করে এমনভাবে তাঁর যতিগুলিকে তিনি বিন্যস্ত করেছেন, যাতে সংলাপটাকে ঠিকমতো বলে যাবার ব্যাপারে কারও কোনও অসুবিধে না হয়। যতির এই স্বাভাবিক বিন্যাসের ফলে গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপে যে একটা অবাধ গতির সঞ্চার হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

যা-ই হোক, আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, আমরা যাকে গৈরিশ ছন্দ বলি, বস্তুত তাকে অমিল অক্ষরবৃত্তের গৈরিশ বিন্যাস বললেই ঠিক হয়। এই বিন্যাসই জানিয়ে দেয় যে,অক্ষরবৃত্তের ব্যবহারে গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা ছিল উল্লেখযোগ্য। আবার, ওই *জনা* নাটকেই বসন্তকে যখন আমরা বলতে শুনি :

> "ওলো তোর নিত্যি নূতন ঢং,
> বালাই বালাই, ছাই মুখে তোর, এ কী আবার রং!
> এমন কথা বলবি যদি আর,
> চলে যাব তোর সোহাগের মুখে দিয়ে ক্ষার...।"

তখন আমরা বুঝতে পারি যে, স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্তের ব্যবহারেও তাঁর দক্ষতা কিছু কম ছিল না।

অবশ্য আমরা সবচেয়ে বিস্মিত হই তখন, যখন দেখি যে, কোনও রকমের কাব্যছন্দের দোলাই যার মধ্যে নেই, সাদামাঠা গদ্যে রচিত সেই সংলাপের মধ্যেও অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে কিছু মিল তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ওই *জনা* নাটকের বিদূষক যখন বলে, "হরি হে, তোমার দোহাই— শীঘ্র না চরণ পাই। দুটো মোণ্ডা খেতে এসেছি দু-দিন, খেয়ে যাই," তখন গোপন সেই মিলগুলি যে গদ্যের মধ্যেও খানিকটা দোলা লাগায়, এবং তাকে— অন্তত খানিকটা পরিমাণে— পদ্যের দিকে এগিয়ে দেয়, তা-ও স্বীকার্য। সত্যি বলতে কী, গদ্যে-পদ্যে এই যে মেলবন্ধন তিনি ঘটিয়েছিলেন, যার ছায়া অত্যন্ত আধুনিক কালের কবিতার শরীরেও আমরা দেখতে পাই, এরই তাৎপর্য হয়তো সবচেয়ে বেশি।

সংযোজন ২ : ছন্দের 'সহজপাঠ'

মজাটা নেহাত মন্দ নয়। কবিতা কেমন লেখা হচ্ছে, তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠছে না, তার বদলে প্রশ্ন উঠছে কবিরা ছন্দ জানেন কি জানেন না, তাই নিয়ে। অর্থাৎ একেবারে শিকড় ধরে টান মারা হচ্ছে। কেউ-কেউ তো দেখছি প্রশ্ন তোলারও ধার ধারছেন না, অম্লানবদনে বলে দিচ্ছেন যে, একালে যাঁরা কবিতা লিখছেন, ছন্দের একেবারে প্রাথমিক পাঠও তাঁরা নেননি। সাদাবাংলায়, ছন্দ নামক ব্যাপারটার 'হ-ক্ষ' তো দূরের কথা, 'অ-আ-ক-খ'ও তাঁদের জানা নেই। তবু যদি তাঁরা ওইসব ছাইপাঁশ লিখতে চান তো লিখুন, কিন্তু সম্পাদকমশাইরা সাবধান, 'কবিতা' নাম দিয়ে ওই ব্যভিচারগুলিকে আর ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবেন না।

শুনে কার কী মনে হয় জানি না, এই লেখকের কিন্তু পাগলা মেহের আলির কথাটাই বারবার মনে পড়ে যায়। "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়।"

তবে কিনা বাংলা কবিতা সম্পর্কে (এবং, বলা বাহুল্য, কবিদের সম্পর্কেও) এমন মন্তব্য যে এই প্রথম শোনা গেল, তা-ও নয়। মোটামুটি এই একই ধরনের কথা শুনছি অনেক বছর ধরেই। অনেক বছর মানে কত বছর? তা পঞ্চাশ বছর তো হবেই, কিছু বেশিও হতে পারে। কাদের সম্পর্কে এবং কোন্ কবিতা সম্পর্কে এমন মন্তব্য? দয়া করে তাহলে শুনুন।

যখন ইস্কুলে পড়ি, তখন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা— যাতে অন্ত্যমিল ছিল না বটে, কিন্তু মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের বাঁধুনি ছিল একেবারে টানটান, উপরন্তু আঠারো-মাত্রার পঙ্‌ক্তিগুলি ছিল একেবারে সমান মাপে টানা— সম্পর্কে এক প্রবীণ পাঠককে বলতে শুনেছিলুম, "দূর দূর, এ আবার কী কবিতা! ছন্দ নেই!" এবারে বলি, *প্রান্তিক*-এর এটি প্রথম কবিতা, সেই যার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হল : "বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল..."। বলা বাহুল্য, প্রথম কবিতার পরে আর সেই পাঠক এক পা-ও এগোননি। ভালোই করেছিলেন। কেন-না, নিজেরই অর্ধশিক্ষার (যা কিনা অশিক্ষার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার) কারণে তিনি যাকে ছন্দ বলে চিনেছিলেন, ও-বইয়ের বেশির ভাগ কবিতাতেই তার কোনও সন্ধান তিনি পেতেন না।

যখন কলেজে পড়ি, তখন আবার এই একই অভিযোগ শোনা গেল জীবনানন্দের বিরুদ্ধে। কি না তাঁর ছন্দজ্ঞান বড়ো কম! অভিযোগের সমর্থনে তাঁর যে কবিতাটির সেদিন উল্লেখ করা হয়েছিল, সেটিতেও ছিল না পৌনঃপুনিক অন্ত্যমিলের আয়োজন; তবে প্রতিটি পঙ্‌ক্তি সমান দৈর্ঘ্যের না হলেও এবং পঙ্‌ক্তিশেষের ভাঙা-পর্বটি মাঝে-মাঝে বর্জিত হলেও (যা কিনা রবীন্দ্রনাথও মাঝে-মাঝে অনাবশ্যক বিবেচনায় বর্জন করতেন) ছন্দ ছিল অবশ্যই। সে-ও পরিপাটি মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ, বিষণ্নতা আর দীর্ঘনিশ্বাস-বিজড়িত বেদনার ভার যা বড়ো সহজে বহন করে। এবারে তবে কবিতাটির নাম বলা যাক। বিখ্যাত কবিতা। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র 'ক্যাম্পে'।

অভিযোগ কি বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধেই উঠত না? তা-ও উঠত বইকি। শুধুই যে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণিত হত কিছু শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষের আপত্তির কোলাহল, তা নয়, বিস্তর পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মুখে তখন নিন্দামন্দ শোনা যেত তাঁর 'ছন্দোজ্ঞানহীনতা' সম্পর্কেও। এবং নিন্দামন্দ যে অকারণ নয়, তাঁর প্রমাণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করতেন *বন্দীর বন্দনা*-র অন্তর্ভূত এমন-সব কবিতার, যাতে ছন্দ ছিল আদ্যন্ত অতি পরিপাটি ও সুশৃঙ্খল; না থাকবার মধ্যে শুধ ওই অন্ত্যমিলটাই ছিল না।

চল্লিশের দশকে যাঁরা হরেক পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন, এক-আধ জনের কথা বাদ দিলে দেখা যাবে যে, আক্রমণের লক্ষ্য এক-কালে তাঁরাও কিছু কম হননি। পরে গালাগাল খেয়েছেন তাঁরাও, যাঁরা কিনা 'পঞ্চাশের কবি' হিসেবে আখ্যাত। এখন আবার গালমন্দ শুনতে হচ্ছে তাঁদের পরবর্তী কালের কবিদেরও। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই একই একঘেয়ে অভিযোগ : ছন্দের ছ'ও এরা জানে না। সুতরাং কবিতা লেখার চেষ্টায় ক্ষান্তি দিয়ে এবারে "তফাত যাও...তফাত যাও"!

এই যে অভিযোগ, এর উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো হাস্যকর ব্যাপার আর কিছুই হয় না। চল্লিশের সমর্থনে তাই অন্তত এই লেখকের পক্ষে একেবারে নীরব থাকাই ভালো। তবে পঞ্চাশের কবিরা যে ছন্দ-টন্দের ব্যাপারে একেবারে আকাট রকমের অজ্ঞ ছিলেন, এবং— সেই অজ্ঞতাকে কথার কম্বলে ঢেকেঢুকে রেখে— স্রেফ নতুন রকমের উচ্চারণের জোরেই আবার মোড় ঘুরিয়েছিলেন বাংলা কবিতার, এইটে মেনে নেওয়া ভারী শক্ত। যদি বলি যে, তাঁদের পরে যাঁরা কবিতা লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন, ছন্দজ্ঞান তাঁদেরও মোটামুটি টনটনে, তো মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না।

এঁরা ছন্দ জানেন না, এমন অভিযোগ তাহলে উঠছে কেন? উঠছে— যদ্দুর বুঝতে পারি— এই জন্য যে, অভিযোক্তাদের নিজেদেরই নেই ছন্দ বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা। ছন্দ বলতে যে ঠিক কী বোঝায়, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না,

যদিও তার জন্যে যে সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে তাঁদের কিছু আটকেছে, তা নয়। আটকায়নি আসলে কোনও কালেই।

বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে আর-একটু খুলে বলি।

প্রান্তিক-এর প্রথম কবিতা পড়ে যিনি বলেছিলেন যে, ওতে 'ছন্দই নেই', অনেক বছর পরে তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করি যে, ছন্দ তো ছিল, তাহলে কেন অমন কথা মনে হল তাঁর। উত্তরে তিনি যে-যুক্তি দিলেন, তাতে তো আমি হতবাক। *বন্দীর বন্দনা*-র একাধিক কবিতার সূত্রে যাঁরা বলতেন যে, লেখকের ছন্দ-জ্ঞান বড়োই অল্প, তা একরকম 'নেই বললেই চলে', একদা হতবাক হয়েছি তাঁদের কথা শুনেও। মনে-মনে ভেবেছি, 'ও হরি, এই তাহলে ব্যাপার!'

এখন বিস্ময়বোধ অনেক কমে গিয়েছে। উদ্ভটসাগরদেরই তো এখন আধিপত্য, তাই এসব ব্যাপারে যিনি যতই উদ্ভট কথা বলুন, তাতে আর বিশেষ অবাক হই না। আর তা ছাড়া এই সহজ সত্যটা তো তখনই আমি জেনে গিয়েছি যে, অন্ত্যমিলকেই অনেকে ছন্দ বলে মনে করেন। হালে আবার জানা গেল যে, তাঁদের সংখ্যাই দিনে দিনে বাড়ছে। পঙ্‌ক্তি-শেষে চালাক-চালাক মিল থাকলে তবেই সেটা ছন্দ, নইলে নয়। ফলে, যে-কবিতায় অন্ত্যমিলের সাড়ম্বর আয়োজন নেই, তাতেও যে ছন্দ থাকতে পারে, থাকে, এই কথাটা তাঁদের কিছুতেই বোঝানো যাবে না।

তা-ও হয়তো যেত, যদি তাঁরা ছন্দের ব্যাপারে একেবারে কিছুই না জানতেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা যে আর-একরকম জেনে বসে আছেন, এবং তারই জোরে জারি করছেন হরেকরকম ফতোয়া, সে-ই হয়েছে মস্ত বিপদ। এখন এই 'উলটো অ-আ-ক-খ' তাঁদের কে ভোলাবে?

ভোলাবার দরকারটাই-বা কী। কিছু না-বুঝে কিংবা বেবাক ভুল বুঝে ছন্দ নিয়ে যাঁর যা খুশি বলুন না, তাতে কান না-দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

এই পর্যন্ত পড়বার পরে অনেকের সন্দেহ হতে পারে যে, এই নিবন্ধের লেখক বোধ হয় অন্ত্যমিল নামক ব্যাপারটারই ঘোর বিরোধী। তা কিন্তু নয়। আসলে, রাইম বা অন্ত্যমিল যে রিদ্‌ম বা ছন্দের একটা জরুরি শর্ত, এই হাস্যকর কথাটাই সে বিশ্বাস করে না। কেন-না, তা যদি সে বিশ্বাস করত, তাহলে একইসঙ্গে তাকে এটাও বিশ্বাস করতে হত যে, গোটা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের কোথাও কোনও ছন্দ নেই।

না, ছন্দ আর মিল একেবারেই আলাদা দুটো ব্যাপার, পরস্পরের সঙ্গে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে তারা আবদ্ধ নয়। যা ছন্দোবদ্ধ, তাতে অন্ত্যমিলের ব্যবস্থা অবশ্য থাকতেই পারে, কিন্তু সেটা যে থাকতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। ছন্দ আসলে অনেক বড়ো মাপের ব্যাপার। এতই বড়ো যে, দলবৃত্ত কলাবৃত্ত আর মিশ্রকলাবৃত্ত নামে যে-তিনটি বাংলা ছন্দের পরিচয় আমরা সকলেই রাখি, এবং মোটামুটি যার মধ্যেই দীর্ঘকাল যাবৎ আটকে ছিল বাংলা কবিতা, তার বলয়েও ছন্দ

নামক ব্যাপারটাকে সর্বাংশে আঁটানো যাচ্ছে না। তার শরীরের অনেকটাই থেকে যাচ্ছে সেই বলয়ের বাইরে। ফলে, দলবৃত্ত কলাবৃত্ত আর মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের (এবং তাদের ত্রিবিধ নিয়মেরই অন্তর্গত অসংখ্যরকম প্যাটার্ন বা বন্ধের) ধারও ধারছেন না যেসব কবি, এবং সেটা ধারবেন না বলেই এই তিন ছন্দের বলয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে লিখছেন তাঁদের কবিতা (যেমন ধরা যাক, সমর সেন তাঁর সংক্ষিপ্ত কবি-জীবনের আদ্যন্ত লিখেছেন বা অরুণ মিত্র আজও লিখে যাচ্ছেন), তাঁদেরই বা আমরা কোন্ কানুনে ছন্দোজ্ঞানহীন বলব? কিংবা তাঁদের রচনাকে বলব ছন্দছুট?

যে-কানুনেই বলি না কেন, সেই একই কানুনে তবে তো (শুধু 'আফ্রিকা' কি 'পৃথিবী' বলে কথা নেই) রবীন্দ্রনাথের তাবৎ গদ্যকবিতাকেই ছন্দছুট বলতে হয়। রক্ষা এই যে, 'ছন্দ-টন্দ বোঝে না' বলে নবীন কবিদের উপরে যাঁরা এখন ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, অতটা সাহস তাঁদের হবে না।

গদ্যকবিতার কথা যখন উঠলই, তখন এই নিয়ে যে-রসের কথাটা এককালে খুব শোনা যেত, সেটাও বলি। অনেককেই তখন বলতে শুনেছি যে, টানা এক পাতা গদ্য লিখে তারপর ইরেজার দিয়ে তার দু-পাশটা একটু এলোমেলোভাবে মুছে দিলেই সেটা অমনি গদ্যকবিতা হয়ে যায়। খুবই যে মোটাদাগের রসিকতা, তাতে সন্দেহ নেই। যাঁরা বলতেন, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করতেও রুচিতে বাধত বলেই আমার এক বন্ধু এই মন্তব্য শুনে একটুও না হেসে খুব অবাক হবার ভান করে বলতেন, "মুছতে যে হবেই, এমন কথা কে বলল। আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। না-মুছলেও কবিতা হয়।" বাজে রসিকতার এটাই ছিল মোক্ষম জবাব।

তখন অন্তত তা-ই ভাবতুম। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখছি, গদ্যের দু-পাশ না-মুছলেও যে কবিতা হয়, এর চেয়ে সত্য উক্তি আর কিছুই হতে পারে না। কথাটা হয়তো আগেও কখনও বলেছি, তবু আবার বললেও ক্ষতি নেই যে, কবিতা তো আর-কিছুই নয়, শব্দকে ব্যবহার করবার এক রকমের গুণপনা, ভাষার মধ্যে যা কিনা অন্যবিধ একটি দ্যোতনা এনে দেয়। সেই দ্যোতনা কি নেহাতই চলতি-অর্থে-ছন্দোবদ্ধ রচনার মধ্যে লভ্য? তা ছাড়া, কি তার বাইরে, কোথাও নয়?

এই যে প্রশ্ন, এর কোনও উত্তর আমরা দেব না। শুধু নীচের কয়েকটি লাইন, যা নিশ্চয় সকলেই একাধিকবার পড়েছেন, আরও একবার পড়তে বলব।

> "তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে— তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না— কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।

> "কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ়কৃষ্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিতে লাগিল।"

এবং আরও কয়েকটি লাইন :

> "কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচুগাছটি কালো চিত্রপটের উপরে গাঢ়তর কালির প্রলেপের মতো লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, প্রচলিত অর্থে ছন্দোবন্ধ (উপরন্তু সমিল) যে-রচনারীতিকে দীর্ঘদিনের সংস্কারের কারণে অনেকেই একেবারে একমেবাদ্বিতীয়ম্ কাব্যরীতি বলে ভাবতে অভ্যস্ত, উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিকে সেই রীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্কসূত্রে গাঁথা যাবে না। এমনকি কোনও গদ্যকবিতা থেকেও তুলে আনা হয়নি এই পঙ্‌ক্তিগুলিকে! তোলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্প থেকে, যার একটির নাম 'একরাত্রি', অন্যটির নাম 'ত্যাগ'।

অথচ ওই যে দ্যোতনার কথা বলেছি আমরা, ভাষার মধ্যে একমাত্র কবিতাই যার উন্মেষ ঘটায়, এই গদ্যরচনার মধ্যেও তা দেখছি অলভ্য নয়। আর ছন্দ? প্রচলিত তিন বাংলা ছন্দের কথা তাহলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে হবে আমাদের, সরিয়ে রাখতে হবে ছন্দের ব্যাকরণ থেকে লব্ধ নানা শুকনো সংস্কার, এবং একেবারে গোড়ায় গিয়ে ভাবতে হবে যে, শব্দাবলির যে-পারস্পরিক সংগতি আর সর্বাঙ্গীণ ভারসাম্যের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের ছন্দ-বিষয়ক ধারণা, তারই কি কোনও অনটন এখানে আমাদের চোখে পড়ছে? কই, তা-ও তো পড়ছে না।

সঞ্চয়িতা থেকে *গল্পগুচ্ছ*-এ সরে এসেছি। এবারে তবে আরও অনেকটা সরে আসা যাক। ঢুকে পড়া যাক *সহজপাঠ* প্রথম ভাগের মধ্যে।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে শিশুদের প্রথম পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার ঠিক পরে-পরেই তাদের জন্য ছ-টি বাক্য সেখানে রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাক্যগুলি এখানে তুলে দিচ্ছি :

বনে থাকে বাঘ।
গাছে থাকে পাখি।
জলে থাকে মাছ।
ডালে আছে ফল।
পাখি ফল খায়।
পাখা মেলে ওড়ে।

কল্পনাপ্রবণ যে-কোনও শিশুর আগ্রহকে তার ঘরের কোণ থেকে বাইরের পৃথিবীর দিকে— অরণ্য জলাশয় আর আকাশের দিকে— ঘুরিয়ে দিচ্ছে এই ছোটো-ছোটো কয়েকটি বাক্য, যার অনুরণন আমাদের মতো বয়স্ক পাঠকের চিত্তেও চট করে ফুরিয়ে যায় না। একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারব যে, বক্তব্যের ধারাবাহিক শৃঙ্খলা, শব্দগত সংগতি আর সর্বাঙ্গীণ ভারসাম্য এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রে এই বাক্য-কটিকে বেঁধে রেখেছে, আর একই সঙ্গে জাগিয়ে তুলছে সেই আভ্যন্তর আন্দোলন, যাকে খুব সহজেই আমরা ছন্দ বলে শনাক্ত করতে পারি। ধীরে-ধীরে যখন পড়ি, তখন হয়তো সেই ছন্দ ততটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে না। কিন্তু তা না-ই পড়ুক, এবং কবিতা হিসাবে না-ই উপস্থাপিত হয়ে থাকুক এই বাক্যসমষ্টি, মাত্রই আঠারোটি শব্দের— এবং খুবই সহজ সরল শব্দের— এই সমাহারও যে বস্তুত কবিতা-ই, তা-ও তো কারও না বুঝবার কথা নয়।

অনেকই অবশ্য বোঝে না! জানে না যে, গদ্যভাষার মধ্যেও অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন থাকে ছন্দ, যা সেই ভাষার মধ্যে এনে দেয় এক অন্যতর অর্থের দ্যোতনা, এবং সেই দ্যোতনাই তখন গদ্যকে তুলে আনে কবিতার পর্যায়ে।

এখন যাঁরা কবিতা লিখছেন, তাঁদের অনেকেই মনে হয় প্রচলিত তিন ছন্দের কাঠামোর মধ্যে আর আটকে রাখতে চাইছেন না নিজেদের, কবিতার মুক্তি চাইছেন তার বলয়ের বাইরে, সেখানে খুঁজে নিতে চাইছেন অন্যতর ছন্দ। এই যে অন্বেষণ, এর কি কোনও তাৎপর্য নেই? আছে নিশ্চয়। চলতি ছন্দেই যদি সমস্ত কাজ চলত, তবে তো আর কথাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে তবে আর অত কষ্ট করে মেলে ধরতে হত না কলাবৃত্তের তাবৎ সম্ভাবনার পাপড়িগুলিকে, এবং তারও পরে গিয়ে ঘা দিতে হত না গদ্যকবিতার দরজায়।

অন্বেষণের দরকার অতএব আছেই। কিন্তু কেউ-কেউ সেটা স্বীকার করতে চাইছেন না। এই বলে চেঁচিয়ে মরছেন যে, ছন্দের একেবারে প্রাথমিক শিক্ষাই এঁদের হয়নি।

কিছুদিন আগে প্রশ্ন উঠেছিল : এত কবি কেন? পালটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়: তাতে এত গাত্রদাহই-বা কেন? বলতে ইচ্ছে হয় : গোল কোরো না বাবারা, যাঁরা লিখছেন, তাঁদের লিখতে দাও। তবু যদি ঝামেলা করো, তো তোমাদের হাতে এবারে একখানা করে *সহজ পাঠ* ধরিয়ে দেব।

পরিশিষ্ট

'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া'র চিঠি— ১

রবিবার দুপুরবেলা। মফস্‌সলের শহরতলিতে সকালবেলায় খবরের কাগজ পাবার উপায় নেই। শরীরটাও বিশেষ ভালো নেই। তাই শুয়ে-শুয়ে খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে 'মোহনবাগানের অপরাজিত আখ্যা' চোখে পড়তেই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। খেলার খবর শেষ করেই আবার শরীর এলিয়ে দিলাম। আলস্যবশে পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে *পড়ল কবিতার ক্লাস*। আগেও চোখে পড়েছে। কিন্তু কোনও দিন ওই ক্লাসে পাঠ নিতে উৎসাহ হয়নি। আমাদের প্রধান অধ্যাপক মহাশয় বাংলা কবিতা পড়ান। তাঁর কাছে পাঠ নিতে-নিতে কবিতার ক্লাসের প্রতি আমার কেমন একটা অ্যালার্জি হয়ে গেছে। তাঁর ক্লাসে পাঠ নিতে গেলেই গায়ে যেন জ্বর এসে যায়। তাই *আনন্দবাজার*-এর কবিতার ক্লাসের চৌকাঠ মাড়াবার ইচ্ছাও হয়নি কোনও দিন। কিন্তু আজকের অলস দুপুরে ওদিকে তাকাতেই চোখে পড়ে গেল কয়েকটি ছড়া। ছড়ার টানেই ঢুকে পড়লাম ক্লাসে। ভারী আশ্চর্য লাগল। এ তো কবিকঙ্কণের ক্লাস নয়, স্বয়ং ছন্দ-সরস্বতীর ক্লাস। মনে হল, কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে ছন্দ-সরস্বতীর কাছে পাঠ নিয়েছিলেন, আমিও যেন তাঁর কাছেই পাঠ নিচ্ছি। এ হল কী? আমার ছন্দাতঙ্ক রোগটা সেরে গেল কী করে? এই রোগটার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের অধ্যাপক মশাই নিজে কবি, তার উপরে গুরুতরভাবে ছন্দ-ভক্ত। আমি বলি, ছন্দের অন্ধভক্ত। তিনি যখন কবিতা পড়েন, তখন কবিতা পড়েন না ছন্দ পড়েন, বোঝা ভার। পড়ানোও তথৈব চ। তাঁর বাইবেল হচ্ছে প্রবোধ সেনের *ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ* বইখানি। আমি বলি, বাইবেল নয়, *ছান্দোগ্য উপনিষদ*। তাঁর টিউটোরিয়াল ক্লাসের জ্বালায় বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। বইটার গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। নাড়াচাড়া করবার পক্ষে রীতিমতো গুরুভার। দুর্বহ বা দুঃসহ বললেই ঠিক হয়। তাঁর এই বইটা পড়বার চেষ্টা করতে গিয়ে ডি.এল. রায়ের একটি হাসির গান মনে পড়ে গেল। অমনি ওটাকে একটু বদলে নিয়ে দাঁড় করালাম এই চারটি লাইন :

প্রবোধচন্দ্র ছিলেন একটি
ছন্দশাস্ত্র-গ্রন্থকার;

এমনি তিনি ছন্দতত্ত্বের
করতেন মর্ম ব্যক্ত—
দিনের মতো জিনিস হত
রাতের মতো অন্ধকার,
জলের মতো বিষয় হত
ইঁটের মতো শক্ত।

এতেও মনের ঝাল মিটল না। গ্রন্থকার-অন্ধকার মিলটাও জুতসই নয়। তাই প্রথম লাইনটাকে আরও বদলে দিলাম—

প্রবোধচন্দ্র ছিলেন একটি
অপখ্যাত ছন্দকার।

এবার অপখ্যাত আখ্যা দিয়ে মনের ঝালও মিটল, ছন্দকার-অন্ধকার মিলে কানও খুশি হল।

প্রবোধচন্দ্রের বইটার আরও একটা বিশেষত্ব আছে। এই বইতে রবীন্দ্রনাথের ও অন্যান্য কবিদের ভালো-ভালো কবিতাকে ছন্দের ছুরি দিয়ে এমন কাটাছেঁড়া করা হয়েছে যে, এই বই পড়ার পরে কবিতার উপরেই অশ্রদ্ধা জন্মে যায়। কোনও কোনও বন্ধু এই বইটাকে বলেন কবিতার ডিসেকশান রুম বা পোস্ট মরটেম রুম। আমি বলি কসাইখানা। ভালো-ভালো কবিতার উপরে এরকম নৃশংস উৎপাত দেখে প্রবোধ সেন সম্বন্ধেই একটা ছড়া বানিয়েছি। কবিতা-ক্লাসের অন্যান্য পড়ুয়াদেরও যদি আমার মতো এ-বই পড়বার দুর্ভাগ্য হয়ে থাকে, তবে আমার ছড়াটা শুনে তাঁরাও কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন। তাঁদের তৃপ্তির জন্য ছড়াটা নিবেদন করলাম :

পাকা ধানে মই দেন, ক্ষেত্র চষেন।
বাংলা কাব্যক্ষেতে তিনিই প্র-সেন।

বলা উচিত যে, ছড়া বানাবার কিছু অভ্যাস আমার ছিল। কিন্তু ছন্দের হিসেব রাখার বালাই ছিল না। কেন-না, আমি মনে করি, ছন্দ গোনার বিষয় নয়, শোনার বিষয়। চোখে ছন্দ দেখা যায় না, কানে শুনতে হয়। কোন্ রচনাটার কী ছন্দ, কোন্ বৃত্ত, কয় পর্ব বা মাত্রা, এসব শুনলেই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই নিয়ে আমার ছন্দে-পাওয়া সহপাঠী কবি-বন্ধুর (সে আবার অধ্যাপক মহাশয়ের পেয়ারের ছাত্র) সঙ্গে প্রায়ই হাতাহাতি হবার উপক্রম হত। একদিন অবস্থা চরমে পৌঁছোল। আমার ক্ষমাগুণে সেদিন শান্তি রক্ষা হয়েছিল। সে একখণ্ড কাগজে আমাকে শাসিয়ে একটি 'কবিতা' রচনা করে আমার দিকে ছুড়ে দিল। কবিতাটি এই :

ওরে হতভাগা হলধর পতিতুণ্ড।
মুখটি খুলিলেই গুঁড়িয়ে দেব মুণ্ড।
ফের যদি তুই বানাতে চাস রে ছন্দ,
সব লেখা একদম করে দেব বন্ধ।

এই কবিতা পড়ে আমার শুধু দম বন্ধ হবার নয়, পেট ফাটবারও উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু কিছু না-বলে ক্ষমা করতে হল। কবি-বন্ধুর কথা দিয়ে কথা রাখার সৎসাহস সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সহপাঠী বন্ধুরা একবাক্যে বললেন, এই কবিতাটির ছন্দ নির্ভুল, মাত্রাসংখ্যার হিসেব ঠিক আছে। কিন্তু আমার—

কান "তা শুনি গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া কহে—
'নহে, নহে, নহে'।"

কান ও জ্ঞানের বিবাদভঞ্জন করতে না পেরে তখন থেকেই ছড়া বানানো একদম বন্ধ করে দিলাম। বন্ধুবরও আমার এই সত্যনিষ্ঠা ও নৈতিক সাহসের তারিফ করেছিল। তার এই গুণগ্রাহিতার প্রশংসা না করে পারিনি।

ছড়া বানানো বন্ধ করার আরও একটা কারণ ঘটেছে। অধ্যাপক মহাশয় একদিন ক্লাসে এসেই প্রবোধ সেনের আর-একখানি সদ্য-প্রকাশিত বই সকলের সামনে তুলে ধরলেন। তারপর চলল প্রশস্তি-বচন। আমি মনে মনে ভাবলাম— 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।'

বইটির নাম *ছন্দ-পরিক্রমা*। প্রথমে মনে হল, 'ছন্দ-পরিশ্রমা'। অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দেশে এই বইটাও নাড়াচাড়া করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে হল 'ছন্দ-পণ্ডশ্রমা'। আমার মতো স্বভাবকবিকে ছন্দ বোঝাবার সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রম, এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। বইটির প্রথমেই পরিভাষা, শেষেও তা-ই। পরিভাষার ইটপাটকেলে হোঁচট খেতে-খেতে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। এগোনো আর হয় না। কোনও পরিভাষা কেন মানতে হবে বা কেন ছাড়তে হবে, তার যুক্তিজালে জড়িয়ে গিয়ে দিশেহারা হতে হয়। প্রবোধ সেনই একসময়ে ছন্দের তিন রীতির নাম দিয়েছিলেন— অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। আর তিনিই বারবার নাম-বদল করে চলেছেন। এই বই পড়তে গিয়ে ডি.এল. রায়ের আর-একটা হাসির গান মনে পড়ে গেল :

"ছেড়ে দিলাম পথটা
বদলে গেল মতটা,
এমন অবস্থাতে পড়লে
সবারই মত বদলায়।"

এই মত-বদল নাম-বদলের পালা কবে শেষ হবে কে জানে। ততদিন ছন্দ শেখার ও ছন্দ লেখার কাজটা মুলতুবিই থাক না। তা ছাড়া যেটুকু সহজাত ছন্দবোধ আমার ছিল, এই বই পড়ে তা-ও ঘুলিয়ে গেল। সুতরাং ছড়া বানাবার অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী?

এমন সময়ে কবিকঙ্কণের কবিতার ক্লাসে ঢুকে যেন দিব্যদৃষ্টি পেয়ে গেলাম। ছন্দাতঙ্ক অ্যালার্জি কেটে গেল। উৎসাহিত হয়ে আগের সপ্তাহের রবিবাসরীয়

আনন্দবাজার খুঁজে-পেতে বার করলাম। সে-সপ্তাহের কবিতার ক্লাসেও পাঠ নেওয়া গেল। দুই ক্লাসের পাঠ নিয়েই ছন্দবোধের কুয়াশা যেন অনেকটা কেটে গেল। আরও পাঠ নেবার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে উঠেছে। আশা হয়েছে, পাঠ নেওয়া শেষ হলে ছন্দে-পাওয়া কবিবন্ধুকে একবার দেখে নিতে পারব। আর প্রবোধচন্দ্রের অন্ধভক্ত অধ্যাপক মহাশয়কেও...। না সে-কথা থাক। ইতিমধ্যে ভালো করে পাঠ নিয়ে রাখা দরকার। আর তা হাতে-কলমে হলেই ভালো। ভরসার কথা এই যে, অধ্যাপক সরখেল মহাশয়ের নাতি ও ভৃত্যটির ছড়া শুনে আমার সেই ছড়া বানাবার ছেড়ে-দেওয়া অভ্যাসটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এখন কবিতার ক্লাসের মনোযোগী ছাত্রের মতো পাঠ নিতেও পারব, প্রশ্ন করতেও পারব। প্রশ্নগুলি বোকার মতো না হলেই হল।

অধ্যাপক সরখেলের দৃষ্টান্ত নিয়েই নূতন ছড়া বানিয়ে প্রশ্ন করব :

স্বর্ণপাত্র নয় ওটা ঊর্ধ্ব নীলাকাশে,
বিশ্বের আনন্দ নিয়ে পূর্ণচন্দ্র হাসে।

এটা কোন্ রীতির ছন্দ? অক্ষরবৃত্তের? ভুল করিনি তো? এবার ছন্দের রীতিবদল করা যাক।

স্বর্ণপাত্র নয় সুনীল আকাশে,'
পূর্ণিমা-চাঁদ হোথা সুখভরে হাসে।

এটা মাত্রাবৃত্ত তো? আমার কান তো তাই বলে। কর্ণধাররা কী বলেন, জানতে চাই। কানমলার ভয় যে একেবারেই নেই, তা বলতে পারি না। আবার রীতিবদল করা যাক :

সোনার থালা নয় গো ওটা
সুদুর নীলাকাশে,
বিশ্বপ্রাণে জাগিয়ে পুলক
পূর্ণিমা-চাঁদ হাসে।

এটাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলা যায় কি? আমার কান তো তা-ই বলে। জ্ঞানের বিচারে কানের দণ্ডবিধান না হলেই বাঁচি। জ্ঞানের এজলাসে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ালে প্রাণটাও ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। হাকিমের রায় শুনে কানও অনেক সময়ে লাল হয়ে ওঠে। তবু অধ্যাপক সরখেল মহাশয়ের পরীক্ষার হলে হাজির হয়েছি। যদি তাঁর কাছে পাস-মার্কা পেয়ে যাই, তাহলে ছন্দে-পাওয়া কবি-বন্ধু ও প্রসেন-ভক্ত ছন্দ-অধ্যাপককে.....। না, এখনও সে-কথা বলবার সময় হয়নি। আগে তো কবিতার ক্লাসে রীতিমতো পাঠ নিতে হবে, প্রশ্নও করতে হবে সন্দেহ দূর করবার জন্য।

এবার মনের দুঃখে নিজের দুরবস্থার কথা ফলাও করে বলতে হল। ভবিষ্যতে সরখেল মহাশয়ের বিরক্তি ঘটাব না। সংক্ষেপেই প্রশ্ন করব।

কবিকঙ্কণের উত্তর

নাম যদিও জানা গেল না, তবু আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' একজন পাকা ছান্দসিক। আমার ধারণা ছিল নেহাতই পাঠশালা খুলেছি, প্রথম পড়ুয়ারা যাতে ছন্দের ব্যাপারটাকে মোটামুটি ধরতে পারেন তার জন্যে সহজ করে সব বুঝিয়ে বলব, জটিলতার পথে আদৌ পা বাড়াব না। বাড়াবার সাধ্যও আমার নেই। একজন পাকা ছান্দসিক যে হঠাৎ সেই পাঠশালায় ঢুকে, পড়ুয়ার ছদ্মবেশে, পাটির উপরে বসে পড়বেন, এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তাঁর পদার্পণে আমি কৃতার্থ; কিন্তু ক্লাস নেবার কাজটা এবারে আরও কঠিন হয়ে উঠল।

'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' কিছু প্রশ্ন করেছেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর আমি এখুনি দিচ্ছিনে। ভাবছি, গোলমেলে কেস হাতে এলেই ছোটো ডাক্তাররা যেমন বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেন, তেমনিই আমাকেও হয়তো বড়ো ডাক্তারের শরণ নিতে হবে। এ-ব্যাপারে আমি যাঁকে সেরা ডাক্তার বলে মানি, তিনি কলকাতায় থাকেন না। উত্তর পেতে তাই হয়তো দেরি হবে।

ইতিমধ্যে একটা কথা অকপটে নিবেদন করি। সেটা এই যে, 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' যদিও আমরা দারুণ প্রশংসা করেছেন, তবু আমি খুশি হতে পারছিনে। খুশি হতে পারতুম, যদি তাঁর চিঠিতে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পর্কে কোনও বক্রোক্তি না থাকত। 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' জেনে রাখুন, শ্রীযুক্ত সেন আমার গুরুস্থানীয় ছান্দসিক। ছন্দের শেষ কথাগুলি আমার জানা নেই। প্রথম কথাগুলি যদি জেনে থাকি, তবে শ্রীযুক্ত সেনের কাছ থেকেই জেনেছি। পরে আরও দু-এক জন প্রখ্যাত ছান্দসিকের কাছে পরোক্ষে পাঠ নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনের কাছে আমার ঋণের পরিমাণ তাতে লাঘব হয় না। এই স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' যদি এর ফলে আমার উপরেও চটে যান, তো আমি নিরুপায়।

'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া'র চিঠি—২

সশ্রদ্ধ নিবেদন এই। যে শ্রদ্ধা নিয়ে আপনার কবিতার ক্লাসে আসন নিয়েছি, প্রত্যেক পাঠের পরে সে-শ্রদ্ধা ক্রমে বাড়ছে। গত রবিবারের পাঠ শুনে এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনার বক্তব্য জেনে আমার ছন্দবোধের কুয়াশা আরও অনেকখানি কেটে গেল। যাঁকে আমি 'কবিঘাতক ছান্দসিক' আখ্যা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করিনি, আপনি সেই প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রতি খুবই অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করেছেন। চটে যেতাম, যদি আপনার সম্বন্ধে অটুট শ্রদ্ধা না থাকত। তাই চটে না গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা ঠিক কি না তা-ই যাচাই করে দেখতে হল। আপনার শেষ পাঠের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দ পরিক্রমা' বইটির মতামতটা মিলিয়ে দেখলাম। অক্ষরবৃত্ত

ছন্দ সম্বন্ধে দুইজনের মতের মিল দেখে আমার বক্রোক্তিগুলির জন্য একটু কুণ্ঠাবোধই হল। এই বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে অক্ষরবৃত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

"পশমী শাল গায়ে দিয়ে
গেলাম কাশ্মীরে,
রেশমী জামা-গায়ে শেষে
আগরা এনু ফিরে।"

আপনার দৃষ্টান্তগুলির মিল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দুই জনের হিসাব দেবার রীতিতেও যথেষ্ট মিল। ... কিন্তু একটা জায়গায় একটু খটকা লাগল। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতায় আছে :

"আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।"

এখানে 'আকবর' শব্দে আপনি ধরেছেন তিন মাত্রা, 'বাদশার' শব্দেও তাই। 'বাঁশি' কবিতাটি পড়ে আমার মনে হল, ওই দুই শব্দে চার-চার মাত্রাই ধরা হয়েছে। কেন-না, ওই কবিতাটিতে 'টিক্‌টিকি', ট্রামের 'খরচা', মাছের 'কানকা', 'আধমরা' প্রভৃতি সব শব্দেরই মধ্যবর্তী হস্‌বর্ণকে একমাত্রা বলে ধরা হয়েছে, কোথাও ব্যতিক্রম নেই। সুতরাং 'আক্‌বর' ও 'বাদ্‌শা' শব্দের ক্‌ ও দ্‌-কে একমাত্রা হিসেবে ধরা হবে না কেন?

সবশেষে বলা উচিত যে, এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কবিতা-ক্লাসের সহায়তা করা, বাধা সৃষ্টি করা নয়। প্রবোধচন্দ্রও তাঁর 'ছন্দ-পরিক্রমা' বইটির নিবেদন অংশে জিজ্ঞাসু ছাত্রের প্রশ্নকে তাঁর চিন্তার সহায়ক বলেই স্বীকার করেছেন। তাই আশা করি আপনিও আমার প্রশ্নকে সেভাবেই গ্রহণ করবেন। ইতি ২০ আশ্বিন ১৩৭২।

অনুলেখ : আজকের পাঠের একটি দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেও মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। সেটাও নিবেদন করি—

'কালকা মেলে টিকিট কেটে সে
কাল গিয়েছে পাহাড়ের দেশে।'

এটা অক্ষরবৃত্ত রীতিতে পড়তে গিয়ে যতটা কানের সায় পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি সায় পেয়েছি স্বরবৃত্ত রীতিতে পড়ে। এরকম সংশয়স্থলে কী করা উচিত? ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৭২।

কবিকঙ্কণের উত্তর :

গত সপ্তাহের রবিবাসরীয় আলোচনীতে 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া'র চিঠি পড়লুম।

(১) তাঁকে যে আমি প্রবোধচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে পেরেছি আপাতত এইটেই আমার মস্ত সাফল্য।

(২) 'ছন্দ-পরিক্রমা' আমি এখনও পড়িনি। পড়তে হবে। ছন্দ নিয়ে যখন আলোচনা করতে বসেছি, তখন প্রবোধচন্দ্রের সব কথাই আমার জানা চাই। শুনেছি প্রবোধচন্দ্র এখন বাংলা কবিতার মূল ছন্দ তিনটির অন্য প্রকার নামের পক্ষপাতী। কেন, তা আমি জানিনে। জানতে হবে। 'ছন্দ-পরিক্রমা' গ্রন্থে ব্যক্ত মতামতের সঙ্গে আমার ধারণার যদি বিরোধ না ঘটে, তবে সে তো আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়।

(৩) 'বাঁশি' কবিতার লাইন দুটির প্রসঙ্গে জানাই, স্মৃতি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার স্মৃতিতে লাইন দুটির স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল না, তারা এক হয়ে গিয়েছিল, এবং সেইভাবেই, অর্থাৎ টানা লাইন হিসেবে, তাদের আমি উদ্ধৃত করেছিলাম। টানা লাইন হিসেবে গণ্য করলে দেখা যাবে, 'আকবর' ও 'বাদশার'— এই দুই শব্দের কাউকেই তিন-মাত্রার বেশি মূল্য দেওয়া যায় না। দোষ আমার বিচারের নয়, অসতর্কতার।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, "আকবর বাদশার সঙ্গে"— এই লাইনটিকে যদি পরবর্তী লাইনের সঙ্গে জুড়ে না-ও দিই, অর্থাৎ তাকে যদি আলাদাই রাখি, তবে তাতেই কি নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, 'আকবর' ও 'বাদশার'— এরা চার-মাত্রারই শব্দ? বলা বাহুল্য, পুরো লাইনটিকে দশ-মাত্রার মূল্য দিলে তবেই এরা চার-চার মাত্রার শব্দ হিসেবে গণ্য হবে। জিজ্ঞাসু পড়ুয়া সে-দিক থেকে ন্যায্য কথাই বলেছেন। কিন্তু পুরো লাইনটির মাত্রা-সংখ্যা যে দশের বদলে আটও হতে পারে, এমন কথা কি ভাবাই যায় না? যে-ধরনের বিন্যাসে এই কবিতাটি লেখা, সেই ধরনের বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে চার-মাত্রা কিংবা আট-মাত্রার লাইন রাখতেন। 'বাঁশি' কবিতাটিতেও আট-মাত্রার লাইন অনেক আছে।

মুশকিল এই যে, "আকবর বাদশার সঙ্গে"— এই লাইনও যে সেই গোত্রের, অর্থাৎ আট-মাত্রার, তা-ও আমি জোর করে বলতে পারছিনে। জিজ্ঞাসু পড়ুয়া এটিকে দশ-মাত্রার মূল্য দিয়েছেন : দিয়ে 'আকবর' এবং 'বাদশার'— এই শব্দ দুটিকে চার-চার মাত্রার শব্দ বলে গণ্য করেছেন। তিনি ভুল করেছেন, এমন কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু অনুরোধ জানাই, তিনিও একবার ভেবে দেখুন, পুরো লাইনটিকে আট-মাত্রার মূল্য দিয়ে, যদি কেউ ওই শব্দ দুটিকে তিন-তিন মাত্রার শব্দ হিসেবে গণ্য করে, তবে সেটা অন্যায় হবে কি না।

জিজ্ঞাসু পড়ুয়া অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে একটি জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। সেটা এই যে, ওই কবিতাটিতে "সব শব্দেরই মধ্যবর্তী হস্‌বর্ণকে এক-মাত্রা বলে ধরা হয়েছে, কোথাও ব্যতিক্রম নেই।" সুতরাং 'আকবর' ও 'বাদশার' শব্দের মধ্যবর্তী 'ক্' ও 'দ্'-কেও একটি করে মাত্রার মূল্য দেওয়া উচিত।

ঠিক কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি এমন কবিতা লেখেননি, যাতে শব্দের মধ্যবর্তী হস্‌বর্ণ কোথাও-বা মাত্রার মূল্য পায়, কোথাও-বা পায় না? এমন কথা কেমন করে বলি? 'আরোগ্য' গ্রন্থের 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতাটি দেখা যাক। সেখানে দেখছি, "হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার খেতে'— এই লাইনটিতে 'বাজরার' শব্দের মধ্যবর্তী 'জ্‌'-কে একটি মাত্রার মূল্য দিতে হয় বটে, কিন্তু তার পরের লাইনেই ("তরমুজের লতা হতে") 'তরমুজ' শব্দের মধ্যবর্তী 'র্‌'-কে মাত্রার মূল্য দিতে হয় না।

বলা বাহুল্য, এতেই প্রমাণিত হয় না যে, 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কিংবা অন্যান্য কবিতায় যে-হেতু ব্যতিক্রম আছে, অতএব 'বাঁশি' কবিতাতেও ব্যতিক্রম আছে, এবং "আকবর বাদশার সঙ্গে"— এই লাইনটিকেও আট-মাত্রার লাইন হিসেবে গণ্য করে 'ক্‌' আর 'দ্‌'-কে মাত্রার মূল্য থেকে বঞ্চিত করতেই হবে। না, এমন অদ্ভুত দাবি আমি করি না। বরং বলি, সম্ভবত জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার কথাই ঠিক, সম্ভবত 'আকবর' ও 'বাদশার'— এরা চার-চার মাত্রার শব্দই বটে। কিন্তু একই সঙ্গে অনুরোধ জানাই, অন্য রকমের বিচারও সম্ভব কি না, জিজ্ঞাসু পড়ুয়া যেন সেটাও একবার সহৃদয় চিত্তে ভেবে দেখেন।

ইতিমধ্যে আর-একটা কথা বলা দরকার। অক্ষরে-অক্ষরে অসবর্ণ মিলনের দৃষ্টান্ত হিসেবে জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার দরবারে 'আকবর' এবং 'বাদশার' যদি একান্তই পাস্‌-মার্ক না পায়, তাহলে রবীন্দ্রকাব্য থেকেই আর-একটি দৃষ্টান্ত আমি পেশ করতে পারি। 'জন্মদিনে' গ্রন্থের 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।" 'মজ্‌দুরি' শব্দটিতে 'জ'য়ে 'দ'য়ে অসবর্ণ মিলন ঘটেছে, জিজ্ঞাসু পড়ুয়া এ কথা আশা করি স্বীকার করবেন। শব্দটিকে কোনওক্রমেই তিন-মাত্রার বেশি মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়। এমন দৃষ্টান্ত আরও কিছু আমার সংগ্রহে আছে।

(৪) "কালকা মেলে...পাহাড়ের দেশে"— এই লাইন দুটিকে অক্ষরবৃত্ত রীতিতে পড়ে কানের যতটা সায় পাওয়া যায়, তার চাইতে বেশি সায় যদি পাওয়া যায় স্বরবৃত্ত রীতিতে, তবে তো বুঝতেই হবে যে, শব্দের বিন্যাসে আমার আরও হুঁশিয়ার থাকা উচিত ছিল। প্রসঙ্গত জিজ্ঞেস করি, জিজ্ঞাসু পড়ুয়া তাঁর চিঠিতে প্রবোধচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে অক্ষরবৃত্তের দৃষ্টান্ত হিসেবে, যে-দুটি লাইন তুলে দিয়েছেন ("পশমী শাল....আগরা এনু ফিরে"), তাদেরও কি স্বরবৃত্ত রীতিতে পড়া যায় না? এ-সব ক্ষেত্রে পাঠকের বিভ্রাট ঘটে মূলত শব্দের গাঁটের জন্য। গাঁটগুলিকে অক্লেশে পেরোতে পারলে যা অক্ষরবৃত্ত, হোঁচট খেলে তাকেই অনেকসময়ে স্বরবৃত্ত বলে মনে হয়। যদি সম্ভব হয়, এই গাঁটগুলি নিয়ে পরে আলোচনা করব।

ড. ভবতোষ দত্তের চিঠি

সবিনয় নিবেদন, আপনার 'কবিতার ক্লাস'-এর আমি একজন উৎসুক পড়ুয়া। কবিতার ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে এল। আপনার শেষের দুটি ক্লাস সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা মনে হয়েছে। নিবেদন করি।

স্বরবৃত্ত ছন্দ যে চার সিলেব্‌ল্-এর কম অথবা বেশি স্বীকার করে, এ-কথা আপনি নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন। আপনার দেওয়া দৃষ্টান্ত কয়টি লক্ষ করলাম— হয় তারা মৌখিক ছড়া অথবা ইয়ে-শব্দযুক্ত কাব্যপঙ্‌ক্তি। ইয়েকে যুগ্মস্বর ছাড়া কী বলা যায় ইংরেজি ডিপথং-এর মতো। বাংলাতেও ঐ অথবা ঔ-এর মতো। আমার ধারণা, আপনি রবীন্দ্রনাথ অথবা সত্যেন্দ্রনাথের অথবা আধুনিক কোনও কবির কবিতায় চার সিলেব্‌ল্-এর ব্যতিক্রম পাবেন না। কিংবা পেলেও সেটা এতই বিরল যে, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ প্রকৃতি বলে নির্দেশ করতে পারেন না। ছড়ার ছন্দে যে-সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তা যদি এর সাধারণ প্রকৃতিই হত, তবে পরবর্তী আদর্শ শিল্পী-কবিরা তার ব্যবহার নিশ্চয়ই করতেন। তাঁরা চার সিলেব্‌ল্-এর পর্বকেই আদর্শরূপে গণ্য করেছেন। তার অর্থ নিশ্চয়ই এই যে, পাঠযোগ্য কবিতায় বাঙালির উচ্চারণ-প্রকৃতি চার সিলেব্‌ল্‌কেই স্বীকার করে মাত্র।

আপনি বলেছেন, স্বরবৃত্ত ছন্দ গানের সুরের ছন্দ। ছড়া ইত্যাদিতে মধ্যযুগে ব্যবহৃত এই-জাতীয় ছন্দকে 'ছড়ার ছন্দ'ই বলা উচিত; সেকালে একে ধামালী ছন্দ বলা হত। রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত এই ছন্দের আধুনিক শিল্পসম্মত রূপকেই খাঁটি স্বরবৃত্ত বলা উচিত। মধ্যযুগের ধামালী অযত্নকৃত— এর প্রকৃতি সম্বন্ধে কেউ অবহিত ছিলেন না। সে-জন্য তিন সিলেব্‌ল্ বা পাঁচ সিলেব্‌ল্ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি। বিশেষত কোনও বড়ো প্রধান গুরু কাব্যেই এই ছন্দের ব্যবহার নেই।

ছড়া সুরে উচ্চারিত হত, এ-কথা সত্য। আপনি বলেছেন, স্বরবৃত্ত ছন্দ এই জন্যই গানের ছন্দ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সুরে গাওয়া বা উচ্চারিত হত না হেন বস্তু মধ্যযুগে ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলির কথা ছেড়ে দিন, বৃহৎকায় মঙ্গলকাব্যগুলিও সুর করে পড়া হত। মঙ্গলকাব্য তো স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা হত না, হত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। কিন্তু এখানেও বলতে পারি, ভারতচন্দ্রের আগে অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দেও চোদ্দ অক্ষরের (বা মাত্রার) নানা ব্যতিক্রম হামেশাই দেখা যেত। সেজন্যে কি বলবেন ব্যতিক্রমটাই সাধু পয়ার রীতির প্রকৃতি? অক্ষরবৃত্তও গানের সুরেরই ছন্দ? এর পরবর্তী সিদ্ধান্ত, ছন্দ মাত্রেই গানের সুর থেকে উদ্ভূত। সেটা অবশ্য আলাদাভাবেই আলোচ্য।

স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এর হসন্ত-প্রবণতা। হসন্ত-ধ্বনি থাকার জন্যই শব্দের প্রথমে ঝোঁক পড়ে। শব্দের প্রথম দিকে ঝোঁক এবং শব্দের প্রান্তের

হসন্ত-ধ্বনি চলিতভাষারও বিশেষত্ব। এ বিষয়ে খুব একটা মতভেদের অবকাশ আছে বলে মনে করি না। বস্তুত স্বরবৃত্ত ছন্দের হসন্ত-প্রবণতা ভাষার মৌখিক রীতির জন্যই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপকে মেনে নিয়েছে।'

এটা লক্ষ্য করলে গানের সুর থেকে স্বরবৃত্ত ছন্দের উদ্ভব হয়েছে এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। চলতি মুখের ভঙ্গি আর সুরের ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। একটাতে থাকে ঝোঁক, আর-একটাতে প্রবাহ। ইতি ২৪. ৩. ৬৬

কবিকঙ্কণের উত্তর :

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর লিখতে অসম্ভব দেরি হল, তার জন্য মার্জনা চাই।...

আপনার প্রতিটি কথাই ভাববার মতো। তা ছাড়া, এমন অনেক তথ্য আপনি জানিয়েছেন, যা আমার জানা ছিল না। জেনে লাভবান হয়েছি। শুধু একটি ব্যাপারে আমার একটু খটকা লাগছে। স্বরবৃত্তে রচিত "পাঠযোগ্য কবিতায় বাঙালির উচ্চারণ প্রকৃতি" যে শুধু চার সিলেব্‌ল্-এর পর্বকেই স্বীকার করে, এই সিদ্ধান্তের যুক্তি হিসেবে আপনি জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ অথবা সত্যেন্দ্রনাথের অথবা আধুনিক কোনও কবির কবিতায় চার সিলেব্‌ল-এর ব্যতিক্রম" পাওয়া যাবে না। "কিংবা পেলেও সেটা এতই বিরল যে, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ প্রকৃতি বলে নির্দেশ" করা উচিত হবে না।

অনুমান করি, আপনি যেহেতু "পাঠযোগ্য" কবিতার উপরে জোর দিতে চান, তাই— ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত হিসেবে— 'মৌখিক ছড়া'র দৃষ্টান্ত আপনার মনঃপূত নয়।

এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে সবিনয়ে নিবেদন করি।

(১) 'মৌখিক ছড়া'গুলি তো একালে শুধুই মুখে-মুখে ফেরে না, লিপিবদ্ধও হয়ে থাকে। এক কালে সেগুলি হয়তো শুধুই কানে শোনবার সামগ্রী ছিল, এখন সেগুলিকে আকছার চোখে দেখছি। এবং পড়ছি। অগত্যা তাদের আর 'পাঠযোগ্য' সামগ্রী হিসেবেও গণ্য না-করে উপায় নেই। তবে আর সেগুলিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করায় আপত্তি কেন?

(২) 'বাঙালির উচ্চারণ-প্রকৃতি'র পক্ষে সত্যিই কি স্বরবৃত্তে শুধুই চার সিলেব্‌ল্-এর পর্বকে স্বীকার করা সম্ভব? সর্বত্র সম্ভব? ক্রমাগত যদি চার-চারটি ক্লোজ্‌ড সিলেব্‌ল্ দিয়ে আমরা পর্ব গড়তে চাই, পারব কি?

(৩) রবীন্দ্রনাথ কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ স্বরবৃত্তকে প্রধানত কীভাবে ব্যবহার করেছেন,

সেটা আমার বিচার্য ছিল না; স্বরবৃত্তকে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেইটেই ছিল আমার দেখবার বিষয়। দেখতে পাচ্ছি, ছয় থেকে দুয়ে এর ওঠানামা। কাজিফুল 'কুড়োতে কুড়োতে' আমরা ছয়ে উঠতে পারি, আবার 'ঝুপঝুপ' করে দুয়ে নামতে পারি। উচ্চারণে যে-ছন্দ ইলাসটিসিটিকে এতটাই প্রশ্রয় দেয়, তাকে ঠিক কবিতার ছন্দ বলতে আমার বাধে। ডিপথং-এর কথাটা আমি ভেবে দেখেছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ওঠানামার সর্বত্র ব্যাখ্যা মেলে না। বরং সন্দেহটা ক্রমেই পাকা হয়ে দাঁড়ায় যে, নিজেদের অগোচরে পর্বকে কখনও আমরা টেনে বড়ো করি, কখনও-বা অতিদ্রুত উচ্চারণে তাকে কমিয়ে আনি। শব্দের উচ্চারণে হ্রাসবৃদ্ধির এতখানি স্বাধীনতা কবিতার ব্যাকরণ স্বীকার করে কি?

পরিশেষে বলি, সম্ভবত আপনার কথাই ঠিক। তবু অনুরোধ করি, আমার কথাটাও দয়া করে একবার ভেবে দেখবেন। আপনি সহৃদয় পাঠক। উপরন্তু যুক্তিনিষ্ঠ। সেইজন্যেই এই অনুরোধ।....

সপ্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। ইতি।

কবি শ্রীশঙ্খ ঘোষের চিঠি

মাননীয়েষু,

কাজটা কি ভালো করলেন? এতো সহজেই যে ছন্দ-কাণ্ডটা জানা হয়ে যায়, এটা টের পেলে ছেলেমেয়েরা কি আর স্কুল-কলেজের ক্লাস শুনবে? ক্লাস মানেই তো সহজ জিনিসটিকে জটিল করে তুলবার ফিকির।

এ-লেখার এই একটি কৌশল দেখছি যে, আপনি শুরু করতে চান সবার-জানা জগৎ থেকে। তাই এখানে 'যুক্তাক্ষর' কথাটিকে ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করেননি, দেখিয়েছেন কোন্ ছন্দে এর কীরকম মাত্রামূল্য। বোঝানোর দিক থেকে এ একটা উপকারী পদ্ধতি।

কিন্তু এর ফলে ছোটো একটি সমস্যাও কি দেখা দেবে না? যুক্তাক্ষর তো শব্দের চেহারা-বর্ণনা, তার ধ্বনিপরিচয় তো নয়। ছন্দ যে চোখে দেখবার জিনিস নয়, কানে শুনবার— এটা মনে রাখলে ধ্বনিপরিচয়টাই নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজে লাগবে? যেমন ধরা যাক, 'ছন্দ' শব্দটি। মাত্রাবৃত্তে যুক্ত-অক্ষর দু-মাত্রা পায়। এখন এ-শব্দটি যদি মাত্রাবৃত্তে থাকে তো দু-মাত্রার মূল্য দেব এর কোন্ অংশকে? যুক্তাক্ষর 'ন্দ'-কে, নাকি রুদ্ধদল 'ছন্'-কে? মাত্রার হিসেবটা কেমন হবে? ১+২ (ছ+ন্দ), না ২+১ (ছন্+দ)? চোখ বলবে প্রথমটি, কান বলবে দ্বিতীয়।

তাহলে দল বা সিলেব্‌ল্ কথাটাকে এড়িয়ে থাকা মুশকিল। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, আপনি ইচ্ছে করেই অল্পে-অল্পে এগিয়েছেন। স্বরবৃত্ত আলোচনার আগে একেবারেই তুলতে চাননি সিলেব্‌ল্-এর প্রসঙ্গ।

আর সেইজন্যেই মাত্রাবৃত্তের একটি নতুন সূত্রও আপনাকে ভাবতে হল। শব্দের আদিতে না থাকলে এ-ছন্দে যুক্তাক্ষর দু-মাত্রা হয়! আপনি এর সঙ্গে আরও একটু জুড়ে দিয়ে বলেছেন যে, শব্দের ভিতরে থাকলেও কখনও কখনও যুক্তাক্ষর একমাত্রিক হতে পারে। কোথায়? যেখানে তার ঠিক আগেই আছে হ্‌স্বর্ণ কিংবা যুক্তস্বর। আপনি বলবেন, 'আশ্লেষ' শব্দের 'শ্লে' আর 'সংশ্লেষ' শব্দের 'শ্লে' মাত্রাবৃত্তে দু-রকম মাত্রা পাচ্ছে। প্রথমটিতে দুই, পরেরটিতে এক। অথবা বলবেন এ-ছন্দে সমান-সমান হয়ে যায় 'চৈতী' 'চৈত্র'?

ঠিক কেন যে তা হচ্ছে, এ-ও আপনি জানেন। জানেন যে, এ-সব ক্ষেত্রে সিলেব্‌ল্ দিয়ে ভাবলে ব্যাপারটাকে আর ব্যতিক্রম মনে হয় না, মনে হয় নিয়মেরই অন্তর্গত। যদি এভাবে বলা যায় যে, মাত্রাবৃত্তে রুদ্ধদল দু-মাত্রা পায়, মুক্তদল এক-মাত্রা— তাহলেই ওপরের উদাহরণগুলির একটা সহজ ব্যাখ্যা মেলে। উদাহরণের দিক থেকে দেখলে শব্দগুলি তো 'সং + শ্লেষ' 'আস্ + লেষ' 'চৈ + তী' 'চৈৎ + র'— এইরকম দাঁড়ায়?

কিন্তু সেভাবে আপনি বলতে চান না; চান না যে, সিলেব্‌ল্-এর বোঝাটা গোড়া থেকেই পাঠকের ঘাড়ে চাপুক। যুক্তাক্ষর বলেই যদি কাজ মিটে যায় তো ক্ষতি কী! ফলে আপনি তো দিব্যি টগবগিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু ক্লাসে যারা ছন্দ পড়াবেন তাঁদের কী দশা হবে?

কবিকঙ্কণের উত্তর

প্রীতিভাজনেষু

শঙ্খ, আপনার চিঠি পেয়ে বড়ো ভালো লাগল।

সত্যি, আমি ঠিকই করেছিলুম যে, সিলেবিক্ ছন্দ স্বরবৃত্তের এলাকায় ঢুকবার আগে সিলেব্‌ল্-কথাটা মুখেও আনব না। আমার ভয় ছিল, ছন্দের ক্লাসের যাঁরা প্রথম পড়ুয়া, গোড়াতেই যদি 'মোরা' 'সিলেব্‌ল্' ইত্যাদি সব জটিল তত্ত্ব তাঁদের বোঝাতে যাই, তাহলে তাঁরা পাততাড়ি গুটিয়ে চম্পট দেবেন। কিন্তু 'অক্ষর' সম্পর্কে সেই ভয় নেই। অক্ষর তাঁরা চেনেন। তাই, প্রাথমিক পর্যায়ে, অক্ষরের সাহায্য নিয়ে আমি তাঁদের ছন্দ চেনাবার চেষ্টা করেছি। তবু, তখনও আমি ইতস্তত বলতে ভুলিনি যে, ধ্বনিটাই হচ্ছে প্রথম কথা; বলেছি যে, চোখ নয়, কানই বড়ো হাকিম। এমনকি, এ-ও আমি স্পষ্ট জানিয়েছি যে, অক্ষর আসলে ধ্বনির প্রতীক- মাত্র। 'কবিতার ক্লাস'-এর পাণ্ডুলিপি তো আপনি দেখেছেন। অক্ষর ও ধ্বনি-বিষয়ক এসব মন্তব্য নিশ্চয় আপনার চোখ এড়ায়নি।

যুক্তাক্ষরের রহস্যটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। এবং যেভাবে সেই রহস্যের আপনি মীমাংসা করেছেন, তাতে সমস্ত সংশয়ের নিরসন হওয়া উচিত। কিন্তু আপনি কি

নিশ্চিত যে, 'চৈত্র'কে 'চৈৎ + র' হিসেবে বিশ্লিষ্ট করেই আপনি নিষ্কৃতি পাবেন? বুদ্ধ সিলেব্‌ল্ 'চৈৎ'কে আপনি দু-মাত্রার মূল্য দিচ্ছেন, মুক্ত সিলেব্‌ল্ 'র'কে দিচ্ছেন এক-মাত্রার। ফলত সব মিলিয়ে এই শব্দটি তিন-মাত্রার বেশি মূল্য পাচ্ছে না। আপনার এই হিসেবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কারও-কারও হয়তো আপত্তি থাকতে পারে। "মাত্রাবৃত্তে বুদ্ধদল দু-মাত্রা পায়, মুক্তদল একমাত্রা", এই বিধান মেনে নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, 'চৈত্র' কি বস্তুত একটি বুদ্ধদল ও একটি মুক্তদলের সমষ্টি? তাঁরা দাবি করতে পারেন যে, 'চৈত্র'কে আসলে চ + ইৎ + র হিসেবে বিশ্লিষ্ট করা উচিত, এবং সেই অনুযায়ী এই শব্দটিকে মোট চার-মাত্রার মূল্য দিতে হবে। (প্রথম ও শেষের দুটি মুক্তদলের জন্য দ্-মাত্রা ও মধ্যবর্তী একটি বুদ্ধদলের জন্য দু-মাত্রা।) 'সৈন্য' 'দৈন্য' 'মৈত্রী' 'বৌদ্ধ' ইত্যাদি শব্দের বেলাতেও আপনার হিসেবের বিরুদ্ধে এই একই রকমের দাবি উঠতে পারে। আপনি এদের সৈন্ + ন, দৈন্ + ন, মৈৎ + রী, বৌদ্ + ধ হিসেবে দেখাবেন। তাঁরা দেখাবেন স + ইন্ + ন, দ + ইন্ + ন, ম + ইৎ + রী, ব + উদ্ + ধ হিসেবে। আপনি এদের একভাবে বিশ্লিষ্ট করবেন; তাঁরা করবেন আর-একভাবে।

আমি অবশ্য আপনার পন্থাতেই এসব শব্দকে বিশ্লিষ্ট করবার পক্ষপাতী। তার কারণ, আমি জানি যে, যুক্তস্বরের পরে হস্‌বর্ণ থাকলে (সেই হস্‌বর্ণটি যুক্তাক্ষরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকলেও কিছু যায়-আসে না) ধ্বনিসংকোচ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এ-তথ্য অনেক আগেই জেনেছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মাত্রাবৃত্তে 'পৌষ'কে পুরো তিন-মাত্রার মূল্য দেওয়া চলে না; নইলে 'চিত্রা' গ্রন্থের 'সিন্ধুপারে' কবিতায় (যা কিনা মাত্রাবৃত্তে লেখা) 'পৌষ'-শব্দটার চলতি বানান ছেড়ে তিনি "পউষ প্রখর শীতে জর্জর..." লিখতে গেলেন কেন? উদ্দেশ্য যে পৌষ-এর উচ্চারণকে আর-একটু বিবৃত করে নিশ্চিন্ত চিত্তে ওকে তিন-মাত্রার পার্বণী ধরিয়ে দেওয়া, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

বুঝতেই পারছেন, যুক্তাক্ষর-রহস্যের মীমাংসা যদি আমি সিলেব্‌ল্ ভেঙে করতে যেতুম, তাহলে, প্রসঙ্গত, এসব প্রশ্ন উঠত। শব্দের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি নিয়ে তর্ক বাধত। ধন্ধ দেখা দিত। ছন্দের প্রথম-পড়ুয়াকে সেই ধন্ধ থেকে আমি দূরে রাখতে চেয়েছি। যেভাবে বোঝালে তাঁরা চটপট ধরতে পারবেন, প্রাথমিক ব্যাপারগুলিকে সেইভাবেই তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

বাকিটা আপনারা বোঝান। আপনার ভাষায় 'দিব্যি টগবগিয়ে' আমি চলে গেলুম। কিন্তু যাবার আগে, চৌরাস্তায় ডুগডুগি বাজিয়ে যেসব পড়ুয়া আমি জোগাড় করেছিলুম, আপনাদের ওই ক্লাসঘরের মধ্যেই তাঁদের আমি ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি। এবারে আপনাদের পন্থায় আপনারা তাঁদের গড়েপিটে নিন। আমার পড়ুয়াদের আমি চিনি। তাই হলফ করে বলতে পারি, যে-পন্থাতেই পড়ান, তাঁদের নিয়ে বিন্দুমাত্র বেগ আপনাদের পেতে হবে না।

কবিতার দিকে

ও

অন্যান্য রচনা

ל

কবিতা ও সংস্কৃতি

আমরা যদি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতে পারতুম যে, কোন্ সংস্কৃতির কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ, তাহলে ধরতে পারা যেত, কোন্ কবিতা কোন্ সংস্কৃতির এলাকার মধ্যে পড়ে কিংবা পড়ে না। কিন্তু তেমনভাবে আমরা আঙুল তুলতে পারছি কোথায়? যত সহজে একটা রাষ্ট্র, রাজ্য, জেলা, মহকুমা কিংবা পৌর এলাকার সীমানা আমরা নির্দেশ করতে পারি, সংস্কৃতির সীমানা তত সহজে নির্দেশ করবার জো নেই। দিনের আলো যেরকম নিজের শেষ সীমানার স্পষ্ট কোনও নির্দেশ না-রেখে রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যায়, একটা সংস্কৃতিও ঠিক তেমনভাবেই অন্য সংস্কৃতির মধ্যে গিয়ে মেশে। বস্তুত, না-আলো না-আঁধার গোধূলির এলাকা এক্ষেত্রে আরও বড়ো বলেই ধাঁধাটা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়, এবং একটা সংস্কৃতির শেষ সীমানার পিল্‌পেগুলোকে খুঁজতে খুঁজতে, হঠাৎ একসময়ে আমরা বুঝতে পারি যে, ইতিমধ্যে আমরা আর-একটা সংস্কৃতির ভিতর-মহলে এসে ঢুকে পড়েছি।

তিরিশের এক ইংরেজ কবিও ঠিক এই রকমের একটা ধাঁধার কথা তুলেছিলেন। তবে তাঁর সমস্যার ক্ষেত্রটা ছিল আরও ছোটো। সংস্কৃতির সঙ্গে কবিতার যোগ-সম্পর্ক নয়, তিনি খুঁজছিলেন এক ধরনের কবিতার সঙ্গে আর-এক ধরনের কবিতার যোগসূত্র। তাঁর প্রশ্ন ছিল, ইংরেজি কবিতাকে একটা উদ্যান হিসেবে কল্পনা করে নিয়ে সেই উদ্যানকে কি আমরা ছোটোবড়ো কতকগুলো টুকরোয় ভাগ করে ফেলতে পারি, এবং সেই টুকরোগুলোর চারধারে বেড়া বেঁধে বলতে পারি যে, দ্যাখো, এইটে হচ্ছে ওয়র্ডসওয়র্থের বাগান, আর ওইটে হচ্ছে শেলির? সেই কবি, ডে-লুইস, নিজেই অতঃপর জানাচ্ছেন যে, না, তা আমরা পারি না।

বলা বাহুল্য, কবিতার ক্ষেত্রে যে-বেড়া বাঁধা যায় না, সংস্কৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাকে বাঁধতে যাওয়া আরও হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কেন-না, এক সংস্কৃতি যেখানে অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে যায়, সেই টোয়াইলাইট জোন্ সে-ক্ষেত্রে আরও বড়ো। কথাটা সত্য আমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্পর্কেও। সীমানা-নির্দেশক কোনও পিল্‌পে কিংবা চেকপোস্ট সেখানে আমাদের চোখে পড়ে না। কিংবা

সাইনবোর্ড লটকে কেউ সেখানে আমাদের বলে দেয় না যে, এই তুমি বঙ্গাসংস্কৃতির এলাকা ছাড়িয়ে অন্য সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকছ। তাহলে তার চৌহদ্দি আমরা কীভাবে বুঝে নেব, এবং কীভাবেই-বা নিশ্চিত হয়ে বলব যে, আধুনিক বাংলা কবিতা বলতে যা আমরা বুঝি, তা এই বঙ্গাসংস্কৃতির চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে না?

তবে, বঙ্গাসংস্কৃতির চতুঃসীমার স্পষ্ট কোনও নির্দেশ না-পেলেও, আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গো তার যোগ-সম্পর্ক নিয়ে যে কেন প্রশ্ন ওঠে, সেটা আমরা ঠিকই বুঝতে পারি। প্রশ্ন ওঠবার কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের এই বঙ্গাভূমির সংস্কৃতি সম্পর্কে যে একটা মোটাদাগের ধারণা অনেকে লালন করে থাকেন, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রকৃতিকে তাঁরা চট করে তার সঙ্গো মিলিয়ে নিতে পারেন না। ফলে তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেন, তাঁদের মনের মধ্যে এই নতুন ধাঁচের কবিতা সম্পর্কে নানা সংশয়ের ছায়া পড়তে থাকে, এবং একসময়ে তাঁরা বলেও বসেন যে, আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গো এর কোনও যোগ-সম্পর্ক নেই, এটা নেহাতই বাইরে-থেকে-আমদানি-করা কিংবা উপর-থেকে-চাপিয়ে-দেওয়া উটকো একটা ব্যাপার।

স্বীকার করা ভালো যে, মোটা-দাগের এই ধারণা আসলে মোটা-দাগের কিছু অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ এমন কিছু অনুষ্ঠানের কাছে সে প্রশ্রয় পায়, যার সাংস্কৃতিক কুলপরিচয় নিয়ে তর্কের কোনও অবকাশ নেই, এবং খুব সহজেই যাকে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গীভূত ব্যাপার বলে শনাক্ত করতে পারি। যথা মাঘমণ্ডল কিংবা পৌষপার্বণ। এ যে আমাদের বঙ্গাসংস্কৃতির একেবারে খাসমহলের ব্যাপার, তা নিয়ে কোনও তর্কই কখনও উঠবে না। বলা বাহুল্য, এই রকমের আরও অসংখ্য অনুষ্ঠান আমাদের রয়েছে। কিন্তু শুধু এইসব অনুষ্ঠানকেই যদি আমরা আমাদের সংস্কৃতির একমাত্র অভিজ্ঞান বলে গণ্য করি, এবং শুধু এরই উপরে নির্ভর করে পেতে চাই আমাদের সংস্কৃতির সার্বিক পরিচয়, তা হলে আমাদের অবস্থা হবে সেইসব অন্ধের মতো, যাদের কেউ-বা শুঁড়, কেউ বা লেজ আর কেউ-বা পায়ের উপরে হাত বুলিয়ে হাতির চেহারা আন্দাজ করতে চেয়েছিল। হাতি নামক প্রাণীটির তারা খণ্ড-পরিচয় পেয়েছিল, পূর্ণ-পরিচয় পায়নি। একটু আগে যেসব অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছি, তার মধ্যেও বস্তুত আমাদের সংস্কৃতির একটা খণ্ড-পরিচয় ধরা রয়েছে। এগুলি আমাদের সংস্কৃতির সেই অংশের মধ্যে পড়ে, মূলত যা গ্রামজ সংস্কৃতি কিংবা লোকসংস্কৃতি। এদের যোগ অনেকটাই আঞ্চলিক ধর্মবিধি, সংস্কার কিংবা লোকাচারের সঙ্গো। এবং শুধু এরই উপরে নির্ভর করে যদি আমরা বঙ্গাসংস্কৃতির পরিচয় পাবার চেষ্টা করি, তাহলে তার পূর্ণ পরিচয় আমরা জানতে পারব না।

কার্যত আমরা অনেকে কিন্তু তা-ই করে থাকি। সংস্কৃতির বিচার করতে বসে অতিমাত্রায় নির্ভর করি এইসব আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া কিংবা লক্ষণের উপরে। এবং মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে যেহেতু লোকসংস্কৃতির এলাকাভুক্ত নানা পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার লক্ষণ খুবই ভূরিপরিমাণে ছড়িয়ে আছে, তাই সেই কাব্যকে বিশুদ্ধ বঙ্গীয় সংস্কৃতির ফসল বলে গণ্য করতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। মধ্যযুগ অবসিত হবার পরেও আমাদের কবিতায় এসব লক্ষণ অনেক পরিমাণে থেকে গিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায়। খুবসম্ভব সেই কারণেই গুপ্তকবিকে আমরা খাঁটি বাঙালি কবি বলতে অভ্যস্ত হয়েছি।

গুপ্তকবি খাঁটি বাঙালি কবি ছিলেন হয়তো, কিন্তু খুব বড়ো দরের কবি ছিলেন কি না, সেটা সন্দেহের বিষয়। যা দিয়ে কবিতা লেখা হয়, সেই উপকরণের ঊর্ধ্বে যিনি উঠতে পারেন, তাঁকেই আমরা বড়ো কবি বলি। গুপ্তকবি সে-ক্ষেত্রে তাঁর উপকরণের দ্বারাই শৃঙ্খলিত, তার ঊর্ধ্বে তিনি উঠতে পারেননি। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। 'খাঁটি বাঙালি কবি' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছিলেন, আপাতত সেটাই আমাদের বিচার্য। বঙ্কিম বলেছিলেন, "এখন আর খাঁটি বাঙালি কবি জন্মে না— জন্মিবার জো নাই— জন্মিয়া কাজ নাই।" কথাটার অর্থ কী? আসলে, বঙ্কিম খুব স্পষ্ট করেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সামাজিক যে-পরিবেশ আমাদের কবিতার ক্ষেত্রে তথাকথিত খাঁটি বাঙালিয়ানাকে উৎসাহিত করে, সেই পরিবেশটাই আর নেই। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, এতাবৎকাল যা ছিল মূলত গ্রামমুখী, ফলত লোকসংস্কৃতির নানা লক্ষণের দ্বারা আপাদমস্তক চিহ্নিত, নগরজীবনের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্র স্বতই আরও প্রসারিত হয়েছে, এবং গ্রামীণ চরিত্রের পাশাপাশি তার একটা নাগরিক চরিত্রও গড়ে উঠেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, আমাদের সাহিত্যপ্রয়াস ইতিমধ্যে শহরে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, এবং— সেই কারণে— তার মধ্যে আর গ্রামজ সংস্কৃতির মোটাদাগের লক্ষণগুলোকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, এটাই যে স্বাভাবিক এবং এর জন্য হা-হুতাশ করা যে নিরর্থক, বঙ্কিম তা-ও খুব ভালোই বুঝেছিলেন। নইলে, "পৌষপার্বণে যে একটা সুখ আছে, বৃত্রসংহারে তাহা নাই" এ-কথা জেনেও তিনি বলবেন কেন যে, আমরা 'বৃত্রসংহার'ই চাই, তার বদলে "পৌষপার্বণ চাই না"?

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সেটা এই যে, শহর এদেশে আগেও ছিল। কিন্তু সেই শহর আর বঙ্কিমের সময়কার শহরের চরিত্র এক নয়। বঙ্কিমের শহর তো মধ্য-উনিশ শতকের কলকাতা। গ্রামজ সংস্কৃতির সঙ্গে তার চিত্তের সম্পর্ক নিশ্চয় আগের তুলনায়— ধরা যাক গ্রামজ সংস্কৃতির সঙ্গে শেষ মধ্যযুগীয় কৃষ্ণনগরের চিত্তের যে-সম্পর্ক, সেই তুলনায়— অনেক কমে এসেছিল। এখন

আরও কমেছে। ফলত, যে 'বৃত্রসংহার'কে বঙ্কিম— 'পৌষপার্বণে'র তুলনায়— প্রগত মানসিকতার ফসল বলে মনে করেছিলেন, একালের কলকাতার শিক্ষিত সমাজ তাকেও বিশেষ প্রগত কিংবা প্রাসঙ্গিক ব্যাপার বলে গণ্য করে না। সাহিত্যমাত্রেই তো এক ধরনের উচ্চারণ। 'বৃত্রসংহার'ও তা-ই। কিন্তু যে-ধরনের উচ্চারণ, একালের শিক্ষিত নাগরিক মানুষ তার সঙ্গে কোনও সাযুজ্য অনুভব করে না, ফলে তার দ্বারা তার নান্দনিক ক্ষুধার তৃপ্তি ঘটে না। এই সহজ সত্যটাকে স্বীকার করে নিলেই ধরতে পারা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে বাংলা কবিতা যে একটা ভিন্ন পথে মোড় নেয়, এবং সেইখানেই থেমে না গিয়ে ক্রমেই আরও নূতনতর সম্ভাবনার মধ্যে খুঁজতে থাকে তার মুক্তি, এটা কোনও উটকো আকস্মিক ঘটনা নয়। আসলে আমাদের নাগরিক মানসিকতার ক্রমিক বিবর্তনের মধ্যেই কবিতার এই দিক্-বদলের জমি ক্রমে তৈরি হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অত্যন্ত সহজ সত্যকেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা স্বীকার করি না। এবং আমরা খেয়াল করে দেখি না যে, এরই ফলে আমাদের আচরণে ও উক্তিতে কত পার্থক্য ঘটে যায়। আমরা একদিকে আমাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাড়নায় বৃহৎ-সংসার থেকে সরে গিয়ে ছোটোমাপের সংসার রচনায় প্রবৃত্ত হই, এবং অন্যদিকে একান্নবর্তী পরিবারের জন্য সমানে অশ্রুমোচন করি। আমরা একদিকে বিজলিবাতির সুবিধেটুকু গ্রহণ করতে ছাড়ি না, এবং অন্যদিকে বলি যে, রেড়ির তেলের আলোয় চক্ষু খুবই স্নিগ্ধ থাকে, সুতরাং আমাদের 'বাপ-পিতেমো'রা যে রেড়ির তেলের পিদ্দিম জ্বেলে পড়াশোনা করতেন, সেটাই ছিল ভালো ব্যবস্থা। মেয়েদের যে স্বয়ং-নির্ভর হওয়া দরকার, মনে মনে এইটে বুঝে গিয়ে আমরা এক-দিকে আমাদের কন্যাদের ইশকুল-কলেজে পাঠাই, এবং অন্যদিকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলি, "আর কি এরা আদর করে পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে? আহা, কী কথাই না গুপ্তকবি লিখে গিয়েছেন!" আসলে এসব মায়াকান্না ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যদি সত্যিই বুঝতুম যে, একান্নবর্তী পরিবারই ভাল, রেড়ির তেলের আলোই ভালো এবং স্ত্রীজাতিকে হেঁসেলের মধ্যে আটকে রাখাই ভাল, তা হলে নিশ্চয় একান্নবর্তী পরিবার থেকে আমরা বেরিয়ে আসতুম না, বিজলিবাতিকে আমাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিতুম না এবং বাড়ির মেয়েদের ইশকুল-কলেজে পাঠাতুম না। কিন্তু তাতে আমরা রাজি নই। আমরা একই সঙ্গে বর্তমানের আঁচল ধরে চলব, এবং অতীতের জন্যে মায়াকান্না কাঁদব। ভেবেও দেখব না যে, এটা কত বড়ো ভণ্ডামি।

এই ভণ্ডামি আসলে আমাদের সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই চলেছে। প্রশ্নটা অবশ্য সর্বদা ঠিক ভালো-মন্দেরও নয়। এমনকি প্রয়োজন-অপ্রয়োজনেরও নয়। বরং বলা

যায়, সাযুজ্যবোধের। আমাদের শহুরে শিক্ষিত মানুষদের অনেকেই যে ময়দানে গিয়ে সংস্কৃতি-সম্মেলনের ছাউনির তলায় বসে, দেহতত্ত্বের গান শুনে কিংবা কবির লড়াই দেখে মুগ্ধ হন, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কেন-না, এ তো আমরা জানিই যে, যা একেবারে আহেলা বিদেশি বস্তু, তা-ও অনেকক্ষেত্রে— আর কিছু নয়, শুধু আউটল্যানডিশ বলেই— আমাদের চিত্তে কিছুটা মোহের সঞ্চার করে। দেহতত্ত্ব কিংবা কবির লড়াই তো সে-ক্ষেত্রে আমাদের ঘরেরই জিনিস, সুতরাং তার সান্নিধ্যে এসে কেউ মুগ্ধ হলে আমরা বিস্মিত হব কেন। কিন্তু শহুরে শিক্ষিত মানুষরা যখন নিতান্ত মুগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত হন না, উপরন্তু বলেন যে, ওরই মধ্যে তাঁদের চিত্তের মুক্তি, তখন একটু ধাঁধা লাগে বইকি। তার কারণ, যে-পরিবেশে তাঁরা লালিত হয়েছেন ও যে-ধরনের শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন, তাতে তাঁদের চিত্তবৃত্তি আরও সূক্ষ্ম ও জটিল হবার কথা, এবং— সেই কারণেই— লোকসংস্কৃতির ওই দুই নিদর্শনের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ সাযুজ্যবোধ করবার কথা নয়। বস্তুত তাঁদের অনেক বেশি আত্মীয়তা বোধ করবার কথা আরও সূক্ষ্ম এবং আরও জটিল গান কিংবা কবিতার সান্নিধ্যে এসে।

হতে পারে যে, সত্যিই তাঁদের একাংশ তা করেন না। সে-ক্ষেত্রে সন্দেহ স্বাভাবিক যে, যদিও তাঁরা শহুরে সংস্কৃতির কোলে বর্ধিত হয়েছেন, তবু নাগরিক পরিবেশ ও শিক্ষার সূক্ষ্মতা ও জটিলতা তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। (সেটা যে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার, তা-ও নয়। বস্তুত, আজন্ম শহরে কাটিয়েও চলনে-বলনে আমৃত্যু এক ধরনের গ্রাম্য সারল্য বজায় রেখে যান, এমন মানুষও এই কলকাতায় অনেক চোখে পড়বে।) অন্যদিকে, সূক্ষ্মতা ও জটিলতার মধ্যে যাঁরা আদৌ অস্বস্তি বোধ করেন না, এবং চরিত্রে ও মেজাজে যাঁরা সর্বৈব আর্বান্, বৈঠকখানায় বাঁকুড়ার ধর্মঠাকুরের ঘোড়া কিংবা পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের মুখোশ সাজিয়ে তাঁরা যখন আধুনিক বাংলা কবিতার আদ্যশ্রাদ্ধ করেন, এবং ঘোষণা করেন যে, এই কবিতা আমাদের সংস্কৃতির বহির্ভূত একটা ব্যাপার, ফলত এতে আমাদের নান্দনিক ক্ষুধার তৃপ্তি নেই, তখন তাঁদের ভণ্ড না-বলে কোনও গত্যন্তর থাকে না।

ভণ্ডামির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মূর্খতা। ভণ্ডেরা সব জেনেশুনেও যে অতীতের জয়ধ্বনি দেয়, তার কারণ, তারা জানে যে, তাতেই হাততালি মিলবার সম্ভাবনা। সেকেলে ছায়াছবিতে দূরবাসী স্বামীকে যে-কারণে একটু শিথিল-চরিত্রের মানুষ হিসেবে দেখানো হত, এবং মদিরাক্ষী মায়াবিনীর খপ্পর থেকে যে-কারণে তাকে আবার সাধ্বী রমণীর কাছে ফিরিয়ে আনা হত, কিংবা শ্রমিকের প্রণয়িনী নায়িকার শিল্পপতি-পিতাকে দিয়ে যে-কারণে অতি উদাত্ত কণ্ঠে বলানো হত, "ভাইসব, এই

কারখানা আমি তোমাদের নামেই লিখে দিলুম", একেলে নাগরিক মজলিশেও ঠিক সেই একই কারণে অনেকসময়ে সেকেলে ধাঁচের কবিতার জন্য অশ্রুমোচন করা হয়। এ আর কিছুই নয়, নিছক ক্ল্যাপট্র্যাপের ব্যাপার।

আর মুর্খেরা সে-ক্ষেত্রে জানেও না যে, জীবন্ত যে-কোনও সংস্কৃতির সীমারেখা কীভাবে দিনে দিনে, আমাদের দৃষ্টির অগোচরে, দূর থেকে আরও দূরে সরে যেতে থাকে। একটি জীবন্ত ভাষা যেভাবে অন্য ভাষার শব্দ আত্মসাৎ করে, একটি জীবন্ত সংস্কৃতিও ঠিক তেমনভাবেই রচনা করে তার নবীনতর প্রয়াসের ক্ষেত্র, কিংবা হাত বাড়িয়ে দেয় অন্যবিধ প্রবণতার দিকে, এবং এইভাবেই ক্রমে বাড়িয়ে নেয় তার সীমানা। এই যে জীবন্ততা, এরই দিকে আঙুল তুলেছিলেন এক বাঙালি কবি। সংস্কৃতি-বিষয়ক এক বিতর্ক-বৈঠকে রহস্যচ্ছলে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, বঙ্গসংস্কৃতি বলতে কি আমরা এমন এক অট্টালিকার কথা বুঝব, যার নির্মাণকার্য আজ থেকে অনেককাল আগেই সমাপ্ত হয়ে গেছে, এবং যাতে আর এখন নতুন করে কিছু জানলা-দরজা ফোটাবার কিংবা যার ঘরের সংখ্যা কিছু বাড়িয়ে নেবার কোনও উপায়ই আর নেই?

না, তা আমরা বুঝি না। বঙ্গসংস্কৃতি যদি শুধু জারি সারি, আউল বাউল, পালপার্বণ, আলপনা আর পাঁচালির মধ্যেই আটকে থাকত, তাহলে বুঝতে হত যে, এর প্রাণশক্তি কবেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা হয়নি বলেই তার পরিসর এখন আগের তুলনায় অনেক বড়ো। একদিকে সে যেমন গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়েছে তার রাজ্যপাট, অন্যদিকে তেমনই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে মাইকেল কি হেম নবীন পর্যন্ত এসেই তার দম ফুরিয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ, সবকিছুকেই সে অক্লেশে আত্মসাৎ করতে পেরেছে। আরও পারবে। শহরে বসে চণ্ডীমণ্ডপের জন্য যিনি যতই হা-হুতাশ করুন, বঙ্গসংস্কৃতির অগ্রগতি তাতে আটকে থাকবে না।

চৈত্র, ১৩৮১

কবিতার দিকে

প্রথম কবিতা কবে, কোথায়, কীভাবে লিখি, এখন আর তা স্পষ্ট করে মনে পড়ে না। আমার বয়স যখন বছর ছয়েক, তখন একবার দিদির উপরে রাগ করে 'বাড়ি'র সঙ্গে 'আড়ি' দিয়ে একটা ছড়া বেঁধেছিলুম, সেই কি আমার প্রথম কবিতা? নাকি, তারও আগে, বড়ো ককিমাকে যখন একদিন বলেছিলুম, 'রাত হল, ভাত দাও', এবং যা নিয়ে আমাদের বাড়িতে সেদিন তুমুল হাসাহাসি হয়, তখন, নিতান্ত ওই এক লাইনের ভিতর দিয়েই কি কবিতার রহস্য আমার বুকের মধ্যে তার প্রথম ধাক্কা লাগায়? কী জানি। এসব অনেক দূরের ব্যাপার, বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে ঝাপসা হয়ে গেছে। বৃষ্টি যেমন দূরের দৃশ্যকে ঝাপসা করে দেয়, সেইরকম।

তবু, সেই অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যেই, খুব কালো, খুব রোগা ও খুব একলা একটি বালক, কখনও-কখনও, আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। পড়াশোনায় তার মন নেই, খেলাধুলোয় সে অপটু, কোনও-কিছুতেই তার সমবয়সিদের সঙ্গে সে ঠিক এঁটে উঠতে পারে না, এবং— খুবসম্ভব সেই কারণেই— তার মুখের উপরে সর্বদা একটি ভয়ের ছায়া লগ্ন হয়ে থাকে। চোখদুটি এমনিতেই খুব বড়ো, মুখখানা অত্যধিক শীর্ণ হবার দরুন আরও বড়ো দেখায়। সারাটা দিন সে নিজের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে নতমুখে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ায়, তারপর সন্ধে হতে-না-হতেই কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। লণ্ঠন হাতে নিয়ে, অন্ধকার ঘরগুলিকে আলোর মুখ দেখাতে-দেখাতে, ঠাকুমা একসময়ে তার তক্তাপোশের পাশে এসে থমকে দাঁড়ান, তারপর করতলের উলটো পিঠ দিয়ে তার কপাল ছুঁয়ে— যেন খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনার কথা জানিয়ে দিচ্ছেন, এইভাবে— বলেন, "ও বড়োবউমা, তোমার ছেলের দেখছি আজও আবার জ্বর এল।"

কবে, কোথায়, কীভাবে সেই ছেলেটি তার প্রথম কবিতা লিখেছিল, আমার মনে নেই। কিন্তু কেন লিখেছিল, আমি জানি। বস্তুত, যে-কারণে তাকে শব্দে-শব্দে মিল লাগাতে হত, আমাকেও সেই একই কারণে কবিতা লিখতে হয়। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কথা বলা। গদ্যেও নিশ্চয় বলা যেত। কিন্তু, স্বীকার করা ভালো, বাল্যবয়সেই এই একটা ব্যাপার আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম যে, গদ্য আমার 'মাতৃভাষা' নয়। সুতরাং কবিতা।

কবিতায় আমি কথা বলি। কিন্তু কার সঙ্গে এই কথা বলা? শুধুই নিজের সঙ্গে? এমন কথা কেমন করে বলি? অনেককাল ধরে এই তত্ত্ব অবশ্য আমরা শুনে আসছি যে, কবিরা তাঁদের নিজেদেরই সঙ্গে কথা বলেন, আর, আড়ি পেতে, অন্যেরা সেই স্বগতোক্তি শোনেন মাত্র। কবিতার এই ব্যাখ্যাটা যে বেশ কাব্যিক, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু, কিংবা হয়তো সেইজন্যই, আমার বিশেষ মনঃপূত নয়। পক্ষান্তরে আমার ধারণা, কবিরা যদি শুধু নিজেদের উদ্দেশেই কবিতা লিখতেন, তাহলে সেই কবিতাগুলি লিপিবদ্ধ হবামাত্র তাঁদের কাজ ফুরোত, এবং— তাঁদের কাজ যেহেতু তন্মুহূর্তেই ফুরিয়েছে,— তাই— হয় সেই কবিতাগুলিকে তাঁরা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিতেন, আর নয়তো বাক্সে বন্দি করে রাখতেন, কষ্ট করে আর সেগুলিকে তাঁরা ছাপতে দিতেন না।

কিন্তু আমরা কবিতাগুলিকে বাতাসে উড়িয়ে দিই না, বাক্স-প্যাঁটরায় বন্দি করেও রাখি না। আমরা সেগুলি ছাপতে দিই।

কেন দিই? লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করাই শ্রেয় যে, আরও কিছু মানুষ সেগুলি পড়বেন, এই প্রত্যাশা আমাদের থাকেই। 'পাঠক' নামক মানুষটিকে তাহলে আর এড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। পাঠক, অর্থাৎ অন্য মানুষ। ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল? কবিতা লিখে একদিকে আমরা নিজেদের সঙ্গে কথা বলছি, আবার অন্যদিকে— সেই কবিতারই মাধ্যমে— চাইছি অন্য কিছু মানুষের কাছে পৌঁছোতে। কবিতা অবশ্যই কথা বলবার ব্যাপার। কিন্তু কার সঙ্গে, এই প্রশ্ন যদি কেউ করেন, তাহলে, যে যা-ই বলুক, আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, নেহাতই নিজের সঙ্গে নয়, অন্যদের সঙ্গেও।

বস্তুত, এই স্বীকৃতি যে খুব লজ্জাকর, এমনও আমার মনে হয় না। বরং কবিতার মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে কথা বলবার, অর্থাৎ আমার কথাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার, এই ইচ্ছা ও প্রয়াসকে খুবই সংগত ও স্বাভাবিক মনে হয়। যাঁরা আমার প্রিয় কবি, তাঁদের অনেকেই এইভাবে নিজের কথাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাঁদের কবিতাই তার সাক্ষ্য দেয়। আমার সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এইখানে যে, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁদের উক্তিকে তাঁরা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারেন। আমি পারি না। যেটা আমার বলবার কথা, তাকে ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারি না; শব্দগুলিকে টানটান করে বাঁধতে পারি না; একটা টেনশন তৈরি করে তুলতে পারি না; উচ্চারণে দোষ থেকে যায়। আমারই অক্ষমতা। যার জন্য খুব বেদনা বোধ করি।

রুগ্‌ণ ও নিঃসঙ্গ সেই বালকের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ছন্দের রহস্য যখন প্রথম তার কাছে উন্মোচিত হয়, তখন তার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তার মনে হয়েছিল,

এতকাল সে অন্যের ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করেছে, তাই স্পষ্ট করে সব বুঝিয়ে বলতে পারেনি। এইবার সে নিজস্ব ভাষায় কথা বলবে।

তার এমনও মনে হয়েছিল যে, ভীষণ ধারালো একটা অস্ত্রকে সে হাতে পেয়েছে। সেই অস্ত্রটিকে সর্বদা সে গোপন করে রাখত। তার পরিপার্শ্বকে এতকাল সে ভয় পেয়েছে। কিন্তু তখন আর তার লেশমাত্র ভয় নেই। সর্বব্যাপারে তার অপটুতায় এতকাল সে লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু তখন আর তার লেশমাত্র লজ্জা নেই। তার মনে হয়েছিল, অন্তত একটা ব্যাপারে সে তার চেনাজানা সকলের চাইতেই অনেক বেশি ক্ষমতাবান। টেরাকোটা যেমন নিতান্ত নিরেট একতাল মাটির ভিতর থেকে, প্রায় দৈববলে, বার করে আনে আশ্চর্য সব পুতুল কিংবা প্রতিমা, সে-ও তেমনই আপাত-নির্বোধ কতকগুলি শব্দের ভিতর থেকে আশ্চর্য সব আনন্দ ও যন্ত্রণাকে তৈরি করে তুলতে পারে। শব্দকে সে করুণ কিংবা আনন্দিত গানের মতো বাজাতে পারে। শব্দকে সে শায়কের মতো নিক্ষেপ করতে পারে, যা তার পরিচিত আর কেউ পারে না।

কিন্তু সেই ক্ষমতার কথা সে সহসা কাউকে জানতে দিতে চায়নি। সমস্ত ব্যঙ্গ, সমস্ত বিদ্রুপের উত্তরে সে তখন মনে-মনে হাসত। বাইরে তখনও সে অসহায়তার ভান করত; কিন্তু মনে-মনে প্রত্যেকের উদ্দেশে বলত, "এখনও তুমি বুঝতে পারনি যে, কী ভীষণ অস্ত্র আমার হাতে। একদিন এই অস্ত্র দিয়ে সবকিছু আমি তছনছ করে দেব।"

বলা বাহুল্য, সেই অবোধ বালকের জন্য আজ আমার খুব দুঃখ হয়। ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে সে অস্ত্র বলে জেনেছিল, যা দিয়ে বিশ্বপৃথিবীকে শাসন করা যায়। প্রেমিককে যা সিংহাসনে বসাতে পারে, এবং সম্রাটকে বলতে পারে, "দূরে যাও।" সেই অস্ত্রকে সে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে। আমি তাকে প্রত্যহ আমার চোখের সামনে তুলে আনি। এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাকে নিরীক্ষণ করি। কিন্তু কোনওকালেই যে সেই অস্ত্রখানি বিশেষ ধারালো ছিল, এমন আমার মনে হয় না।

২

অথচ এখনই অস্ত্র পরিহার কী করে করব?

এখনও আমার অনেক কথাই বলা হয়নি। সুতরাং দ্বিতীয় কোনও ভাষা যখন আমার নেই, তখন কবিতার এই ভাষাকেই এখনও অনেক দিন আমি উচ্চারণ করে যাব। তবে, একইসঙ্গে চেষ্টা করব, তাকে— আমার পক্ষে যতটা সম্ভব— দীপ্ত করে তুলতে।

এখনও অনেক যুদ্ধ পড়ে আছে। সুতরাং, যতই অক্ষম হোক, এই অস্ত্রকে আমি পরিহার করতে পারব না। দ্বিতীয় কোনও অস্ত্র যখন আমার নেই, তখন তাকেই

আমি রক্ষা করব। সেইসঙ্গে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করব, তাকে— আমার পক্ষে যতটা সম্ভব— শানিত করে তুলতে।

প্রায় একইসঙ্গে আমরা ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছিলুম। আমি, অরুণকুমার সরকার ও নরেশ গুহ। নরেশ দীর্ঘকাল কবিতা লেখেনি, অরুণের লেখাও ইদানীং আর দেখতে পাই না। প্রশ্ন জাগে, নরেশ কেন নির্বাক? অরুণ কেন অদৃশ্য? তাদের কি আর বলবার মতো কোনও কথা নেই? কিংবা, করবার মতো কোনও যুদ্ধ? বিশ্বাস হয় না। বরং আমার ভাবতে ভালো লাগে যে, বছর কয়েকের জন্য আড়ালে সরে গিয়ে তারা তাদের ভাষাকে আরও ঝকঝকে করে তুলছে, তাদের অস্ত্রকে আরও ধারালো। ভাবতে ভালো লাগে যে, অলক্ষ্য সেই প্রস্তুতির পালা সাঙ্গ হবামাত্র তারা আবার আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়াবে।

আমি কখনও আড়ালে গেলুম না। সর্বদা আমি সর্বজনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমার সীমাহীন অক্ষমতা নিয়ে। তাতে আমার লজ্জা নেই। কেন-না, কে জানে, এই অক্ষমতাই হয়তো আমার নিয়তি। উপরন্তু যাদের উদ্দেশে আমি কথা বলতে চাই, তাদের সকলকেই আমি আমার আত্মীয় বলে জেনেছি। সুতরাং, তাদের কাছেই বা আমার লজ্জা কীসের? আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চেয়েছি, তোমরা আমার প্রতিটি ব্যর্থতার সাক্ষী রইলে। বলতে চেয়েছি, এই ব্যর্থতার সঙ্গে সংগ্রামের শেষে, রক্তাক্ত শরীরে, টলতে-টলতে যখন আমি মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হব, তখনও তোমরাই সাক্ষী থাকবে। বলেছি, তোমাদের শ্রুতি ও চক্ষু থেকে কিছুই আমি গোপন করিনি। আমার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত প্রতিটি আর্তি তোমরা শুনেছ। নির্বুদ্ধি এক বালকের কাছ থেকে পাওয়া, জং-ধরা, এই অস্ত্রখানির প্রতিটি অক্ষম আস্ফালন তোমরা দেখেছ। আমি আমার প্রতিটি ভুল উচ্চারণ তোমাদের শুনতে দিচ্ছি। আমি আমার রণকৌশলের প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রস্তুতি তোমাদের দেখতে দিচ্ছি।

কবে আমার উচ্চারণ নির্ভুল হবে? আদৌ হবে কি? কবে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠব? আদৌ উঠব কি? এখনও আমি জানি না।

আমি শুধু এইটুকুই জানি যে, এক বালকের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি তাকে কথা দিয়েছিলুম যে, তার ভাষা একদিন শুদ্ধ হবে। তার অস্ত্র একদিন সূর্যালোকে ঝকঝক করে উঠবে।

৩

এই পর্যন্ত যা লিখেছি, তার থেকে এমন কথা স্বতই সকলের মনে হতে পারে যে, আমার সব কবিতাই সজ্ঞানে লেখা। আমি নিজেও এককালে তা-ই ভাবতুম। বস্তুত, বন্ধুমহলে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেও বেড়াতুম যে, আমি পরিতে-পাওয়া মানুষ নই; যা- কিছু লিখি, ষোলো আনা জাগ্রত অবস্থায় ভেবে-চিন্তে লিখি।

কিন্তু পরে একসময়ে বুঝতে পারি যে, কথাটা সত্যি নয়। বুঝতে পারি যে, আমার কবিতা অনেকক্ষেত্রে, আমারই অজান্তে, অন্য পথে মোড় নেয়। রাস্তা পালটে যায়; লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটে; এক-ঠিকানায় যাব বলে যাত্রা শুরু করি, তারপর যাত্রাশেষে বুঝতে পারি যে, আর-এক ঠিকানায় এসে পৌঁছেছি। তা ছাড়া, কবিতা লেখা শেষ হয়ে যাবার পরে, অনেকক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, এমন অনেক শব্দ এসে তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, যাদের প্রবেশ আমার প্রত্যাশিত ছিল না।

দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বাতাসী'র উল্লেখ করতে পারি; বছর সাতেক আগে এই কবিতা আমি লিখেছিলুম। কীভাবে এটি লেখা হয়েছিল, এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

আমার প্রায় সব কবিতার নীচেই তারিখ দেওয়া থাকে। এটির তারিখ দেখতে পাচ্ছি ২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭১। কিন্তু তারিখ না-থাকলেও কিছু ক্ষতি ছিল না। মনে আছে, তখন শেষ-হেমন্ত। রাত প্রায় আটটা-নটা হবে। বাতাসে অল্প-অল্প শীতের আমেজ। ধোঁয়ার সঙ্গে মিশেছে কুয়াশা; কলকাতার রাস্তা বেশ-একটা রহস্যময় রূপ পেয়েছে। তেত্রিশ নম্বর বাসে আমি দক্ষিণ-কলকাতা থেকে শ্যামবাজারের দিকে আসছিলুম। এই বাসটা পার্ক সার্কাসের দক্ষিণে এমন একটা রাস্তা দিয়ে আসে, যার পুব দিকে আছে বস্তি এলাকা। বাসের দোতলায়, ডান দিকে, জানলার ধারে আমি বসেছিলুম। সেইসময়ে একটা ব্যাপার ঘটে। জানলা থেকেই আমি দেখতে পাই যে, বাবরি-চুল, মিশকালো, যণ্ডামতন একটি লোক অকস্মাৎ একটা বস্তিবাড়ির ভিতর থেকে 'বাতাসী বাতাসী' বলে চিৎকার করতে-করতে ছুটে বেরিয়ে এল, এবং রাস্তার উপরে এক মুহূর্ত বিভ্রান্ত দাঁড়িয়ে থেকেই আবার ছুটতে-ছুটতে পাশের আর-একটা বস্তিবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কী যে ছিল তার ওই চিৎকারে, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আমি জানি না, বাতাসী তার কে। স্ত্রী, না প্রণয়িনী, না রক্ষিতা। আমি জানি না, পরিপার্শ্বের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, বাতাসীকে অমন আর্তগলায় সে ডাকছিল কেন। সে কি তার পায়ের পাতার উপর মাথা রেখে উন্মাদের মতো মুখ ঘষতে চায়? নাকি চায় তাকে খুন করতে? কিছুই আমি জানি না। আমি শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছিলুম যে, বাতাসী নাম্নী এক রমণীই তার সর্বস্ব।

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, ওই চিৎকার শুনবার পর থেকে সারাটা পথ আমি এক অবর্ণনীয় অস্বস্তির মধ্যে ছিলুম। মনে আছে, সেই রাত্রে বাড়ি ফিরেই আমি 'বাতাসী' কবিতাটি লিখে ফেলি।

লিখবার পরে আমার খেয়াল হয় যে, ঘটনাটা যদিও আমি বাসের জানলা থেকে দেখেছিলুম, কিন্তু কবিতায় অন্য কথা লিখেছি। সেখানে আমি জানাচ্ছি : "ধাবিত

ট্রেনের থেকে এই দৃশ্য চকিতে দেখলুম।" ইচ্ছে করে, জ্ঞাতসারে, বাসকে ট্রেন বানাইনি; আমার অজ্ঞাতসারে, সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে, বাস ট্রেন হয়ে গেছে।

কেন হল? কারণটা কি এই যে, বাস নামক যানটির সেই রহস্য নেই, যা হয়তো রেলগাড়ির আছে, এবং যেহেতু এই কবিতা একটি রহস্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তাই রেলগাড়িই তার, এই কবিতার, মনঃপূত? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে-খুঁজতে আরও খানিকটা এগোনো যায়। বলা যায়, বাস থেকে নেমে আমরা রহস্যের তদন্ত করতে পারি, কিন্তু রেলগাড়ি থেকে যত্রতত্র নামতে পারি না। রেলগাড়ির জানলা-থেকে-দেখা রহস্য তাই রহস্যই থেকে যায়, তার কোনও কিনারা হয় না। হতে পারে, মনে-মনে আমিও চাইনি যে, বাতাসী-রহস্যের কোনও কিনারা হোক। হতে পারে, সেই জন্যেই আমি— কবিতায়— বাসের বদলে ট্রেনে উঠেছি। বাস্তবে যা আমি বাসের জানলা থেকে দেখেছিলুম, কবিতায় তাকে দেখতে চাইছি ট্রেনের জানলা থেকে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? বাস্তবের সত্য আর কবিতার সত্য কি দুটো ভিন্ন ব্যাপার? আমি জানি না। আমি শুধু এইটুকুই জানি যে, যা বলব বলে কবিতা লিখতে বসি, অনেকক্ষেত্রেই তা বলা হয় না। কবিতা আমাকে দিয়ে অন্য কথা বলিয়ে নেয়। কবিতা, নাকি আমারই নেপথ্যবর্তী আমি? অর্থাৎ, এমন-কিছু গূঢ়েষা, যার চেহারা ও চরিত্র আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। কিছুদিন ধরেই এই প্রশ্নটা আমাকে ভাবাচ্ছে। আমার বর্মচর্ম খসে পড়ছে। আমি নম্র হতে শিখছি।

৪

কবিতা বলতে এককালে এক স্বপ্নরাজ্য আমার চোখে ভাসত। এখন আর ভাসে না। দাম্ভিক-গলায় এককালে সবাইকে বলতে ইচ্ছে করত, "এসো, আমার হাত ধরো, সেই স্বপ্নলোকে আমি তোমাদের পৌঁছে দেব।" অর্বাচীন সেই ইচ্ছা কবেই বিদায় নিয়েছে। পঁয়তিরিশে পৌঁছবার আগেই বুঝতে পারি, কবিতা কোনও দূর-জগতের ব্যাপার নয়, ফলত সেখানে কাউকে পৌঁছে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। বুঝতে পারি, কবিতার যাবতীয় উপাদান আমাদের চতুর্দিকেই ছড়িয়ে আছে। দরকার শুধু চিত্তে ঈষৎ বেদনা অথবা চক্ষুতে ঈষৎ কৌতূক নিয়ে তাদের দিকে তাকানো। দরকার শুধু তাৎক্ষণিক অর্থের অতিরিক্ত কোনও অর্থ তাদের মধ্যে খুঁজে নেওয়া। আমি কি কোনও নতুন ফুল, কিংবা নতুন পাখি, কিংবা নতুন মানুষ কাউকে দেখাতে পারি? তা নিশ্চয় পারি না। কিন্তু চেষ্টা করতে পারি, পুরোনো ফুল, পুরোনো পাখি আর পুরোনো মানুষকেই অন্য চেহারায় দেখাতে। চেষ্টা করতে পারি, তাদের অস্তিত্ব, আন্দোলন ও উন্মোচনের একটি অন্যতর তাৎপর্য খুঁজে নিতে। আমার চিত্তে যখন বেদনা, তখন কলকাতার এক নিরন্ন, উলঙ্গ

ভিখারিশিশুকে আমি বেথেলহেমের জ্যোতির্ময় জাতক হিসাবে দেখতে পারি, এবং চৌরঙ্গির রাস্তায় তার টালমাটাল পদক্ষেপ দেখে ভাবতে পারি যে, সে বিশ্বজয়ে বেরিয়েছে। অন্য দিকে, আমার দৃষ্টিতে যখন কৌতুক, শহর-কলকাতার 'এনামেল-করা' মুখশ্রী তখন নিমেষে অর্থহীন হয়ে যায়; নিয়নে-টেলিফোনে সাজানো, কংক্রিটে-বাঁধানো এই কলকাতার মধ্যেই তখন অষ্টাদশ শতকের অন্ধকার রাত্রি এসে হানা দেয়। অতীত ও বর্তমান তখন একাকার হয়ে যায় আমার চোখে। বাঙ্গুর অ্যাভিনিউয়ের আধুনিক নানা নির্মাণের মধ্যে তখন কৃষ্ণপুর মৌজার হোগলাবনের দিনগুলিকে আমি ফিরে আসতে দেখি। আমার মনে হয়, সারারাত্রি আমরা লগি ঠেলেছি বটে, কিন্তু নৌকো আসলে অদৃশ্য এক শেকল দিয়ে ঘাটের সঙ্গেই বাঁধা ছিল। তখন আমি না-হেসে পারি না।

অসংগতি আর কনট্রাডিক্‌শন থেকেই তো কৌতুকের জন্ম। মফস্‌সলের কাঁচা রাস্তায় গোরুর গাড়ি চলেছে, এই দৃশ্যের মধ্যে কোনও কনট্রাডিক্‌শন নেই। রানওয়ের উপরে এরোপ্লেন নামছে, এই দৃশ্যের মধ্যেও না। কিন্তু অল্প কিছুকাল আগে, কলকাতা থেকে মধ্যমগ্রামের দিকে যেতে যেতে, যখন আমি দেখতে পাই যে, দমদম বিমানবন্দরের রানওয়ের নির্মীয়মাণ নতুন অংশের উপরে একটি গোরুর গাড়ি থেকে ইট নামানো হচ্ছে, তখন আমি কৌতুক বোধ না করে পারিনি। রানওয়ের উপরে গোরুর গাড়ি— ব্যাপারটাকে আমার মস্ত একটা কনট্রাডিক্‌শন বলে মনে হয়েছিল।

এই কনট্রাডিক্‌শনকেই পুনশ্চ প্রত্যক্ষ করলুম সত্তরের সেপটেম্বরে। দেখলুম দিনকয়েকের তুমুল বর্ষণে শহরতলি জলমগ্ন। দেখলুম, স্ট্রিটল্যাম্পগুলি দিব্যি আলো দিচ্ছে। কিন্তু সেই আলোর তলায়— পথের উপরে— এক-মানুষ জল। দেখলুম, পিচ-বাঁধানো যে-রাস্তা দিয়ে শহুরে বাবুমশায়দের মোটর ছুটবার কথা, তার উপরে নৌকো চলছে। না হেসে থাকা যায়?

পুব-বাংলার নাবাল অঞ্চলে আমার জন্ম। বন্যা আমার কাছে নতুন ব্যাপার নয়। প্রায় প্রতিটি বড়ো বর্ষাতেই আমাদের খেতখামার তো বটেই, ঘর-দুয়ারও জলে ভাসত; সাঁকো না বেয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার উপায় থাকত না। আমার এক জ্যাঠতুতো ভাইকে সেই প্লাবনের দিনেই আমরা হারিয়েছিলুম। পাঁচ বছরের অসুস্থ দুর্বল বালক, সাঁতার জানত না, সকলের অলক্ষ্যে দাওয়া থেকে সে উঠোনে পড়ে তলিয়ে যায়, জীবিত অবস্থায় তাকে আর ফিরে পাওয়া গেল না। ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলুম আমরা। শোকে-দুঃখে জ্যাঠাইমা প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যে পরিবেশ আর সেই যে সংকট, তার মধ্যে যে কোনও কনট্রাডিক্‌শন আছে, এমন কথা আমাদের কখনও মনে হয়নি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুঝবার মতো কোনও

প্রস্তুতিই তো আমাদের ছিল না। তাই সংকটই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রকৃতির কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করেছিলুম। আমরা ধরেই নিয়েছিলুম যে, এইরকমই হবে, এইরকমই হয়।

কিন্তু কলকাতার সম্পর্কে আর তেমন কথা ভাবা গেল কই? কনট্রাডিক্‌শন এক্ষেত্রে এতই প্রকট যে, নিতান্ত গবেট কিছু পৌরপিতা আর আপাদমস্তক আকাট কিছু আমলা ছাড়া সকলের চোখেই তা ধরা পড়বে। আমার চোখেও পড়েছিল। খুব-একটা যে বিপদে পড়েছিলুম তা নয়। মাসখানেকের জন্য একটু অসুবিধে ঘটেছিল, এই মাত্র। তা-ও মারাত্মক কোনও অসুবিধে নয়। রাস্তার উপরে এক-মানুষ ও ঘরের মধ্যে এক-হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেলে, রেস্‌কুবোটের জন্যে দিন তিনেক ব্যর্থ-প্রতীক্ষায় কাটিয়ে তারপর অসুস্থ শিশুকন্যাকে ভেলায় করে ডাক্তারখানায় পাঠাতে হলে, কলের জলের বদলে বৃষ্টির জলে তেষ্টা মেটাতে হলে, শয়নকক্ষের মধ্যে দু-একটা ঢোঁড়াসাপ ঢুকে পড়লে, এবং জল থেকে সেই সাপগুলি ক্রমাগত বিছানার উপরে উঠে আসবার চেষ্টা করতে থাকলে যে-কোনও মানুষের যেটুকু অসুবিধে হয়, তার চাইতে বেশি অসুবিধের মধ্যে নিশ্চয় পড়িনি। উপরন্তু, ব্যাপারটার মধ্যে এক্ষেত্রে একটা কনট্রাডিক্‌শন ছিল বলেই, যৎসামান্য সেই অসুবিধের মধ্যেই যে আমি প্রচণ্ড কৌতুক বোধ করেছিলুম, তা-ও অস্বীকার করতে পারি না। জলের তোড়ে ঘরের মধ্যে ভেসে-আসা কচুরিপানার ফুলগুলিকে খুব যত্ন করে ফ্লাওয়ার ভাসে সাজিয়ে রাখতে-রাখতে সহসা আমার মনে হয়েছিল যে, জোব চার্নক কিংবা তাঁরও আগের কলকাতা যেন ডুবসাঁতারে সময়-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই বিশ শতকের কলকাতায় এসে হানা দিয়েছে। ফিরে এসেছে সুতোনুটি আর গোবিন্দপুর। ফিরে এসেছে সেই ডিঙি-ভাঙার খাল, একদা যেখানে জাহাজডুবি হয়েছিল।

রাস্তার উপরে ঢেউ তুলে খলখল করে ছুটে যাচ্ছে জলস্রোত। জলের উপরে পড়েছে নিয়নবাতির প্রতিবিম্ব। দিব্যি একটা সাইকেডেলিক ছবির মতো দেখাচ্ছে। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বলেছিলুম, "কলকাতা, ব্রণবিধ্বস্ত মুখের উপরে পাউডার বুলিয়ে তুমি তোমার জলা-জঙ্গালের দিনগুলিকে ভুলতে চেয়েছিলে; এবারে তোমার আচ্ছারকম শিক্ষা হল!"

এই যে কনট্রাডিক্‌শন, এরই থেকে জন্ম নিয়েছিল 'হ্যালো দমদম' কবিতা। নিজেকে নিয়ে অল্প একটু মজা করেছিলুম, এই আর কী!

৫

এইভাবেই এক-একটা কবিতা লেখা হয়ে যেতে থাকে। কখনও সে বেদনা থেকে জন্ম নেয়। কখনও কৌতুক থেকে। কখনও পিছনে তাকাই। কখনও সামনে।

কখনও রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে, তারপর রাস্তার ধারে কোনও গাড়িবারান্দার নীচে খানিকক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। কখনও বাস কিংবা ট্রাম থেকে রাস্তায় নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাই। কখনও পুরোনো-কলকাতার অচেনা কোনও গলির মধ্যে ঢুকে, কী জানি কেন, মনে হয়, আগেও যেন এই গলিতে একবার এসেছিলুম। কখনও আজন্ম-পরিচিত মানুষদেরও অচেনা ঠেকতে থাকে। কখনও হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টির পরে দেখতে পাই যে, পিচের রাস্তা থেকে অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে। কখনও লক্ষ করি, সামান্য একটা প্রশ্নের আঘাতে বন্ধুবান্ধবদের মুখের চেহারা কীভাবে পালটে যায়। কানে বাজে হাজার মানুষের কথা। চোখে ভাসে হাজার মানুষের মুখ। আর এই সমস্ত-কিছুর থেকেই জন্ম নেয় কবিতা।

দৃশ্যাবলি নিত্য-নিয়ত পালটে যাচ্ছে। কিন্তু ছেলেবেলায় সেই যে একবার অন্ধকার মাঠের মধ্যে পথ হারিয়ে, তারপর হঠাৎ একসময়ে বাড়ির নিশানা খুঁজে পেয়েছিলুম,— দেখতে পেয়েছিলুম, লণ্ঠন-হাতে ঠাকুমা এসে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তার চাইতে শুদ্ধ কোনও দৃশ্য কি আর কখনও দেখা হবে?

ত্রিকূট পাহাড় থেকে নামতে-নামতে বাবাকে যখন জড়িয়ে ধরি, স্থির ও শান্ত গলায় তিনি তখন বলেছিলেন, "ভয় পেতে নেই।" তার চাইতে পবিত্র কোনও উচ্চারণও বোধহয় আর কখনও শোনা হবে না।

হোক আর না-ই হোক, আমার চোখ আর কান আমি খোলা রেখেছি। টানটান করে বাড়িয়ে রেখেছি আমার আঙুল। সবকিছু আমাকে দেখতে হবে। সবকিছু আমাকে শুনতে হবে। সবকিছু আমি ছুঁতে চাই। জানিয়ে যেতে চাই, কোন্ দৃশ্য আর কোন্ কণ্ঠ আমার কেমন লেগেছিল। কোন্ বিদ্যুৎবাহী তার স্পর্শ করে আমি কতটা শিউরে উঠেছিলুম।

কবির কাজ তাঁর নিজস্ব হৃদয়কে উন্মোচিত করে দেখানো। কিন্তু তার মানে কি এই যে, শুধু ব্যক্তিগত কিছু দুঃখ-সুখের কথাই তিনি বলবেন? আমার তা মনে হয় না। হৃষীকেশ কী লছমনঝুলার সন্ন্যাসী তিনি নন। তিনিও সামাজিক মানুষই। উপরন্তু, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তাঁকেও একটি রাজনৈতিক বিন্যাসের মধ্যেই নিশ্বাস নিতে হয়। ফলত, তাঁর চতুষ্পার্শ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি, প্রায় অনিবার্যভাবেই, তাঁর কবিতার উপরে ছায়া ফেলতে থাকে। তাঁকে প্রভাবিত, প্ররোচিত করতে থাকে। ক্রমে সেইসব ঘটনা ও প্রবণতা সম্পর্কে একটা মনোভাবও তাঁর তৈরি হয়ে যায়। তাঁর কবিতায় কি সেই মনোভাবের, সেই প্রতিক্রিয়ার কোনও প্রতিফলন আমরা দেখব না? তিনি কি স্বাগত জানাবেন না সেই সামাজিক সংগ্রামকে, অন্যায় নানা অভ্যাসকে যা ভাঙতে চায়? অথবা ধিক্কার

দেবেন না সেই ভণ্ড রাজনীতিকে, নিজের সন্তানকে নিরাপদে রেখে, অন্যের সন্তানকে যা ঠান্ডা মাথায় আগুনের দিকে ঠেলে দেয়? ব্যক্তিগত দুঃখ-সুখের কথা তো তাঁকে বলতেই হবে। কিন্তু, একইসঙ্গে, তাঁর সময় ও তাঁর সমাজের একটা ব্যাখ্যাও কি তিনি শুনিয়ে যাবেন না?

যত জনকে শোনাতে পারেন, ততই ভালো। অথচ, অনেক জনকে যদি শোনাতে হয়, তবে এমন ভাষাতেই শোনাতে হবে, যা অনেক জনের বোধগম্য। অন্যদিকে, কবিতার নিজস্ব মহিমাকেও নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। মান্য করে চলতে হবে তার নিজস্ব শর্তকে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে সেই রহস্য, যা থাকলে তবেই শব্দের সমাহার কবিতা হয়ে ওঠে।

বড়ো কঠিন কাজ। নিজেকে মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করি, আমি কি এই কাজের যোগ্য? আমার হাত বড়ো মলিন। তাই শব্দের গায়ে ময়লা লেগে যায়। আমার প্রণয় বড়ো একরোখা ও জেদি। সবকিছুকেই আমি খোসা ছাড়িয়ে, বিশ্লিষ্ট করে, দাঁতে কেটে দেখতে চাই। কোনও-কিছুরই রহস্য তাই বাঁচে না।

কিন্তু আমার চেষ্টা আমি ছাড়িনি। হাতে আমার টিনের তরোয়াল। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভুলিনি। বারবার ব্যর্থ হয়েও চেষ্টা করছি সেই কবিতা লিখতে, নিজস্ব মহিমায় অম্লান থেকেও যা অনেক জনের কাছে পৌঁছোতে পারবে। কবি ও তাঁর পাঠককে যেখানে মেলানো যাবে।

তারই জন্যে নিজেকে আমি তৈরি করছি। তারই জন্যে নিজেকে আমি নিয়ত পালটাচ্ছি। তারই জন্যে আমি এক ভূমি থেকে ক্রমাগত অন্য ভূমিতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। কবিতার শরীর থেকে একে-একে খুলে নিচ্ছি তার পোশাকি সজ্জা এবং অলংকার।

পাঠক, আপনিও আপনার পোশাকি প্রত্যাশা এবারে বর্জন করুন। তা নইলে আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হবে না।

বৈশাখ ১৩৭৯

বাংলাদেশের কবিতা

সীমান্তের ওইদিকে আমার জন্মভূমি, এইদিকে আমার স্বদেশ। ভেবেছিলুম, কত অসংখ্য মানুষ তো তাদের জন্মভূমিকে একটু একটু করে ভুলে যায়, আমিও ভুলতে পারব। কিন্তু তা আর হল কই! স্বদেশকে আমি ষোলো-আনা আনুগত্য ও ভালোবাসা দিয়েছি, তার গৌরবকে আমারই আনন্দ এবং গ্লানিকে আমারই যন্ত্রণা বলে চিনেছি; তবু স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, পুব-বাংলার কথা আজও নিয়ত আমার মনে পড়ে, আমার রক্ত থেকে তার স্মৃতিকে এই এতগুলি বছরেও আমি মুছে ফেলতে পারিনি।

পুব-বাংলাকে আমি ভুলে যেতে, ভুলে থাকতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ভোলা গেল না। তার শ্যামল মুখশ্রী আমার চেতনায় আজও স্পষ্ট হয়ে জ্বলছে। আজও— রাত বারোটায় যখন আলো নিভিয়ে শুতে যাই, তখন— ফরিদপুর জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম তার সূর্যোদয়ের নম্র আলো ও সূর্যাস্তের কোমল অন্ধকার নিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দৃশ্যের এক দীর্ঘ মিছিল, যেন-বা চলচ্ছবির মতো, আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়।

আমি দেখতে পাই সেই দোতলা কাঠেরবাড়িটিকে, যার উত্তরে জনবসতি, পুবে ও পশ্চিমে পুকুর, দক্ষিণে ধুধু ধানখেত। দেখতে পাই, ভিতরের উঠোনের এক পাশে, কার্তিকপুজোর দিনটিকে এগিয়ে আনবার জন্যে ঠাকুমার দেওয়া 'হালা'র ভিতর থেকে চক্রাকারে ধানের চারা মাথা তুলছে। দেখতে পাই, বাইরের উঠোনে তেহারদ্দি তার আলু-বেগুন-বরবটির ঝাঁকা নামিয়ে রাখল। দেখতে পাই, উনুন থেকে ফেনাভাত নামিয়ে বড়ো কাকিমা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেখতে পাই, পুকুরে জাল পড়ছে, চিনিটোরা আমগাছের বেয়াড়া ডালটা ঢেউতোলা টিনের চালে গা ঘষছে, কামলারা বসে ছ্যাঁচাবাঁশের বেড়া বাঁধছে, টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমপাড়ার মেয়ে-বউরা। পাঁচ-ছ বছর বয়সের সেই ম্যালেরিয়ায় ভোগা রোগা শিশুটিকেও আমি দেখতে পাই, রাত ফুরোবার আগেই যার ঘুম ভেঙেছিল; শেষরাত্তিরের অন্ধকারে যে ঠাকুমার পাশে শুয়ে শুনেছিল "যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকীর উদরে / স্বর্গ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।" এইমাত্র সে পুকুর থেকে মুখ ধুয়ে ফিরল; একখানা প্রমাণ-ধুতিকে চার ভাঁজ করে গলার পিছনে গিঁট

লাগানো, হাতে খেজুর-রসের মস্ত গেলাস, ঘর থেকে বেরিয়ে, উঠোন পেরিয়ে সে এখন খড়ের গাদার সিংহাসনের দিকে চলেছে। ওই সিংহাসনের উপরে বসে খেজুর-রসে চুমুক দিতে-দিতে সে রোদ পোহাবে। শীতের সকাল। শিশির এখনও শুকিয়ে যায়নি। টিনের চাল থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় হিম ঝরছে উঠোনের উপরে। মাঠ থেকে হালকা ধোঁয়ার মতো কুয়াশা উঠছে। এইসবই আমি দেখতে পাই। চল্লিশ বছর দূর থেকে দেখা। তবু অতি দীর্ঘ এই দূরত্ব সত্ত্বেও, এমনকি সেই শিশুটিকেও আমি চিনতে পারি।

কিছুই আমি ভুলিনি। কিছুই না। গোবিন্দপুর স্টেশন থেকে যে-পথটা হঠাৎ ঢালু হয়ে খালের দিকে নেমে গিয়েছিল, সেই পথটা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। খাল থেকে নৌকো কেরায়া করলুম, কাকার সঙ্গে গঞ্জ থেকে চিঁড়ে, মুড়ি, রসগোল্লা কিনে আনলুম, চলন্ত নৌকোর পাটাতনে উনুন সাজিয়ে মা খুব চটপট ভাত আর রায়েক মাছের ঝোল রাঁধলেন, মাঝিরা দাঁড় টানছে, দু-দিকের জল মোচড় খেয়ে পিছনে চলে যাচ্ছে, ভ্যাসাল থেকে ছোঁ মেরে একটা মাছ তুলে নেবে, এই আশায় মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরছে একটা বাদামি রঙের চিল, খাল ছাড়িয়ে তিনমাল্লাই নৌকো গিয়ে ধানখেতের দারার মধ্যে ঢুকল, অল্প জল, এখানে দাঁড় চলবে না, পিছনে উঁচু গলুইয়ে হাল ধরে বসে আছে বুড়ো মাঝি, সামনে দাঁড়িয়ে দুই জোয়ানে লগি ঠেলছে, ছইয়ের ফুটো দিয়ে হাত বাড়িয়ে জল ছুঁতে গিয়েছিলুম, ধানের ধারালো পাতায় আমার আঙুল ছড়ে গেল, কুমার নদে পৌঁছোতে-পৌঁছোতে সন্ধে, খাল-বিলের সীমানা ছাড়িয়ে নদীতে পড়বামাত্র স্রোতের টানে নৌকো হঠাৎ ঘুরে যায়, নৌকোর পেটে ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে ছলাত-ছলাত শব্দ ওঠে, সেই শব্দটাই-বা এখনও আমি ভুলতে পারলুম কই? মাঝি কখন ছইয়ের সামনে-ঝোলানো লণ্ঠনটা জ্বেলে দিয়েছিল, জানি না; আকাশ আর নদী কখন কালো হয়ে গিয়েছিল, জানি না; নৌকোর দুলুনিতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, মাঝরাত্তিরে দিদি হঠাৎ ঠ্যালা মেরে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। “ওঠ্, খোকা, আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি।”

কলকাতায় আমাদের বাসা ছিল, পুব-বাংলায় আমাদের বাড়ি। সেই বাড়ির কথা যখন মনে পড়ে, তখন খাল, বিল, নদী, নালা, সরষেখেত, হলুদফুল, বাঁশের সাঁকো, কাঠের ‘থল’, গঞ্জ, খামার, ধানের ‘মলন’, জলে-ডোবানো পাটের গন্ধ, হাটের পাশে ডিঙির সারি, হিজলের ছায়া, বাঁশবনের মটমট শব্দ, ভোরের আলো আর সন্ধ্যার ম্লানতা আমাকে নিমেষে অধিকার করে নেয়। স্মৃতি বড়ো বেদনাবহ। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই, “কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।” আমি বাসি। কেন-না, আমি জেনে গেছি যে, স্মৃতিচারণের এই বেদনাও বড়ো আনন্দময়।

২

আজ তাঁকে নানা কারণে ভালোবাসি; কিন্তু প্রথম যৌবনে যে, জীবনানন্দকে ভালোবেসেছিলুম, তার একটা মস্ত কারণ নিশ্চয় এই যে, পূব-বাংলার এই শান্ত, শ্যামল— হয়তো বা ঈষৎ করুণ— মুখশ্রী তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নানা কবিতায় বড়ো সুন্দর ফুটেছে। মনে পড়ে, "মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে / আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে / পোড়ো জমি— খড়— নাড়া— মাঠের ফাটল, / শিশিরের জল" কিংবা "অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে / হিম হয়ে আসে / বাঁশপাতা— মরাঘাস— আকাশের তারা" কিংবা "অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল / জোনাকিতে ভরে গেছে; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে / চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ ..." ইত্যাদি সব লাইন পড়তে পড়তে চোখ জ্বালা করত, বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠত, গলার মধ্যে কিছু-একটা আটকে যেত; মনে হত, যেন মন্ত্রবলে তিনি আমাকে সেই হারানো জগতের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। এই চাঁদ, এই খড়-নাড়া মাঠের ফাটল, এই হিম-হয়ে-আসা বাঁশপাতা আর মরা ঘাস, এদের কিছুই তো আমার অচেনা নয়, এই-সবই তো আমার জন্মভূমির, আমার পুরোনো পরিচিত পৃথিবীর অনিবার্য অনুষঙ্গ, কিন্তু ঠিক এমন করে যে এদের ছবিকে কেউ ফোটাতে পারেন, তা আমি কখনও ভাবিনি।

ছবি, ছবি আর ছবি। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমরা যারা আর-কখনও পুব-বাংলায় ফিরে যাব না, এই ছবিগুলিই এখন তাদের একমাত্র সম্বল; স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এখন যাঁরা পুব-বাংলার প্রতিষ্ঠিত কবি, তাঁদের রচনার দিকেও মূলত এই একই প্রত্যাশায়—ছবির প্রত্যাশায়—প্রথম আমি চোখ ফিরিয়েছিলুম।

প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। আল মাহমুদের কবিতায় "কিছুই থাকে না কেন? করোগেট ছন্ কিংবা মাটির দেওয়াল / গাঁয়ের অক্ষয় বট উপড়ে যায় চাটগাঁর দারুণ তুফানে..." কিংবা "কুয়াশায় ঢাকা পথ, ভোরের আজান আর নাড়ার দহন / পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ, / মাছের আঁশটে গন্ধ, উঠোনে ছড়ানো জাল আর / বাঁশঝাড়ে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর" ইত্যাদি সব লাইন যখন পড়েছি, কিংবা শামসুর রাহমানকে যখন বলতে শুনেছি, "কাঁঠাল গাছের ডালে হলদে পাখি লেজটি নাচায় / ঘন ঘন, বেলা বাড়ে... / অনেক পেছনে রইল পড়ে / লাউয়ের সবুজ মাচা, নদী, মাঠ, / কলাইয়ের খেত আর পুকুরের ঘাট", কিংবা হাসান হাফিজুর রহমান যখন গাঢ়কণ্ঠে জানিয়েছেন, "যাবে নদী দূরে দূরে সমন্বিত / ভাঙা মাস্তুলের নৌকা ঠোঁটে নিয়ে" কিংবা সৈয়দ আলি আহসান যখন প্রায় প্রার্থনার মতো অথবা— বলতে পারি— শ্রদ্ধাবিনম্র প্রণয়-সম্ভাষণের মতো উচ্চারণ

করেছেন, "আমার পৃথিবীর বৃষ্টি— মাটির / গন্ধ, ধানখেত ভেসে যাওয়া / আমগাছের ডাল ভেঙে পড়া / হঠাৎ গরুর ডাক, ভিজে যাওয়া / পাখির ডানা ঝাপটানো / আবার পুকুরে নদীতে / ডোবায় লাবণ্যের সাড়া / আমার পুব-বাংলার অনেক রাত্রে / গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো", তখন, সন্দেহ নেই, মূলত এই কারণেই আমি অভিভূত হয়েছিলুম যে, শব্দ দিয়ে রচিত চিত্রাবলির এক আশ্চর্য অ্যালবাম এইসব কবিতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। সেই চিত্র পুব-বাংলার চিত্র। আমার জন্মভূমির মুখচ্ছবি। পুব-বাংলার কবিদের কবিতা পড়তে-পড়তে মূলত এই কারণেই তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলুম যে, যে জন্মভূমিকে আমি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি এবং যার কোলে আর কখনও আমার স্থায়ীভাবে ফিরে যাওয়া হবে না, আর কিছু না হোক, অন্তত তার শ্যামল মুখশ্রীকে এইসব কবিতার মধ্যে বারবার আমি দেখতে পাব।

আমি জানি যে, শুধুই নদীনালা-গাছপালা-খেতখামার কি জ্যোৎস্না-রৌদ্র-মেঘ-কুয়াশার বর্ণনা দিয়ে একটা ভূখণ্ডের সার্বিক চিত্র তৈরি করা যায় না; উপরন্তু সেই ছবির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নটাও খুব জরুরি। জানি যে, চিত্রটাকে সপ্রাণ ও—অন্তত আধুনিক মানুষের কাছে— গ্রাহ্য করে তুলবার জন্যে মানুষের মুখশ্রীকেও তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা চাই; ঈশ্বরের সৃষ্টির পাশাপাশি স্থাপন করা চাই মানবসমাজের আপন হাতের সৃষ্টিকে। পুব-বাংলার তরুণ কবিরা এই দ্বিতীয় দায়িত্বের প্রতিও যে প্রথম থেকেই নজর রেখেছেন, তাঁদের কবিতাই তার প্রমাণ। হরেক রকমের মানুষের মুখ তাঁরা তাঁদের লেখার মধ্যে এঁকে যাচ্ছেন; শহরের মাস্টার-কেরানি-ছাত্র-মজুরের মুখের পাশাপাশি ছোটোখাটো গঞ্জ আর গ্রামাঞ্চলের জেলে, মাঝি, ব্যাপারী, পাইকার, চাষি গেরস্তের মুখও সেখানে এতই অবিরল ফুটছে যে, মানুষ সম্পর্কে তাঁদের মৌলিক আগ্রহের একটা সন্দেহাতীত সাক্ষ্য তার মধ্যে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, একই কবি সব রকমের মানুষের কিংবা সব রকমের মানবিক পরিশ্রমের ছবি আঁকছেন না, সেটা সম্ভবও নয়, কিন্তু তাঁদের সামগ্রিক রচনাকর্মের ভিতর থেকে যে এই সমস্ত-কিছুর একটা সার্বিক চিত্রই প্রবলভাবে ফুটে উঠছে, এটাই সুখের কথা।

উপরন্তু লক্ষণীয়, এই নবীন ও তেজি কবি-সমাজের আপনাপন বিশ্বাসের ছবিও তাঁদের লেখার মধ্যেই ফুটছে। কী তাঁদের প্রতিজ্ঞা ও কীসে তাঁদের প্রত্যয়, তা জানাবার জন্যে আলাদা করে কোনও ফতোয়া কিংবা ইস্তাহার তাঁদের লিখতে হয়নি; তাঁদের কবিতা পড়েই আমরা জানতে পারছি যে, একদিকে যেমন পুব-বাংলার ভৌগোলিক প্রকৃতিকে, তার জল হাওয়া আলো ও মাটির নিজস্ব চরিত্রকে তাঁরা নিবিড়ভাবে ভালোবাসেন, অন্যদিকে তেমনই বুদ্ধিজীবী মানুষ হিসেবেও তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন। নিছক প্রকৃতিবর্ণনা কিংবা

নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের উচ্চারণ কি কোনও সৎ কবিকে একালে আর তৃপ্তি দিতে পারছে? তিনি জেনে গিয়েছেন যে, তাঁর সমকালীন জনসমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও যন্ত্রণাকে একটা বাঙ্‌ময় রূপ না-দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। তিনি বুঝে গিয়েছেন, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব, সেই অনুভূতিগুলির কথা তিনি লিখবেন ঠিকই, কিন্তু, একইসঙ্গে, আপন সময় ও আপন সমাজের একটা ব্যাখ্যাও তাঁকে দিয়ে যেতে হবে— তাঁর কবিতার মধ্যে। পুব-বাংলার কবিদের লেখা পড়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, কবির এই বিশেষ দায়িত্বকে তাঁরা কেউই অস্বীকার করছেন না। আজকের পুব-বাংলায় তরুণবয়সি এমন একজন কবিরও সম্ভবত সাক্ষাৎ মিলবে না, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যিনি নীরব ; এমন কবিরও না, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ঝরিয়ে অন্তত কয়েক লাইন যিনি লেখেননি। লক্ষ্য যখন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, অত্যন্ত সংযতবাক কবির কণ্ঠও তখন আবেগে কাঁপতে থাকে; উদ্দেশ্য যখন অত্যাচারীর সমালোচনা, অত্যন্ত নম্র স্বভাবের কবির কণ্ঠও তখন বিদ্রুপে বেঁকে যায়। জন-আন্দোলনের ওষ্ঠে অব্যর্থ শব্দ যোজনা করে শহিদ কাদরি তখন বলেন, "সব কিছু আজ চিৎকার করে চাইতে হয়— স্বাস্থ্য স্বস্তি এবং আয়ু"; রাজপথে রক্ত ঝরতে দেখে হুমায়ুন আজাদ তখন বলেন, "প্রতিটি পথিক কিছু রক্ত রেখে যায় ব্লাডব্যাংকে বাংলার মাটিতে"; অত্যাচারীর মত্ত অবাধ হত্যালীলা দেখে এনামূল হক তখন বলেন, "আবার হত্যার ঢেউ বুড়িগঙ্গা-বন্দরে উঠেছে", এবং জনতার অনিবার্য জয়যাত্রা প্রত্যক্ষ করে পলায়মান দুঃশাসকদের প্রতি ঘৃণা ঝরিয়ে গোলাম সারওয়ার তখন বলেন, "...ফুসমন্তর ফুসমন্তর ঝড় উঠেছে ওই, কোথায় জাঁহাপনা তাঁহার খয়ের খাঁরা কই?"

৩

আগেই আমি বলেছি যে, কিছু ছবিই ছিল আমার প্রাথমিক ও প্রধান প্রত্যাশা। আমি আমার জন্ম-মৃত্তিকার মুখচ্ছবিকে আবার নতুন করে দেখতে চেয়েছিলুম, এবং তারই জন্যে হাত বাড়িয়েছিলুম পুব-বাংলার এই কবি-সমাজের দিকে। কিন্তু এখন দেখছি, নিতান্ত কিছু ছবিই আমার হাতে তাঁরা তুলে দেননি; তাঁদের বিশ্বাস ও আদর্শের একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয়পত্রও ওই কবিতাবলির মাধ্যমে তাঁরা আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের কবিকর্মই প্রমাণ দিচ্ছে যে, তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও মানবধর্মে আস্থাশীল। হিন্দু-মানুষ, মুসলিম-মানুষ ইত্যাদি সংকীর্ণ পরিচয়ে কোনও আস্থাই তাঁরা রাখেন না। মানব-পরিচয়কেই তাঁরা তাবৎ মানুষের সবচাইতে বড়ো পরিচয় বলে জেনেছেন।

অন্যদিকে, বাঙালি হিসেবেও তাঁদের গৌরববোধের অন্ত নেই।

প্রশ্ন উঠবে, বিশুদ্ধ বাঙালিয়ানার এই গৌরব কি মানবিকতার বৃহত্তর আদর্শের

বিরোধী? না, তা নয়। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। আয়ুব খাঁর সফরের বিবরণ পাঠাবার জন্যে ১৯৬০ সনের জানুয়ারি মাসে, দেশি-বিদেশি আরও অনেক সাংবাদিকের সঙ্গে, পুব-বাংলার জেলায় জেলায় কয়েকটা দিন আমাকে খুব ঘুরতে হয়েছিল। আয়ুব যেদিন পদ্মায় তাঁর স্টিমারে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন, সেদিন ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারি। ঠিক করলুম, আমরা ভারতীয়রা আমাদের আনুষ্ঠানিক ভারতীয় পোশাক পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করব। সেই অনুযায়ী পাতলুনের উপরে গলাবন্ধ কোট পরে নিচ্ছি, এমন সময়ে ঢাকার এক তরুণ কবি-সাংবাদিক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপার কী দাদা? পোশাক পালটাচ্ছেন কেন?"

বললুম, "বাঃ, আজ যে আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস। তোমাদের প্রেসিডেন্টের পার্টিতে তো আজ পুরোদস্তুর ভারতীয় পোশাকেই আমাদের যাওয়া উচিত।"

তরুণ কবিবন্ধু এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে, বিষণ্ণ গলায় বললেন, "দাদা, আপনি ভাগ্যবান, নিজেকে আপনি ভারতীয় বলে ভাবতে পারেন। আমরা কিন্তু নিজেদের আর পাকিস্তানি বলে ভাবতে পারি না। আমরা বাঙালি।"

জিজ্ঞেস করেছিলুম, নিজেকে পাকিস্তানি ভাবতে তাঁর অসুবিধে হয় কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, হয়, তার কারণ, কোনও রকমের গোঁড়ামিতে তাঁদের বিশ্বাস নেই, এবং পাকিস্তান-ভাবনার ভিত্তি যে একটা প্রচণ্ড গোঁড়ামি, তা তাঁরা জেনে গিয়েছেন। সেই গোঁড়ামিকে যদি একবার মেনে নেন, তাহলে উদার মানবিকতার ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছোনো তাঁদের পক্ষে শক্ত হবে।

আমার পরবর্তী প্রশ্ন : "কিন্তু বাঙালি-পরিচয়টাও তো মানব পরিচয়ের চাইতে অনেক ছোটো। এই ছোটো পরিচয় কি বড়ো পরিচয়কে আড়াল করে দেবে না?"

জ্বলজ্বলে গলায় তিনি উত্তর দিলেন, "না। হোক ছোটো, তবু এই পরিচয়ের মধ্যে কোনও গোঁড়ামি নেই। আর তাই, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের এই পরিচয় কাউকে দূরে ঠ্যালে না, কাউকে পর বলে ভাবতে শেখায় না। দেখবেন, আপনারা যেমন ষোলো-আনা বাঙালি থেকেও ষোলো-আনা ভারতীয় হতে পেরেছেন, আমরাও তেমনি ষোলো-আনা বাঙালি থেকেও ষোলো-আনা মানুষ হতে পারব।"

তিনি ঠিকই বলেছিলেন। বাংলাদেশের সমস্ত কবির সমস্ত রচনা আমি পড়িনি। কিন্তু যে-ক'জনের যা-কিছু পড়েছি, তাতে বলতে পারি যে, ষোলো-আনা মনুষ্যত্বের পরিচয়ই তাঁদের সেই লেখার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে।

বৈশাখ ১৩৭৮

কবিতা নিয়ে ভাবনা

চারদিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে খুব ভাবনায় পড়ে যাই। খুব অস্বস্তি বোধ করি। অস্বস্তি আমার একার নয়। আমার, আপনার, প্রত্যেকের। আমরা কেউ বিশেষ স্বস্তির মধ্যে নেই, অথচ সেই স্বস্তিহীনতার কথাটাকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতেও যেন আমাদের দারুণরকম অস্বস্তি। আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি যে, অনেক তো দৌড়ঝাঁপ হল, এইবারে কোথাও একটু বসতে পারলে ভালো হত, কোনও গাছের তলায় না হোক, কোনও গাড়িবারান্দার নীচে, কোনও নদীর ধারে না হোক, কোনও জনবিরল সরাইখানার স্তব্ধতায়। শরীর ক্লান্ত, মন বিশ্রাম চাইছে, চোখ-দুটিও দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে অবিশ্রান্ত ধাবিত হতে অনিচ্ছুক,— তারাও এখন, অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে, একই দৃশ্যে নিবিষ্ট থাকতে চায়।

অথচ সেই বিরতির ব্যবস্থা আমরা রাখিনি। মাঝে-মাঝেই একটা অদ্ভুত রকমের তুলনা আমাদের মাথায় আসে। অদ্ভুত, তবু একেবারে অবাস্তব নয়। মনে হয়, যেন একটা ট্রেনের কামরায় আমরা বসে আছি, ভীষণ জোরে ছুটছে সেই ট্রেন, ছুটেই চলেছে, দু-পাশের বাড়িঘর, গাছপালা, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তারের উপরে মাছরাঙা, খেলার মাঠ আর খেতখামারও সেইসঙ্গে উলটোদিকে দৌড়োচ্ছে, এই এখুনি যেটা আমাদের চোখের সামনে, পরক্ষণেই সেটা পিছনে অন্ধকারে হারিয়ে গেল, অনেকক্ষণ পরে-পরে আসছে এক-একটা স্টেশন, কিন্তু তারাও তাদের প্ল্যাটফর্ম, জলের কল, কলের পাশে কৃষ্ণচূড়া, টিকিট কাউন্টার, মানুষজন ইত্যাদিকে এক লহমার বেশি দৃশ্যমান রাখছে না, যেন সেই সবকিছু সমেত মানুষী পরিশ্রমের এক-একটা চমৎকার বিন্যাস মাত্রই এক মুহূর্তের জন্য ভুশ করে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তারপরেই ঝাঁপ দিচ্ছে উলটোদিকে,— চোখের অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে।

দৃশ্যগুলি দ্রুত ছুটছে; বিশ্ব জুড়ে দ্রুত ঘটছে অসংখ্য রকমের ঘটনা। সেসব ঘটনার একটিরও গুরুত্ব কম নয়, অথচ বড্ড বেশি দ্রুত ঘটছে বলেই যেন তার গুরুত্ব, তার তাৎপর্য আমরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছি না। ঘটনার পর ঘটনা, চমকের পর চমক, ঘরে, বাইরে, প্রাচ্যে, প্রতীচীতে— সর্বত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

আগের দিনগুলিকে মনে পড়ে। খুব বেশি দিন আগের কথা তো নয়; অথচ তখনও, আজকের তুলনায়, ঘটনাস্রোতের গতি ছিল অনেক মন্থর, জগৎ যেন তখনও খুব আস্তে-সুস্থে, বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে, এগোচ্ছিল, বড়ো রকমের কোনও ব্যাপার ঘটলে তক্ষুনি সে-বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার দরকার হত না, নানান দিক থেকে তাকে বিচার করবার, তার উপরে আলো ফেলবার, ব্যাপারটা ভালো কি মন্দ ভেবে দেখবার সময় পাওয়া যেত। এখন যায় না। এখন খুব চটপট সিদ্ধান্ত নিতে হয়, নইলে হয়তো আদৌ কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া যাবে না, তার আগেই নতুন কিছু ঘটে যাবে, এবং সেই নতুন ঘটনার গুরুত্ব হয়তো আরও বেশি, সে-ই হয়তো তখন আমাদের সমস্ত আগ্রহ দাবি করে বসবে, পিছনের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে আগের মুহূর্তের ঘটনা, তার সমস্ত তাৎপর্য। ব্যাপার দেখে মনে হয়, যেন নিষ্ঠুর, অস্থির, উন্মাদ কোনও পরীক্ষকের সামনে আমরা পরীক্ষা দিতে এসেছি, তিনি প্রশ্ন করছেন, কিন্তু ভেবেচিন্তে উত্তর দেবার জন্যে যতটা সময় চাই, তা কিছুতেই বরাদ্দ করছেন না, আমরা মুখ খুলবার আগেই তিনি আর-একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন। কিংবা, আমরা খাতা খুলবার আগেই কেড়ে নিচ্ছেন আমাদের কলম।

অবস্থাটা যে একটু গুছিয়ে, একটু স্থির হয়ে কোথাও বসবার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়, সে-কথা আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি। তার জন্যে প্রত্যেকেই আমরা অস্বস্তি বোধ করছি; শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা আরও, কেন-না এমনিতে যদিও ভীষণ রকমের জ্বালা তাঁদের মাথার মধ্যে, দারুণ রকমের অস্থিরতা তাঁদের মনে, তবু অন্তত সৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁদের স্থির হয়ে বসতেই হয়; অন্তত তখন, অর্থাৎ যখন তাঁরা হাতে তুলি নিয়ে ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিংবা কলম নিয়ে টেবিলে নিবিষ্ট, অন্তত তখন— সৃষ্টির সেই মুহূর্তে— অস্থির হলে তাঁদের চলে না।

ধরা যাক, প্রেক্ষাগারে তাঁরা বসে আছেন, চোখের সামনে দ্রুত-অপস্রিয়মাণ দৃশ্যের মিছিল, সেই অবস্থাতেই অন্যের অগোচরে, সহস্রজনের মধ্য থেকে, নিঃশব্দে একসময়ে তাঁদের বেরিয়ে আসতে হয়, নিজের ঘরে ফিরে এসে প্রত্যেককেই বসতে হয় তাঁর নিজের আসনে; এখন— অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে— তিনি দ্রষ্টা নন, স্রষ্টা; যেটুকু দেখেছেন, শান্ত হয়ে মগ্ন হয়ে সেইটুকুর কথাই এখন তিনি লিখবেন, নিজের চিত্তে প্রতিফলিত করে তাকে নতুন করে আবার নির্মাণ করবেন।

কিন্তু কী তিনি দেখেছেন? যা দেখেছেন, তাকে ভালো করে দেখবার মতো সময় তিনি পেয়েছিলেন কি? কতক্ষণ সেই দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ছিল? তার চাইতেও বড়ো কথা, যা-কিছুই আমরা দেখি, তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না,

সবকিছুকেই তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্থাপন করে দেখতে হয়, নতুন করে আবার যখন তাকে রচনা করব, তখন সেই পরিমণ্ডলকেও ফুটিয়ে তোলা চাই, তার মধ্যে স্থাপন করে তাকে দেখানো চাই, নইলে তার তাৎপর্য কিছুতেই স্পষ্ট হবে না, সে প্রাণ পাবে না। সুতরাং প্রশ্ন, ধাবমান দৃশ্যপটে যে-বৃক্ষ কিংবা পাখি কিংবা মানুষটিকে কোনও শিল্পী কিংবা সাহিত্যিক কিংবা কবি দেখেছিলেন, তার অনুষঙ্গও তাঁর চোখে পড়েছিল তো? শুধু বৃক্ষটিকে দেখলেই কাজ ফুরোচ্ছে না, তার পাশের নদী কিংবা পুকুরটিকেও দেখতে হয়; উড়ন্ত পাখির সঙ্গে দেখতে হয় তার আকাশ, কিংবা তার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি নিষাদকে; শুধু কৃষকটিকে নয়, তার চারপাশে শস্যের ঐশ্বর্য কিংবা শস্যহীন মাঠের রিক্ততাও দেখে নেওয়া চাই। লিখবার সময়ে সেই অনুষঙ্গের মধ্যে তাকে স্থাপন করতে হবে, পরিপার্শ্বের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে দেখাতে হবে। কিন্তু তেমন করে তিনি কি তাকে দেখেছিলেন?

সুযোগ ছিল না। সময় ছিল না। না একটু নিবিষ্ট হয়ে দেখবার, না একটু মগ্ন হয়ে লিখবার। অন্য বিষয়ের কথা অন্যেরা বলবেন, আমি শুধু কবিতার কথাই বলতে বসেছি, একালের কবিতা— শুধু এদেশের নয়, অন্যান্য দেশেরও সাম্প্রতিক কবিতা— পড়তে পড়তে অনেকসময়েই আমার মনে হয়, ইতস্তত যেন-বা অনেক ফাঁক রয়ে গেল, ছবিটা ঠিক সম্পূর্ণ হল না, এক-পলকে-দেখা নিসর্গ কিংবা মানুষকে তাতে কোনও ক্রমে চিত্রিত করা হয়েছে, যেন দেখা এবং লেখা, এই দুটি কাজই অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিল, যেন যে বিষয়ে যিনি লিখেছেন, তাকে ভালো করে দেখবার মতো সময় কিংবা সুযোগ তাঁর ছিল না, এবং লেখার মধ্যে যখন আবার নতুন করে তাকে নির্মাণ করেছেন, তখনও তিনি যতটা দরকার ঠিক ততটাই সময় কিংবা একাগ্র আগ্রহ তাকে দিতে পারেননি।

দোষ সর্বদা কবির নয়, সর্বাংশে তো নয়ই। মগ্ন হয়ে কিছু লিখবার আগে মগ্ন হয়ে কিছু দেখা চাই। কিন্তু তেমন করে দেখতে তাঁকে দিচ্ছে কে? ঘটনার পিঠে ঘটনা যখন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, তখন কোনও কিছুই তো তার যাবতীয় অনুষঙ্গ নিয়ে সমগ্রভাবে, স্পষ্টভাবে তাঁর চোখের সামনে ফুটছে না। তিনি খণ্ডখণ্ড ছবিই শুধু দেখে যাচ্ছেন,— টুকরো টুকরো নিসর্গ, টুকরো টুকরো মানুষ, টুকরো টুকরো ভাবনা। তাঁর লেখার মধ্যেই-বা কী করে তবে সমগ্রতার চিত্র আমরা দাবি করব?

অথচ আমরা জানি যে, যতক্ষণ না সানুষঙ্গ সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে, কোনও কিছুই ততক্ষণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না, সাহিত্যের সত্য হয়ে ওঠে না। কবিতা নিয়ে কতজনেই তো কত মামুলি অভিযোগ তোলেন, খুব সহজেই সেসব অভিযোগের উত্তর দিয়ে দেওয়া যায়। একালের কবিরা আঙ্গিকে পটু নন, এই উক্তির উত্তরে

বলে দেওয়া যায়, বাজে কথা, শারীরিকভাবে নিখুঁত কবিতার সংখ্যাই একালে বেশি। একালের কবিরা আগের যুগকে অস্বীকার করতে চান, এই উক্তির উত্তরে অনায়াসেই বলা চলে, সর্বকালের কবিরাই তা করে থাকেন। কেউ নীরবে করেন, কেউ সরবে। তার দরকার নেই এমনও নয়। নিতান্ত নতজানু হয়ে আগের যুগকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নিলে নতুন-কিছু করবার তাগিদ আসবে কোত্থেকে? অভিযোগ আরও অনেক, মামুলি অবান্তর অভিযোগ, কখনও দুর্বোধ্যতা, কখনও অশ্লীলতা, উপলক্ষের তো অভাব হয় না, একটা কিছু তর্ক একবার উঠলেই হল, চতুর্দিক থেকে অমনি প্রশ্নের বান ডেকে যায়। ডাকুক, তা নিয়ে কোনও দুঃখ নেই। দুঃখিত সম্ভবত তরুণ কবিরাও নন। উষ্মার, আপত্তির, আক্রমণের লক্ষ্য হতে তাঁদের সম্ভবত ভালোই লাগে। দুঃখ শুধু এইখানে যে, যেটা আসল প্রশ্ন, সেটাই কাউকে তুলতে দেখি না। ভুলেও কেউ একবার জিজ্ঞেস করেন না, এই যে অসম্পূর্ণতা, দর্শনের নির্মাণের এই যে খণ্ডতা, কবিতাকে এর হাত থেকে উদ্ধার করবার উপায় কী?

আমি ধরেই নিচ্ছি যে, যদিও উচ্চারিত হয় না, তবু পাঠকদের মনে এই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই জেগেছে। সুতরাং, সেই ট্রেনের উপমাতেই আমি ফিরে যাব, ট্রেনের দু-পাশ দিয়ে ছিটকে ছিটকে যেসব দৃশ্য পিছনে হারিয়ে যাচ্ছে, তার দিকে আঙুল তুলে বলব, আমরা নিজেরাও তো কোনও-কিছুই সমগ্রভাবে সম্পূর্ণ করে দেখতে পাচ্ছি না।

কোনও-কিছুই না? আমার উত্তরের মধ্যে ফাঁকি আছে, আমি জানি। সবকিছুই যে অস্থির, তা তো নয়। ছুটন্ত এই ট্রেনের জানলা থেকেও দেখতে পাচ্ছি, কাছের দৃশ্যগুলি যখন এত অস্থির, দূরের পাহাড় ও গ্রাম, দূরের মানুষগুলি তখনও অচঞ্চল, আমার চোখের সামনে থেকে তারা দ্রুত সরে যাচ্ছে না, দূরের সূর্যও সেই তখন থেকে পাহাড়চূড়ায় লগ্ন হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ তো কাছের দৃশ্যে, তাৎক্ষণিকে লিপ্ত ছিলুম, সম্ভবত এবারে আর একটু দূরে আমাদের চোখ রাখতে হবে।

শ্রাবণ ১৩৭৫

কবির ভূমিকা

প্রাচীন পৃথিবীর সেই দার্শনিককে আমরা সকলেই জানি। তাঁর কল্পরাজ্যে কবির কোনও স্থান হয়নি। কবিকে তিনি নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন।

একালের দার্শনিক কিন্তু কবিকেই ডাক দিয়েছেন। কেন-না, "...এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে / দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে / ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা..."

সুতরাং ডাক পড়ল, "কবি তবে উঠে এসো— "

অর্থাৎ কবি নেহাত নিষ্কর্মা নন। পৃথিবীর এই কর্মযজ্ঞে তাঁরও কিছু কাজ আছে। "মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দেবার কাজ! "শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে" আশার বাণী ধ্বনিত করবার কাজ। বড়ো কঠিন কাজ। সে-কাজ আর-কাউকে দিয়ে হবার আশা নেই। তার জন্যে কবিকেই চাই।

প্লেটো দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথও দার্শনিক। কিন্তু কবির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা দেখা যাচ্ছে দুই রকমের। একজনের ধারণা, কবির কাজ নেহাতই মিথ্যাভাষণ। কবিকে তিনি নির্বাসন দেবার পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ জানেন, আপাতদৃষ্টিতে সবাই যাঁকে নিষ্কর্মা বলে মনে করে, সেই কবির দ্বারাই অসাধ্যসাধন হবে ; তাঁকে নইলে হবে না।

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কবি রবীন্দ্রনাথকেই ডাক দিয়েছিলেন; আর-কাউকে নয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার লক্ষ্য তিনি নিজেই। তিনি নিজেই সেখানে স্বপ্নের মায়ালোক থেকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে নেমে আসতে চাইছেন। কবিতাটি তারই ভূমিকা। (এর দ্বারা অবশ্য স্বপ্নলোকের মহিমা কিছু খর্ব হয় না; তবে বাস্তবকেও তার যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়।) কিন্তু সে-কথা থাক। প্রশ্ন হচ্ছে, যেমন নিজেকে, তেমনই সমগ্রভাবে কবি-সমাজকেও কি তিনি বাস্তব জীবনের কঠিন দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেননি? তা-ও দিয়েছেন। যেমন একদিন বাস্তবকে অঙ্গীকার করবার জন্যে নিজেকেই ডাক দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "কবি, তবে উঠে এসো— ", তেমনই তাঁর পরবর্তীকালের কবিদের কাছেও কি এ-ব্যাপারে তাঁর কিছু প্রত্যাশা ছিল না? তা-ও ছিল। তাঁর আশা করতে ভালো লেগেছিল যে, এমন কবির

একদিন দেখা পাওয়া যাবে, নিতান্ত সাধারণ মানুষের আনন্দ আর বেদনা, আশা আর নৈরাশ্য যাঁর লেখনীতে বাঙ্‌ময় হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাই তাঁর শেষজীবনের কবিতায় এত সহজে, এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলতে পেরেছিলেন, "এসো কবি, অখ্যাতজনের / নির্বাক মনের। / মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।"

বলা বাহুল্য, ঊর্ধ্বাকাশের স্বপ্নকে তিনি অস্বীকার করেননি। করার কোনও অর্থও হয় না। কেন-না, ঊর্ধ্বাকাশে তাকিয়ে মুগ্ধ হবার মধ্যেও মনুষ্যধর্মের পরিচয় কিছু কম নেই। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তো এইখানেই প্রধান পার্থক্য। শুধু পেটের ক্ষুধা মিটলেই তার চলে না, তার মনের ক্ষুধাও মেটা চাই। মাটির উপরে দাঁড়িয়েও সে তাই আকাশে তাকায়। রবীন্দ্রনাথ এই দুয়ের উপরেই সমান জোর দিয়েছিলেন; মেঘের সঙ্গে মৃত্তিকার দাবিকেও তিনি একটি বিপুল ঐকতানের মধ্যে মেলাতে চেয়েছিলেন। একটু আগেই যে কবিতার থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করেছি, তার নাম 'ঐকতান'ই। মেঘের কথা তো আমরা অনেক শুনেছি, এখন মাটির মানুষের প্রাণের কথাকে যিনি গানে বেঁধে নিতে পারবেন, ভবিষ্যতের সেই কবির উদ্দেশে তাতে তিনি বলছেন, "সাহিত্যের ঐকতান-সংগীতসভায় / একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়— / মূক যারা দুঃখে সুখে / নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে / ওগো গুণী, / কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।"

প্রশ্ন উঠবে, 'কাছে থেকে দূরে যারা', একালের কবিতায় কি তাদের বাণী শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কথা বলে বসলে অতি বড়ো নৈরাশ্যবাদের পরিচয় দেওয়া হয়। আর তা ছাড়া, কথাটা সত্যিও হবে না। তার চাইতে বলা ভালো, নিতান্ত মাটির মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের আভাস ইদানীং বাংলা কবিতায়, আগের তুলনায়, অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে; তবে তাদের বাণী আজও বিশেষ স্পষ্ট হয়নি। কবে হবে, জানি না। শুধু এইটুকু এখনই নিশ্চিতভাবে বলতে পারা যায় যে, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে যেটুকু মানসিক পালাবদল ইতিমধ্যেই বাংলা কবিতায় সূচিত হয়েছে, তার গুরুত্বও নিতান্ত কম নয়।

কথাটার অর্থ তাই বলে এই নয় যে, এখন যা নিয়ে কবিতা লেখা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা নিয়ে লেখা হয়নি। না, তা কিছুতেই বলা যায় না। একালের কবিতার মূল বিষয়বস্তু অবশ্যই মানুষ। কিন্তু সেটা কিছু নতুন বিষয়বস্তু নয়। মানুষ নিয়ে এর আগেও অনেক কবিতা লেখা হয়েছে। তফাতটা তাহলে কোথায়? তফাত আসলে দৃষ্টিভঙ্গিতে। মানুষকে এর আগে যেভাবে দেখা হয়েছে, একালে ঠিক সেইভাবে দেখা হয় না। তা ছাড়া, ব্যক্তি-মানুষকে গুরুত্ব দেবার ঝোঁক একালে অনেক

বেড়েছে। এবং সেই ব্যক্তি-মানুষরা আদৌ অসামান্য মানুষ নয়। তারা সামান্য, সাধারণ মানুষ। কিন্তু সাধারণ হয়েও তারা স্বতন্ত্র, তারা একটা বিরাট জনপিণ্ডের অংশমাত্র নয়। তাদের প্রত্যেকেরই একটা পৃথক চিন্তা-ভাবনার জগৎ রয়েছে; পৃথক-পৃথক সুখ-দুঃখ রয়েছে। সকলের মধ্যে থেকেও তাই তাদের সকলেই স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্য তাদের জীবনকে একটি বিশেষ মহিমা দিয়েছে। সেই মহিমাকে সবাই চিনতে পারে না। একালের কবিদের কবিতা পড়ে মনে হয়, তারা পেরেছেন।

পার্থক্য আসলে বিষয়বস্তুর নয়, এম্‌ফ্যাসিসের। মানুষ, নেহাতই সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ যারা জীবিকার জন্য চাকরি করে, কিংবা খোঁজে; উদরান্নের সংস্থানের জন্যে যাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়; যারা আশায় উৎফুল্ল হয়, আবার নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে; রেশনের জন্যে যারা লাইনে দাঁড়ায়; যারা প্রেমে পড়ে, কিন্তু চাঁদের দিকে তাকাবার ফুরসত পায় না; কর্মখালির সন্ধানে যারা হন্যে হয়ে ওঠে; বাড়িতে একটা ছোটোখাটো অসুখ বাধলেও যাদের বাজেট বিপর্যস্ত হয়; যারা প্রতিবেশীর সঙ্গে যথাসাধ্য ভাব রাখতে চায়, কিন্তু সবসময়ে পারে না; যারা অন্য মানুষকে ভালোবাসতে চেয়েও মাঝে-মাঝে মুখ ফিরিয়ে নেয়; নিজেরই মাস-মাইনের থেকে নিজেরই শখের খাতিরে দু-চার আনা সরিয়ে নিয়ে তারপর বাড়ির লোকের কাছে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়; যারা আয়ের অঙ্ক বাড়াবার জন্যে বাড়তি কাজ হাতে নেয়, তারপর বাড়তি কাজের ধাক্কায় অসুখে পড়ে আবার ডাক্তার ডাকতে ছোটে; অর্থাৎ ক্রমাগত যারা এই ভাবনায় ভুগছে যে, ধুতিটাকে হাঁটুর নীচে আর-একটু নামিয়ে এবারে আর-একটু ভদ্রভাবে বাঁচা দরকার, সেইসব সাধারণ মানুষের মুখ এখনকার কবিতায় সম্ভবত আগের চাইতে আরও বেশি দেখা যাচ্ছে, এবং তার চাইতেও যেটা বড়ো কথা, তাদের ব্যক্তিজীবনের মহিমাকে চিনতে পেরেছেন বলেই সম্ভবত কবিরা আজ সার্বিকভাবে সেই মুখগুলিকে দেখে নিতে চাইছেন।

সার্বিকভাবে দেখতে গেলে জীবনের সবটাকেই দেখতে হয়। সব দিক থেকেই আলো ফেলতে হয়। আলো ফেলতে গিয়ে একালের মানুষের কতকগুলি মারাত্মক অসুখের খবর ধরা পড়ল। যথা দ্বিধা, যথা সংশয়, যথা অস্থিরতা। আগের যুগের মানুষ কি এত দ্বিধায়-সংশয়ে-অস্থিরতায় কেঁপেছে? তাদের জীবন কি আজকের মতো এত অনিশ্চিত ছিল? মৃত্যুর ছায়া কি তাদের জীবনের একটা বিপুল অংশকে কখনও এতখানি অন্ধকার করতে পেরেছে? সভ্যতার এক সার্বিক বিনষ্টির আশঙ্কা সারাক্ষণ বুকের মধ্যে নিয়ে কি তাদের দিন যাপন করতে হত? বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্যিই বিস্ময়কর। কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধি কি সেই তুলনায় অর্ধেকও এগোতে পেরেছে? ভাবতে অবাক লাগে যে, মাটির মানুষ চাঁদের দিকে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু

একইসঙ্গে আবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় যে, মানুষের ভবিষ্যৎ কি আর কখনও এত অনিশ্চিত ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার জন্যে খুব বেশি মাথা-ঘামাবার দরকার করে না। বলা বাহুল্য, অনিশ্চয়তার ব্যাধি সর্বযুগেই ছিল; কিন্তু সর্বমানুষের জীবনে তা আর-কখনও এত ব্যাপকভাবে দেখা দেয়নি। সেকালে একদিকে যখন রাজ্যপাটের ভাঙাগড়া চলত, অন্যদিকে চাষি তখন নিত্যকার মতোই— নিশ্চিন্ত না হোক— নির্বিকার চিত্তে মাঠে লাঙল দিতে পেরেছে, বীজ বুনতে পেরেছে, ফসল কাটতে পেরেছে। একালে কিন্তু পারে না। কোনও দেশেই পারে না। অনিশ্চয়তার ব্যাধি আর এখন স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়; সর্বত্র তা ছড়িয়ে গিয়েছে। এখনও যাচ্ছে। বিস্মিত একটি বিপন্নতার বোধ একালের মানুষের জীবনকে ক্রমে-ক্রমে অধিকার করে নিচ্ছে। অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতা— কোনও-কিছুই আর তাকে সেই শান্তি দিতে পারে না, আগের যুগে যা অনেক সহজলভ্য ছিল। জীবনানন্দের কথা মনে পড়ে। "জানি— তবু জানি / নারীর হৃদয়— প্রেম— শিশু— গৃহ— নয় সবখানি;/ অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়— / আরও এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে / খেলা করে; / আমাদের ক্লান্ত করে / ক্লান্ত— ক্লান্ত করে— "। আজ থেকে অনেক দিন আগেই যে-বিপন্ন বিস্ময়ের কথা তিনি বলেছিলেন, ক্রমে যে তার গ্রাস আরও বড়ো হয়েছে, তাতে সন্দেহ করি না।

বলা বাহুল্য, জীবনকে বাদ দিয়ে কোনও-কিছুই নয়। কবিতাও নয়। সুতরাং, জীবনের এই যে বিপন্নতা, এই যে অনিশ্চয়তা, এই যে সংশয়, কবিতার উপরেও এর ছায়া পড়া স্বাভাবিক। পড়েছেও। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই কবির ভূমিকায় এই পালাবদলের শুরু; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এর আদল আরও স্পষ্ট হয়েছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই সবটা বলা হয় না। কেন-না এত রকমের বিড়ম্বনা সত্ত্বেও মানুষ মানুষই। সে তাই রক্তের মধ্যে সংশয়ের ব্যাধি নিয়েও আকাশের দিকে তাকায়, ফুল ফুটলে খুশি হয়, নদীর ধারে গিয়ে বসে, প্রিয়জনের হাতে হাত রাখতে পারলে— অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে— তার বিড়ম্বনার কথা ভুলে যায়। এবং তা নিয়েও কবিতা লেখা হয়। হবে না-ই-বা কেন? যা-কিছু যিনি বিশ্বাসযোগ্য করে লিখতে পারেন, তিনি তা-ই নিয়েই কবিতা লিখবেন। যিনি দ্বিধা-সংশয়ের কথা ভালো বুঝেছেন, তিনি তা-ই নিয়েই লিখুন; আর এই দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যেও যদি কেউ অন্তঃস্রোতা কোনও ভালোবাসার দেখা পেয়ে থাকেন, তবে তিনি সে-কথাটাই কবিতায় জানান। সবই তো মানুষের কথা। যেমন দ্বিধা আর সংশয়, তেমনই ভালোবাসার মধ্যেও তো আমরা মানুষী মনেরই পরিচয় পাচ্ছি।

শুধু একটা কথা। "সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি / ভালো নয়,

ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।” রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণীটা যেন আমরা মনে রাখি। যুবক, বৃদ্ধ, ছাত্র, কেরানি, চাষি, শ্রমিক—এঁদের কেউই ত্যাজ্য নন। এঁদের সকলকে নিয়েই লেখা যেতে পারে। কিন্তু এঁদের জীবনকে ভালো করে জেনে না নিয়ে লেখা যেতে পারে না। যিনি মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে লিখতে চান, তিনি মধ্যবিত্তের সুখদুঃখের খবর ভালো করে জেনে নিয়ে, তারপরে লিখুন। যিনি চাষি-মজুরের কথা লিখতে চান, সর্বাগ্রে তিনি চাষি-মজুরের সুখদুঃখের শরিক হোন। তা না হয়েও, শুধু শখের খাতিরেও, অবশ্য লেখা যায়। কিন্তু সে-লেখা কারও চিত্তে দাগ কাটে না। সে-লেখা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। সাহিত্যে সেটা সত্য হয়ে ওঠে না।

পৌষ, ১৩৭১

সাহিত্য ও স্বাধীনতা

কথাটা একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু এমন-কিছু মানুষ সত্যিই আছে, স্বাধীনভাবে কিছু চিন্তা করতে, চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে যারা ভয় পায়। কেন পায়? যার জন্যে অনেকে প্রাণের মূল্য দিতেও কুণ্ঠিত নয়, সেই স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তারা স্ফূর্তি পায় না কেন? শৃঙ্খলের চিন্তা তাদের স্বস্তি দেয় কেন? শৃঙ্খল মোচনের প্রস্তাবে তারা পিছিয়ে যায় কেন? অসংখ্য মানুষ যখন স্বয়ংনির্ভর হতে চাইছে, এবং স্বয়ংনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকবার আগ্রহে অসংখ্য রকমের দুঃখ বরণ করছে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে তখন যৎসামান্য ইচ্ছাও কেন তাদের হয় না?

প্রশ্নটা জরুরি। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবার আগে বরং আর-একটা প্রশ্ন তোলা যাক। সব সময় মানুষ কি বেঁচে থাকতেই চায়? এমন মানুষ আমরা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু দেখেছি, যাদের জীবনতৃষ্ণা খুব প্রবল। কিন্তু এমন মানুষও আমরা কম দেখিনি, জীবন নামক ব্যাপারটা সম্পর্কে যারা বিশেষ আগ্রহ বোধ করে না। তাদের এই আগ্রহহীনতার কারণ কী? কারণটা যে সর্বদাই আর্থিক অনটন কিংবা আত্মিক দুঃখশোক, এমন কথা বলতে পারি না। বলা বাহুল্য, আর্থিক অনটন, শারীরিক ব্যাধিক্লেশ অথবা আত্মিক দুঃখশোক অনেকক্ষেত্রে মৃত্যুবাসনাকে প্রবল করে তোলে। কিন্তু এসব কারণ যাদের ক্ষেত্রে উপস্থিত নয়, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ দেখেছি বাঁচতে ভীষণ ভয় পায়। কেন পায়?

কারণ খুঁজতে গেলে হয়তো দেখা যাবে যে, তাদের ভয় আসলে দায়িত্ব সম্পর্কে। বস্তুত, দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক বলেই হয়তো জীবনের প্রতি তারা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে না। সেটা কিছু বিচিত্র ব্যাপারও নয়। তার কারণ, সত্য অর্থে যাকে আমরা বাঁচা বলি, দায়িত্ব নামক ব্যাপারটা তার সঙ্গে একেবারে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। বাঁচতে হলে প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপেই দায়িত্ব নিতে হয়। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। তা নইলে বাঁচা যায় না। দায়িত্ব বহনে অনিচ্ছুক কিছু মানুষ যে সে-ক্ষেত্রে জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে অনেক কাম্য মনে করবে, তাতে আর সন্দেহ কী। মৃত্যুকে তারা কাম্য মনে করে। জ্ঞানত না হোক, মনের অগোচরে করে। তার কারণ, মৃত্যুর পরে আর যা-ই থাক, দায়িত্ব থাকে না।

দায়িত্ব নেই শৃঙ্খলেও। রবীন্দ্রনাথের একটি অসাধারণ কবিতার কথা— 'দুই পাখি'র কথা— এখানে স্মরণ করতে পারি। বনের পাখি এসে খাঁচার পাখির কানে মুক্তির মন্ত্রণা দিয়েছিল। কিন্তু খাঁচার পাখির চিত্ত তাতে সায় দেয়নি। সে বলেছিল, "মোর শকতি নাহি উড়িবার"। প্রশ্ন উঠবে, শক্তি না-হয় ছিল না, ইচ্ছা তো থাকতে পারত; তা-ই কি ছিল? না, তা-ও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই ইচ্ছাহীনতার কথাটাকে খুব স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু যা বলেছেন, তাতেই বোঝা যায় যে, বন্ধনহীন জীবন যাপনের জন্য যে ইচ্ছা থাকা দরকার, খাঁচার পাখির মধ্যে সেই ইচ্ছাটাই ইতিমধ্যে মরে গিয়েছিল। বন্ধনকে অস্বীকার করতে হলে কিছু দায়িত্ব স্বীকার করতে হয়। খাঁচার পাখি সেই দায়িত্ব স্বীকার করেনি। স্বীকার করতে ভয় পেয়েছে।

অনেকেই পায়। সেই ক্রীতদাসদের কথা স্মরণ করা যাক, মুক্তি পাবার পরেও যাদের অনেকে একদিন মুক্তি নিতে চায়নি। স্বাধীনতা যে মোটেই নির্দায়িক ব্যাপার নয়, নিজের পায়ে খানিকটা পথ হাঁটবার পরেই এই সহজ কিন্তু নির্মম সত্যটা তারা বুঝেছিল, বুঝে ভয় পেয়েছিল; ভয় পেয়ে আবার পুরাতন প্রভুর কাছে ফিরে এসেছিল। পরাধীন ভারতবর্ষেও এমন মানুষ আমরা সকলেই দেখেছি। কিছু-না-কিছু দেখেছি। আসন্ন স্বাধীনতার চিন্তা তাঁদের চিত্তে এতটুকু সাড়া জাগাত না। সাতচল্লিশের সেই উদ্দীপনাময় দিনগুলিতেও তাঁরা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়িয়েছেন। হাটে-মাঠে ট্রামে-বাসে নিচুগলায় পরস্পরকে প্রশ্ন করেছেন, "সায়েবরা চলে গেলে কী হবে মশাই? রাজ্য অচল হয়ে পড়বে না তো?"

স্বাধীনতার চিন্তায় তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন। তাঁদের ভয় আসলে দায়িত্বকে। নিজের হাতে রাজ্য চালাতে গেলে দায়িত্ব নিতে হয়; দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজ করতে চাইলেও তার দায়িত্ব তাঁরা নিতে চাননি। ফলত, প্রায় অনিবার্য-ভাবেই তাঁরা ভেবেছেন যে, সাহেবরা যদি কায়েম হয়ে থাকে, তাহলেই ভালো। কেন-না, ভিনদেশি ওই মানুষগুলি যদি আমাদের গার্জেন হিসেবে থেকে যায়, তাহলে আর কোনও দায়িত্ব আমাদের নিতে হয় না। দায়িত্ব যা নেবার, তা সাহেবরাই নেবে। সিদ্ধান্ত যা করবার, তা সাহেবরাই করবে। আমরা তাদের হুকুম অনুযায়ী কাজ করে যাব মাত্র। তাতে অসম্মান আছে, কিন্তু ঝুঁকি নেই।

স্বীকার করা ভালো, দায়িত্বের ভয়ে যাঁরা স্বাধীনতাকে ভয় পান, তাঁরা কোনও বিশেষ শ্রেণি কিংবা ক্ষেত্রের মানুষ নন। সমাজের সর্বত্র তাঁদের সন্ধান পাওয়া যাবে। তবে, বলা বাহুল্য, সাহিত্যিক আর চিন্তাবিদ যখন দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চান, এবং স্বাধীনতার নামে আতঙ্ক বোধ করেন, তখন সেটা দ্বিগুণ দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তার কারণ, তাঁদের ভীরুতার পরিণাম শুধু তাঁদের জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না, আরও অনেকের জীবনে তার প্রভাব পড়ে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা স্বাধীনতাকে ভয় পান, এমন একটা ব্যবস্থাই তাঁদের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা করা স্বাভাবিক, সাহিত্যিককে যেখানে নিজের দায়িত্বে কাজ করতে হবে না, নির্দেশটা যেখানে অন্যের মুখ থেকে উচ্চারিত হবে, এবং সাহিত্যিকরা যেখানে স্রেফ নির্দেশ পালন করেই দায় চুকিয়ে দিতে পারবেন। এক অধ্যাপককে আমি বলতে শুনেছি যে, এই আকাঙ্ক্ষা বস্তুত নাবালকের আকাঙ্ক্ষা। এই কামনা সেই দড়কচা-মেরে-যাওয়া নাবালকের, বড়ো হয়ে উঠতে এবং বয়স্ক মানুষের দায়িত্ব বহন করতে যে ভয় পাচ্ছে।

কিন্তু, যেমন শরীরে তেমনই মনে, বড়ো হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার; ছোটো হয়ে থাকাটা নয়। দায়িত্ব নেবার চেষ্টাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার; দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টাটা নয়। স্বাধীন হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার; অন্যের ইচ্ছার অধীন থাকাটা নয়।

স্বাধীনতায় যন্ত্রণা আছে, কে না জানে। কিন্তু যিনি সুস্থবুদ্ধির সাহিত্যিক, একটা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা তাঁর কাম্য হতে পারে না। দায়িত্ব ও যন্ত্রণাকে তিনি স্বীকার করে নেবেন। তাঁর স্বাধীনতায় তিনি অটল থাকবেন।

শ্রাবণ ১৩৭০

কাব্যনাট্যের জন্য

কাব্যনাট্য সম্পর্কে, খুব সাধারণভাবে, এখানে কিছু বলতে চাই। বলতে চাই সেই আন্দোলন সম্পর্কেও, অদ্যাপি যার সূত্রপাত হয়নি, কিন্তু অবিলম্বে যার সূচনা হওয়া দরকার। পদ্যবন্ধে নাটক লেখার দায়িত্ব সম্পর্কে দীর্ঘকাল আমরা উদাসীন থেকেছি। সেই ঔদাসীন্যের এখন অবসান বাঞ্ছনীয়। অন্যথায়, এ-ব্যাপারে আমাদের অনিচ্ছা যদি ক্রমেই আরও শিকড় গেড়ে বসে, তাতে লাভের আশা তো নেই-ই, ক্ষতির আশঙ্কা সমূহ। আর-কিছু না হোক, ভাবনা প্রকাশের অন্তত একটি মাধ্যম ইতিমধ্যে আমাদের অনায়ত্ত থাকছে। তার ক্ষতিও সামান্য নয়।

অবশ্য এমন অনেকে আছেন, সাহিত্যের মাধ্যম নিয়ে যাঁরা বিশেষ মাথা ঘামান না। তাঁরা হয়তো বিশ্বাস করেন যে, বিষয়ের সঙ্গে মাধ্যমের কোনও সম্পর্ক নেই; বিশ্বাস করেন যে, বিষয়বস্তু পালটে গেলেই যে মাধ্যমেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে, এমন কোনও কথা নেই; বিশ্বাস করেন যে, লেখক যে-ক্ষেত্রে শক্তিশালী, যে-কোনও চিন্তার রূপায়ণ সে-ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে অসম্ভব— যে-কোনও মাধ্যমের সাহায্যে।

রূপায়ণ হয়তো সম্ভব। কিন্তু সার্থক রূপায়ণ সম্ভব কি না, তাতে সন্দেহ করি। পক্ষান্তরে, আমার সন্দেহ নেই যে, গল্পের কথা গল্পে বলাই ভালো; কবিতার কথা কবিতায়। উপন্যাসের কথা বলবার জন্য উপন্যাসই লিখতে হবে; নাটকের কথা বলবার জন্য নাটক। ভাবনার অভিব্যক্তি যেহেতু অন্যথায় বিশেষ বল পায় না। বস্তুত, এমন কবিতা, অনুমান করি, সকলেই কিছু-না-কিছু পড়েছেন, যা পড়তে হয়তো ভালোই লেগেছে, কিন্তু একই সঙ্গে আবার পাঠককে যা মনে না-করিয়ে ছাড়েনি যে, লেখক যে-কথা বলতে চান, তা হয়তো প্রবন্ধের মাধ্যমেই আরও ভালো করে বলা যেত। নিজের কথা বলতে পারি, এমন কবিতা আমি অনেক পড়েছি। এমন গল্পও পড়েছি, গল্প না বলে যাকে উপন্যাসের অঙ্কুর বললেই ঠিক হয়। পড়ে মনে হয়েছে, লেখক যেন তাঁর চিন্তাকে এখানে, অর্থাৎ ছোটোগল্পের আঁটসাঁট শরীরের মধ্যে, ঠিকমতো খেলাতে পারেননি; যেন, বিষয়বস্তুর প্রতি সুবিচারের স্বার্থে, গল্পের বদলে একটি উপন্যাস লেখাই তাঁর উচিত ছিল। আবার, এমন উপন্যাস একালে কে না পড়েছেন, আসলে যা কিনা গল্পেরই সম্প্রসারণমাত্র?

প্রসঙ্গত এলিয়টের একটি উক্তিকে এখানে উদ্ধার করতে চাই। তাঁর বিশ্বাস, "...anything that can be said as well in prose can be said better in prose."। যে-প্রসঙ্গে তাঁর এই বিশ্বাসের কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, মূলত যা কিনা গদ্যে বলবার বিষয়, তা নিয়ে কাব্যরচনায় তিনি অনাগ্রহী।

প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে এলিয়ট যেখানে গদ্যে-পদ্যে পার্থক্য টানার পক্ষপাতী, স্বাতন্ত্র্যের সীমানাকে সেখানে আরও বাড়ানো যায়। বলা যায় যে, গদ্যের রূপ একটি-মাত্র নয়, এবং পদ্যের পদ্ধতিও একাধিক। বলা যায় যে, সব রকমের কাব্য-ভাবনাকে সব রকমের কাব্য-পন্থায় প্রকাশ করা যায় না। বলা যায় যে, এমন অনেক বিষয় আছে, কবিতা না লিখে যা নিয়ে নাটক লেখাই বাঞ্ছনীয়। অপিচ, কবিরা যখন নাটক লিখবেন, তখন যে তাঁরা কাব্যনাট্যই লিখবেন, এ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রশ্ন উঠবে, কাব্যনাট্য রচনার প্রয়োজন সত্যিই ঘটেছে কি না। অর্থাৎ, এমন কোনও বিষয় সত্যিই দেখা দিয়েছে কি না, কবিদের পক্ষে একমাত্র নাটকের মাধ্যমেই যার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব। আমার মনে হয়, দিয়েছে। মনে হয়, এমন অনেক ঘটনা এখন ঘটছে, এমন অনেক পরিবেশ এখন তৈরি হচ্ছে, দৃশ্যপটের এমন অনেক পরিবর্তন আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, এবং— সর্বোপরি— এমন অনেক ভাবনা আমাদের জীবনকে এখন গ্রাস করছে, একমাত্র নাটকের মাধ্যমেই যার চরিত্রকে ঠিকমতো ফুটিয়ে তোলা যায়। বিশেষত এইজন্য যে, যেসব বিষয়ের আমি এখানে আভাসমাত্র দিয়েছি, তার অন্তঃস্থ আবেগ অত্যন্তই ক্ষুব্ধ, অস্থির এবং বলবান। এত বেশি বলবান যে, সেই উত্তাল আবেগকে যদি সাধারণ একটি কবিতার মধ্যে এনে জায়গা দেওয়া হয়, তার প্রকাশভঙ্গি তাহলে ঈষৎ 'নাটকীয়'— এমনকি, 'নাটুকে'— হয়ে উঠবার আশঙ্কা থাকে। অথচ, সাধারণ একটি কবিতায় যার উপস্থিতি অনেকের বিরক্তি ঘটায়, 'নাটকীয়তা' নামক সেই লক্ষণ অবশ্যই নাটকের মধ্যে ক্ষমার্হ।

শুধু তা-ই নয়, আমরা যখন নাটক দেখি, অথবা পড়ি, বিক্ষোভের একটি প্রত্যাশাও যেন তখন স্বতই আমাদের মধ্যে জাগরূক হয়ে ওঠে। আমরা আশা করতে থাকি যে, বাসনার বিভিন্ন বর্ণের বিরোধ এখানে আরও তীব্র হবে; বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার পার্থক্য আরও প্রশ্নাতীত। যেন আমরা ধরেই নিই যে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ভাবনার সংঘাত এখানে আরও স্পষ্ট, এবং আবেগের উত্থানপতন আরও নগ্ন চেহারায় দেখা দেবে। বস্তুত, প্রকাশভঙ্গিমার এই নগ্ন প্রবলতাই যে ক্লাইম্যাক্স অর্থাৎ তুঙ্গ-পরিণতির— জীবনে যা না-ও আসতে পারে, কিন্তু নাটকে যা অনিবার্য— আয়োজনকে আরও সহজ করে তোলে, তাতে সন্দেহ করি না।

বিস্ময়ের কথা, সাহিত্যে নয়, জীবনেই সেই তুঙ্গ-পরিণতির আয়োজন যে-কালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সাহিত্যে তাকে চিত্রিত করবার আগ্রহ তখনও দেখা দেয়নি। বলা বাহুল্য, সাহিত্যে যদি তাকে চিত্রিত করতে হয়, তবে— জীবন যেহেতু নিজেই এখন নাটকীয় লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত, অতএব— নাটকের মাধ্যমেই তা করতে হবে। করা সম্ভব হবে, নাটক সম্পর্কে আমাদের মৌল অনিচ্ছার যদি অবসান হয়।

আমার আগ্রহ, স্বভাবতই, গদ্যে-লেখা নাটক সম্পর্কে ততটা নয়, যতটা কাব্যনাট্য সম্পর্কে। তার কারণ অবশ্য নিতান্ত এই নয় যে, পদ্যের তুলনায় গদ্যে আমার কলম আরও অপটু। বলা বাহুল্য, সেটাও একটা বড়ো কারণ। কিন্তু কাব্যনাট্যের প্রতি আমার পক্ষপাতের যেটা প্রধান হেতু, তা এই যে, নৈর্ব্যক্তিক বিচারে, কাব্যের ভাষায় এমন একটা অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা থাকে, গদ্যে যাকে পাওয়া যায় না। আমি 'ব্যঞ্জনা' বলেছি; আমার এক তরুণ বন্ধু বলেন 'ডাইমেনশন'। কাব্যনাট্যের সপক্ষে তিনি আমাকে বোঝালেন যে, নাটক যখন কবিতায় লেখা হয়, তখন তাতে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোজনাও সহজ হয়ে ওঠে। তাঁর উক্তির আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কাব্যনাট্যের সংলাপ কি পুরোপুরি কবিতায় লেখা হবে, নাকি অংশত গদ্যে? এলিয়টের ধারণা, একালে যিনি নাটক লিখবেন, তাঁর পক্ষে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ ঘটানো কোনও কাজের কথা নয়। কেন-না, দর্শকসমাজ একদা, একই নাটকে, গদ্য ও পদ্য, এই দ্বিবিধ ভাষার সংলাপ শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সেই অভ্যাসের ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটেছে; অচিরে যে তার পুনরুজ্জীবন হবে, এমনও মনে হয় না। সুতরাং "...a mixture of prose and verse in the same play is generally to be avoided"; বিশেষ করে এই জন্যে যে, "each transition makes the auditor aware, with a jolt, of the medium.'।

কাব্যনাট্য রচনায় যেহেতু এলিয়টের সিদ্ধি একালে তর্কাতীত, অতএব ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁর এই পরামর্শকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা বড়োকথা, তা এই যে, নাটকের সঙ্গে মঞ্চের সম্পর্ক প্রায় অঙ্গাঙ্গী; নাটক যদিও শুধুই দর্শনীয় অথবা শ্রাব্য নয়, পাঠ্যও, তবু পাঠকের মুখ চেয়ে, শুধুই পাঠকের মুখ চেয়ে, কেউ নাটক লিখতে চান না; এবং গদ্য-নাটকের মঞ্চ-সম্ভাবনাই যেখানে সুদূর, কাব্যনাট্য রচনায় কাউকে উৎসাহী করে তোলা সেখানে আদৌ সহজ কর্ম নয়। (আমি নিজে অবশ্য বিশ্বাস করি না যে, তুল্যমূল্য দুখানি গদ্য-নাটক ও কাব্যনাট্যের মধ্যে শেষোক্তের মঞ্চ-সাফল্যের সম্ভাবনা কিছুমাত্র কম।)

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। কাব্যনাট্য যাতে অভিনীত হয়, কবিরা তাঁদের আপন উদ্যোগেই তার ব্যবস্থা করতে পারেন। বলা বাহুল্য, সেই ব্যবস্থার মধ্যে একটা সামগ্রিক আন্দোলনের আভাস থাকা চাই। পরিচিত প্রায় সকল কবির সঙ্গেই এ-সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি; এমনও মনে হয়েছে যে, এ-ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহের অভাব নেই; কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে, তাঁদের সংকল্প যেহেতু বাচনিকমাত্র, তাই কার্যক্ষেত্রে তাঁদের দেখা মেলে না। ফলত, অবস্থাটা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে, বিচ্ছিন্নভাবে যদিও একালের কবিদের একটি-দুটি কাব্যনাট্য ইতস্তত মঞ্চস্থ হচ্ছে, তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট, ব্যাপক ও পরিচ্ছন্ন আন্দোলনের আজও সূচনা হয়নি। অবস্থাটা শোকাবহ তাতে সন্দেহ নেই।

আষাঢ়, ১৩৬৮

কবিতার কেন্দ্রে

প্রথম বক্তা বললেন, এ এক তাজ্জব ব্যাপার। যা আমি দেখি, তা আমি লিখি না। অসুখ দেখেও আমি সুখের কথা লিখি। আমার চারপাশে যাদের দেখতে পাচ্ছি, যারা আমার চেনা মানুষ, তাদের কেউই নেহাত সুখে নেই। কাঁধের উপরে মস্ত একটা চটের থলি নিয়ে দশ বছরের যে রোগা-টিংটিঙে ছেলেটা রোজ ডাস্টবিন ঘেঁটে ময়লাকাগজ কুড়িয়ে বেড়ায়, কিংবা শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় আমি নিত্য যাকে আবেদন জানাতে শুনি : একটা মাজন নিন বাবু, কিংবা রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যারা ছেঁড়া ডালা আর ভাঙা কুলোর সংসার সাজিয়ে বসেছে, যাদের একটা জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আর-একটা জীবন আজও শুরু হয়নি, কিংবা হাটের এবং মাঠের সেইসব মানুষ, যারা মনুমেন্টের তলায় মিটিং বসাচ্ছে, চৌরাস্তায় মিছিল বার করছে, শূন্যে হাত ছুড়ছে, এবং অন্য দিকে— ট্রামে কিংবা বাসে উঠে— যে-কোনও ছুতোয় ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্ছে, তাদের কাউকেই আমি সুখী বলতে পারি না। প্রত্যেকেই তারা অসুখী। তাদের অনেকেই দু-বেলা খেতে পায় না; কেউ-কেউ ইশকুলে-কলেজে পড়তে পায়। অথচ, তাজ্জব ব্যাপার, তাদের নিয়ে আমি কবিতা লিখি না।

কবিতা লিখি প্রেম নিয়ে, দ্বিতীয় বক্তা বললেন, ঘাস-ফুল-পাখি নিয়ে। ধর্মতলার মোড়ে বছর-পাঁচের একটা ছেলেকে একবার খুব মার খেতে দেখেছিলুম। কী যে তার অপরাধ, আমি আজও জানি না। শুধু মনে আছে, ছেলেটা কাঁদছিল। ডুকরে-ডুকরে কাঁদছিল। আর কোঁকড়াচুলো, কালো, সিরিঙ্গে একটা লোক, সম্ভবত তার বাবা, ওই বাচ্চাছেলের মাথাটাকে একটা ল্যাম্পপোস্টের উপরে ঠুকে দিতে-দিতে বলছিল, “ক্যান মনে থাকে না তর? ক্যান? ক্যান?” ধর্মতলা থেকে বাড়ি ফিরে একটা কবিতা লিখেছিলুম সেদিন। কিন্তু, স্বীকার করা ভালো, কোনও শিশুর কান্নার যন্ত্রণা তাতে বাজেনি। স্বীকার করা ভালো, জীবনের একটা নিদারুণ যন্ত্রণার সাক্ষী হয়েও আমি সেদিন একটি প্রেমের কবিতা লিখেছিলুম।

তৃতীয় বক্তা বললেন, অনেকেই লেখে। তবে অনেকেই জানে না যে, এ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে সংকোচের কোনও কারণ নেই। কারণ থাকত, যদি বুঝতুম,

প্রেম এখানে পলাতকের আশ্রয়। কিন্তু তা তো নয়। কেউই আমরা পলাতক নই। আমার কথাই ধরো। সকালে আমি বাজারে যাই, দুপুরে এসপ্লানেডে। বিকেলে ছাত্র পড়িয়ে আবার রাত দশটায় পদ্য বানাতে বসি। এ কি পলায়নের লক্ষণ? না বাপু, বিস্তর মার খাচ্ছি বটে, কিন্তু অদ্যাপি হাল ছাড়িনি। লাঠি-হাতে লড়াই করছি না বটে, কিন্তু মাটি আঁকড়ে পড়ে আছি। একা আমি নই। আরও অনেকে। রাম, শাম, যদু, মধু, রাখাল কিংবা নবীন নামে যাদের পরিচয়। তাদের সঙ্গে আমার তফাত মাত্র একটি। তারা গান বানাতে জানে না। আমি জানি। আমি তাদের জন্যে গান বানাচ্ছি। প্রেমের গান। অপ্রেমের গান নয় কেন? এই জন্যে নয় যে, অপ্রেমে তাদের রুচি নেই।

প্রয়োজনও নেই, চতুর্থ বক্তা বললেন, অপ্রেমের অন্ধকারেই যেহেতু তারা এখন বন্দি হয়ে আছে। আমি তো সেই অন্ধকারের উপরে মহত্ত্ব আরোপ করতে চাই না। আমি চাই, অন্ধকারকে তারা ভেঙে ফেলুক। তা তারা ভাঙবে না, যদি না কেউ তাদের জানিয়ে দেয় যে, কঠিন সেই অন্ধকারের বাইরে— দ্বিতীয় কোনো অন্ধকার নয়— নরম একটা আলোর নদী আছে। মাথার উপরে নীল একটা আকাশ, এবং পায়ের তলায় সবুজ একটা মাঠ আছে। আকাশে মেঘ এবং মাঠে ফুল আছে। এককথায় প্রেম আছে। আমি জানাব। আমি তাই প্রেমের গান গাই।

আলোচনা শেষ হল। আমরা পথে গিয়ে নামলুম। কে যেন বলল, "কই, আপনি তো কিছু বললেন না?"

আমি কিছু বলিনি। আমি ভাবছিলুম অতিপরিচিত সেই খেলাটার কথা, অক্ষর পালটে-পালটে 'কালো'কে যেখানে 'সাদা' বানাতে হয়।

কবিতার কেন্দ্রেও কি অমন কোনও খেলা চলছে? 'অপ্রেম'কে 'প্রেম' বানাবার খেলা?

১৩৬৭

সাহিত্য ও সরকার

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে, নানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রকল্প অনুযায়ী, উন্নয়নের কাজ চলছে। শিল্পের ক্ষেত্রে, কৃষির ক্ষেত্রে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। সাহিত্যও সমাজছাড়া ব্যাপার নয়। সমাজের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে গেলে তাই শুধু শিল্প কৃষি আর বাণিজ্যের উন্নতি ঘটালেই চলে না। আর-পাঁচটা ব্যাপারের সঙ্গে সাহিত্যেরও উন্নতি ঘটাতে হয়। এক্ষেত্রেও আমাদের সরকার, অতএব, হাত গুটিয়ে বসে নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

খুব সুখের কথা। আরও সুখের হত, যদি বুঝতুম যে হাতটা বাড়িয়ে দেবার আগে কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন তাঁরা বেশ ভালোভাবে চিন্তা করে নিয়েছেন। যেমন— সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সরকারি সহযোগিতা, তার উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, সবসময়েই শুভঙ্কর হয় কি না। যেমন, সহযোগিতা যদি করতেই হয়, কীভাবে করা উচিত, প্রত্যক্ষভাবে, না পরোক্ষভাবে। যেমন, যেভাবে সহযোগিতা করা হবে, তার ফলে সাহিত্যের উপরে অফিশল্‌ডমের প্রভাব বিস্তৃত হবার আশঙ্কা থাকবে কি না। যেমন, যদি সে-আশঙ্কা থাকে, সাহিত্যিকদের উপরে (সাহিত্যিকরাও যেহেতু রক্তমাংসেরই মানুষ) তার কী কী প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। কয়েকটিমাত্র প্রশ্নের এখানে উল্লেখ করলুম। এমন আরও অনেক প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলি— আশঙ্কা করি— সরকারি কর্তাব্যক্তিদের মস্তিষ্কে কোনও আলোড়ন তোলেনি।

আমাদের প্রশ্নটা, প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো, সাহিত্য অকাদেমির প্রবর্তনা নিয়ে নয়। এই প্রতিষ্ঠানটি অবশ্য ইতিমধ্যেই অনেকের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে, এবং সেই আক্রমণ যে সর্বাংশেই অকারণ, এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু আক্রমণ করতে গিয়ে এই সহজ কথাটা আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই যে, সাহিত্য অকাদেমির স্থাপনা এমন কোনও অভূতপূর্ব কাজ নয়, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনও সভ্য দেশে ইতিপূর্বে যা করা হয়নি। সাহিত্যপ্রয়াসকে প্রেরণা জোগাবার জন্য সভ্য ও প্রাগ্রসর প্রায় সকল দেশেই, যে-নামেই হোক, অনুরূপ একটি-না-একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতবর্ষেও যে অকাদেমির প্রবর্তনায় অহেতুক কালক্ষয় করা হয়নি, তাতেই বরং আমাদের খুশি হওয়া উচিত। প্রশ্ন হল, আমাদের

দেশের সরকার আমাদের দেশের সাহিত্যপ্রয়াসকে কীভাবে প্রেরণা জোগাবেন,—অকাদেমির মাধ্যমে ও অন্যান্য পন্থায়? সরকারি কার্যকলাপে এ-যাবৎ এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া গিয়েছে, তাতে খুব উৎসাহিত হওয়া চলে না। কেন চলে না, সে-কথা পরে আসবে। তার আগে আরও দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

যেমন অন্যান্য দেশে, তেমনই ভারতবর্ষেও এ-যাবৎ সাহিত্যের দুটি পৃথক ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। একটি ধারা নাগরিক, অন্য ধারা লোকসাহিত্যের। লোকসাহিত্য কোনও ব্যক্তিগত অথবা প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না; নাগরিক সাহিত্য রাখে। যেমন অন্যান্য দেশের, তেমনই ভারতবর্ষের নাগরিক সাহিত্যও ঠিক সেইসব সময়েই সর্বাধিক সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তার পিছনে যখন রাষ্ট্রশক্তির সক্রিয় সমর্থন ছিল। বিদেশি ইতিহাসের ছাত্ররা এই প্রসঙ্গে এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডের কথা উল্লেখ করবেন। আমরা সে-ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের কথা স্মরণ করব। ভারত-ইতিহাসে গুপ্তযুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। তার হেতু কি শুধুই সামরিক সামর্থ্য অথবা বৈষয়িক সমৃদ্ধি? তা নিশ্চয়ই নয়। আসলে, এদেশের সাংস্কৃতিক প্রয়াসও তখন রাষ্ট্রশক্তির আত্যন্তিক দাক্ষিণ্য পেয়েছিল। সেই সময়কার ভারত-সংস্কৃতি যে নানা দিক থেকে এত সহজে এত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এই দাক্ষিণ্য তার অন্যতম মৌল কারণ। রাষ্ট্রীয় দাক্ষিণ্য তখন এমন একটি অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিল, সাংস্কৃতিক প্রতিভা যার মধ্যে স্ফূর্তি পায়। একালের রাষ্ট্রনায়কেরাও যদি আজ আবার সেই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন, এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনকল্পে যদি আবার সেই একই দাক্ষিণ্যের দুয়ার খুলে দেন, তাতে বিস্মিত হব না।

শুধু একটি কথা আমরা বিনয়-সহকারে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেব। সেটা এই যে, সময় এখন অনেক পালটে গিয়েছে, এবং— সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে— নাগরিক সাহিত্য আর লোকসাহিত্যের অন্তত একটি ব্যবধান এখন ধীরে-ধীরে কমে আসছে। নাগরিক সাহিত্যও আর আজকাল আগের মতন তত ব্যাপকভাবে কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ বা রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। যুগের হাওয়া এখন যে-দিকে বইছে, তাতে মনে হয়, ব্যবধানটা কালক্রমে আরও হ্রাস পাবে, এবং এমন একদিন হয়তো আসবে, যখন এই দুইয়ের মধ্যে—অন্তত এই একটা ব্যাপারে—কোনও পার্থক্য থাকবে না। যেমন লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে, তেমনই নাগরিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও জনসাধারণই সেদিন সমস্ত পৃষ্ঠপোষণার দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নেবে। এবং সেদিন হয়তো খুব দূরবর্তীও নয়। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ইতিমধ্যেই সেই হাতবদলের কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। মুদ্রণ ও প্রকাশনব্যবস্থা এখনও এদেশে তেমন উন্নত নয়; উপরন্তু একদিকে যেমন

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জনসাধারণের একটা মস্ত অংশ এখনও মুক্তি পায়নি, অন্যদিকে তেমনই দারিদ্র্য এখনও ব্যাপক। ডালভাতের সংস্থান করতেই যারা গলদ্‌ঘর্ম, তারা বই কিনবে কোত্থেকে? কিন্তু এই অবস্থা নিশ্চয় চিরকাল থাকবে না। অবস্থা নিশ্চয় পালটাবে, এবং—বইয়ের চাহিদা বাড়বার ফলে মাস-প্রোডাকশনের অনুকূল পরিবেশ যদি গড়ে ওঠে, তা হলে—প্রকাশন-সংস্থাগুলিও নিশ্চয় আরও শস্তায় বইপত্তর জোগাতে পারবেন। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণার যে-দায়িত্ব একদা রাষ্ট্রের, এবং রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল, সেই দায়িত্ব তখন সার্বিকভাবে সমাজের হাতে গিয়ে পৌঁছোবে।

কথাটাকে কে কীভাবে নেবেন জানি না, কিন্তু বলে রাখা দরকার যে, সাহিত্যের কাজটা সর্বদাই কিছু মনোরঞ্জনের কাজ নয়। মাঝে-মাঝেই সেখানে দু-একটি কটু কথা বলবার, দু-একটি রূঢ় সত্য উচ্চারণের দরকার হয়ে পড়ে। অথচ, সাহিত্যের যিনি পৃষ্ঠপোষক, স্বভাবতই তিনি আশা করতে থাকবেন যে, অন্তত তাঁকে কোনও কটূক্তির লক্ষ্য হতে হবে না। সরকার যদি পৃষ্ঠপোষক হন, তিনিও আশা করবেন। যেমন স্বৈরতন্ত্রী নানা দেশে করছেন। আর সমাজ যদি পৃষ্ঠপোষক হয়, সে-ও আশা করবে। যেমন বাদবাকি সব দেশেই করছে। তাহলে? সাহিত্যিক তো কোনও অন্যায় আশা মেটাতে পারবেন না। না সরকারের, না সমাজের। সাহিত্যের উন্নতির চাইতে সাহিত্যিকের স্বাধীনতার প্রশ্ন তো কিছু কম জরুরি নয়।

সমস্যাটা জটিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরও সমাধান আছে। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। সুতরাং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণার দায়িত্ব এ-দেশে, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতোই, কালক্রমে সমাজের হাতেই গিয়ে ন্যস্ত হবে। কিন্তু সরকারের দায়িত্ব তাতে ফুরোবে না। সরকারকে লক্ষ রাখতে হবে, সাহিত্যিককে যেন সমাজের কোনও অন্যায় আশা মেটাতে না হয়। না মিটিয়েও তিনি যেন তাঁর আপন লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারেন।

কিন্তু সরকার কি এই নিষ্কাম সাধনায় উৎসাহী হবেন? সরকারি কর্তাদের ক্রিয়াকলাপে এযাবৎ যেটুকু বুঝতে পারা গিয়েছে, তাতে খুব আশান্বিত হওয়া চলে না। অকাদেমির ভিতরে ও বাইরে তাঁদের মানসিক প্রবণতার যে-চিত্র ধীরে-ধীরে ফুটে উঠছে তাতে মনে হয়, সাহিত্যিকের স্বাধীনতা থাকল কি গেল, তা নিয়ে তাঁদের তেমন-কিছু মাথাব্যথা নেই। মনে হয়, তাঁদের নিজেদেরই কিছু-কিছু দাবি-দাওয়া আছে, এবং সরকারের কাছে কিছু আশা করতে হলে সেই দাবি-দাওয়াগুলিকে একে-একে মিটিয়ে যেতে হবে। রাজদরবারে সাহিত্যকে তাঁরা সাহায্য দেবেন অবশ্যই; কিন্তু সাহিত্যের আপন দরবারে প্রথম শ্রেণির কয়েকটি আসন হয়তো একে-একে হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেখানে আমলারা এসে জাঁকিয়ে

বসবেন। সাহিত্যিকদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে যে-যাঁর আপন কাজ গুছিয়ে যাবেন, এবং তার কোনও প্রতিবাদ করা চলবে না। প্রবন্ধের সূত্রপাতে অফিশল্‌ডমের প্রভাবের কথা বলেছি। সে-প্রভাব যে এত দ্রুত দেখা দেবে, কে জানত।

কেউ-কেউ জানতেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁরা এই অন্যায় প্রবণতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট কোনও প্রতিবাদ জানাননি। তাঁরা হয়তো আশঙ্কা করেন যে, প্রতিবাদ জানালে সাহিত্যের উন্নতি তেমন দ্রুত হবে না। অথবা হয়তো আশঙ্কা করেন যে, তাঁদের নিজেদের উন্নতি তাতে ব্যাহত হবে। আগেই আভাস দিয়েছি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমলাদের অনুপ্রবেশ ঘটলে সাহিত্যিকদের উপরেও তার অপপ্রভাব বিস্তারিত হতে পারে। কিন্তু তা-ও যে এমন দ্রুত বিস্তারিত হবে, তা-ই-বা কে জানত।

আসলে, রাষ্ট্র ও সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য থেকে সাহিত্যকে যত দূরে সরিয়ে রাখা যায়, ততই ভাল। তাতে করে সাহিত্যের উন্নতি দ্রুত হোক আর না-ই হোক, সাহিত্যিকের অবনতি অন্তত রোধ করা যাবে। আঁদ্রে জিদ বলেছিলেন, যিনি শিল্পী, চলতি স্রোতের বিরুদ্ধে তাঁকে সাঁতার কাটতে হয়, এবং সেটাই তাঁর ধর্ম। বলা বাহুল্য, সাহিত্য যখন রাষ্ট্র ও সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যের আওতায় আসে, সাহিত্যিকের ধর্মরক্ষা তখন শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সরকার তাহলে কী করবেন? আমাদের বক্তব্য, যদি কিছু করতে চানই, পরোক্ষভাবে করুন। পরিকল্পনার সাহায্যে 'মেঘদূত' কিংবা 'গীতাঞ্জলি' কিংবা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' লেখানো যায় না, কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ঘটানো যায়। শিক্ষার তাঁরা বিস্তার ঘটাতে থাকুন। সমগ্র দেশ যদি সাক্ষর হয়, সাহিত্যের গায়েও তার হাওয়া লাগবে। দেশবাসীর রুচি যদি উন্নত হয়, সাহিত্যের সাধারণ মানও তখন আপনা হতেই উন্নত হবে। তার জন্য সম্মেলন ডাকতে হবে না, কৃপাকটাক্ষ বিতরণেরও দরকার হবে না।

কিন্তু আবার বলি, সরকার কি এই নিষ্কাম প্রেমে উৎসাহী হবেন?

১৩৬৪

সাহিত্যের ভূগোল

বন্ধুবরেষু,

আচমকা একখানা স্কান্দিনেভীয় উপন্যাস আমার হাতে এসেছে। বড়োমাপের উপন্যাস, পৃষ্ঠাসংখ্যা পাঁচশোর কিছু বেশি, তার মধ্যে অর্ধেকও আমার পড়া হয়ে ওঠেনি। না হোক, লেখক যা বলতে চান, তার একটা মোটামুটি আভাস ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। কাহিনি খুব জমজমাট নয়, একটু-বা মন্থর, কাব্যধর্মী, চরিত্রসংখ্যা অল্প, তারা সব সোজা-সোজা কথা বলে, ঘটনার মধ্যেও বিশেষ-কিছু মারপ্যাঁচ নেই। না থাক, চিত্তাকর্ষক এর পটভূমিকা। স্থানকালের সংকীর্ণ সীমানায় আস্থাহীন স্বপ্নসম্বল এক শিল্পী, হৃদয়ের কী এক অনির্দেশ্য, অনিবার্য তাড়নায় দেশ থেকে দেশান্তরে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর বিশ্বাস, দেশে-দেশে তাঁর ঘর আছে পাতা। তাঁর সংকল্প, সেই ঘর তিনি খুঁজে নেবেন। ভ্রাম্যমাণ এই শিল্পীর সঙ্গ নিয়ে ইতিমধ্যেই তিন-তিনটে মহাদেশ দেখা হল আমার। আপাতত তিনি জাহাজে, ঝড়ের প্রলয়-দোলে অকূল সমুদ্রকোলে দুলছেন। যদি না জাহাজডুবি হয়, তাঁর অন্বেষণেচ্ছা যদি অব্যাহত থাকে, এবং বাকি পাতাগুলিও যদি শেষ করে উঠতে পারি— না পারার কোনও সংগত কারণ নেই— তো আশা আছে আগামী কালের মধ্যেই হয়তো আর-দুটো মহাদেশও আমার দেখা হয়ে যাবে।

সেটা আমার ব্যক্তিগত লাভ। বিশ্বাস করতে পারেন, এই অ-ব্যয় দেশভ্রমণের একটা সালংকার বর্ণনা শুনিয়ে আপনার সদয় হৃদয়ে ঈর্ষা সঞ্চারের কোনও অসাধু বাসনা আমার নেই। আমি ভাবছি আর-একটা কথা। স্থানকালপাত্রের যে-বাঁধাধরা চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের চলাফেরা, কে তাকে লঙ্ঘন করতে চান? উপন্যাসের নায়ক সেই শিল্পী, নাকি উপন্যাসের লেখক? সেটাই আমার সত্যি বলে মনে হচ্ছে। বইখানার মধ্যে অসাধারণত্ব অবশ্য কিছু নেই। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি খুব উদার হয়তো, তবে বক্তব্য পুরোনো, ভঙ্গিটাকেও নতুন বলতে পারলে আমি খুশি হতুম। আর তা ছাড়া প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রমাণ করবার জন্য নায়ককে এইভাবে নানান দেশে ঘুরিয়ে মারাটা যতই না কেন চমকপ্রদ হোক, খানিকটা ছেলেমানুষিও যে তার মধ্যে আছে, সে-কথাও অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এতসব বলার পরেও

একটা কথা থেকে যায়। সত্যিই চিত্তাকর্ষক এর পটভূমিকা। নানান দেশ, নানান দেশের মানুষ, তাদের রীতি-কানুন, জীবনপদ্ধতি, সংস্কার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, এসব তো আছেই, সেইসঙ্গে বিভিন্ন ভূখণ্ডের ভৌগোলিক দৃশ্যসম্ভারকেও লেখক যে আশ্চর্য কৌশলে তার পটভূমিকার অঙ্গীভূত করেছেন, তাতে, আর-কিছু না হোক, গৃহকাতর স্কান্দিনেভীয় সাহিত্যে এবার একটা হাওয়াবদলের কাজ হবে।

বাংলা সাহিত্যেও হওয়া দরকার। কীভাবে হবে, কার দ্বারা হবে, অত শত আমার জানবার কথা নয়। আপনারা সম্পাদকরা সেটা ভালো বুঝবেন। আমি শুধু বুঝতে পারছি, হাওয়াবদলটা এবারে আর না-হলেই চলছে না। গ্রে স্ট্রিট আর গোবরডাঙার বৃত্তান্ত আমরা অনেক শুনেছি, আর না, বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমানা এবারে আর-একটু বিস্তৃত হোক।

কথাগুলো ঈষৎ দুর্বিনীত হয়ে গেল হয়তো, হয়তো-বা একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছি, এবং— লিখতে বসে যেহেতু আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তাই—কলমের মুখে আমার উত্তেজনা হয়তো প্রকাশও পেয়ে থাকবে। তার জন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, উত্তেজিত না হয়ে আমার উপায় ছিল না।

তাহলে খুলেই বলি। কিছুদিন আগে আপনি আমাকে একখানি বই পাঠিয়েছিলেন, আপনার মনে থাকতে পারে। লেখকের নামোল্লেখ করব না, কেন-না, যদিও এ-লাইনে আমার অভিজ্ঞতা খুব অল্পদিনের, তবুও দেখছি, নামোল্লেখ করে কোনও-কিছুর সমালোচনা করাটা তেমন নিরাপদ নয়। একে তো বাংলা বই, তার উপর আপনি সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন। সুতরাং বেশ উৎসাহ নিয়ে পড়তে বসেছিলুম। পড়ে এখন বুঝতে পারছি—অপরাধ নেবেন না, সত্য কথাটা স্বীকার করাই ভালো—আমার উদ্যম তার উপযুক্ত পুরস্কার পায়নি। তার মানে এই নয় যে, বইখানি খারাপ। ভাল, বেশ ভাল। রবীন্দ্র-বর্ণিত সেই উচ্চভ্রূ সমালোচকের মতো এমন কথাও বলব না যে, ভালো হত আরও ভালো হলে। আমি শুধু বলব, লেখকের গল্প বলার কায়দাটি বেশ মনোরম, বক্তব্য সাধু, মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক সম্পর্কগত সমস্যাটাকেও তিনি খুব ভালোই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু—কিন্তু এইটুকু বলেই আমি চুপ করব না। সেইসঙ্গে আরও দু-একটি কথা আমি বলব। এই বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুন কিছু নেই, এর পটভূমিকা সেই চিরপরিচিত অতি-বাঙালি চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং সেই চেনা চৌহদ্দির চারদেয়ালের মধ্যে লেখক-মহোদয় এখানে যতই কৃতিত্ব দেখিয়ে থাকুন, দেয়ালগুলিকে তিনি ভাঙবার চেষ্টা করেননি। যদি করতেন, তাহলেই আমি সবচাইতে বেশি খুশি হতুম। অমুক লেখকের সাহিত্যে 'বাংলা দেশের একেবারে মনের কথাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে', তমুক লেখকের দৃষ্টিতে 'পল্লী বাংলার সেই শাশ্বত

রূপটি ধরা পড়িয়াছে', এসব কথায় এককালে আমি অনির্বচনীয় পুলক লাভ করেছি। আজকাল আর করি না।

প্রশ্ন করতে পারেন, বাঙালি লেখকরাই যদি বাংলা দেশের কথা না বলেন, তো কে বলবে? সে-দায়িত্ব কি ফরাসি সাহিত্যিকরা এসে পালন করবে নাকি? যদিচ ফরাসি সাহিত্যের দু-এক জায়গায় বাংলা দেশের দু-একটি উল্লেখ আমার চোখে পড়েছে, তবুও আশা করছি, এ-প্রশ্ন আপনি করবেন না। করলে বুঝব, আমার বক্তব্য আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি। কিংবা ভুল বুঝেছেন। বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের কথা থাকবে না, এমন অন্যায় আবদার আমি জানাইনি। তবে শুধু বাংলা দেশের কথাই যেন না থাকে।

কোথাকার কথা থাকবে তাহলে? বেচুয়ানাল্যান্ডের? তার উত্তরে বলব, হ্যাঁ, তার কথাও থাকবে। সেই সুদূরদুরূহ ভূখণ্ডের প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি থাক; কেন-না, যতদূর আমি জানি, আজ পর্যন্ত কোনও বাঙালি লেখকের সেখানে পদার্পণের সৌভাগ্য ঘটেনি। যেখানে-যেখানে ঘটেছে, ইতিমধ্যে সেই সেই জায়গার পটভূমিকায় দু-চারখানা গল্প-উপন্যাস যদি তাঁরা লেখেন তো আমরা, অর্থাৎ পাঠকরা, অর্থাৎ শুধু গ্রে স্ট্রিট আর গোবরডাঙার পৌনঃপুনিক উল্লেখ যারা আর শুনতে চাই না, দু-হাত তুলে তাঁদের জয়ধ্বনি দেব। বাংলা দেশের কথা তো তাঁরা লিখবেনই, তার বাইরের কথাও লিখুন।

জন্মভূমির প্রতি তাতে আনুগত্যের অভাব ঘটবে? কী যে বলেন! ইংরেজরাও তাদের জন্মভূমিকে ভালোবাসে। আমাদের চাইতে কিছু কম বাসে না। তাই বলে কি সেখানকার সাহিত্যিকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাস-কবিতার ভৌগোলিক পটভূমিকে শুধু ইংল্যান্ডের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন? ডিকেন্সের কথাই ধরুন। স্বদেশের পটভূমিকায় তিনি বিস্তর সাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু চ্যানেল পেরিয়ে ফ্রান্স পর্যন্ত ধাওয়া করতে তাঁর আটকায়নি। কিংবা, ডিকেন্সের দৃষ্টান্তে যদি সন্তুষ্ট না হন, একালের কথায় আসুন। সমরসেট মম্ আমাদের প্রিয় লেখক; একালের অতি ইনটেলেকচুয়াল সমালোচকগোষ্ঠী (এইখানে আমার বুকের উপরে আমি একটি ক্রস কাটলুম) তাঁকে 'জাস্‌ট কমপিটেন্ট'-এর চাইতে উচ্চমূল্য সম্মানের সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকৃত হলেও আপনি আমি এবং আর-পাঁচজন ভদ্রব্যক্তি মনে-প্রাণে তাঁর ভক্ত-পাঠক, এবং—আঁতেলরা যতই চোখ রাঙান—প্রকাশ্যে সেই ভক্তির কথাটা ঘোষণা করতে আমরা রাজি। তা সেই মম্-ই-বা কম কীসে? তাঁর পাঁচ-পাঁচখানা বইয়ের নাম করছি। 'দ্য পেন্‌টেড ভেল', 'দ্য মুন অ্যান্ড সিক্‌স পেন্‌স', 'দ্য রেজর'স এজ্', 'দেন অ্যান্ড নাউ' আর 'ক্যাটালিনা'। পাঁচ-পাঁচখানা বই, তার একখানারও পটভূমি ইংল্যান্ড নয়। তাই বলে কি মম্ কিছু কম ইংরেজ? বিশ্বাস

করি না। ইংল্যান্ডকে নিয়েও লিখেছেন মম্, ইংল্যান্ডকে নিয়েই লেখেননি। তাঁর দৃষ্টি শুধু ওই সংকীর্ণ-পরিসর দ্বীপভূমির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, উত্তরাশিতেও না, বহির্বিশ্বের অবারিত উন্মুক্ত আসরে, তার সীমাহীন সমুদ্রে, তার বিশাল জনারণ্যে, তার অরণ্য-মেখলায় তিনি তাঁর দৃষ্টি মেলে দিয়েছিলেন। যেখানে যা-কিছু তিনি পেয়েছেন, দু-হাতে কুড়িয়ে নিয়েছেন। সেই বহুবিচিত্র উপকরণের দুর্লভ সমন্বয়েই তৈরি হয়েছে তাঁর গল্প, তাঁর উপন্যাস।

কিন্তু না, আর আত্মনিন্দা করব না। যদি বলি, বাংলা সাহিত্যে তেমন কোনও চেষ্টা কখনও হয়নি ('চেষ্টা' কথাটা এখানে ভুল; এসব ব্যাপারে চেষ্টা কেউ কখনও করে না, যে পারে সে আপনি পারে) তো মিথ্যা বলা হবে। অন্তত একজন লেখকের নাম আমি এই মুহূর্তেই করতে পারি, বাংলা দেশের বাইরেও যাঁর দৃষ্টি পড়েছিল, 'মহাভারত'-এর অন্যান্য প্রদেশের মানুষকেও আত্মার আত্মীয়বোধে গ্রহণ করতে যাঁর আটকায়নি। তাদের জীবনযাত্রা, তাদের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ-বেদনার মধ্যে নিরন্তর তাঁর চিন্তাভিসার ঘটেছে। বাংলা গল্প-সাহিত্যের যে-সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন তিনি, আত্মিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি তাঁর পটভূমির ক্ষেত্রেও যে-নবতর সৌন্দর্য যোজনা করেছেন, তার জন্য—বলাই বাহুল্য—তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর মতো লেখকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। মম্-এর ওদেশে অনেক সঙ্গী, এখানে ইনি একক।

দুঃখটা সেই কারণেই। বাঙালি লেখকদের কেউ দক্ষিণ সমুদ্রের নামগোত্রহীন দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে বলছে না, দু-দশ বছরের মধ্যে বলবেও না। শুধু, পুজোর ছুটিতে তাঁরা যেন শুধুই মধুপুর কিংবা গিরিডি না যান (যদিও সেটা গেলেও পশ্চিমবঙ্গের, আর-কিছু না হোক, চৌকাঠটা অন্তত পেরুনো হবে); ঘরের বাইরে দু-পা এগোলেই যে আন্দামান, সেইখান থেকে তাঁরা একবার ঘুরে আসুন। তা তাঁরা যাবেন না। যদি বলি, সামোয়ায় যাবার দরকার নেই, আসামের অরণ্যাঞ্চলে গেলেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব, তাঁরা শিউরে উঠবেন। ইংরেজ লেখকদের সঙ্গে এইখানেই আমাদের তফাত, এবং তফাতটা বড়ো মারাত্মক।

তুলনাটায় আপনার আপত্তি হবে, আমি জানি। আপনি বলবেন, ইংরেজ লেখকদের অনেক সুবিধে। আমি স্বীকার করব। আপনি বলবেন, ইচ্ছে করলেই তাঁরা সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে পারেন। আমি প্রতিবাদ করব না। কিন্তু তারপর যখন আর নতুন কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে খানিক্ষণের জন্য আপনি চুপ করে থাকবেন, তখন—তখন আমি বলব যে, আপনার যুক্তি খুব জোরালো নয়। ইংরেজ লেখকদের আর্থিক সাচ্ছল্য যে এদেশের লেখকদের তুলনায় অনেক বেশি, ইচ্ছে

করলেই যে বহির্বিশ্বের রঙ্গাভূমি থেকে তাঁরা নিত্যনূতন উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন, তাঁদের জীবনে অভিজ্ঞতা আহরণের পন্থা যে আরও প্রশস্ত, এ সবই আমি জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর-একটা কথাও জানি। শুধু আহরণ করেই তাঁরা তৃপ্ত থাকেন না, আহৃত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার ইচ্ছেটাও তাঁদের আছে। যা আমাদের নেই বললেই হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। এই সুদূর প্রবাসে আমার এক বাঙালি বন্ধু আছেন। ভদ্রলোক সাহিত্যিক। বয়সে তরুণ, কিন্তু কলম খুব জোরালো। তার চেয়েও বড়ো কথা, মানুষটি একেবারে নির্ভেজাল। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কনট সার্কাসের এক কফিখানায় বসে তাঁর সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক সেদিন মুডে ছিলেন। বললেন, আরে মশাই, খুব তো অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা করছেন, অভিজ্ঞতা কি গাছে ফলে? তার জন্যে নানান দেশে যাওয়া দরকার। দেশভ্রমণের মতো পয়সা আছে আমাদের, না সময় আছে? থাকলে দেখিয়ে দিতুম।

তাঁরই টিন থেকে সিগারেট ধরিয়ে তাঁরই পয়সায় কফি খাচ্ছিলুম, সুতরাং প্রতিবাদ করা গেল না। বলা গেল না যে, এই যে তিনি বাংলা দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এতদিন এই দূর-ভূমিতে কাটালেন, এখানকার মানুষজনের সঙ্গে এত মেলামেশা করলেন, কই, তারও তো কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না তাঁর সাহিত্যে। কী জানেন, পয়সা নেই সময় নেই, ওসব বাজে কথা। আসল কথা, ইচ্ছে নেই, লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার ইচ্ছে। ইনি যদি মঙ্গলগ্রহেও যান, তো সেখান থেকে ফিরে এসেও সেই গ্রে স্ট্রিটের বৃত্তান্তই লিখবেন।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই। কলকাতায় আমার এক কবি-বন্ধু আছেন। দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ নেই। লোকপরম্পরায় শুনেছি, কিছুদিন আগে তিনি গাড়োয়ালের এক দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে তাঁর কবিতা পড়ি। কিন্তু, অবাক কাণ্ড, গাড়োয়াল সম্পর্কে তিনি নীরব।

এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক দিতে পারি। কিন্তু তার দরকার কী?

মোদ্দা কথাটা এই যে, এ এক অদ্ভুত চক্রের মধ্যে পড়েছি আমরা। একই জায়গায় একই বিন্দুকে কেন্দ্র করে আমাদের ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। তার মোহবন্ধনকে ছিন্ন করে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না। দোষটা যে আমাদের অভাবের নয়, খানিকটা স্বভাবেরও, এতক্ষণেও যদি তা বুঝিয়ে বলতে না পেরে থাকি, তবে কেমন করে আর পারব?

তবুও হতাশ হব না। স্কান্দিনেভীয় এই ঔপন্যাসিকই আমার নির্জীব ভাবনায় ফের আশার সঞ্চার করছেন। নরওয়ে ডেনমার্ক সুইডেন—এসব দেশের

লেখকদের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মিক মিল ছিল এতদিন। চেনা চৌহদ্দির স্মৃতিগন্ধ-বিজড়িত এক নস্‌টালজিক আবহাওয়ার মধ্যেই আমরা আবদ্ধ হয়ে ছিলুম—এখনও আছি। সেইটেই আমাদের নিজভূমি, আমাদের চিন্তার স্বক্ষেত্র। ভারী সুন্দর সেই জগৎ, কিন্তু ভারী সংকীর্ণ। আর এতই বেশি মানুষ সেখানে যে, ভালো করে একটু নিশ্বাস পর্যন্ত নেওয়া যায় না। আমরা যে সেখানে বন্দি, স্বভাবের শৃঙ্খলে বন্দি, তা-ও আমরা বুঝতে পারিনি। সেই সুন্দর সংকীর্ণ কারাগারে কী-এক মূর্খ সুখে আমরা আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম। তার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, সেই জগৎ যে আরও বড়ো, আরও বিচিত্র, আমরা জানতুম না।

স্কান্দিনেভীয় এই ঔপন্যাসিক সেই বহির্বিশ্বের একটা খবর নিয়ে এসেছেন। তাঁর নায়ক এখন মাঝসমুদ্রে। ঝড় থেমে গিয়েছে হয়তো, অন্তহীন জলরাশির উপরে মেঘ-ভাঙা এক টুকরো আলো এসে পড়েছে। খানিক আগের সেই দুরন্ত গর্জন আর শোনা যাচ্ছে না। ঝড় থেমে গিয়েছে। প্রিয়সঙ্গসুখকামনায় এক প্রগল্‌ভা নায়িকা যেন উন্মত্ত হয়ে ছুটে এসেছিল এই সফেন সমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে। সংশ্লেষান্তে সে এখন শান্ত, সংবৃতবসন, লজ্জিত। নীলাম্বরীর আঁচলে সে তার মুখ লুকিয়েছে। আর এই দুর্লভ মুহূর্তে যদি এখন পা টিপে-টিপে আমার অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসের পৃষ্ঠায় ফিরে যাই, হয়তো দেখব, নিঃসঙ্গ সেই শিল্পী এতক্ষণে ডেকের উপরে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাওয়ায় তাঁর চুল উড়ছে, দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন। অনেকক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। যতক্ষণ-না রাত্রি গভীর হয়, যতক্ষণ-না শান্ত হয় তাঁর মন। তাঁর অন্বেষণ এখনও শেষ হয়নি।

হতাশ হব না। গৃহমুখী স্কান্দিনেভীয় সাহিত্যও যখন বিশ্বমুখী হয়েছে, আমাদের সাহিত্যও হবে। একদিনেই হয়তো হবে না, কিন্তু একদিন-না-একদিন হবে।

ভালোবাসা জানাই।

চৈত্র, ১৩৬০

লেখার লক্ষ্য

মানুষের উদ্দেশ্য অন্তহীন। উপায়েরও অন্ত নেই। উপায়টার যে ফলিত রূপ, তাকে বলি কাজ। সাহিত্যও একটা কাজ। তার কোন্ উদ্দেশ্য?

প্রশ্নটা কিছু নতুন নয়। বস্তুত এতই পুরোনো যে, পুনশ্চ এ নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করাটাও ঈষৎ ক্লান্তিকর। নানান সময়ে, নানানতর পরিস্থিতিতে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, সাহিত্যিকরা তার উত্তর দিয়েছেন। সে-উত্তর কিছুদিনের জন্য মানুষকে শান্ত রেখেছে, চিরদিনের জন্য রাখেনি। তা যদি রাখত, নতুন করে এই প্রশ্ন তবে আর উত্থাপিত হত না। প্রশ্নাবলি উত্থাপিত হয়েছে নানানতর ভাবে; কখনও নিছক অনুসন্ধিৎসার থেকে, কখনও উত্তর আদায়ের ভঙ্গিতে। আগে-আগে সাহিত্যিকরাই এসব প্রশ্নের জবাব দিতেন, ভঙ্গিটা পালটাবার পর থেকে আর দেন না। ইদানীং রাজনৈতিক নেতারা দিচ্ছেন।

উত্তরমালা আমাদের মুখস্থ নয়। শুধু জানি, মূল উত্তর দুটো। একদল বলেছেন, সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য; অন্যদল বলেছেন, জীবনের জন্য। এবং জীবন বলতেই যেহেতু এঁরা সমাজজীবন বোঝেন, তাই এঁদের দাবি, সমাজসেবাতেই সাহিত্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করুক। সে-ই তার পরম উদ্দেশ্য হোক, সেইখানেই তার চরম সার্থকতা। দৃশ্যত, বিরোধের এইখানেই সূত্রপাত। কার্যত, এইখানেই এ-বিরোধের সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল। কেন, সেই কথাই বলছি।

মানুষ যে সমাজবদ্ধ জীব, এবং সমাজের উন্নতিতে যে তারও উন্নতি, তা নিয়ে, আশা করি, আর আপত্তি উঠবে না। যদি ওঠে, এই প্রবন্ধ তাহলে অবান্তর। গোড়ার থেকেই তাহলে আলোচনা শুরু করতে হয়। সে-আলোচনা, বলাই বাহুল্য, সাহিত্য নিয়ে হবে না; মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক-নির্ণয়াত্মক একখানা নৃতাত্ত্বিক প্রবন্ধে গিয়ে ঠেকবে। তর্কের খাতিরেই ধরে নিচ্ছি, সমাজ আমাদের প্রাণধারণের জলবায়ু, আমাদের অস্তিত্বের প্রধানতম শর্ত। জলবায়ুটা যাতে বিশুদ্ধ করে তোলা যায়, তার দায়িত্বও তাই আমাদেরই।

প্রশ্ন হল, কী করে তা করা যায়? উত্তর হল, বিশেষ কোনও একটা ছক-কাটা পথে তা করা যায় না। এটা নেতিবাচক উত্তর, এতে কেউ খুশি হবেন না। তাই

প্রত্যয়বাচক ভঙ্গিতে বলি, বহুধা পথেই সমাজকল্যাণ সম্ভব। অর্থাৎ? অর্থাৎ, যে যাঁর নিজের পথেই অগ্রসর হতে পারেন, সমাজকে তাঁর সেবা দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারেন। বিজ্ঞানী তাঁর বিজ্ঞানসাধনার পথে, শ্রমিক তার শ্রমের পথে, কৃষক তাঁর কর্ষণের পথে। এ যা বলা হল, এসবই কোনও-না-কোনও একটা কাজ। আগেই বলে নিয়েছি, সাহিত্যও একটা কাজ। তা যদি হয়, সাহিত্যিকের কাছেই-বা সমাজ তার সেবা পাবে না কেন?

সাহিত্যিকের কাছেও পাবে। তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। শুধু সাহিত্যিকদেরই-বা এ-ব্যাপারে একটা আলাদা কোঠা নির্দিষ্ট করে দিয়ে লাভ কী, প্রত্যেকেই বস্তুত সমাজকে এই পরোক্ষ সেবাই দিয়ে থাকেন। 'সমাজকল্যাণ করছি'—অষ্টপ্রহর এই চিন্তা মনে রেখে কি কেউ কাজ করেন? প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে কাজ করে যান। বিজ্ঞানী, শ্রমিক এবং কৃষকও তার ব্যতিক্রম নন। প্রয়োজনটা নিজস্ব হলেও পরোক্ষভাবে সমাজ তাতে উপকৃত হয়।

বিবৃতি প্রদানের সময়ে কি আমরা এত কথা মনে রাখি? রাখি না। সমাজকেই তখন সামনে এগিয়ে দিই। তাতে করে আমাদের কাজের ওপর বেশ-একটা মহত্ত্বের প্রলেপ পড়ে। তখন বলি, যা-কিছু আমরা লিখি, সমাজের জন্যই লিখি। এইটুকুমাত্র বলেই থামি না। আরও এক ধাপ এগিয়ে বলি, সমাজের জন্য লিখলে তবেই সে-লেখা ভালো হয়। সমাজবোধটা সেখানে সাহিত্যের ভালো-হয়ে-ওঠার একটা শর্ত।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমাজচেতনার উপর যদি কেউ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, তবে সে সমাজবাদী লেখকগোষ্ঠী। সম্প্রতি একখানা 'সমাজবাদী' গল্প-সংকলন পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল। গল্পগুলির মধ্যে সমাজচেতনা, সমাজের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনের আকাঙ্ক্ষা খুব প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। সুতরাং পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী সাহিত্য হিসেবেও এগুলির সার্থক হয়ে ওঠা উচিত ছিল। তা কিন্তু হয়নি। অনেকগুলি আবার গল্পই হয়ে ওঠেনি। অথচ এঁরা সমাজবোধসম্পন্ন লেখক, সমাজের হিতসাধনই এঁদের শিল্পকর্মের একমাত্র আদর্শ। সে-আদর্শ আমাদের হৃদয়কেও প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তাকে আমরা শ্রদ্ধাও করি। সেইসঙ্গে এ-কথাও বলি, অন্য কোনও উপায়ে তা সফল করতে গেলেই যেন ভালো হত। দুর্বল কতকগুলি গল্প রচনার কী এমন দরকার ছিল? সমাজের এতে উপকার হবে না।

সমাজকে যাঁরা প্রত্যক্ষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সকলেরই শিল্পসৃষ্টি দ্বারা সমাজ যেমন কিছু উপকৃত হয়নি, তেমনই সমাজকে যাঁরা পরোক্ষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদেরও সকলের দ্বারা সমাজ এমন কিছু অপকৃত হয়নি। আধুনিক সমাজবাদী লেখকগোষ্ঠীর সকলের দ্বারাই কি সমাজ কিছু উপকৃত হচ্ছে? শেলি, কিটস,

ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ—এঁদের দ্বারাই কি সমাজ কিছু অপকৃত হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য দু-বার করে ভাবতে হয় না।

ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল? সমাজকল্যাণের জন্যে লিখলে তবেই সে-লেখা ভালো হবে, এটা এমন-কিছু ধ্রুবসত্য নয়। হতে পারে, না-ও হতে পারে। অপরপক্ষে যিনি বলেন, সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্য, তাঁর দ্বারাও সমাজের উপকার হওয়া সম্ভব। সাহিত্যিকের শক্তির উপরেই সেটা নির্ভর করছে। লেখাটা যদি ভালো হয়, তবেই সমাজের মঙ্গল।

কিন্তু সে-কথা থাক। সাহিত্যের দ্বারা কী কী জনকল্যাণকর কার্য সাধিত হতে পারে, তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তার দ্বারা কী হয়, সেটা পরে ভাবা যাবে, আপাতত দেখা যাক, সে কী চায়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী, আমরা লিখি কেন? এর উত্তর : আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই আমরা লিখি। জীবনকে জানবার জন্যে। আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের অনুভূতিকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে।

কথাটার একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। সকলেই স্বীকার করবেন, অভিজ্ঞতাই সাহিত্যকর্মের উৎস। অথচ, সাহিত্যিকরা নিজমুখেই ইতস্তত স্বীকার করেছেন, যে বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ, সে-বিষয়ে কোনও-কিছু লিখতে তাঁরা ভয় পান। অভিজ্ঞতার সেই সম্পূর্ণতাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়া যাবে না, সে-ভয় নয়। সাহিত্যে তাকে রূপ দিতে গেলে, পুনশ্চ—চিন্তার ক্ষেত্রে হলেও—যে সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, সেই ভয়। জীবনে আমরা দৈহিক অর্থে সুখ অথবা দুঃখ সঞ্চয় করি, লিখবার সময়ে চিন্তার ক্ষেত্রে তার স্মৃতিকে পুনরাবাহন করতে হয়। যে-সুখ অথবা যে-দুঃখ সম্পূর্ণ নয়, তাকে পুনর্জীবন দেওয়া সোজা। যে-সুখ অথবা যে-দুঃখের অনুভূতি সম্পূর্ণ, তাকে পুনর্জীবন দেওয়া কি এতই সোজা?

দুঃখের কথাটা বুঝলুম, সুখের কথাটা বুঝলুম না। দুঃখের স্মৃতিকে সাহিত্যিক না হয় না-ই জাগিয়ে তুললেন, সুখের স্মৃতির স্বাদ গ্রহণে তাঁর দ্বিধা কেন? দ্বিধা এই জন্যে যে, যে-সুখ সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ-দুঃখের সঙ্গে তার তিলমাত্রও পার্থক্য নেই। সুখের সম্পূর্ণতা আনন্দে, দুঃখের সম্পূর্ণতা বিষাদে। যা কিনা আনন্দেরই নামান্তর। সুখের সঙ্গে দুঃখের তফাত রয়েছে, আনন্দের সঙ্গে বিষাদের নেই। এই দুয়ের ভারই সমান দুঃসহ।

সম্পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে যে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না, তার আরও একটা কারণ আছে। অনুভূতি যাঁর সম্পূর্ণ, তাঁর সকল চাওয়াই মিটেছে, তাঁর সকল পাওয়াই তিনি পেয়ে গেছেন। তিনি আবার লিখতে যাবেন কোন্ দুঃখে? এ-অনুভূতি সাহিত্যিকের কিছু একচেটিয়া সম্পত্তিও নয়। এই সম্পূর্ণতাকে সকলেই স্পর্শ করেন, জীবনের

কোনও-না-কোনও ক্ষেত্রে করেন। শ্রমিক তাঁর শ্রমের মধ্যে একে পান, কৃষক তাঁর কর্ষণের মধ্যে।

আমরা পাইনি। পাইনি বলেই আমরা লিখি। যে-কারণে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে সাহিত্য লেখা হয় না, ঠিক সেই কারণেই আবার অর্ধ-অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা সাহিত্যসৃষ্টির তাড়না বোধ করি। জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্ধেক, সৃষ্টির মাধ্যমে—চিন্তার ক্ষেত্রে হলেও—বাকি অর্ধেক আমাদের অর্জন করতে হয়। জীবনের ভাণ্ডারকে এই পথেই আমরা সম্পূর্ণ করে তুলি। না লিখেই যদি সেই সম্পূর্ণতাকে অর্জন করা যেত, আমরা লিখতুম না।

১৩৫৭

২

প্রসন্না, প্রিয়ভাষিণী

'লেখন' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে। অতঃপর এই গ্রন্থ সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বার হয়। প্রবন্ধটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। তাতে 'লেখন'-এর অন্তর্ভূত কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

"...পড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল।— মনে হল ভালোই লিখেছি। বিস্মরণশক্তির প্রবলতাবশত নিজের কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায় তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরনো লেখা নিয়ে বিস্ময় বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না—কেন-না, তার সম্পর্কে আমার অহমিকার ধার ক্ষয় হয়ে যায়। পড়ে দেখলাম—

তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি,
এ জগতে কারও তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

"নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত— এমন-কি, একে বড়ো আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলুম।

"তার পরে আর-একটা কবিতা—

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে,
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে।
কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে—
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

"আবার বললেম, শাবাস! হৃদয়ের ভেতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে এ কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা

সাহিত্যে আর কে বলেছে? ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোটো কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করেছিলেম এজন্যে নিজেকে মনে মনে বলতে হল, ধন্য...”

একটি-দুটি নয়, পরপর এইভাবে চারটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ; চারটির প্রশংসাই চূড়ান্ত। পড়তে পড়তে পাঠককে থমকে দাঁড়াতে হয়; অস্বস্তি বোধ করতে হয়; ভাবতে হয়, কথাগুলিতে স্মিত একটু পরিহাসের ছোঁয়া লেগেছে বটে, কিন্তু পরিহাসের ছলেও কি এতটা আত্মপ্রশংসা কাউকে মানায়? নিজের উদ্দেশে স্তুতি রচনা কারও পক্ষেই শোভন কর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটা ঘোর অস্বাভাবিক ঠেকে এই জন্যে যে, রুচির চ্যুতি কদাচ তাঁর ক্ষমা পেত না।

পাঠকের অস্বস্তি অবশ্য একটু বাদেই কেটে যায়। তিনি জানতে পারেন, যে-কটি কবিতার উপরে প্রশংসার এই প্রবল ধারা-বৃষ্টি, রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত গ্রন্থের অন্তর্ভূত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়। সেগুলি আর-এক জনের রচনা।

সেই আর-এক জনের নাম প্রিয়ংবদা দেবী। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই তাঁর কয়েকটি কবিতা ‘লেখন’-এর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। এবং— প্রিয়ংবদা নিজে সে-কথা না-জানানো পর্যন্ত— স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বুঝতে পারেননি যে, সেগুলি তাঁর নিজের লেখা নয়।

বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ংবদার স্মৃতি ইতিমধ্যে ধূসর হয়েছে। ধূসরতর হয়েছে তাঁর মায়ের স্মৃতি। প্রসন্নময়ী আর প্রিয়ংবদা। মা আর মেয়ে। জীবনের মিল লক্ষণীয়। দাম্পত্য জীবনে একজনও সুখী হননি; দুজনেই যন্ত্রণার আগুনে সমানে জ্বলেছেন। প্রসন্নময়ীর যখন বিবাহ হয়, তাঁর বয়স তখন মাত্র দশ; তার বছর দুয়েক বাদেই তাঁর স্বামী পাগল হয়ে যান। অর্থাৎ সুশ্রী সুখী দাম্পত্য জীবন যে কাকে বলে, প্রসন্নময়ীর তা জানবার পর্যন্ত অবকাশ হয়নি। মেয়ে জেনেছিলেন; কিন্তু সে-ও নেহাতই সামান্যকালের জন্যে। একুশে বিবাহ হয়েছিল প্রিয়ংবদার; চব্বিশে তিনি বিধবা হলেন। জননী আর কন্যার মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাই আর-একটি ব্যাপারেও; কাব্যরচনায় দুজনেরই প্রতিভা ছিল সহজাত। তার চাইতেও বড়ো মিল : কবিতা তাঁদের একজনের কাছেও নিতান্ত বক্তব্য প্রকাশের একটি মাধ্যমমাত্র ছিল না। কবিতাকে তাঁরা দুজনেই যেন সেই বিশল্যকরণী বলে জেনেছিলেন, যা মৃতকে প্রাণ দান করে, শোকের শ্মশানভূমিতে সঞ্জীবনের মন্ত্র শোনায়। প্রসন্নময়ী আর প্রিয়ংবদা। কবিজননী আর কবিকন্যা। কবিতার কাছে সম্ভবত তাঁরা এমন কোনও শুশ্রূষা চেয়েছিলেন যা অন্যত্র লভ্য নয়। কিংবা এমন কোনও প্রবল প্রত্যয়ে তাঁদের

দুজনেই সম্ভবত বুক বেঁধেছিলেন যে, কবিতার মধ্যেই তাঁদের সমস্ত শোকের সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁদের কবিতা পড়ে অন্তত সেই রকমই মনে হয়।

কিন্তু কবিতার কথা পরে। আগে তাঁদের জীবনের কথা বলা যাক।

বাংলা দেশের এক বিখ্যাত জমিদারবংশে—সিপাহি বিদ্রোহের বছরে (১৮৫৭) প্রসন্নময়ীর জন্ম। তাঁর পিতৃকুলের খ্যাতি অবশ্য শুধুই ঐশ্বর্যের নয়; বরং লক্ষ্মীর তুলনায় সরস্বতীর আশীর্বাদই পাবনা-হরিপুরের সেই বিখ্যাত চৌধুরী-পরিবারের উপরে আরও অকৃপণ ধারায় ঝরেছে। প্রসন্নময়ীর পিতার নাম দুর্গাদাস চৌধুরী। তিনি ছিলেন উদার আদর্শের মুক্তবুদ্ধি মানুষ। সমাজকল্যাণের নানাবিধ ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ ছিল, এবং তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তায় কোনও গোঁড়ামি ছিল না।

ভ্রাতৃ-পরিচয়ে প্রসন্নময়ীকে আরও সহজে চেনা যাবে। সাত-ভাইয়ের তিনি বড়দি; সাতটি ভাইয়ের প্রত্যেকেই খ্যাতিমান। তার মধ্যে আবার দুজনের নাম একটু পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে। একজন এদেশের বিখ্যাত বিচারক স্যার আশুতোষ চৌধুরী। অন্যজন প্রমথ চৌধুরী। অর্থাৎ বীরবল।

প্রসন্নময়ীর মাতৃকুলের খ্যাতিও কম নয়। "কিংবদন্তী এইরূপ যে, ইঁহার মাতামহ-বংশ, বাগকাশীনাথপুরের রায়েরা, বাঙলার দ্বাদশ ভূম্যধিকারিগণের [অর্থাৎ বারো ভুঁইয়ার] অন্যতম ছিলেন। বংশ-মর্যাদায় এখনও বাগকাশীনাথ-পুরের রায়েরা বারেন্দ্র সমাজে প্রধান।" (*বঙ্গের মহিলা কবি*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৩ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

পরিচয়ের সূত্রে আর-একটি কথার উল্লেখ করি। "নাটোরের মহারানি কৃষ্ণমণি" ছিলেন প্রসন্নময়ীর "পিতামহীর সহোদরা"।

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, রুপোর চামচ মুখে নিয়েই তাঁর জন্ম। চৌধুরী-পরিবারে লেখাপড়ার চর্চা ছিল, এবং পাঠাভ্যাসের প্রয়োজন যে শুধু পুরুষদের, এমন ধারণাকে সেখানে প্রশ্রয় দেওয়া হত না। বাড়িতে পণ্ডিত রেখে মেয়েদের পড়ানো হত। প্রসন্নময়ীর পিসিমারাও ছিলেন রীতিমতো বিদুষী নারী। দুর্গাদাস অবশ্য নিজেই তাঁর কন্যাকে পড়াতেন। স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী মানুষ; অনুমান অসংগত নয় যে, শিক্ষাদানের দায়িত্ব অন্যের উপরে ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। (পরে—স্বামী-গৃহ থেকে প্রসন্নময়ী যখন পিত্রালয়ে চলে আসেন, তখন—অবশ্য দুর্গাদাস তাঁর কন্যার জন্য একজন শ্বেতাঙ্গী শিক্ষিকা নিয়োগ করেছিলেন। প্রসন্নময়ীকে তিনি ইংরেজি শেখাতেন। সেইসঙ্গে ছিল সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা।)

প্রসন্নময়ীর দাম্পত্য জীবন, আমরা আগেই বলেছি, সুখের হয়নি। মাত্র দশ

বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। স্বামীর নাম কৃষ্ণকুমার বাগচী; বিবাহের দু-বছর বাদে কৃষ্ণকুমার পাগল হয়ে যান। দুঃখের সেই সূচনা। বাকি জীবন একটির পর একটি শোকের আঘাত এসেছে প্রসন্নময়ীর জীবনে; দুঃখের আগুনে আমৃত্যু তাঁকে জ্বলতে হয়েছে। স্বামী পাগল হয়ে যাবার কিছুকাল পরে তিনি পিত্রালয়ে চলে এসেছিলেন; পরে আর স্বামীগৃহে ফেরেননি। বালিকাবয়সেই তাঁর কবিতা লেখায় হাতেখড়ি। একদা যা ছিল খেয়ালের খেলা, তা-ই অতঃপর তাঁর আশ্রয় হয়ে দাঁড়াল। সাহিত্যের মধ্যেই তাঁর সর্বশোকের সান্ত্বনা তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন।

শুধুই পদ্যে নয়, গদ্যেও প্রসন্নময়ীর অধিকার ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থ পাঁচটি। ১) আধ-আধ ভাষিণী, ২) যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগম, ৩) বনলতা, ৪) নীহারিকা—প্রথম ভাগ, ৫) নীহারিকা—দ্বিতীয় ভাগ।

গদ্যগ্রন্থ চারটি। ১) অশোকা, ২) আর্যাবর্ত, ৩) পূর্বকথা, ৪) তারাচরিত।

কবিতার আলোচনায় পরে আসছি। ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য, সাহিত্যমূল্য ছাড়াও তাঁর গদ্যরচনার অন্যবিধ মূল্য আছে। তাঁর সময়কার দেশ ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি তাঁর গদ্যে পাওয়া যায়। সে-ও কম প্রাপ্তি নয়।

প্রসন্নময়ীর যে-সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হল, বলা বাহুল্য, অংশত তা প্রিয়ংবদারও। প্রসন্নময়ীর বিবাহ হয়েছিল পাবনা জেলারই গুনাইগাছা গ্রামে। সেইখানে, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে, প্রিয়ংবদার জন্ম। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রসন্নময়ী পিতৃগৃহে চলে এসেছিলেন। জমিদার শ্রী দুর্গাদাস চৌধুরী কর্মজীবনে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রিয়ংবদার তিনি মাতামহ। মাতামহের কর্মস্থলে, কৃষ্ণনগরে, শিক্ষারম্ভ; সেখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে প্রিয়ংবদা কলকাতার বেথুন স্কুলে এসে ভরতি হন। তাঁর বয়স তখন এগারো। মেধাবী ছাত্রী ছিলেন; পরীক্ষায় বরাবর ভালো ফল করেছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলেন; বি.এ. পরীক্ষায় রৌপ্যপদক। সেইসঙ্গে, সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ যে তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল, এই উক্তিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করা চলে।

যে-বছর বি.এ. পাস করেন, সেই বছরেই বিবাহ হয় প্রিয়ংবদার। তাঁর বয়স তখন একুশ। স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী; থাকতেন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে।

বিবাহের মাত্র তিন বছর বাদেই প্রিয়ংবদার সিঁথির সিঁদুর মুছে যায়। তাঁর একমাত্র অবলম্বন তখন একটি শিশুপুত্র। অল্পকাল বাদে তাকেও হারাতে হল। সংসারজীবনে এমন-কিছুই তাঁর রইল না, জীবনকে যা তাৎপর্য দিতে পারে, জীবনধারণের প্রয়াসে প্রেরণা জোগাতে পারে।

প্রিয়ংবদার জীবন অতঃপর ব্যর্থ কয়েকটি বৎসরের সমষ্টি হয়ে উঠতে পারত।

ওঠেনি, তার কারণ, ঘরের দ্বীপ নিবে যাবার পর তিনি গৃহসীমানার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন; ঘরের কাজ যখন অকালে অতর্কিতে ফুরিয়ে গেল, তখন বাইরের কাজে মগ্ন হয়ে নিজের জীবনকে আবার ভিন্নতর একটি তাৎপর্য দিতে পেরেছিলেন।

"ইহার পর হইতে নানারূপ লোকহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি তাঁহার নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনে দুঃখ ও শোককে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিকভাবে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন ও বহুদিন সেইভাবে তাঁহার প্রিয় ছাত্রীসম্প্রদায়কে শিক্ষাদান করিয়া অসুস্থতার জন্য সে কার্য ত্যাগ করেন।

"শরীর কিছু ভালো হইলে সরলা দেবীর প্রতিষ্ঠিত 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের' কার্যভার কৃষ্ণভাবিনী দাসের মৃত্যুর পর তিনি নিজে গ্রহণ করেন। কিছুদিন তিনি ঐ কার্য দক্ষতার সহিত চালাইয়া পরে শ্রীমতী সরলা দেবী পঞ্জাব হইতে বাংলায় আসিলে তাঁহাকে সে ভার ছাড়িয়া দেন। পরে তিনি 'হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রমের' সম্পাদিকা রূপে উহার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি Greaves Rescue Home-এরও একজন উদ্যোগী সভ্য ছিলেন।" ('বঙ্গের মহিলা কবি', দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৭০-৭১, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

তবে সমাজকল্যাণের নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত এই কর্মকাণ্ড নইলে যে প্রিয়ংবদার পক্ষে বাঁচাই অসম্ভব হত, এমন কথা বলতে পারি না। কেন-না সংসারের সমস্ত সুখ মৃত্যুর হাতে লুঠ হয়ে যাবার পরেও তাঁর জীবন একেবারে শূন্য হয়ে যায়নি। তখনও, সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও, তাঁর জীবনে একটি দীপশিখা জ্বলছিল। তখনও সাহিত্য ছিল।

সাহিত্যে হাতেখড়ি, মায়ের মতোই, মেয়েরও হয়েছিল শিশু-বয়সে। "শৈশবাবধি বাংলা-সাহিত্যে প্রিয়ংবদার অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'ফুল' নামে একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পরবৎসর 'ভারতী ও বালকে' (কার্তিক ১২৯৩) তাঁহার একটি 'গান' 'বালিকার রচনা' হিসাবে মুদ্রিত হয়।" ('বঙ্গসাহিত্যে নারী', পৃ. ২৫, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সুখের দিনে কবিতাকে পরিত্যাগ করেননি প্রিয়ংবদা। দুঃখের দিনে কবিতাই তাঁকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল।

প্রিয়ংবদার কবিতার বই পাঁচটি। ১) রেণু, ২) তারা, ৩) পত্রলেখা, ৪) অংশু, ৫) চম্পা ও পাটল। তা ছাড়া ছোটোদের জন্যেও খানকয় বই তিনি লিখেছিলেন।

মা ও মেয়ের জীবনে মিল ছিল। সাহিত্যেই কি ছিল না? সাহিত্যেও ছিল। কিন্তু মিল সেখানে নিতান্তই বিষয়গত। প্রকাশরীতিতে মিলের চাইতে অমিলটাই একটু

বেশি করে চোখে পড়ে। একজনের গলা একটু চড়া পর্দায় বাঁধা, অন্যজন পারতপক্ষে চেঁচিয়ে কিছু বলেন না। একজন খুব স্পষ্ট করে, বিশদ করে, কোনও কিছু গোপন না-করে কথা বলবার পক্ষপাতী। এমনকি, সবিস্তারে সব বলবার ঝোঁকে অনেকক্ষেত্রেই তিনি এমনভাবে কথা বলেন যে, ব্যাপারটা প্রায় অতিকথনের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়। অন্যজন আভাসে-ইঙ্গিতে-ব্যঞ্জনায় তাঁর বক্তব্যে প্রায়ই অন্যতর তাৎপর্যের ছোঁয়া লাগিয়ে দেন। কিছুটা হাতে রাখেন, সবটা বলেন না। এবং তৎসত্ত্বেও, কিংবা হয়তো সেইজন্যেই, তাঁর কবিতার আবেদন আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মিলের কথা আগেই বলেছি। যেমন প্রসন্নময়ী, তেমনই প্রিয়ংবদার কবিতারও কিছুটা অংশ ঈশ্বরের দখলে; বাকি অংশে, অনেকখানি জায়গা নিয়ে, শোক আর স্মৃতির গুরুভার মন্থর পদচারণা। তারই মধ্যে-মধ্যে প্রকৃতির সুকুমার মুখ ইতস্তত উঁকি দিয়ে যায়; আমাদের চারপাশে যা ছড়িয়ে আছে, সেই পরিচিত দৃশ্যাবলির মুখমণ্ডল আবার নতুন করে চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলি আলাদা কিছু নয়। যেন তারা প্রত্যেকেই একটি বৃহৎ চিত্রের অংশমাত্র; যেন সমগ্র চিত্রখানিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার প্রয়োজনে তারা কবিতার মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এই শেষের কথাটি প্রিয়ংবদার কবিতা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। প্রসন্নময়ীর কবিতায় উপকরণ অনেকক্ষেত্রেই মূল বিষয়কে ছাপিয়ে যায়; যে-কোনও উপলক্ষ্যে 'দেশ', 'জাতি', 'আর্যসমাজ' ইত্যাদি সব বড়ো-বড়ো প্রসঙ্গ উঠে পড়ে; হিতকারী চিন্তা অত্যধিক প্রশ্রয় পাবার ফলে কবিতার ভিতরকার খোলামেলা ভাবটা ঠিক বজায় থাকে না। তা ছাড়া তাঁর বর্ণনা অনেকক্ষেত্রেই অন্যতর কোনও উপলব্ধির সঙ্গে অন্বিত হয় না। চিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যহীনভাবে আলাদা-আলাদা দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে কবিতার আয়োজনটাই প্রায়শ মূল কবিতার চাইতে সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে;বর্ণনা আর চিত্রগুলিও কোনও বড়ো রকমের কাজে লাগে না। প্রিয়ংবদার কবিতাতেও যে এই ধরনের দুর্ঘটনা কখনও ঘটে না, তা নয়, ঘটে; তবে সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতার উপরে যখন চোখ রাখি, তখন আর সেই ত্রুটিগুলিকে বিশেষ দেখতে পাই না। তখন বুঝতে পারি, প্রিয়ংবদার সেই বিরল ক্ষমতা ছিল, যা থাকলে তবেই আয়োজনকে গোপন করে কবিতা লেখা যায়; যা থাকে না বলেই কবিতার প্রতিজ্ঞা অনেকসময়ে পরাস্ত হয়, এবং কবিতা লিখতে গিয়েও অনেকে আহেলা কিছু পদ্য লিখে বসেন।

আসলে কথাটা এই যে, প্রিয়ংবদা তাঁর নিজেরই চিত্তের মধ্যে ডুব দিতে জানতেন। তাই বাইরের পৃথিবী থেকে লোভীর মতন তাঁকে উপকরণ কুড়িয়ে আনতে হয়নি। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, শরতের আকাশ কিংবা বসন্তের পুষ্প

তাঁর কবিতায় কখনও ধরা দিত না। কিন্তু সেই আকাশ বস্তুত তাঁরই চিত্তের দর্পণে প্রতিফলিত আকাশ; সেই পুষ্পও বস্তুত তাঁরই চিত্তের আয়নায় প্রতিবিম্বিত পুষ্প। অর্থাৎ, চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যাবলি তার ফলে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় না; যেভাবে দেখেছেন, সেটাই আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে থাকে।

দেখবার কথায় বলি, তাঁর দৃষ্টিতে বেদনা ছিল। যা-কিছুর উপরেই তিনি চোখ রাখুন, তারই মধ্যে তাই বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগত। চিৎকৃত কোনও যন্ত্রণা নয়, বুকফাটা কোনও বিলাপ নয়, স্থির শান্ত একটি বিষণ্ণতা—বর্ষাদিবসের ছায়াসঞ্চারী মেঘের মতো—তাঁর কবিতার উপরে ছড়িয়ে আছে। তাঁর কবিতা বস্তুত নম্র একটি শোকাঞ্জলি।

অনুমান করতে পারি, স্বল্পবাক এই নম্রতাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ করে ভালো লেগেছিল। তাঁর প্রশংসায় যে আতিশয্য নেই, এমন কথা বলি না। কার্যকারণের যে পরম্পরায় ওই প্রশংসা, তাতে—সত্যি বলতে কী—আতিশয্যই হয়তো স্বাভাবিক। প্রিয়ংবদার কবিতাকে নিজের কবিতা বলে ভুল করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নিজের গ্রন্থে তাকে স্থান দিয়েছিলেন। ভুলটা ধরা পড়বার পরে, প্রশংসার বন্যায় তাকে ভাসিয়ে না দিয়ে, বিনাবাক্যে সেই কবিতাগুলির বর্জন নিশ্চয়ই অশোভন হত। কিংবা 'অশোভন' কথাটায় যদি কারও আপত্তি হয়, তো এইটুকু অন্তত বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্যের সঙ্গে সেই পত্রপাঠ-বর্জনের কোনও সংগতি খুঁজে পাওয়া যেত না।

কিন্তু সে-কথাও থাক। আসলে, প্রিয়ংবদার কবিতাকে যে নিজের কবিতা বলে ভুল করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এই মূল ঘটনাটাই প্রিয়ংবদার পক্ষে একদিকে যেমন গৌরবজনক, অন্যদিকে তেমন, কিছুটা অন্তত, অগৌরবের। ভ্রান্তি প্রমাণ করেছে, প্রিয়ংবদার কবিতার মান খুবই উঁচু, তা নইলে আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাকে নিজের কবিতা বলে ভুল করবেন কেন? অন্যদিকে এই একই ঘটনা প্রমাণ করে যে, প্রিয়ংবদার কণ্ঠস্বরে তেমন-কিছু নিজস্বতা ছিল না; থাকলে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারতেন যে, সেগুলি অন্যের কবিতা।

তা যে বোঝা যায়নি, তার থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, প্রিয়ংবদা একান্তভাবেই রবীন্দ্র-বৃত্তের কবি। তিনি শক্তিমতী, তাঁর রচনারীতি নিখুঁত; কিন্তু ভাবনায় কিংবা তার প্রকাশে তিনি স্বতন্ত্র নন।

তা না-ই হোন, আমরা যখন তাঁর কবিতা পড়ি, তখন পরিশুদ্ধ যে-অভিজ্ঞতার ভূমিতে আমাদের হাঁটতে হয়, তার মূল্যকে তো কোনওমতেই অস্বীকার করতে পারি না। যখন বুঝতে পারি যে, তাঁর প্রতিজ্ঞায় কোনও ফাঁকি ছিল না, তখন স্বতই আমাদের মাথা নোয়াতে হয়।

এবং ডরোথি পার্কারের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তখন প্রায় অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে পড়ে।

"His little trills and chirpings were his best.
No music like the nightingale's was born
Within his throat ; but he, too, laid his breast
Upon a thorn."

সর্বনামগুলিকে পালটে নিলেই এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে যেন প্রিয়ংবদার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতা পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রিয়ংবদাও কাঁটার উপরে বুক রেখেছিলেন, এবং প্রিয়ংবদাও কিছু রক্ত ঝরিয়েছিলেন।

সেইসব রক্তবিন্দুর অনেকগুলিই গোলাপ হয়ে ফুটেছে।

চৈত্র ১৩৭২

রজনীকান্ত

কবে প্রথম শিখেছিলুম, কে শিখিয়েছিল, সেসব কথা আর আজ খুব স্পষ্ট করে মনে পড়ে না। শুধু বুকের মধ্যে সেইসব গান এখনও রিন্‌রিন্‌ করে। 'পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভালো হয়?' 'আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ', 'নয়নের বারি নয়নে রেখেছি', 'স্নেহ-বিহ্বল করুণা-ছলছল শিয়রে জাগে কার আঁখি রে'— এইসব গান একদা আমাদের দিনরাত্রির প্রহরগুলিকে আনন্দে-বিষাদে ভরাট করে রেখেছিল। এখন আর এসব গান বিশেষ শুনতে পাই না। গানগুলি যে কার লেখা, তা-ই-বা একালে ক-জনে জানে। রজনীকান্ত সেনকে আমরা ভুলতে বসেছি।

হয়তো একেবারেই ভুলতুম, যদি-না কবি সুশীল রায়ের চিঠি হঠাৎ চোখে পড়ত। কাগজে চিঠি লিখে শ্রীযুক্ত রায় এদেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, রজনীকান্তের শতবর্ষ এবারে পূর্ণ হল। আশ্চর্য, এত লোকের জয়ন্তী নিয়ে এত হইহল্লা হয়, অথচ রজনীকান্তের কথা কারও মনে পড়েনি।

দোষটা আমাদেরই, রজনীকান্তের নয়। এমন নয় যে, সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর দান সামান্য। অনেকের চাইতেই বেশি। এমন নয় যে, তাঁর নিজস্বতা ছিল না। অনেকের চাইতেই বেশি ছিল। এমন নয় যে, তাঁর সাহিত্যের কোনও স্থায়ী আবেদন নেই। অনেকের চাইতেই বেশি আছে। তার প্রমাণ, তাঁকে ভুললেও, তাঁর গান আর কবিতার নানা পঙ্‌ক্তি কিংবা অংশ আজও আমরা ভুলতে পারিনি। শুধু সেসব পঙ্‌ক্তি কার লেখা, সেইটে অনেকেই জানে না।

দৃষ্টান্ত দিই। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'— এই পঙ্‌ক্তিটি একালেও কে না জানে? জানে সকলেই। কিন্তু কথাগুলি কার, একালের মানুষদের অনেকেই তা বলতে পারবে না। আচমকা প্রশ্ন করলে ভুল করে অনেকেই হয়তো বলে বসবে, রবীন্দ্রনাথের।

তবু, রজনীকান্তের পঙ্‌ক্তিকে এইভাবে রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি বলে ভুল করবার যে আদৌ কোনও কারণ নেই, তা-ও নয়। ভাষা আলাদা, বাক্যের বিন্যাস দুই জাতের, একজন সর্বক্ষেত্রে সরল, অন্যজন অনেকক্ষেত্রেই জটিল— তবু এই দুই কবির মধ্যে একটা ব্যাপারে এমন মিল ছিল যে, অন্যান্য পার্থক্যকে তা ভুলিয়ে

দেয়। মিল রুচির। কবিতায় না হোক, তাঁদের বিভিন্ন গানে— বিশেষ করে ভক্তি কিংবা দেশপ্রেমের গানে— সেই মিলটা বেশ স্পষ্ট করে চোখে পড়ে।

গ্রামদেশে এককালে রজনীকান্ত সেনের গানের খুব সমাদর দেখেছি। তার একটা কারণ সম্ভবত কথার সারল্য। রজনীকান্তের গানের বাণী খুব স্পষ্ট। গায়কের মুখ থেকে তা সরাসরি শ্রোতার বুকে গিয়ে ঘা দেয়। শ্রোতার মনে হয়, কথাগুলি যেন বিশেষ করে তাকেই বলা হচ্ছে। সাহিত্য একালে অনেক জটিল হয়েছে, ভাষাকে অনেকেই ভাব-গোপনের অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগান। এমনভাবে কথা বলেন যে, ভঙ্গির আড়ালে আসল কথাটা চাপাই থেকে যায়। রজনীকান্ত এসব ধূর্ত কৌশলের কারবারি ছিলেন না। তিনি সহজ কথা বলতেন, এবং অত্যন্ত সহজভাবে বলতেন। 'সহজ কথা' মানে অবশ্য একেবারে সাদামাটা কথা নয়। বরং জীবনের অনেক গহন উপলব্ধির কথাই তিনি বলেছেন। কিন্তু একটা কথাও কখনও বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বলেননি। সেটা তাঁর স্বভাবেই ছিল না।

সারল্যের চাইতেও বড়ো সম্পদ তাঁর আন্তরিকতা। কিংবা, এ-দুটি ব্যাপারকে হয়তো আলাদা করে দেখা ঠিক নয়। কেন-না, অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন বলেই সম্ভবত তাঁর উপলব্ধির কথাগুলিকে তিনি এত সরলভাবে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। বাল্যকালে পুব-বাংলার গ্রামাঞ্চলে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মুখেও তাঁর গান শুনেছি। তাঁরা কেউ পাকা গায়ক নন; সুর তাল লয় ইত্যাদি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চর্চা করবার সময় কিংবা সুযোগ তাঁরা পাননি। কিন্তু শিক্ষার এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁদের গান এক আশ্চর্য পরিবেশ গড়ে তুলতে পারত। গানের মধ্যে তাঁরা একেবারে ডুবে যেতেন। যাওয়া যে সম্ভব হত, তার কারণ বাণীর ওই আন্তরিকতা। আমি দেখেছি, নিজেকে আলাদা রেখে রজনীকান্তের গান গাইবার উপায় নেই। গাইতে-গাইতে গানের মধ্যে ডুবে যেতে হয়। শুনতে-শুনতেও।

শুধু ভক্তি কিংবা দেশপ্রেম নয়, হাসির গানও তিনি অনেক লিখেছেন। তার মধ্যে অনেকগুলিই বিখ্যাত। 'যদি কুমড়োর মতো চালে ধরে রত পানতোয়া শত শত'— বিখ্যাত এই হাসির গানটি কে না শুনেছেন। যদিও গানটি যে রজনীকান্তের, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। কিন্তু সে-কথাও থাক। আসলে আমাদের বলবার কথাটা এই যে, কবিতাই হোক আর গানই হোক, তাঁর সব লেখাতেই একটি নির্মল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। নির্মল এবং পবিত্র।

'তুমি নির্মল করো মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে'— রজনীকান্ত তাঁর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আমরা আমাদের মালিন্য মোচনের জন্য, আর-কিছু না হোক, রজনীকান্তের গানের মধ্যে আর-এক বার ডুব দিতে পারি। কেন-না, এতটা নির্মলতা এবং এতটা মঙ্গলময়তা আর কোথাও আছে বলে আমি জানি না।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

রবীন্দ্রচর্চা, বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রনাথের উপরে, কিছুকাল আগে, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই প্রবন্ধ অনেকের তুমুল ক্রোধের কারণ হয়েছে। তাঁদের কারও-কারও বক্তব্য মোটামুটি এই রকমের যে, রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে এতে এমন অনেক উক্তি আছে, যার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। কেউ-কেউ শুধু ওইটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। বুদ্ধদেবের উপরে তাঁরা একটি উদ্দেশ্য আরোপ করেছেন। তাঁরা বলতে চাইছেন যে, বিদেশি পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়।

প্রবন্ধটি আমি পড়েছি। পড়ে মনে হয়েছে, বুদ্ধদেব যা বলতে চান, তা আরও বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বিষয়ের গুরুত্বের তুলনায় তাঁর প্রবন্ধটি খুব ছোটো। অনেক কথা তিনি সূত্রাকারে বলেছেন। বিস্তৃত করে বললে আরও পরিষ্কার হত। কিন্তু এমন কি বলতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথকে তিনি হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন?

তা তিনি কেন চাইবেন? রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে এতকাল যে-অসংখ্যা প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, তাকে অসার প্রতিপন্ন করবার জন্যে? রবীন্দ্রনাথের প্রতি এতকাল যে-জ্বলন্ত, জীবন্ত অনুরাগ তিনি জানিয়ে এসেছেন, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্যে? স্পষ্ট মনে পড়ে, ভারতীয় এবং বিদেশি সাহিত্যিকদের মধ্যে কার রচনা তাঁকে সবচাইতে প্রবলভাবে টানে, জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে একবার তিনি জানিয়েছিলেন— "রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ"। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, কলকাতারই এক দৈনিক পত্রিকায় সে-উত্তর ছাপা হয়েছিল। অনেকে হয়তো স্মরণ করতে পারবেন। সেই নিখাদ রবীন্দ্রভক্ত মানুষটি, যাঁর সম্পর্কে কারও-কারও একমাত্র আপত্তিই ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কারও তুচ্ছতম আপত্তিকেও তিনি আমল দিতে চান না, সেই মানুষটির সম্পর্কে অকস্মাৎ শোনা গেল যে, তাঁর ভূমিকা এখন রবীন্দ্রবিরোধী। কথাটা অনেকে বিশ্বাসও করলেন। সত্যিই কি এই কথাটা খুব বিশ্বাসযোগ্য ছিল?

জানি, এই প্রশ্নে অনেকে সন্তুষ্ট হবেন না। অনেকে হয়তো এমন ইঙ্গিতও

করবেন (ইতিমধ্যেই করেছেন) যে, স্বদেশে এবং বিদেশে তাঁর ভূমিকা এক নয়। স্বদেশে তিনি রবীন্দ্রভক্ত, কিন্তু বিদেশে গিয়ে তাঁর নিন্দা রটান।

আবার প্রশ্ন করি, তা তিনি কেন করবেন? পশ্চিমি জনসমাজের হাততালি পাবার আশায়? হাততালি তারা দেবে কেন? আজ যদি কোনও ইংরেজ সমালোচক এদেশে এসে মহৎ কোনও ইংরেজ লেখকের— ধরা যাক মিলটনের— নিন্দা রটান, তাহলে কি আমরা তাঁকে বাহবা দেব? খুবসম্ভব দেব না। পশ্চিমি জনসমাজও খুব-সম্ভব হাততালি দেয় না, ভারতীয় সমালোচকের রচনা অথবা বক্তৃতায় যদি তারা মহৎ কোনও ভারতীয় লেখকের নিন্দা শোনে। ভারতীয়দের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। স্বয়ং লর্ড মেকলে, প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য যাঁর দাম্ভিক অবজ্ঞার বস্তু ছিল, ইংরেজ হয়েও তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে বাহবা পাননি। অন্তত তাঁর প্রাচ্যবিদ্বেষের জন্যে পাননি। বলা বাহুল্য, পশ্চিমি মানুষেরা যে আমাদের চাইতে বেশি উদার, এমন কথা ভাববার কোনও দরকার নেই। কিন্তু তাই বলে যে তারা একান্ত অনুদার, এমন কথাই-বা ভাবতে যাব কেন? আমরা কেন ভুলে যাব যে, খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা একদিন রবীন্দ্রনাথকে বরণ করেছিল?

না, রবীন্দ্রনাথের কুযশ গাইলে পশ্চিমি মানুষের বাহবা পাওয়া যাবে, কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি যে স্বপ্নেও এমন কথা ভাবতে পারেন, তা আমরা মনে করি না। (হাততালি পাওয়া সম্ভব হলেই যে বুদ্ধদেব সেই হাততালি কুড়োবার জন্যে লুব্ধ হতেন, এমন কথাই-বা মেনে নেব কেন? কেন ভুলে যাব যে, অন্যের সততায় এত দ্রুত সন্দিহান হওয়াও এক ধরনের মানসিক দারিদ্র্য ছাড়া আর-কিছুই নয়?) যে-উদ্দেশ্য বুদ্ধদেবের উপরে আরোপ করা হয়েছে, সেটা সুতরাং ধাপে টেকে না। কিন্তু শুধু এইটুকুই আমার বলবার কথা নয়। আরও একটি কথা আমি নিবেদন করতে চাই। সেটা এই যে, কুযশ গাওয়া তো দূরের কথা, যেরকম উচ্ছ্বসিত ভাষায় সম্প্রতি পশ্চিমের নানা স্থানে তিনি রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা হয়তো তাঁর মাতৃভাষায় রচিত প্রবন্ধের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত হবে। 'স্যাটার্ডে রিভিয়ু' পত্রিকায় তিনি যা লিখেছেন, তার একাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি :"..... Tagore was one of the wonders of the world. The only poet who matches him in size and range is Goethe, the creator of modern German culture; it is difficult to think of another writer who did as much for his people as these two did for theirs. ....This poet, this lover of clouds and mystic exhalation...was also a great commentator. He discussed all questions of his times, big or small, abstruse or mundane, and always his exposition was full, his insight pure, and his language rich and moving. People simply

lived off him, for well over fifty years. Not to be affected by him, in some way or other, was impossible." ('Saturday Review', May 13, 1961.)

নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে যেভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বুদ্ধদেব, তার পরেও কি বিশ্বাস করা যায় যে, বিদেশি পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথকে তিনি অপব্যাখ্যা করতে চান?

শিক্ষিত মানুষমাত্রেই জানেন, তবু নতুন করে আবার বলবার দরকার হল যে, একালে যাঁরা রবীন্দ্রচর্চা করেন, তাঁদের অনেকের চাইতেই বুদ্ধদেবের ভূমিকা অনেক পরিচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বাইরে থেকে সমালোচনা করেননি। সমালোচক হিসেবে সেই অসামান্য শিল্পীর প্রতি দৃষ্টিপাতের পূর্বে তিনি অনুরাগী হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সমালোচনাকে তাই ক্রিটিসিজ্‌ম না বলে অ্যাপ্রিসিয়েশন বলাই ভালো। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন। মূল্যায়ন মূল্যবান হয়েছে, কেন-না তিনি নিজেও একজন কবি। বস্তুত, অসংখ্য পণ্ডিত-সমালোচক যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই, প্রায় তোতাপাখির মতন, 'ভূমা' 'সীমা' 'প্রমা' ইত্যাদি 'মান্ত' ক্লিশেগুলি আউড়ে যান, এবং গোটা ব্যাপারটাকেই অনর্থক ধোঁয়াটে করে তোলেন, কবি বুদ্ধদেব তাঁর বিভিন্ন আলোচনায় তখন, স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ভাষায়, রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পর্কে এমন অনেক জরুরি কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে—তাঁর আনন্দ এবং যন্ত্রণাকে, তাঁর শান্তি এবং সমস্যাকে—বুঝবার পক্ষে যা সহায়ক হয়। তেমন-কিছু কথা কি তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটিতেও ছিল না?

প্রবন্ধটির দোষ তাহলে কোথায়? দোষ কি এই অনুমানের মধ্যে যে, পশ্চিমের দিকেও সেই মহাকবির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল? বেশ তো, যাঁরা মনে করেন যে, তা ছিল না, প্রত্যুত রবীন্দ্রনাথ পূর্বাস্য হয়েই তাঁর সমস্ত প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন, যুক্তি দিয়ে বুদ্ধদেবের উক্তির তো তাঁরা অনায়াসেই প্রতিবাদ করতে পারতেন। তা তাঁরা করলেন না কেন? প্রতিবাদী আলোচনার মধ্যে না গিয়ে কেন সারাক্ষণই তাঁরা ক্রোধ প্রকাশ করে গেলেন? বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই এমন দাবি করেন না যে, সকলেই অন্ধ এবং একমাত্র তিনিই চক্ষুষ্মান। প্রতিবাদী আলোচনায় যদি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যেত যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোথাও পশ্চিমি প্রেরণা নেই, তাহলে বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই তা মেনে নিতেন। তাহলে কেন আলোচনার পথে, বিতর্কের পথে গেলুম না আমরা?

তবে কি বুঝব, শুধু ক্রুদ্ধই আমরা হতে চেয়েছিলুম? শুধু আঘাত করতেই আমাদের আগ্রহ? বিশ্বাস করতে আমার কুণ্ঠা হয়। কেন-না, এমন অন্তত চার-পাঁচ জন লেখকের আমি নাম করতে পারি, বুদ্ধদেবের প্রবন্ধের একাধিক অংশ সম্পর্কে

যাঁদের আপত্তি ছিল, কিন্তু কাদা ছোড়ায় যাঁদের স্পৃহা ছিল না। "রবীন্দ্রনাথ ও পশ্চিমী সাহিত্য"— এই বিষয়টি নিয়ে তাঁরা একটি সর্বাঙ্গীণ আলোচনার সূত্রপাত করতে চেয়েছিলেন। করলে ভালো হত। সে-ক্ষেত্রে আপত্তি উঠত, তর্ক হত, নতুন-নতুন যুক্তি-প্রমাণের সমাবেশ ঘটত, অনকে দিক থেকে আলো পড়ত, এবং —পরিণামে—যা সত্য, তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠত। এমন আলোচনা সকল দেশেই হয়, লেখকরা তাতে যোগও দিয়ে থাকেন। কিন্তু এখানে তা হল না। হবার কোনও উপায় পর্যন্ত রইল না। কেন-না, আলোচনায় যাঁদের আগ্রহ ছিল, তাঁরা যখন দেখতে পেলেন যে, আক্রোশের ভঙ্গিটাই প্রবল হয়ে উঠছে, তখন সংকোচে তাঁরা সরে দাঁড়ালেন। আবহাওয়া ঘুলিয়ে উঠল।

এই ঘুলিয়ে-ওঠা আবহাওয়া থেকে অন্তত একটা শিক্ষা আমরা পেলুম। তা এই যে, যুক্তির কেন্দ্র থেকে আমরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি। আলোচনার চাইতে আঘাত করতেই আমাদের বেশি আনন্দ। আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছি। অন্যের মতামতকে আমরা বিচার করে দেখতে চাই না। আমরা রেগে যাই।

স্বীকার করব, বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সম্পর্কে এমন আলোচনাও আমার চোখে পড়েছে, লেখক যেখানে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন, ব্যক্তিগত আক্রমণে উৎসুক হননি। কিন্তু তেমন আলোচনা আর ক-টি হল? পক্ষান্তরে, অধিকাংশ মানুষই কেন আক্রোশকে আশ্রয় করলেন? অসহিষ্ণু গলায় কথা বলতে চইলেন?

এই আক্রোশকে নিয়েই আমার দুর্ভাবনা। এই অসহিষ্ণুতাকে নিয়েই আমার আতঙ্ক। বুদ্ধদেব আজ অনেকের প্রবল উষ্মার লক্ষ্য হয়েছেন। কিন্তু তা নিয়ে কারও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কেন-না অনেকের চাইতেই তাঁর রবীন্দ্রানুরাগ অনেক বেশি। আজ না হোক, কাল তা সবাই মেনে নেবে। কাল না হোক, পরশু। কিন্তু ভাবতে আমার ভয় হয় যে, এমন-কিছু মানুষও হয়তো এ-দেশে আছে, মনেপ্রাণে যারা ভারতবাসী, কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের সকল অংশ যাদের সমানভাবে টানে না। তাদের কী হবে? তারা কি আমাদের নিষ্ঠুর বিদ্রুপের শিকার হবে? আমরা ষোলোআনা রবীন্দ্রভক্ত। কিন্তু তা যারা নয়, কথায় কথায় কি আমরা তাদের টিটকারি দেব? তাদের শান্তি নষ্ট করব? তাদের নিয়ে ছড়া লিখব? এবং সেইটেই কি আমাদের রবীন্দ্রভক্তির প্রমাণ বলে গণ্য হবে?

ভাবতে আমার লজ্জা হয়।

১৩৬৮

গগন অন্ধকার

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাঁর কবিতা গল্প কিংবা প্রবন্ধের মাধ্যমে নয়। আমি তাঁকে তাঁর গানের মাধ্যমে চিনেছিলুম। চিনিয়ে দিয়েছিল আমার দিদি। আমার বয়স তখন সাত বছর; দিদির নয়।

তিরিশ বছর আগেকার সেই সন্ধ্যাটিকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যে, পুব-বাংলার একটি গ্রাম্য গৃহের বারান্দায়, আমাদের দেশের বাড়ির বারান্দায়, আমরা গোল হয়ে বসে ছিলুম। আমি, ঠাকুমা, মা, কাকিমা আর দিদি। বারান্দার এক কোণে একটা কুপি জ্বলছিল। কিন্তু উঠোনের অন্ধকার তাতে ঘোচেনি। হাওয়া বইলে আমাদের ঢেউ-খেলানো টিনের চালের ওপরে একটা অদ্ভুত শব্দ উঠত। চিনিটোরা আমগাছের যে বেয়াড়া ডালটা তার মূল কাণ্ডের থেকে অনেকখানি সরে এসে আমাদের চালের গায়ে হেলান দিয়ে থাকত, তার ঘষটানির শব্দ। দিনের বেলায়, সহস্র রকমের শব্দের মধ্যে, তাকে আলাদা করে চেনা যেত না। কিন্তু রাত্রি এলেই সেই শব্দটা খুব স্পষ্ট হত। তখন আমি ভয় পেতুম। সেদিন হাওয়া ছিল না। তাই টিনের চালে কোনও শব্দ হচ্ছিল না। চুপচাপ আমরা বসে ছিলুম। দেখতে পাচ্ছিলুম যে, কুয়াশা ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে।

সেই নিঃশব্দ সন্ধ্যায়, দৃশ্যবিহীন সেই কুয়াশার মধ্যে, সব-কিছুকেই খুব বিষণ্ণ লাগছিল। আমি আশা করছিলুম যে, এইবারে কেউ একটা গল্প বলবে।

কেউ কোনও গল্প বলল না। মা বললেন, "লতু, তুই একটা গান গা।"

দিদি গান গাইল। "ভীষ্ম যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার..."

গান শেষ হবার পরে আমাকে বলল, "কার গান জানিস?"

আমি বললুম, "না।"

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাঁর গান শুনে সাহেবরা তাঁকে এক লাখ টাকা দিয়েছে। তিনি খুব বড়ো কবি। পৃথিবীর সবচাইতে বড়ো কবি। তুই তাঁর নাম শুনেছিস?"

"না।"

দিদি হেসে উঠল, বলল, "মা, তোমার এই ছেলেটা একটা আকাট মুখ্খু। কিছু জানে না।"

কথাটা ঠিক নয়। রোজই যেহেতু কৃত্তিবাস আর কাশীরামের গ্রন্থ থেকে ঠাকুরদাকে কিছু-না-কিছু পড়ে শোনাতে হত, তাই সাত বছর বয়সে আমি আর-কিছু না জানি, 'রামায়ণ' আর 'মহাভারত'-এর প্রায় প্রতিটি চরিত্রেরই নাম জানতুম। সবচাইতে ভালো করে জানতুম ভীষ্মকে, স্বেচ্ছায় যিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

তাই রবীন্দ্রনাথের নাম না জানলে কী হয়, তাঁর ওই গানটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। "ভীষ্ম যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার...।" শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন ভীষ্মের মৃত্যুর দৃশ্যটা আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। শরশয্যার ওপরে তিনি শুয়ে আছেন, নতমুখ কৌরব আর পাণ্ডব বীরেরা তাঁকে ঘিরে আছে, সূর্য অস্ত গেল, সারা আকাশ অন্ধকার। কে জানে, সেই সন্ধ্যায় ঠিক আজকের মতোই এত কুয়াশা জমেছিল কি না। হয়তো জমেছিল। হয়তো ঠিক আজকের মতোই, সেদিন কোথাও এতটুকু হাওয়া ছিল না। গাছের পাতা স্থির হয়ে ছিল।

এতটাই হয়তো ভাবিনি। কিন্তু দিদির মুখে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে-শুনতে যে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গানের একটি নিঃশব্দ সন্ধ্যা আর আমাদের গ্রামের বাড়ির উঠোনের সেই বিষণ্ণ অন্ধকার আমার চোখের সামনে বারবার একাকার হয়ে যাচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

দিদির গানে ভুল ছিল, আমি বড়ো হয়ে জানলুম। কথাটা 'ভীষ্ম' নয়, 'বিশ্ব' হবে। "বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার...।" কিন্তু, আশ্চর্য, আজও যখন ওই গান শুনি, আকাশ-অন্ধকার-করা একটি বিপুল মৃত্যুর দৃশ্যই আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আশ্বিন ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা

জগৎ-কবিসভায় মোরা তাঁহার করি গর্ব। কিন্তু সে কি শুধু এই জন্যে যে, তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন? তা নিশ্চয়ই নয়। বরং, নোবেল কমিটির কথা ভাবতে গেলেই বেদনা বোধ করি। যে-বই লিখে অন্য যে-কেউ ধন্য হত,কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আর-পাঁচখানা গ্রন্থের তুলনায় যার আবেদন, বিশ শতকের মানুষের কাছে, অনেক পরিমিত, সেই *গীতাঞ্জলি*-র মারফতে তাঁরা রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁদের দোষ নেই। কেন-না, একে তো তাঁরা তখন বস্তুবাদী সভ্যতার বিনাশী রূপ দেখে বিচলিত বোধ করছিলেন, তদুপরি *গল্পগুচ্ছ*-র রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা চিনতেন না। চেনা সম্ভব ছিল না। অন্যতম অন্তরায় ছিল ভাষা। যতদূর জানি, গল্পকার রবীন্দ্রনাথ তখনও পশ্চিম-দেশে অনূদিত হননি।

গীতাঞ্জলি থেকে আমার যাত্রারম্ভ। *গল্পগুচ্ছ*-র দিকে। শব্দ বদলে বলতে পারি, আকাশ থেকে আমার যাত্রারম্ভ। মৃত্তিকার দিকে। ঈশ্বর নিয়ে আমি আদৌ ভাবিত নই ; আমি মানুষ নিয়ে ভাবিত। তা-ও 'নির্বিশেষ মানুষ' নিয়ে নয়, 'বিশেষ মানুষ' নিয়ে। এবং এই উক্তি যে একা আমার পক্ষে সত্য, এমন কথা আমার মনে হয় না। সত্য একালের অনেক লেখকের পক্ষেই। তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, তাঁরা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। আসল কথা, ঈশ্বর আছেন কি নেই, এই সমস্যা নিয়ে তাঁরা তেমন ভাবিত নন। তাঁদের ভাবনা, প্রধানত, মানবকেন্দ্রিক। ব্যক্তিজীবনে তাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে পারেন ; কিন্তু শিল্প-জীবনে তাঁরা ঈশ্বরকে প্রায় অনুপস্থিত রেখেছেন। আসন দিয়েছেন মানুষকে। সেইসব মানুষকে, যারা আশায় উন্মুখ এবং বিপদে ব্যাকুল হয়। ক্ষোভে অস্থির এবং লোভে জর্জর হয়। ধমনির মধ্যে যারা অন্ধকারের অসুখ বহন করে। যারা অন্ধকারকে পেরিয়ে যেতে চায়, কিন্তু প্রতিবন্ধ যেহেতু বাইরের নয়, ভিতরের, সুতরাং—আপন অসুখেরই শত্রুতাবশত—সেই উত্তরণ যাদের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয় না।

এক কথায়, নেহাতই যারা সাধারণ মানুষ, তারাই এখন সাহিত্যিকের ভাবনাকে অধিকার করেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোন্‌খানে এমন সাধারণ মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে? বলা বাহুল্য, তাঁর কথাসাহিত্যে। তা-ই যদি হয়, তবে একালের যাঁরা

সাহিত্যিক, কবি রবীন্দ্রনাথের চাইতে কথাকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই যে তাঁরা বেশি-পরিমাণে যুক্ত হতে চাইবেন তাতে আর আশ্চর্য কী।

একটা কথা এখানে বলা দরকার। *গীতাঞ্জলি*-র কাব্যভাবনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। শুধুই *গীতাঞ্জলি* কেন, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাহিত্যই আমাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধার বস্তু। আমাদের পক্ষে খুবই গর্বের বিষয় হত, কবি রবীন্দ্রনাথের মতন অতখানি প্রবল বিশ্বাস নিয়ে যদি আমরা ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকাতে পারতুম। তা আমরা পারি না। কেন-না, স্বীকার করা ভালো, সেই প্রবল বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে আমরা নির্বাসিত হয়েছি। আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছি মাটিতে। প্রথম অবস্থায় সেটা পরম বেদনার ব্যাপার হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখছি, মৃত্তিকায় যারা বিচরণ করে, সেই মানুষগুলির আকর্ষণও নেহাত অল্প নয়।

আমরা আপাতত, সেই মানুষগুলির মধ্যেই মগ্ন আছি। তারা কি রবীন্দ্র-সাহিত্যে নেই? নেই, এমন অদ্ভুত কথা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস যিনি পড়েননি। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রকাব্য যিনি খুঁটিয়ে পড়েছেন, তাঁর পক্ষেও বোধহয় বলা সম্ভব নয় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তারা আছে। আমি জানি, এখানে 'দুই বিঘা জমি' এবং অনুরূপ আরও কিছু কবিতার কথা উঠবে। কিন্তু, এসব কবিতাকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করাই ভালো। কেন-না, রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর বলতে যা বোঝায়, এসব কবিতার সুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক সত্যিই সুদূর। রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে ঈশ্বর এবং প্রকৃতিকে নিয়ে। সেইসঙ্গে 'নির্বিশেষ মানুষ'কে নিয়ে। 'বিশেষ মানুষ'-এর আশা-আনন্দ অথবা দুঃখ-বেদনা নিয়ে নয়। অন্য কথায় বলতে পারি, কবি রবীন্দ্রনাথ 'মানবতা' নিয়ে যত ভেবেছেন, 'মানুষ' নিয়ে তত ভাবেননি।

উক্তিটা হয়তো স্ববিরোধী শোনাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি স্ববিরোধী? না, তা নয়। কেন-না, যেমন নির্বিশেষের সঙ্গে বিশেষের, তেমনই মানবতা-সম্পর্কিত ভাবনার সঙ্গে মানব-সম্পর্কিত ভাবনারও কিছু পার্থক্য আছে। আমরা যখন মানবতার কথা ভাবি, তখন কোনও বিশেষ মানুষ তার চেহারা অথবা চরিত্র নিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। স্পষ্ট একমাত্র তখনই হয়, আমরা যখন রাম শ্যাম কিংবা যদুর কথা ভাবি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কবিতা যদি মানবতার উপরে দৃষ্টি না রেখে রাম শ্যাম অথবা যদুর উপরে রাখে, অর্থাৎ 'বিশেষ মানুষ'-এর উপরে রাখে, তার মহিমা কি তাতে নষ্ট হবে না? হবে না। তার কারণ, মানবতার চাইতে মানুষ-এর মাহাত্ম্য কিছু কম নয়। ব্যক্তি-মানুষের অ-বিকল্প স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে রাখলে আর এ নিয়ে কোনও সংশয়ের কারণ থাকে না।

একালে যাঁরা কবিতা লেখেন, ব্যক্তি-মানুষ অথবা বিশেষ-মানুষের সেই স্বাতন্ত্র্য তাঁদের কল্পনাকে হয়তো অধিকার করে থাকবে। তাঁদের কবিতায় ইতিমধ্যেই ব্যক্তি-মানুষের গলা শুনতে পাচ্ছি। অনুমান করি, বাংলা কবিতায় অতঃপর হয়তো ঘটনার ছায়া পড়বে। ঘটনার মধ্যে গিয়ে না দাঁড়ালে যেহেতু ব্যক্তি-মানুষের চারিত্রিক প্রবণতা তেমন স্পষ্ট হয় না। কেমন ঘটনা? তেমন ঘটনা, কবিতার পক্ষে যার ভার বহন করা খুব শক্ত নয়। এমন ঘটনা, পাঠককে যা ধাক্কা দেয় না, চমকে দেয় না; কিন্তু পাঠকের ভাবনায় তবু যার ছায়া পড়ে। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে যার অজস্র উদাহরণ আছে। তার থেকে শিক্ষা নিয়েই এখন বাংলা কবিতায় কিছু পরীক্ষা চালানো সম্ভব।

খেয়াল করবার বিষয়, বাংলা গল্পসাহিত্যে এদিকে ঘটনার প্রভাব ক্রমেই ধূসর হয়ে যাচ্ছে। কবিতা এবং গল্প কি এখন, যে যার আপন কোঠা থেকে খানিকটা পথ এগিয়ে এসে, পরস্পরের সান্নিধ্য পেতে চায়? এ-প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে, আমার এক তরুণ বন্ধু কিছুকাল আগে মন্তব্য করেছিলেন যে, কবিতা এবং গল্পের আত্মিক ব্যবধান অচিরে লোপ পাবে। মনে হয়, তাঁর মন্তব্যে কিছু যুক্তি ছিল।

চৈত্র, ১৩৬৭

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শরদিন্দু আমার খুবই প্রিয় লেখক। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নেহাত আজকের নয়, প্রায় বাইশ বছরের। অথচ, ভাবতে বিস্ময় লাগে, তাঁকে আমি দেখেছি মাত্র একবার। কলকাতার এক বৈশাখী সাহিত্যসভায়। সেখানে আলোচনার ব্যবস্থা ছিল, পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল এবং প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না, যাতে একে অন্যের সঙ্গে আলাপিত হতে পারেন। শরদিন্দুর সঙ্গে কেউ আমাকে আলাপ করিয়ে দেননি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার আগ্রহের অন্ত ছিল না। কিন্তু গায়ে-পড়ে কথা বলতে যাওয়াটাকে একালে যেহেতু অশালীন আচরণ বলে গণ্য করা হয়, করতলে থুতনি রেখে তাই আমাকে বসে থাকতে হয়েছিল। পরে মনে হয়েছে, ভুল করেছি। কেন-না, লেখা পড়ে যেটুকু বুঝতে পারি, শরদিন্দু তো একালের মানুষ নন। যে-কাল তার সমস্ত সমারোহ নিয়ে বিদায় নিয়েছে, এবং যাবার বেলায় আকাশের গায়ে শান্ত এবং নিরুচ্চার একটি বেদনার রক্তরাগরেখা রেখে গিয়েছে মাত্র, তিনি সেই কালের মানুষ। সুতরাং তিনি নিশ্চয় কিছু মনে করতেন না। তাঁর কাছে অনেক কথা আমার জানবার ছিল। জেনে নিলেই ভালো হত। অনেক কথা তাঁকে বলবার ছিল। না-বলে ভালো করিনি। তিনি দূরে থাকেন এবং কালেভদ্রে কলকাতায় আসেন। সুতরাং অচিরকালের মধ্যে আর হয়তো দেখাসাক্ষাতের সুযোগ আসবে না। শরদিন্দু আজও নিশ্চয় জানেন না, তাঁর এক অনুরাগী পাঠক সেদিন তাঁর ঠিক পাশেই এসে বসে ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে তার মুখ খোলেনি, নীরবে ফিরে গিয়েছে।

লেখক হিসেবে শরদিন্দুকে যে আমার এত ভালো লাগে, তার অন্যতম কারণ, আমার বিস্মৃত শৈশবকে তিনি আবার নতুন করে মনে পড়িয়ে দেন। আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগেকার কথা বলছি; আমার বয়স তখন পুরো তেরোও নয়। কলকাতার রাস্তাঘাট তখনও শান-বাঁধানোই ছিল বটে, কিন্তু তাতে বিজলিবাতির এত সমারোহ ছিল না। গলিতে-গলিতে গ্যাসের বাতি-জ্বলত। এবং মনে হত, শহরটা যেন সেই মায়াবী আলোয় ডুব দিয়ে সুন্দর কোনো স্বপ্ন দেখছে। বাড়িতে তখন চারখানি কাগজ আসত। বড়োদের জন্য তিনখানি— *ভারতবর্ষ*, *বসুমতী* আর

প্রবাসী। ছোটোদের জন্য একখানি— *শিশুভারতী*। বাবার ইচ্ছে ছিল, *শিশুভারতী* পড়িয়ে-পড়িয়ে তাঁর গৃহের শিশুদের জ্ঞানের বনিয়াদটাকে তিনি পোক্ত করে তুলবেন। বাড়িতে শিশু বলতে তখন আমি আর দিদি। ওই জ্ঞানগর্ভ কাগজখানিকে আমরা কিন্তু খুব ভালোবাসতে পারিনি। তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক খবর থাকত বটে, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের গল্প থাকত না। আকাশকে নীল দেখায় কেন, এবং সমুদ্রের জল নোনা কেন, *শিশুভারতী* পড়ে তা জানা যেত, কিন্তু সিংহ অথবা দস্যুর কবলে পড়লে কী করে তাদের জব্দ করতে হয়, এই জরুরি তথ্য জানবার কোনো উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে, আমাকে তাই *মৌচাক* কিনতে হত। পরে একদিন আবিষ্কার করা গেল, বাবা যখন কলেজে চলে যান, এবং দুপুরের কাজকর্ম সেরে হেঁশেল চুকিয়ে মা যখন *ভারতবর্ষ* পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, সেই বয়স্কপাঠ্য কাগজখানি তখন দিদির হস্তগত হয়। ঘড়িতে চারটে বাজবার আগেই দিদি সেটিকে আবার যথাস্থানে রেখে আসে। এই দু-ঘণ্টার জন্য *ভারতবর্ষ*-র এতদিন একটিমাত্র শিশু-পাঠিকা ছিল। এবারে তার একটি শিশু-পাঠকও জুটল। সেইসঙ্গে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়েরও।

শরদিন্দুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর পুরুষ-চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমার সহোদরার মনোভাব কী ছিল, আজও তা আমি জানতে পারিনি। কিন্তু তাঁর নারী-চরিত্রগুলি আমার দিনের আহার এবং রাত্রির নিদ্রা কেড়ে নিল। এককথায় আমি তাদের প্রেমে পড়ে গেলুম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। কথাটা সত্য বলে আমার মনে হয় না। অন্তত আমার ক্ষেত্রে সত্য হয়নি। হাফপ্যান্ট-পরা অজাত-গুম্ফশ্মশ্রু একটি কিশোরের চিত্তে ভালোবাসার যে-স্নিগ্ধ আলোটি সেদিন জ্বলে উঠেছিল, এখনও তার নিববার লক্ষণ নেই। তার চোখের সামনে প্রেমে পরিপূর্ণ এবং স্নেহে শান্ত এক আশ্চর্য পৃথিবীর দুয়ার সেদিন খুলে গিয়েছিল। সেই পৃথিবীর আকর্ষণ আজও কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি। তার সেই আকাশের নম্র নীলিমাকে, ঝরনার কলস্বরকে, অরণ্যের বর্ণালিকে আজও আমি সমান ভালোবাসি। মাঝখানে বাইশ বছরের ব্যবধান। কিন্তু শরদিন্দু আজও আমার প্রিয় লেখক।

এখন প্রশ্ন উঠবে, লেখক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এমন কী তিনি দিয়েছেন, যাতে আর-পাঁচজনের তুলনায় তাঁকে একটু বেশি ভালো লাগতে পারে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। আগে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান নেওয়া যাক।

স্বাতন্ত্র্য তাঁর সর্বত্র। বিষয়-নির্বাচনে, চরিত্র-রচনায়, পরিবেশ-নির্মাণে। এমন অনেক বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন, তাঁর আগে আর কেউ-ই কখনও যাকে স্পর্শ

করবার পর্যন্ত সাহস পাননি। এমন কিছু চরিত্র তিনি উপহার দিয়েছেন, যার তুলনা সত্যিই বিরল। এবং এমন কিছু পরিবেশের তিনি নির্মাতা, ঘনবর্ণ বর্ণনার সমারোহে যা আজও আমাদের বিস্ময়ের উৎস হয়ে রয়েছে। সর্বোপরি তাঁর ভাষা। সাধুভাষাও যে এত সহজ হতে পারে, কে তা জানত। সে-ভাষা সহজ এবং সুন্দর। হয়তো-বা এত সহজ বলেই এত সুন্দর! তাই দিয়ে, যেন কোনো জাদুকরের অনায়াস দক্ষতায়, নিটোল মুক্তোর মতন এক-একটি গল্প তিনি গড়ে তুলেছেন। পাঠককে কোথাও এতটুকু শ্রান্ত হতে দেননি। কোনো এক আশ্চর্য আকাশের, কোনো এক মায়াবী অরণ্যের মেঘ আর আলো আর অন্ধকারের গল্প শোনাতে-শোনাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে এসেছেন। গল্প শেষ হল। পাঠক ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, সেই আকাশ আমাদেরই এই নিত্যকার আকাশ, যার মেঘ আর বর্ণচ্ছটা আমাদের চোখে পড়েনি। সেই অরণ্যও আমাদের নিত্যকার অরণ্য। যার অন্ধকার আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। গল্প শেষ হল, কিন্তু পাঠক তবু মুখ খুললেন না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কেন-না, কথা যদিও ফুরিয়েছে, তার রেশ তখনও ফুরোয়নি। শরদিন্দুর গল্প পড়ে মনে হয়, যেন একটি গান শোনার অভিজ্ঞতা হল। কিংবা কবিতা পাঠের। শোনা কিংবা পড়ার ঠিক পরমুহূর্তেই যা ফুরিয়ে যায় না।

সতর্ক পাঠক হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, আধুনিক কালের প্রতি শরদিন্দুর বিশেষ পক্ষপাত নেই। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, একালের মানুষদের নিয়ে তিনি লেখেননি। লিখেছেন। বস্তুত, এমন গল্পও তাঁর প্রচুর, এই খণ্ডকালের সমস্যাই যার উপজীব্য। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, কালের খণ্ডতা সেই গল্পগুলির আবেদনকে কোথাও খণ্ডিত করেনি। চার-দেয়ালের মাঝখানে যে-অল্প-একটু পরিসর, তাঁর অনেক চরিত্রই সেখানে সংসার বিছিয়ে বসেছে বটে, কিন্তু লেখকের লক্ষ্য ছিল, তাদের আনন্দ-বেদনাও যেন তারই মধ্যে আবদ্ধ না থাকে। সময়ের সেই দেয়াল ডিঙিয়ে নিত্যকালের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে যেন তা যুক্ত হয়। মানুষগুলি ছোটোমাপের, তাদের অনুভূতির আয়তনও অবশ্যই ছোটো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই অনুভূতি যেন নিঃসম্পর্ক না হয়, যেন কোনো বৃহৎ অনুভূতির সঙ্গে সে তার যোগ রাখতে পারে।

অনুমান ভুল হতে পারে, কিন্তু সত্যিই এক-এক সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, বর্তমানকালের ছোটো হাসি আর ছোটো কান্নার ইতিবৃত্ত রচনায় শরদিন্দু খুব-একটা উৎসাহ কখনও পাননি। পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর হাতে ছিল নিত্যকালের তুলি, তাঁর প্যালেটে ছিল লাল, হলুদ, নীল আর সবুজের সমারোহ। এবং তাঁর সামনে ছিল মস্ত-বড়ো একটা ক্যানভাস। ওই তুলি আর ওই রং দিয়ে বিরাট ওই ক্যানভাসে যদি তিনি পটোলডাঙার এক ভাড়াটে-বাড়ির ছবি আঁকতে যেতেন তো সেটা প্রচণ্ড

একটা ঠাট্টা হয়ে দাঁড়াত। ছবির বিষয়বস্তু খুঁজতে শরদিন্দুকে তাই অতীতে যেতে হয়েছে। কখনও-বা কাছের অতীতে, কখনও-বা দূরের। সেখানে "এমন অনেক জিনিস ছিল— যাহা সেকালের সম্পূর্ণ নিজস্ব, এ কালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই। অতিকায় হস্তীর মতো তাহারা সব লোপ পাইয়াছে। মনে হয় যেন তখন মানুষ বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড়ো-একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর- একজনকে হত্যা করিত, এবং সেইজন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রূরতা, চাতুরি, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না।"

শরদিন্দুরই বিখ্যাত একটি গল্প (অমিতাভ, *জাতিস্মর*) থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে দিয়েছি। তাঁর সব কথাই আমরা মেনে নেব, শুধু একটি কথা ছাড়া— "এ কালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই।" সম্বন্ধ যদি না-ই থাকবে, তো বারে-বারে কেন একালের এক শ্রেষ্ঠ লেখক তার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াবেন। সাদৃশ্য তেমন নেই, কিন্তু সম্বন্ধ আছে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর না হোক, কালের সঙ্গে কালের। এবং আত্মার সঙ্গে আত্মার। শরদিন্দু— ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত তাঁর গল্পগুলিতে— সেই সূত্রটিকেই হয়তো খুঁজে বেড়িয়েছেন। একালের এনট্রান্স পাস করা এক রেল-কেরানিকে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছেন সেকালের রাজ-ভাস্কর পুণ্ডরীকের সঙ্গে, দুর্গাচরণ ব্যানার্জি লেনের কসাই গোলাম কাদেরকে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছেন সেকালের মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদকির সঙ্গে। এই চেষ্টা অবশ্যই অকারণ নয়।

শরদিন্দুর গল্প-উপন্যাসকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করে নিতে পারি : সামাজিক, ঐতিহাসিক আর রহস্যকেন্দ্রিক। রহস্যকেন্দ্রিক কাহিনিগুলির মধ্যেও আবার নতুন আর-একটি শ্রেণিবিভাগ সম্ভব : ভৌতিক এবং গোয়েন্দা-গল্প। গোয়েন্দা-গল্প নামটা অবশ্য তেমন সুবিধের নয়, খট করে কানে লাগে ; এবং বাংলা ভাষায় সচরাচর যেসব শিশুসেব্য গোয়েন্দা-গল্প পড়তে আমরা অভ্যস্ত, তাতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ও বস্তুর সঙ্গে হয়তো সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক সত্যিই ছিল না। শরদিন্দুকে ধন্যবাদ, সেই সম্পর্ক তিনি ঘটিয়েছেন। তাঁর সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের নানা কীর্তিকাহিনি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সকলেই একথা স্বীকার করবেন। নিজে আমি গোয়েন্দা-গল্পের ভক্ত। কোনান ডয়েলের রোগা-গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌স, চেস্টরটনের বেঁটে-গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন থেকে শুরু করে আগাথা ক্রিস্টির গুঁফো-গোয়েন্দা অ্যারকিউল পোয়ারো এবং স্ট্যানলি গার্ডনারের ভদ্র-গোয়েন্দা পেরি মেসনের সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। নিকোলাস ব্লেক— এই ছদ্মনামে তিরিশের বিখ্যাত কবি ডে-লুইস যেসব

গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন, তারও সত্যান্বেষী চরিত্রটিকে আমি চিনি। কিন্তু বলতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই যে, ব্যোমকেশকে এদের কারও তুলনাতেই এতটুকু নিষ্প্রভ বলে কদাচ আমার মনে হয়নি। বরং অনেকের তুলনাতেই উজ্জ্বলতর মনে হয়েছে।

কথায়-কথায় অনেক দূরে এসে পড়েছি। আসলে আমার বলবার কথা ছিল এই যে, ঐতিহাসিক অথবা রহস্যকেন্দ্রিক—যে-গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, শরদিন্দুর প্রতিটি রচনাই বড়ো মধুর। চোখে এক অলৌকিক আলো এবং বুকে এক আশ্চর্য ভালোবাসা নিয়ে এই পৃথিবীকে তিনি দেখেছেন। তার ফুল-লতা-পাতা, তার আকাশ, তার সমুদ্র, তার অরণ্য আর বিশাল প্রান্তরই শুধু নয়, তার মানুষগুলিও তাই অসামান্য এক রূপের শরীর নিয়ে তাঁর চোখের সামনে এসে ভেসে উঠেছে। নিমাই পণ্ডিত তাঁর সমস্ত কাজ ফেলে রেখে তাই প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সেতু বেঁধে দেন, কালো মেয়ে রুচিরাও তাই প্রেমের আশীর্বাদে ধন্য হয়, এবং গোয়েন্দার বউ সত্যবতীও তাই সুরসিকা হয়ে ওঠে। সত্যিই হয়তো এই পৃথিবী অত সুন্দর একটা জায়গা নয়, এবং মানুষগুলিও হয়তো আর-একটু কুশ্রী; কিন্তু শরদিন্দুর দৃষ্টি যেহেতু প্রেমের, কোনো কুশ্রীতাই সেখানে তাই ধরা পড়েনি। শরদিন্দু দেখতে চেয়েছিলেন যে, আমরা সুন্দর। তা-ই তিনি দেখেছেন।

কেউ কেউ বলবেন, এই দেখাটা পূর্ণ-দেখা নয়। কার দেখাটাই বা পূর্ণ? চোখে অণুবীক্ষণ এঁটে মানবজীবনের ছোট্ট এক-একটা অপূর্ণতাকে যাঁরা তিনশো গুণ বড়ো করে দেখছেন, এবং দেখাচ্ছেন—তাঁদের? প্রশ্নটা নির্বাচনের এবং রুচির। আসল কথা, শরদিন্দু সৌন্দর্যনিষ্ঠ শিল্পী। তাই, অলক্ষ্মীর মূর্তি যদি কেউ গড়াতে চান, অন্য কারও কাছে তাঁকে যেতে হবে, শরদিন্দুর কাছে নয়।

নিজের কথা বলতে পারি। সৌন্দর্যে আজও আমার অরুচি ঘটেনি। আমি তাই শরদিন্দুর কাছেই যাব।

চৈত্র ১৩৬৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

> His conduct towards his friends, and especially to those who tried to help him, was cavalier. He made a principle of biting the hands that tried to feed him. And the curious thing is that he loved those friends none the less, while they were grateful to accept his abuse.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে সূচনাতেই ডি.এইচ. লরেন্স সম্পর্কে সমালোচক রিচার্ড চার্চের একটি মন্তব্য উদ্ধার করেছি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, লরেন্সের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যিই কিছু সাদৃশ্য ছিল। শিল্পাদর্শে না হোক, শিল্পের উপকরণে। এবং জীবনেও।

শিল্প এবং জীবনকে ইংল্যান্ডের আর ক-জন সাহিত্যিক অভিন্ন রাখতে চেয়েছিলেন? লরেন্সের মতো? শিল্প এবং জীবনকে এই বঙ্গভূমির আর ক-জন সাহিত্যিক একীভূত করতে পেরেছিলেন? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো? এবং এই একীকরণের প্রয়াসে লরেন্স অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এতখানি মূল্যই বা আর ক-জনকে দিতে হয়েছে?

সাহিত্য-জীবনে এই একীকরণের পরিণাম দুজনেরই পক্ষে সুফলপ্রদ হয়েছিল। ব্যক্তিজীবনে কারও পক্ষেই হয়নি। যেমন লরেন্সের, তেমনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জীবন এবং মৃত্যু সেই আংশিক অসাফল্যের প্রমাণ হয়ে রইল। কিন্তু তার জন্য আক্ষেপ করে লাভ নেই। কেন-না, ব্যক্তিজীবনের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্বে লরেন্সের আস্থা ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও না।

নির্বিচার প্রয়োগের ফলে 'বিপ্লব' কথাটির গুরুত্ব ইদানীং হ্রাস পেয়েছে। অন্যথায় বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকে এক বৈপ্লবিক ঘটনা বলে আখ্যাত করা চলত। সত্যিই বৈপ্লবিক। সাহিত্যের আদর্শ না হোক, উপায় এবং উপকরণ সম্পর্কে যেসমস্ত ধারণা এ দেশে প্রচলিত ছিল, সর্বাংশে না হোক, অনেকাংশেই তিনি তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। এবং, আদর্শই বা নয় কেন? আদর্শের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশ্বাস তো প্রচলিত বিশ্বাসের সমর্থক ছিল না। সে-কথা তিনি ইতস্তত ব্যক্তও করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধে, ভাষণে, বক্তৃতায়। এসবই আমরা জানি। কিন্তু সত্যের খাতিরে শেষপর্যন্ত বলতেই

হয় যে, অন্তত এক্ষেত্রে— আদর্শের ক্ষেত্রে— তাঁর বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেনি। এমনকি, তাঁর আপন সাহিত্যেও না। সাহিত্যের কোন্ আদর্শে তাঁর আস্থা ছিল? মনোহরণের আদর্শে অবশ্যই নয়। হিতসাধনকেই তিনি তাঁর লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কতখানি হিত সাধিত হয়েছে, সে-বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলবার সময় এখনও আসেনি। আপাতত, এইটুকুই বলবার যে, শেষ লক্ষ্য যা-ই হোক, মানবজীবনের এক অজ্ঞাতপরিচয় অংশের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, এবং সেই প্রয়াসের সাফল্য প্রায় অভূতপূর্ব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধহয় প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক, আমাদের শিক্ষাগত নানাবিধ পূর্বসংস্কার এবং চিন্তাগত নানাবিধ ভাবালুতা সম্পর্কে যাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। সমাজের অবহেলিত মানুষকে নিয়ে তাঁর আগে কি আর কেউ সাহিত্য রচনা করেননি? অনেকেই করেছেন। এককভাবে তো বটেই, এমনকি সঙ্ঘবদ্ধভাবেও। ভুলে না যাই, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবের আগেই কল্লোল-গোষ্ঠীর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। তাঁর অগ্রবর্তী শিল্পীরা যেখানে সাহিত্যের উপকরণ নির্বাচনে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েও বুদ্ধির আভিজাত্যকে ত্যাগ করতে পারেননি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ছিলেন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মানুষ। নীচের তলার মানুষকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেই তিনি অনন্য নন। অনন্য এই কারণে যে, সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোধহয় নীচের তলায় গিয়ে দেখেছিলেন।

যাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। তার কারণ তথাকথিত শিক্ষিত এবং সভ্য সম্প্রদায়ের অসার সম্ভ্রমবোধ সম্পর্কে তাঁর অশ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তাদের চিন্তায় যে কতখানি ভ্রান্তি, আচরণে কতখানি কৃত্রিমতা, এবং এ-দুয়ের মধ্যে যে কত বড়ো অসংগতি রয়ে গিয়েছে, তা তিনি জানতেন। একমাত্র তিনিই বোধহয় জানতেন যে, শুধু অন্যকেই নয়, নিজেদেরও তারা ফাঁকি দিয়ে থাকে, দিতে বাধ্য হয়। কার্নিশের দিকে চোখ দেবার আগেই বাড়ির ভিতটাকে যে পাকা করে তুলতে হয়, তা তারা জানে না। কিংবা জানলেও হয়তো ভুলে থাকতে চায়।

এদের নিয়ে কি তিনি লেখেননি? এদের নিয়েও লিখেছেন। এই ফাঁপা আভিজাত্য নিয়ে তিনি বিদ্রুপ করতে পারতেন। তা তিনি করেননি। এমন অনেক ছোটোগল্প এবং এমন একাধিক উপন্যাস তাঁর আছে, বিকৃতবুদ্ধি অথবা বিভ্রান্ত মানুষরাই যার উপজীব্য। এদের তিনি আঘাত দিয়েছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের লক্ষ্য করে তোলেননি। তার কারণ আর অন্য কিছুই নয়, তিনি সিনিক ছিলেন না। সমাজ-শরীরের নানা বিচ্যুতি এবং সমাজ-মানসের নানা অসংগতি সম্পর্কে তাঁর

প্রচণ্ড অশ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু শুধুই অশ্রদ্ধা ছিল না, বেদনাও ছিল। এবং তারও তীব্রতা বড়ো সামান্য নয়। হৃদয়ে বেদনা নিয়ে আঘাত হয়তো করা যায়, ব্যঙ্গ করা যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেননি। এমনকি, তাঁর অন্যতম স্মরণীয় গল্পের সেই ঠিকেদার নায়কটিকেও না, যুদ্ধের বাজারে যে রাতারাতি বড়োলোক হতে চেয়েছিল এবং মোটারকমের একটি কনট্রাক্ট আদায়ের অভিপ্রায়ে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গো নিয়ে মিলিটারি অফিসারের গুহায় ধাওয়া করতে যার বাধেনি। কিংবা সেই নিষ্ঠুর চরিত্রটিকেও না, আপন প্রণয়িনীকে যে গণিকালয়ে নিয়ে তুলেছিল। তারা জানত না যে, তাদের মূর্খতার পরিণাম মাত্র একটিই হতে পারে, এবং সেই পরিণামের হাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায় না। অনায়াসে এদের নিয়ে বিদ্রুপ করা চলত। কিন্তু বিদ্রুপ যেহেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবধর্ম ছিল না, এদেরও তিনি করুণার পাত্র করে তুলেছেন।

সমাজের যারা উপরতলার মানুষ, লোভের পাত্রে যারা মুখ ডুবিয়ে বসে থাকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী তাদের ক্ষমা করেনি। মধ্যস্থানে থেকে যারা উপর-তলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তিনি তাদের করুণা করেছেন। তাঁর মমতা এবং সহানুভূতি শুধু তাদের জন্যই সঞ্চিত ছিল, যারা নীচের তলার মানুষ, জীবনে যাদের বিড়ম্বনার অন্ত নেই। সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ে সেই বিড়ম্বনার হেতুনির্ণয়ে তাঁর ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা তার প্রকৃত রূপচিত্রণে। বলতে বাধা নেই, তাঁর সেই সময়কার সাহিত্যে ঈষৎ নিয়তিবাদী মনোভাবও পরিস্ফুট হয়েছিল। যেমন *পুতুলনাচের ইতিকথা*-য়। এ বই যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে বোঝা যায়, আর্টের দরবারে উদ্দেশ্যের ভূমিকা সত্যিই হয়তো উল্লেখযোগ্য নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন মনোভাব অবশ্য স্থায়ী হয়নি। পরে তিনি সাম্যবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সাহিত্যের সামাজিক উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত এবং কী হওয়া উচিত নয়, সাম্প্রতিককালে সে-বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মতামতও তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সামাজিক দাবির তুলনায় আর্টের আপন দাবিকেই তিনি বড়ো বলে গণ্য করতেন। তাঁর সাহিত্য অন্তত সেই কথাই বলবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন। তাঁর আপন পন্থায়। কিন্তু জীবন যেহেতু তার প্রেমিককেই সর্বাধিক দুঃখ দেয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে শুধু দুঃখই দিয়েছে। এ নিয়ে তাঁকে আক্ষেপ করতে শোনা যায়নি। আক্ষেপের কোনো হেতুও হয়তো ছিল না। কেন-না, বিরহের স্বস্তিকে নয়, মিলনের যন্ত্রণাকেই তিনি কাম্য মনে করতেন।

১৩৬৩

সাতজন কবি

গত দেড়শো বছরে বাংলা সাহিত্যের দ্রুত, প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত, সমৃদ্ধি ঘটেছে। সেটা সুখের কথা। দুঃখের কথা, সেই সমৃদ্ধি সর্বাঙ্গীণ নয়। এমনকি, সর্বাঙ্গীণ নয় বললেও ছবিটা ঠিক পরিষ্কার হয় না। বলা উচিত, সাহিত্যের অধিকাংশ অঙ্গই এখনও অপুষ্ট। সন্দর্ভ-সাহিত্যের আজও বয়ঃসন্ধি ঘটেনি, সমালোচনার শৈশব চলছে, সার্থক সামাজিক নাটকের কোঠায় প্রায় শূন্য বললেও চলে, এবং সার্থক উপন্যাসের সংখ্যা গণনায় বোধকরি একটিমাত্র হাতেরও সবকটি আঙুলের প্রয়োজন হয় না। কথাটা বেদনাদায়ক। কিন্তু সত্য।

বাংলা সাহিত্যের গর্ব তাহলে কী নিয়ে? দুটিমাত্র ঐশ্বর্য নিয়ে। এক, তার ছোটোগল্প। দুই, তার কবিতা। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির দরবারে এতদ্দেশীয় সাহিত্যের যা-কিছু পরিচয়— এবং সে-পরিচয়ে আমাদের কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই— তার ভিত্তিভূমি, মূলত, সাহিত্যের এই বিশেষ দুটি শাখার পরিচয়কে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। অথচ, ঠিক এই দুটির সম্পর্কেই বাঙালি পাঠক-সমাজের অনীহা সম্প্রতি উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এমন দুর্দিনও এসেছিল, বহু কৃতী কবিও যখন তাঁদের কাব্যগ্রন্থের পাঠক খুঁজে পেতেন না, এবং ছোটোগল্পের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখককেও যখন প্রকাশকের হাতে উপন্যাসের উৎকোচ দিয়ে তাঁকে গল্প-গ্রন্থ প্রকাশে সম্মত করাতে হত। সেই অনাসক্তির এখনও অবসান হয়নি। তবে, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে, হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সুলক্ষণ, তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের আলোচনা কবিতা নিয়ে। আলোচনার পরিধিকে আরও একটু গুটিয়ে এনে বলতে পারি, আধুনিক কবিতা নিয়ে।

কালগত অর্থে অবশ্য 'আধুনিক' বিশেষণটির বিশেষ কোনো মূল্য নেই। আধুনিক কালে— এবং সব কালই একসময়ে আধুনিক ছিল— যা-কিছু লেখা হচ্ছে, এক হিসেবে তার সবকিছুকেই আমরা আধুনিক বলতে বাধ্য। আবার এই বিশেষ কালটি উত্তীর্ণ হয়ে গেলে একালের কোনো রচনাই আর সেই বিশেষ হিসেবে আধুনিক থাকবে না। আগামীকালের পাঠকের কাছে আগামী কালের রচনাই তখন আধুনিক হয়ে দাঁড়াবে। কালগত অর্থে আধুনিক। বলা বাহুল্য, বিশেষ-কিছু কবিতাকে যে-অর্থে আমরা আধুনিক কবিতা বলি, সে-অর্থ, আর যাই হোক, নিতান্ত কালগত নয়। আধুনিক কবিতার জন্ম অবশ্যই একালে। কিন্তু শুধু কালের আধুনিকতার জন্যই যে সে 'আধুনিক' তা নয়। অন্য কিছু লক্ষণ তার আছে। যা

তাকে অন্যান্য কবিতার থেকে পৃথক করে রেখেছে। বস্তু আর মেজাজ, দুই ক্ষেত্রেই সেই লক্ষণগুলি পরিস্ফুট। বস্তুর ক্ষেত্রে ততটা নয়, যতটা মেজাজের ক্ষেত্রে। ভঙ্গিও তার পৃথক। যদিচ শুধু ভঙ্গি দিয়েই সে চোখ ভোলায়নি।

আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের সূত্রপাত এ দেশে মোটামুটি বছর-তিরিশেক আগে হয়েছে। ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ খুব আত্যন্তিক না হলে এত তাড়াতাড়ি এই আন্দোলন ঘটত কি না সন্দেহ। ফরাসি ভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আর-একটু নিবিড় হলে আরও তাড়াতাড়ি ঘটত। প্রথম থেকেই সেই আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, এখনও যাঁরা আছেন, এবং প্রথম অবস্থায় খানিকটা দূরে সরে থাকলেও পরবর্তীকালে তার পরিবর্তন-প্রয়াসকে যাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি, বরং আপনাপন কবিকর্মের মাধ্যমে সেই প্রয়াসকে যাঁরা আরও তাৎপর্যময় করে তুলেছেন, প্রসঙ্গত এমন কয়েকজন কবির সাম্প্রতিক কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। আধুনিক কবিতার যেসব লক্ষণের ইতিপূর্বে আভাস দিয়েছি, সেই লক্ষণগুলিকে বিচার করবার ব্যাপারে তাতে সুবিধে হবে।

যাঁদের নিয়ে এই আলোচনা, কাব্যের লক্ষণ বিচারে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী অবশ্যই তাঁদের সগোত্র নন। তবু যে তাঁকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি, তার একটা স্বতন্ত্র কারণ আছে। সে-কথা যথাসময়ে আসবে। তার আগে আরও দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্র-প্রভাব সম্পর্কে।

বাংলা দেশের সার্বিক শিল্পসাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে কতখানি, সকলেই তা জানেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় শুধু কবি হিসেবে নয়, এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁর পরিচয় শুধু সাহিত্যিক হিসেবে নয়। বস্তুত আমাদের জাতীয় জীবনে এমন কোনো ক্ষেত্র বোধহয় নেই, যেখানে তাঁর মঙ্গল-হস্তের স্পর্শ পড়েনি। সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, শিল্প, নাট্যকলা— প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসামান্য তাঁর দান; প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের জীবনকে তিনি এক অনন্যপূর্ব সমৃদ্ধি দিয়ে গিয়েছেন। পৃথিবীর আর-কোনো দেশে, আর-কোনো কালে, এমন কোনো মনীষী বোধহয় জন্মগ্রহণ করেননি, যাঁর একক সাধনায় একটি জাতির পক্ষে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এত কথার পরেও একটা কথা থেকেই যায়। তা হল এই যে, প্রতিভার এই সর্বতোমুখিতা সত্ত্বেও তিনি মূলত ছিলেন কবি, এবং সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর কবিচিত্ততারই একটি সুন্দর সম্প্রসারণ ঘটেছিল। বিশেষ করে বাংলা কাব্য-ভাবনা যদি দীর্ঘকাল ধরে তাঁরই ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে লালিত হয়ে থাকে, তাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। বরং সেটাই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতা রয়েছে অন্যত্র, আমাদেরই চরিত্রে। একবার যদি কোথাও একটা আশ্রয় মিলে যায় তো সহজে আর সেই আশ্রয় আমরা ছাড়তে চাই

না। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবচ্ছায়ায় যখন আমরা আশ্রয় পেয়েছিলুম, আশ্রয় পাবার প্রয়োজন তখন ছিল। তারপর, স্বনির্ভর হবার জন্যই সেই মহৎ আশ্রয় থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজনও একদিন দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রয়োজনটিকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলুম। দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করতে পারিনি।

শুধু তা-ই যদি হত, দুঃখের কারণ ছিল না। যদি বুঝতুম, সেই সুবিপুল আশ্রয়ের সর্বত্র আমরা সমান স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পেরেছি, সেটা সুখেরই কারণ হত। তা-ও আমরা পারিনি। দৃষ্টান্ত হিসেবে কবিদের কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রানুসারী এমন কবি খুব কমই ছিলেন, এবং আছেন, রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক কাব্যসাধনার অখণ্ড স্রোতটিকে যাঁরা পুরোপুরি অনুসরণ করতে পেরেছেন। নিতান্তই দু-একজন পেরেছেন। বাকি প্রায় সকলেরই সীমানা হল *মানসী* আর *সোনার তরী*। কেউ-কেউ বড়োজোর *ক্ষণিকা* আর *নৈবেদ্য* পর্যন্ত এগিয়েছেন। মুখে কিংবা প্রবন্ধে তাঁরা যা-ই বলুন— এবং আশ্চর্য এই যে, রবীন্দ্রপ্রভাবের সবচাইতে উচ্চকণ্ঠ প্রবক্তা তাঁরাই—পরবর্তী পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। থাকলেও, তাঁদের কাব্যে তার স্পষ্ট কোনো স্বাক্ষর নেই। রবিরশ্মি শুধু হীরকখণ্ডেই প্রতিফলিত হয়নি, কাচখণ্ডেও হয়েছে।

আগেই বলেছি, আপন কবিকর্মে রবীন্দ্র-কাব্যসাধনার ধারাটিকে পুরোপুরি অনুসরণ করে আসতে পেরেছেন, এমন কবির সংখ্যা খুবই কম। যাঁরা পেরেছেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রাশ্রয়ের প্রায় সর্বত্র—প্রথম দিককার কবিতা থেকে 'নবজাতক' 'সানাই' কিংবা 'আরোগ্য', এই সুবিস্তৃত পরিসরে— তাঁর বিচরণ প্রায় সমান অসংকোচ। এবং তার চাইতেও যা বিস্ময়ের কথা, আপন অভিরুচির স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই দুরূহ তীর্থ-পরিক্রমায় তিনি সক্ষম হয়েছেন। দুটি উদ্ধৃতি থেকেই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে—

"ভালোবাসিবার এই তো নিমেষ,
    মন-বদলের ক্ষণ,
সজিনার ফুলে শিশিরের রেশ
    রহিবে যতক্ষণ।
ঊর্ণাতন্তু ক্ষীণ ভালোবাসা
বেশি খন রবে নাহি হেন আশা,
পলক নিপাতে হয় হোক্ শেষ
    মন-বদলের ক্ষণ।।" (গানের সময় । হংসমিথুন)

আর—

"তোমার খুলে-পড়া স্নিগ্ধ কেশপাশ
    রচনা করুক

অন্তহীন বাসররাত্রির ঘনিষ্ঠ তমিস্রা,
আর তোমার নির্দয় আলিঙ্গনে
নিষ্পেষিত চৈতন্য বিলীন হয়ে মরুক
দিগঙ্গনার বাহুবন্ধনে
সন্ধ্যার অসহায় অন্তিম রৌদ্রটুকুর মতো।"

(পৃথিবীর প্রতি সমুদ্র। উত্তরমেঘ)

এ-দুটি কবিতাংশের মধ্যে চিন্তা, ভাষা এবং বলবার ভঙ্গির যে-পার্থক্য, তা *ক্ষণিকা* আর *পত্রপুট*-এর পার্থক্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে প্রমথনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও এখানে কারও চোখে না পড়বার কথা নয়। প্রমথনাথ রবীন্দ্রাশ্রয়ী কবি। কিন্তু সে-আশ্রয় তাঁর স্বাতন্ত্র্যের অন্তরায় হয়নি। ফলত, তাঁর কাব্যসাধনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্তী কবিদের মধ্যে একটি সুন্দর যোগসূত্র রচিত হয়েছে। যে-যোগসূত্র প্রত্যক্ষত-রবীন্দ্রানুগামী আরও একাধিক কবির দ্বারা রচিত হতে পারত। কিন্তু হয়নি।

প্রচলিত চিন্তাভাবনার আশ্রয় থেকে মুক্ত হবার প্রথম প্রয়াস দেখা দেয় মোটামুটি বছর-তিরিশেক আগে। *কল্লোল* ও সেইসময়কার আরও কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই প্রয়াস একটা স্পষ্ট চেহারা নিতে চেয়েছিল। সময়টা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকাল। অর্থাৎ, পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ জুড়ে প্রচলিত প্রায় সমস্ত মূল্যবোধ যখন ভেঙে পড়েছে অথচ নতুন কোনো মূল্যবোধও যখন জন্ম নেয়নি। এই সন্ধিলগ্নের সুতীব্র উৎকণ্ঠায় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের চিন্তাই তখন সর্বাধিক পীড়িত হয়েছিল। এবং এরই পরিণামে পাশ্চাত্য শিল্পী-সমাজের এক বৃহৎ গোষ্ঠীর রচনায় দুটি লক্ষণ বড়ো প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অনিশ্চয়তা আর নৈরাশ্য। নৈরাশ্য বললেও কথাটা ঠিক পরিষ্কার হয় না। আসলে বলা উচিত মোহমুক্তি। মানবজীবনের বহিরাবরণের মিথ্যা সৌন্দর্য সম্পর্কে একটি তিক্ত, তির্যক মনোভাব। যদিচ এরই পাশাপাশি জীবনের অন্যতর কোনো মূল্য— যা আরও দৃঢ়, আরও দীর্ঘস্থায়ী— অন্বেষণের প্রয়াসও তখন দুর্লক্ষ্য ছিল না।

যদি বলি, চাল-ডাল-তেল-নুন-লকড়ির মূল্যবৃদ্ধি ছাড়া প্রাচ্য জীবনের অন্য আর কোনো ক্ষেত্রেই প্রথম মহাযুদ্ধের বিশেষ প্রভাব পড়েনি, তো অবশ্যই বাড়িয়ে বলা হবে। পড়েছিল, কিন্তু সেটা এমন কিছু প্রত্যক্ষ অথবা প্রবল নয়, যাতে করে বঙ্গভূমির সাহিত্যক্ষেত্রে এত বড়ো একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হতে পারে। আসলে, পরিবর্তনের একটা অন্য-নিরপেক্ষ আকাঙ্ক্ষা আগের থেকেই দানা বাঁধছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের রচনায় সেই পরিবর্তন যখন দেখা দিল, বাঙালি সাহিত্যকরা হাত বাড়িয়ে তার সূত্রটিকে গ্রহণ করলেন মাত্র। প্রেমকে তাঁরা বাতিল করলেন না, কিন্তু শরীরের বন্ধনকেও স্বীকার করে নিলেন। এবং এমনকি,

শরীর-বন্দনারও প্রাক্‌মুহূর্তে বাঙালি কবি তখন এই বোধের দ্বারা অধিকৃত হয়েছেন যে, তার

"...ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল—
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন সাদা শুষ্ক অস্থিশ্রেণী—
জানি, সে কিসের মূর্তি। নিঃশব্দ বীভৎস এক রুক্ষ অট্টহাসি—
নিদারুণ দন্তহীন বিভীষিকা।" (প্রেমিক। *বন্দীর বন্দনা*)

বাংলা কাব্যে এমন কথা এর আগে আর বলা হয়নি বটে, কিন্তু, সত্যি বলতে কী, বলবার কোনো কারণও ছিল না। বিভীষিকা দর্শনের প্রত্যক্ষ কোনো হেতু বাঙালি চেতনায়, তখনও অন্তত, উপস্থিত হয়নি। অথচ, জমি তৈরি হবার আগেই, বাংলা কাব্যে তার ছায়া পড়ল। কেন পড়ল, একটু আগেই তার আভাস দিয়েছি। এবারে ইংরেজ কবির গুটিকয়েক পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে দেব—

"Webster was much possessed by death
And saw the skull beneath the skin ;
And breastless creatures underground
Leaned backward with a lipless grin."
(Whispers of Immortality. T.S. Elliot.)

প্রসঙ্গত বলতে পারি, 'Whispers of Immortality'-র রচনাকাল ১৯২০।

তাতে অবশ্য কিছুই যায়-আসে না। কেন-না, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রারম্ভিক এই বিচ্যুতিকে, পশ্চিমি চিন্তা-প্রবণতার প্রতি এই অতিমাত্রিক আনুগত্যকে, পাঠকদের মতোই, কবিরাও শেষপর্যন্ত ক্ষমা করেননি। করেননি, কেন-না, তাঁদের আন্তরিকতায় সত্যিই কোনো খাদ ছিল না। যে-মুহূর্তে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে যদি স্থায়ী কোনো পরিবর্তন ঘটাতে হয় তো দেশের নাড়ির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে নয়, দেশের নাড়ির উপরে হাত রেখেই তা ঘটাতে হবে, প্রায় সেই মুহূর্তেই তাঁরা যাত্রাভঙ্গ করলেন। নতুন করে তাঁদের যাত্রা যখন শুরু হল, আরও অনেক ঐশ্বর্যের মতোই, রবীন্দ্রসাধনার উত্তরাধিকারকেও তাঁরা তখন স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও তার অর্থ আর যা'ই হোক, রবীন্দ্রনাথের অপ্রশ্ন অনুসরণ নয়। তার কিছুকাল পরেই বুদ্ধদেব বসুকে আমরা বলতে শুনলুম—

"আমি ভুলে গিয়েছিলুম জীবনে এত মধুরতা
এত কোমলতা,
আমার মনে ছিল ভয়, কঠিন, বিবর্ণ ভয়।
কাকে আমি ঘা দিতে গিয়েছিলুম আমার বিদ্রূপে?
কাকে আমি মারতে গিয়েছিলুম আমার নিষ্ঠুরতায়?
— আমি আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে আনতে চেয়েছিলুম

নিজের হাতে।"

(নতুন দিন। নতুন পাতা। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*)

এবং এখন—

"যে-মৃত্যুকে ভেদ ক'রে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভুল
রাশি রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়,
যে-মৃত্যুকে দীর্ণ ক'রে বরফের কবর ফেটে ফুল
জ্বলে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়—
সেই মৃত্যুর— নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।"

(শীতরাত্রির প্রার্থনা। *শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর*)

(উদ্ধৃত কবিতাংশ দুটির মধ্যে প্রথমটির চতুর্থ ও পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে ইংরেজির যে স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে, তা নিতান্তই বাক্য-গঠনরীতিগত, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং, অন্তত এটুকু মেনে নেবার মতন মনও এতদিনে পাঠকের তৈরি হয়েছে।)

পশ্চিমি প্রভাব এতদ্দেশীয় সাহিত্যে শুধু তিক্ততারই ফসল ফলায়নি। জীবন অনিশ্চয়, জীবন অস্থির— এই অপ্রিয় সত্যকে জানার মধ্যে যে-একটি মর্মক্ষয়ী বেদনার বীজ নিহিত হয়ে রয়েছে— যে-বেদনা শিল্পীর দৃষ্টিকে অনেকসময়েই অনচ্ছ করে তোলে, এবং কোনো কোনো সময়ে তাঁকে দিয়ে তাৎক্ষণিক সুখের বন্দনা করিয়ে নেয়— বাঙালি কবিদের অনেকেই সেই বেদনায় তখন আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই সবটা বলা হয় না। বেদনা ছিল। তিক্ততাও ছিল। কিন্তু তার থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাও কিছু দুর্লভ ছিল না। দৃষ্টান্ত বিষ্ণু দে। তাঁর সেই প্রথম যুগের বিখ্যাত একটি কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি—

"চোরাবালি ডাকি দূর দিগন্তে
কোথায় পুরুষকার?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গো আমার দেবে না অঙ্গীকার?"

ঘোড়সওয়ার। *চোরাবালি*

এই প্রাথমিক স্পষ্টভাষণের পর তাঁর কবিতার চেহারা যদিও বারংবার পালটেছে এবং সেই বিচিত্র রূপবিভঙ্গ যদিও কবি হিসেবে তাঁর চলিষ্ণুতারই স্বাক্ষর, তাঁর বিশ্বাস তেমন কিছু পালটায়নি। শুধু, যে-বিশ্বাস আগে একটি স্বল্পায়তন কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তার পরিসর ধীরে-ধীরে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। (*সাত ভাই চম্পা*-র অনেক কবিতাই অবশ্য তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। সাময়িকতার মোহে কবি সেখানে অনেকক্ষেত্রেই তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত।) এবং নাগরিক কাব্যকলার তর্জনী-সংকেত সত্ত্বেও আবেগকম্প্র কণ্ঠে তিনি বলতে পেরেছেন—

"রৌদ্রে এই সুর বিলিয়ে দাও,
মধ্যদিনে হোক স্পন্দিত
আমার দিন শুরু সাতটি রঙে,
রাত্রি আদি নীল সমুদ্রের,
স্নায়ুতে স্বপ্নের আনন্দের
অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
রঙের ঘনঘটা অতন্দ্রিত
অমোঘ শিল্পীর তুলির টান— ।"

(পাঁচ প্রহর। *নাম রেখেছি কোমল গান্ধার*)

বাংলা কবিতায় যখন নানাবিধ বিষয়ের এক প্রবল আলোড়ন চলছে, সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যেও তখন আপন কবি-স্বভাবের সৌকুমার্যকে যিনি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, তিনি অমিয় চক্রবর্তী। বিষয় আর আঙ্গিকের বিচারে তাঁর কবিতার অভিনবত্ব যদিও অনস্বীকার্য, প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা বোধহয় কোনোদিনই কোনো অভিনবত্বের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়নি। বস্তুত, তাৎকালিক ভাবনা-মানসের ক্ষেত্র থেকে কখনও এমন কিছু দূরে যাবার প্রয়োজন হয়নি তাঁর যে, নতুন করে আবার কাছে আসবার প্রয়োজন হবে। জীবন-রঙ্গমঞ্চে তাঁর ভূমিকা যেন এক নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত দর্শকের। শুধু দেখাই যাঁর উদ্দেশ্য। যে-উদ্দেশ্যকে উদ্দেশ্যের অভাব বললেও কিছু বাড়িয়ে বলা হয় না। পরিণামে, তাঁর কবিতার প্রায় সর্বত্রই একটি শান্ত, মধুর আবহের সৃষ্টি হয়েছে। আয়োজন যার প্রধান কথা নয়।

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভরে রাখুক
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক।।"

(পিঁপড়ে। *পারাপার*)

কিংবা—

"বাগানে লোহার তারে কাপড় শুকোয়,
গাদাফুল ফুটেছে সোনার গুচ্ছ,
ব্যথায় প্রভাতী বাজে কঠোর রামকেলি
অশ্রুত সানাই
আমাদেরি নিতান্ত আপন
কী আনন্দ দোলে দু'দিনের।।"

(এরোপ্লেনে। *পালা-বদল*)

কিংবা এই রকমের আরও কয়েকটি স্তবকের সঙ্গো যাঁর পরিচয় রয়েছে, কাব্যক্ষেত্রে অমিয় চক্রবর্তীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর কোনো সংশয় থাকবার কথা নয়।

সুধীন্দ্রনাথের সম্পর্কেও না। তবে, অমিয় চক্রবর্তী আর সুধীন্দ্রনাথের নাম একই নিশ্বাসে উচ্চারণ করছি দেখে, ভুলেও যেন কেউ এই দুই কবির কাব্যকলায় কোনো সাদৃশ্য খুঁজবার চেষ্টা না করেন। আসলে আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনাপন কবিকর্মে এঁদের প্রত্যয়ের—তার পার্থক্য যদিও প্রায় মেরুপ্রতিম—যে-প্রগাঢ় স্বাক্ষর রয়েছে, তারপরে আর এ বিষয়ে কোনো ভ্রান্ত ধারণা পোষণের হেতু নেই। সুধীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, প্রত্যয়ের এই পার্থক্যের কারণেই তাঁর কবিতা তখন একটা রূঢ় প্রতিবাদের মতন শুনিয়েছিল। আঙ্গিকের কারণে নয়। যে-বিষয়ে তাঁর মতন এতখানি ঐতিহ্যনিষ্ঠ কবি এ-যুগে খুব কমই আছেন। অথচ, আশ্চর্য এই যে, প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও, অব্যবহিত পূর্বকালের সঙ্গো তাঁর এক দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও, পূর্বতরকালীন চিন্তা-দর্শনের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতার সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল। এবং এই কারণেই—

> "নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত
> বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দূরান্ত তারায়
> উধাও মনের আগে..."

(সোহংবাদ। *সংবর্ত*)

এইসব ধাতব কঠিন উক্তিকেও বাঙালি পাঠক এখন আপন জ্ঞানে গ্রহণ করতে শিখেছেন। নিতান্তই ঠুংরি-রসিকদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

বুদ্ধির ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথই বোধহয় আমাদের কাব্য-চেতনাকে সবচাইতে বেশি অধিকার করতে পেরেছিলেন। বোধের ক্ষেত্রে যেমন জীবনানন্দ দাশ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। শেষোক্ত দুজনের কৃতিত্ব প্রধানত এইখানেই যে, আধুনিক বাংলা কবিতায় নূতনত্বের নামে যখন নানাবিধ অস্থায়ী উদ্দীপনার প্রবল উৎপীড়ন চলছে, যেটা খুবই স্বাভাবিক, তখন এঁরাই সর্বপ্রথম সেই কোলাহলের মধ্যে একটি স্থায়ী, সংহত সুরমূর্ছনার সৃষ্টি করলেন। এই দুঃসাধ্যসাধন— অন্তত যতদূর আমাদের মনে হয়—সম্ভব হয়েছিল প্রধানত এই কারণে যে, জীবনের সামগ্রিকতা সম্পর্কে এঁদের দুজনেরই একটা সুস্পষ্ট অ্যাটিচিউড ছিল, যা কখনও পোজের সাময়িকতায় পর্যবসিত হয়নি। সেই বিশিষ্ট মনোভঙ্গিরও অবশ্য একাধিক অধ্যায় রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে পারম্পর্য খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের কথা বলছি। একাধিক অন্ধকার পর্যায়ের মধ্য দিয়ে "জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার" (আমি যদি হতাম। *বনলতা সেন*) থেকে অন্যতর মহত্তর কোনো ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হবারই সাধনা ছিল তাঁর, যদিও কালবৈগুণ্যে তা বারংবার বিড়ম্বিত হয়েছে। যাঁরা বলেন, তিনি নির্জনতার কবি, অথবা এক ছায়াচ্ছন্ন নৈঃশব্দ্যের (হেমন্তের পাণ্ডুর

পৃথিবীই দীর্ঘকাল তাঁর কবিতাকে অধিকার করে রেখেছিল), তাঁরা ঠিকই বলেন হয়তো। কিন্তু তাতেই তাঁর কবিপ্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় ব্যক্ত হয় না। কেন-না, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র প্রায় সর্বত্র—এবং *বনলতা সেন*-এরও বহু স্থানে— যিনি এক নিঃশব্দ, কোমল তমিস্রার হাতে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁকেই আবার আমরা বলতে শুনেছি—

"তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।"

(তিমিরহননের গান। *সাতটি তারার তিমির*)

এবং আরও পরে—

"এঁকে বেঁকে প্রজাপতি রৌদ্রে উড়ে যায়—
আলোর সাগর ডানে— আনন্দসমুদ্র তার বাঁয়ে;
মহাশূন্যে মাছরাঙা আগুনের মতো এসে জ্বলে;
যেন এই ব্রহ্মাণ্ডের শোকাবহ রক্তে অনলে
মানে খুঁজে পেয়েছে সে অন্তহীন সূর্যের ঋতুর :

* * *

শূন্য তবু অন্তহীন শূন্যময়তার রূপ বুঝি ;
ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস ;—
যদি না মানব এসে তিনফুট জাগতিক
কাহিনিতে হৃদয়ের নীলাভ আকাশ
বিছিয়ে অসীম ক'রে রেখে দিয়ে যায়;
অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।"

(পুরো কবিতাটির নাম 'মহাজিজ্ঞাসা'। ১৩৬১ সালের শারদীয়া *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশিত হয়েছিল।)

মনে হয়, 'নির্জনতা'র পরবর্তী অধ্যায়েই তাঁকে অনেক জটিল জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। *সাতটি তারার তিমির*-এ যার সংশয়াতীত প্রমাণ বর্তমান। এবং, তারও পরবর্তী অধ্যায়ে, সেই মর্মক্ষয়ী প্রশ্নগুলির কোনো গ্রাহ্য মীমাংসাও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন হয়তো। কিন্তু সে-কথা ব্যক্ত করবার সময় আর তিনি পাননি। তার পূর্বেই তিনি লোকান্তরিত হলেন।

আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মলগ্নে পাঠক তাঁর কণ্ঠে নতুন যেসব কথা শুনতে পেয়েছেন, তার মধ্যে সংশয় ছিল, বেদনা ছিল, তিক্ততা ছিল, এবং এই রকমের

আরও অনেককিছু ছিল, পাঠকের চিত্ত যাতে তৎক্ষণাৎ সায় দিতে পারেনি। পারেনি, কেন-না, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে— তখনও অন্তত— এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয়নি, এইসমস্ত বৃত্তিকে যার অনিবার্য পরিণাম বলে গ্রহণ করা যায়। আর তা ছাড়া, জীবন সম্পর্কে প্রবল কোনো আগ্রহও তাতে পরিস্ফুট হয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাতন্ত্র্য ঠিক এইখানেই। জীবনের থেকে দূরে সরে না গিয়ে জীবনকে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এই গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাব্যসাধনায় একটি স্বতন্ত্র চরিত্র যোজনা করেছে। জীবন সম্পর্কে—

"ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
বুকে আরো প্রেম যেন আনি
পৃথিবীকে আরও যেন ভালো লাগে।"

(যদি ফিরে আসি। *প্রথমা*)

এই ধরনের অনুরাগ, কিংবা—

'মৃত্যুরে কে মনে রাখে?
— মৃত্যু সে তো মুছে যায়।
যে-তারা জাগিয়া থাকে তারে লয়ে
জীবনের খেলা...'

(মৃত্যুরে কে মনে রাখে। *প্রথমা*)

এই ধরনের সবল উক্তি তখনকার দিনে খুব সহজলভ্য ছিল না। শুধু তা-ই নয়। সাহিত্যের আসরে সাধারণ মানুষদের কথা তাঁর আগেও কেউ-কেউ বলেছিলেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ বোধহয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যেই সর্বপ্রথম একটা সুন্দর শিল্পরূপ নিয়েছিল! তিনিই সর্বপ্রথম বলতে পেরেছেন—

"সমবায়ে সুখ আছে আর আছে শান্তি,
যতো পারো গড়ো সমবায় সমিতি সুতরাং!
কিন্তু সাম্রাজ্যও যে চাই আমার
তোমার আমার সকলের চাই সাম্রাজ্য।
শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট!
শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সাম্রাজ্য।'

(সম্রাট। *সম্রাট*)

প্রেমেন্দ্র মিত্র মানবতাবাদী কবি। তাঁর কাব্যে ইতস্তত মানবতাবাদের একটি প্রবল উপস্থিতি প্রায় সকলেই লক্ষ করে থাকবেন। এবং আরও একটি কথা। বুদ্ধি ও বোধের, মনন ও আবেগের একটি সুষ্ঠু সমন্বয়ও তিনি ঘটাতে পেরেছেন।

একালের কবিরা আমাদের অনেক দিয়েছেন। কিন্তু কারণটা যা-ই হোক, স্বীকার করতে কারও আপত্তি থাকা উচিত নয় যে, সমন্বয়ের এই সূত্রটিকে তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আবার যদি তার উদ্ধার সম্ভব হয়, সেটা সুখের কথা হবে।

পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে আপত্তি প্রধানত তিনটি। প্রথম আপত্তি রবীন্দ্র-কাব্যসাধনার সঙ্গে সম্পর্কলোপ। এ-বিষয়ে বেশি কিছু বলবার দরকার করে না। এই আলোচনায় ইতস্তত যেসব কবিতাংশ উদ্ধৃত হয়েছে, লক্ষণ মিলিয়ে-মিলিয়ে শুধু তারই থেকে প্রমাণ করা যায়, রবীন্দ্র-কাব্যসাধনার সঙ্গে আধুনিক কবিতার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

বাকি থাকে দুটি অভিযোগ। দুর্বোধ্যতা, এবং কাব্যশরীরে গদ্য-গঠনরীতির প্রভাব। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে এ-অভিযোগ ইংল্যান্ডেও উঠেছিল। এবং এলিয়ট এই দুটি আপত্তিরই খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। প্রথমটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be (...I am speaking of some kinds of poetry and not all) to satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its work upon him ; much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat for the house dog. This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets do not work that way ; some of them, assuming that there are other minds like their own, become impatient of this 'meaning' which seems superfluous, and perceive possibilities of intensity through its elimination. I am not asserting that this situation is ideal ; only that we must write our poetry as we can, and take it as we find it."

(The Use of Poetry and the Use of Criticism)

এবং দ্বিতীয়টি সম্পর্কে—

"...Poetry has as much to learn from prose as from other poetry ; and I think that an interaction between prose and verse, like the interaction between language and language, is a condition of vitality in literature."

(The Use of Poetry and the Use of Criticism)

এ-বিষয়ে এলিয়টের রায়ই যে চূড়ান্ত, এমন কথা ভাববার অবশ্য কোনো দরকার নেই। আপাতত এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট যে, চূড়ান্ত রায় দেবার সময় এখনও আসেনি।

অগ্রহায়ণ ১৩৬২

৩

জাপানে রবীন্দ্রসন্ধ্যা

রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। 'এশিয়া সেন্টার অব জাপান'-এর চারতলায় উঠে, ঘরে ঢুকে, জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে, সদ্য শয্যা নিয়েছি, এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

বুঝতে পারলুম না, এত রাত্রে কে আমাকে ডাকছেন। টোকিয়োয় তো এক বিকাশ বিশ্বাস ছাড়া কেউ আমাকে চেনে না। কিন্তু বিকাশ তো এই একটু আগেই এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে এই হোটেলে পৌঁছে দিয়ে, 'কাল সকালের আগে আর কথাবার্তা হচ্ছে না' বলে বিদায় নিয়ে গেল। এখন তাহলে আবার কে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?

স্পষ্ট বাংলায় উত্তর ভেসে এল, "আমি কাজুও আজুমা।"

সাড়ে তিন বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন, যুবাবয়সি বঙ্গভাষী এই জাপানি অধ্যাপকের নাম এ দেশে অনেকেই শুনে থাকবেন। *দেশ* পত্রিকায় কিছুকাল আগে জাপানি ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতার যে-রচনা বেরিয়েছিল, তার তরজমাকার হিসেবে অমিত্রসূদনের সঙ্গে কাজুও আজুমারও নাম দেখেছিলুম; তাছাড়া শান্তিনিকেতনে দূর থেকে তাঁকে লক্ষ করেছি। কিন্তু তিনি যে আমাকে চেনেন, তা আমি জানতুম না।

অনুযোগ করে বললেন, "হোটেলে উঠেছেন কেন? অনর্থক পয়সা-খরচা। আমার এখানে থাকতে কি আপনার খুব কষ্ট হবে?"

সত্যি বলতে কী, হোটেলে থাকতেই আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। নিঃসঙ্গতার কষ্ট। খরচাটা ধর্তব্য নয়; অবিশ্বাস্য রকমের অল্প মূল্যে দিব্যি একটা ঘর পেয়েছি, জানালার পর্দা সরিয়ে দিলেই বিজলিবাতির আলোয় ঝলমল ছোট্ট একটা বাগান চোখে পড়ে; বিকাশ বলেছে, সকালে ওই জানালা দিয়ে রোদ্দুর এসে ঘর ভাসিয়ে দেবে ; উপরন্তু এই জরুরি তথ্যটাও ইতিমধ্যে আমার কর্ণগোচর হয়েছিল যে, এখানকার খাবারদাবার নেহাত খারাপ নয়, দামেও সস্তা, ডাইনিংহলে গিয়ে আড়াইশো ইয়েন গুনে দিলেই মুরগির ঝোল আর ভাত মিলবে। এইসবই খুব উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার। তবু, স্বীকার করি, থাকা আর খাওয়ার এমন চমৎকার একটা

ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমি বিশেষ উৎসাহিত হতে পারছিলুম না। পর্যটনের এই অন্ত্য অধ্যায়ে অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতার বোধ আমাকে একটু-একটু করে গ্রাস করে নিচ্ছিল।

নিঃসঙ্গতা বলা যায়, অবসাদ বললেও ভুল হয় না। প্রায় দু-মাস হল দেশ ছেড়েছি, ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি বিদেশ থেকে বিদেশে, এক শহরের হোটেল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে—যেন-বা যন্ত্রচালিতের মতো—আর-এক শহরের হোটেলবাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকছি। প্রথমে টের পাওয়া যায় না, বরং ব্যাপারটা যেন বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু একই রুটিনের এই যে পৌনঃপুনিকতা, একটা সময়ে মনের উপরে এর চাপ পড়তে থাকে, এবং সেটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যায় দিনাবসানে, সারাটা দিন কাজকর্মে কাটিয়ে তারপর পর্যটক যখন হোটেলে ফেরেন, তখন তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের উপরে অনির্দেশ্য এক অবসাদের ছায়া ব্যাপ্ত হয়ে যায়।

অবসাদের অন্যতম কারণ হয়তো হোটেলজীবনের বৈচিত্র্যহীনতা। কে না জানে, হোটেলে-হোটেলে একালে আর বিশেষ ফারাক নেই। বিশেষ করে, পাইকিরি হারে পর্যটক গিলবার জন্যে একালে যেসব জাম্বো-হোটেল তৈরি হয়েছে, এবং যাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, বহিরঙ্গে আলাদা হয়েও চরিত্রে তারা অভিন্ন। বিখ্যাত এক বাঙালি লেখক তাঁর এক লেখার মধ্যে একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টগুলোর নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই, অন্তত তার লাউঞ্জে কিংবা কাস্টমস-এনক্লোজারে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে বুঝবার উপায় নেই যে, আমি অমুক দেশে আছি, সর্বদেশের সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যেন একই ছাঁচে ঢালা। কথাটা বোধহয় তিমিঙ্গিল এই হোটেলগুলোর সম্পর্কেও খাটে। একই রকমের উদাসীন দক্ষতা, একই রকমের নিষ্প্রাণ নৈপুণ্য। একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো তফাত বোঝা যায় না; বস্তুত, নতুন কোনো হোটেলে এসে, ঘরের মধ্যে না ঢুকেও বলে দেওয়া যায় যে, তার বাথরুমে কটা সাবান আছে, বেসিনের উপরকার তাকে কটা গেলাস, কিংবা আলনায় কটা তোয়ালে। ব্যাপারটা প্রায় ক্লান্তিকর পুনরুক্তির মতো, পর্যটককে যা কিনা ধীরে-ধীরে অবসন্ন করে তুলতে থাকে। তাঁর মনে হতে থাকে, আর নয়, এবারে ঘরে ফিরলেই বাঁচি।

‘এশিয়া সেন্টার অব জাপান’ অবশ্যই পাঁচতারা এইসব তিমিঙ্গিলের পর্যায়ে পড়ে না। তবু, বাইরে দূরে অনেক ঘুরে আমারও তখন মনে হচ্ছিল, আর নয়, এখন মন চলো নিজ নিকেতনে। কিংবা— নিজের নিকেতনে যখন একান্তই যাওয়া হচ্ছে না, তখন—অন্য কারও নিকেতনে। হোটেলবাড়িকে, আর যাই হোক, নিকেতন বলা যায় না।

কিন্তু এই হোটেল এখন আমি ছাড়বই বা কী করে?

'চেক ইন' করবার সময়ে লিখিতভাবে জানিয়েছি যে, একতিরিশে অক্টোবর সকালের আগে আমার বিদায় নেবার সম্ভাবনা নেই; ছাব্বিশ থেকে তিরিশ—মোট পাঁচটা দিন এই আশ্রয়ে আমি কাটাব। তার আগে বিদায় চাইলে কি কথার খেলাপ হবে না? বিদায় মিলবে না, এমন নয়, কিন্তু শর্তভঙ্গের দণ্ড না দিয়ে মিলবে কি না, সেটা সন্দেহের ব্যাপার।

আজুমা সানকে—সান আমাদের বাবুর পর্যায়ে পড়ে—আমার সমস্যার কথা বলতে তিনি উত্তর দিলেন, "তাহলে একটা রফায় আসা যাক। অন্তত শেষের দিনটা আমাদের সঙ্গে থাকুন। তিরিশ তারিখ সকাল নটায় আমি হোটেল থেকে আপনাকে নিয়ে আসব, তারপর একতিরিশের সকালে আপনাকে পৌঁছে দেব হনেডা এয়ারপোর্টে। রাজি?"

"কিন্তু তিরিশ তারিখেই বা এরা বিনাদণ্ডে আমাকে ছাড়বে কেন?"

"যাতে ছাড়ে, তার ব্যবস্থা আমি করব।"

উনতিরিশ তারিখের রাত্রে যখন হোটেলে ফিরি, আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন। তিরিশ তারিখে সকালে জেগে উঠে দেখলুম, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। সাতসকালেই শহর জুড়ে বাদল-আঁধার নেমেছে, বৃষ্টি আর বাতাসের দাপটে জানালার শার্সি থরথর করে কাঁপছে— এমন তুমুল বর্ষণ এই বঙ্গভূমির বাইরে আর কোথাও আমার চক্ষে পড়েনি। ভয় হল, আজুমা সান আসতে পারবেন না।

তাহলে এখন কী করি? 'এশিয়া সেন্টার'-এ থাকবার উপায় নেই, তার কারণ, আগের রাত্রেই আজুমা সান এখানকার ম্যানেজারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিশাবসানেই আমি হোটেল থেকে বিদায় নেব। সুতরাং?

সুতরাং বিকাশকে একটা ফোন করে দেখা যাক, সে কী বলে। কলকাতা থেকে যত বাঙালি জাপানে আসেন, বিশ্বাস-দম্পতি অর্থাৎ বিকাশ আর মালা এই প্রবাসে তাঁদের বন্ধু ও ত্রাণকর্তা। তারা কি এখন এই বিপদে মধুসূদন হয়ে একটা-কিছু সমাধান আমাকে বাতলে দেবে না?

মালা ফোন ধরেছিল। আমার সমস্যার কথা শুনে সে অভয় দিয়ে বলল, "কিচ্ছু, ঘাবড়াবেন না, নীরেনদা। আজুমা সানকে আপনি চেনেন না ; বৃষ্টি তো বৃষ্টি, প্লাবন কিংবা ভূমিকম্প হলেও তাঁর কথার নড়চড় হবে না, নটায় যখন বলেছেন তখন নটা বেজে এক মিনিট হবারও জো নেই, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় নটায় তিনি হোটেলে হাজিরা দেবেন।"

ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা। চটপট সুটকেস গুছিয়ে, স্নান সেরে, পোশাক পালটে নীচে নামলুম। নেমে দেখি, আজুমা সান লবিতে বসে কাগজ পড়ছেন।

আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "দোমো আরিগাতো। যান, কাউন্টারে গিয়ে বিল মিটিয়ে দিন, আমি ট্যাক্সি ডেকে আনছি।"

সমানে বৃষ্টি পড়ছে, ছাতা মাথায় আজুমা সান রাস্তায় গিয়ে নামলেন।

ট্যাক্সিতে উঠে জিজ্ঞেস করলুম, "তাহলে আমরা এখন ইচিকাওয়ায় যাচ্ছি তো?"

আজুমা সান বললেন, "না। ইচিকাওয়ায় আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবার আগে এই টোকিয়ো শহরেই আপনার সঙ্গে একটু ঘুরতে চাই! সর্বাগ্রে যাব টোকিয়ো রেলস্টেশনে। সেখানে আপনার সুটকেসটা জমা রেখে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসব। কী জানেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

কী কথা, সেটা রেস্তোরাঁয় বসে জানা গেল।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কাজুও আজুমা বললেন, "দেখুন, আমি যে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম, সেটা নেহাত চাকরি করতে নয়। গিয়েছিলুম এইজন্যে যে, আপনাদের দেশকে আমি ভালোবাসি। শুধু আমি বলেই বা কথা কী, জাপানে আপনি এমন মানুষ বিস্তর পাবেন, শাক্যমুনির ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাঁদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার অন্ত নেই। শাক্যমুনি আমাদের আত্মিক ক্ষুধার খোরাক জুগিয়েছিলেন। একালে আর-একজন মহামানব সেই সুধার সন্ধান দিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সাহিত্য আমি পাঠ করেছি। না, তরজমায় নয়, তাঁরই আপন ভাষায়। তাঁকে ভালোবেসে তাঁর ভাষাকেও আমি ভালোবেসেছি।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন আজুমা সান। তারপর বললেন, "জানেন, এই টোকিয়ো শহরেই এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত অল্প নয়, গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল। তাঁদের অনেকে শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিলেন। কেউ পড়তে, কেউ পড়াতে। তাছাড়া, তরুণ কিছু রবীন্দ্রভক্তেরও আমরা দেখা পাচ্ছি। প্রবীণ আর নবীনদের নিয়ে একটা সমিতিও গড়ে তুলেছি আমরা। তার নাম দিয়েছি 'ভারত-জাপান ঠাকুর সমিতি'। উদ্দেশ্য : রবীন্দ্রচর্চা। ফি মাসে আমাদের সভা হয়, তাতে রবীন্দ্রসাহিত্য আর রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলোচনা নেহাত কম হয় না।"

বললুম, "দেশে থাকতে শুনেছিলুম, শান্তিনিকেতনে যাতে একটা জাপান ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়, তার জন্যে আপনারা চেষ্টা চালাচ্ছেন।"

আজুমা সান বললেন, "বিলক্ষণ। জাপান আর ভারতর্ষকে যে-প্রীতির ডোরে বেঁধে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাকে আমরা আরও দৃঢ় করে তুলতে চাই। নিপ্পন ভবন সেই প্রীতির প্রতীক হয়ে থাকবে।"

শুনলুম, বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির কাছে এই বিষয়ে একখানা চিঠিও ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে। তাতে এঁরা জানিয়েছেন যে, নিপ্পন ভবনের

প্রতিষ্ঠায় যা খরচ হবে, সে-টাকা জাপানের এই রবীন্দ্র-ভক্তেরাই জোগাড় করে দেবেন।

কফির পাত্রে শেষ চুমুক দিয়ে আজুমা সান বললেন, "আমাদের সমিতির কথা তো শুনলেন, তা আজই আমাদের মাসিক বৈঠকের দিন। কোমিয়োজি মন্দিরে বিকেল তিনটেয় সভা। চলুন, আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় টোকিয়ো সেদিন ভেসে যাচ্ছিল। দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই, শুধু ঝমাঝম বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না। তার মধ্যে ছাতা মুড়ি দিয়ে আমরা দৌড়োদৌড়ি করতে থাকি। কখনও ট্যাক্সিতে উঠি। কখনও ট্রেনে। কখনও এস্কেলেটরে দাঁড়িয়ে দাইমারু-বিপণির পাঁচতলায় উঠে যাই; কখনও ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে টোকিয়ো শহরের তলায় নেমে আলোয়-ঝলমল পাতালপুরীতে ঢুকি। আজুমা সান বলেন, "জনসংখ্যার হিসেবে টোকিয়ো এখন নিউইয়র্ককেও টেক্কা দিয়েছে। দিনের বেলায় এখানকার জনসংখ্যা কত জানেন? প্রায় দু-কোটি। সর্বত্র ভিড়ে ভিড়াক্কার; শান্তিনিকেতনের পেরুমলদা বলেন, ওরেব্বাস, এ যে লাইনবরাদ্দ পিঁপড়ের সারি চলেছে। লোক, লোক আর লোক। এত লোক, অথচ জায়গা সেই তুলনায় কত কম। মাটির উপরে তো এই শহরের চৌহদ্দি আর বাড়ানো যাচ্ছে না, তাই কী আর করা, মাটির তলায় গিয়ে ঢুকতে হয়েছে।"

আমার চোখ ইতিমধ্যে একটা রেস্তোরাঁর শো-কেসের উপরে আটকে গিয়েছিল। কাঁচের শো-কেসে প্লাস্টিকের রেকাবিতে প্লাস্টিকের ভাত আর প্লাস্টিকের চিকেন কারি। দেখে অবশ্য নকল বলে বোঝা যায় না, আসল বস্তু বলেই ভ্রম হয়। আমার দৃষ্টি আর সেদিক থেকে নড়ছে না দেখে আজুমা বললেন, "বেশ তো, আজকের দুপুরের খাওয়াটা না-হয় এইখানেই সারব। কিন্তু তার আগে শুনুন, দোকানের ওই সাইনবোর্ডের উপরে জাপানি ভাষায় কী লেখা রয়েছে। দোকানি জানাচ্ছে ; ভারতীয় চিকেন কারির কাছে আমরা হার মানব না, হার মানব না।"

শুনলুম, ওসাকার এক্সপো-৭০ প্রদর্শনীতে ভারতীয় চিকেন কারির খুব সুনাম হয়েছিল। এবং বিস্তর জাপানি তারপর থেকে হঠাৎ 'রাইস অ্যান্ড চিকেন কারি'-র ভক্ত হয়ে পড়েছেন। উপরন্তু, ভারতীয় রান্নার সেই অপূর্ব স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে তো, যা হোক কোনো প্রকারে কারি বানিয়ে তাঁদের আর তাই খুশি করা যাচ্ছে না। তাঁদের সাফ কথা, কারিটা একেবারে ভারতীয় পাকপ্রণালীসম্মত হওয়া চাই।

পাতালপুরীতে মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করে আমরা আবার মাটির উপরে, ঝড়বাদলের রাজ্যপাটে ফিরে আসি। তখনও সমানে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির

মধ্যেই আমরা হাঁটতে থাকি। ঠিক তখুনি অবশ্য সভাস্থলে যাই না। আজুমা সান আমাকে প্রথমে নিয়ে যান গিন্‌জা এলাকায়। সেখানে খানিকক্ষণের জন্যে আমরা দোকানে-দোকানে বিজ্ঞাপনের বাহার দেখি। তারপরে যাই মেইজি মন্দিরে। বৃষ্টির তোড়ে আমাদের জামা, কাপড়, জুতো, মোজা সবই ইতিমধ্যেই ভিজে একশা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আর ছাতা খুলে রাখবার কোনো দরকারই আমাদের হয় না। মন্দিরের প্রবেশপথের দু-পাশে সারি সারি দীর্ঘ গাছ। তার পত্রপল্লব থেকে মোটা ফোঁটায় জল ঝরতে থাকে আমাদের মাথার উপরে। কিন্তু তাতে আর আমাদের কোনো অস্বস্তি হয় না। বরং বেশ মজাই লাগতে থাকে। আমরা ভুলে যাই যে, যে-বয়সে ফ্লু কিংবা নিউমোনিয়া কাউকে ভয় দেখাতে পারে না, সেই বয়সকে আমরা দুজনেই অনেক দূরে ফেলে এসেছি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা হাসতে থাকি, এবং শিন্‌টো মন্দিরের বিশাল চত্বরে সিক্ত, সুখী, আত্মভোলা দুই বালকের মতো আমরা ঘুরে বেড়াই।

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে, ট্রেন পালটে যখন কোমিয়োজি মন্দিরে গিয়ে পৌঁছোই, তখন ঠিক তিনটে বাজে।

'কোমিয়োজি' বললে আর আলাদা করে মন্দির বলবার দরকার হয় না; কেন-না 'জি' কথাটার মানেই হচ্ছে মন্দির। আর 'কোমিয়ো' মানে উজ্জ্বল।

উজ্জ্বল মন্দিরের সেই সভার কথা কখনও আমি ভুলব না। গিয়ে দেখলুম, জনা পঞ্চাশেক রবীন্দ্রভক্ত— ভয়ংকর সেই দুর্যোগের মধ্যেও— যথাসময়ে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। বেদির সামনে, মেঝের উপরে পুরু গালিচা। সেই গালিচায় তাঁরা শান্ত হয়ে বসে আছেন। তাঁদের কারও বয়স পঁচিশের নীচে, কারও বয়স আশির কাছাকাছি। তাঁরা সকলেই যে টোকিয়োর বাসিন্দা, তা নয়। কেউ কেউ এসেছেন কিয়োটো কিংবা অন্য কোনো দূর নগর থেকে। ঝড় আর বৃষ্টি তাঁদের আটকে রাখতে পারেনি।

আজুমা সান একে-একে তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ইনি শ্রীযুক্ত ৎসুশো বিয়োদো। পণ্ডিত মানুষ। তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানে ছিলেন প্রায় দু-বছর। সেই সময়ে শাস্ত্রী মশায়ের কাছে সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। ইনি শ্রীযুক্ত তোসিমাসা হাসেগাওয়া। মাত্রই তিন বছর আগে শান্তিনিকেতন থেকে ঘুরে এসেছেন। আজকের সভায় ইনি পৌরোহিত্য করবেন। ইনি শ্রীমতী কিমিকো ওতানি। এখানকার সবচেয়ে বড়ো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান পরিবারের কন্যা। দক্ষিণ ভারতে দু-বছর থেকে নৃত্যশিক্ষা করেছেন। শান্তিনিকেতনেও ছিলেন কিছুদিন। ইনি শ্রীযুক্ত কিইৎসু সাকাকিবারা। ১৯৫৩ সনে শান্তিনিকেতনে যান। সেখানে

নৃত্যের পাঠ নিয়েছিলেন। ভারতীয় নৃত্যকে জাপানে পরিচিত করিয়ে দেবার ব্যাপারে ইনি যা করেছেন, তার তুলনা হয় না। *এশিয়ার নৃত্যকলা* নামে এঁর একখানা বই আছে। প্রামাণিক বই।

একে একে সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই বৃদ্ধাকেও দেখি, ইকেবানা অর্থাৎ পুষ্পবিন্যাস শেখাবার জন্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে পরম সমাদরে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিচয় ঘটে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে। গৃহস্থঘরের বধূ ও কন্যাদের সঙ্গে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষদের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথকে এঁরা ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসার সূত্রে এঁরা এখানে এসে মিলেছেন।

বিকাশ আর মালাও সেদিন উজ্জ্বল মন্দিরে এসেছিল। তারা জাপানি ভাষা বোঝে। আমি বুঝি না। আজুমা সান বললেন, "তার জন্যে ভাবনা নেই, দোভাষীর কাজ করতে আমার ভালোই লাগে, হাসেগাওয়া আর সাকাকিবারার বক্তৃতা আমি বাংলায় তরজমা করে বুঝিয়ে দেব।"

হাসেগাওয়া বললেন রবীন্দ্র-সাধনার বিষয়ে। আর সাকাকিবারার বিষয় ছিল ভারতীয় নৃত্যকলা। প্রসঙ্গত দুজনেই বললেন যে, যেমন ব্যক্তি তেমন প্রতিটি জন-সমাজকেও সেই আত্মিক সম্পদের সন্ধান করতে হয়, যা থাকলে তবেই সমাজের জীবন একটা ভারসাম্য পায়, এবং যা না থাকলে তার অন্যবিধ প্রতিষ্ঠা কোনো সত্যকারের তাৎপর্য পায় না। দুজনেই বললেন, সেই আত্মিক সম্পদের সন্ধানেই আজ জাপান আবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথের দিকে চোখ ফিরিয়েছে ; তাঁর আদর্শ ও সাধনাকে আরও ভালো করে বুঝতে চাইছে।

বক্তৃতার আগে শ্রীমতী ওতানি ভারতীয় নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। সাকাকিবারা সেই নৃত্যকে ব্যাখ্যা করলেন। বলে দিলেন কোন্ মুদ্রার কী অর্থ।

বক্তৃতার পরে গান। সেই গান গাইলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সমবেত কণ্ঠে পরপর তিনটি রবীন্দ্রসংগীত তাঁরা শোনালেন। "আগুনের পরশমণি", "কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ", আর "পুরানো সেই দিনের কথা"। জোরালো গলা, নিখুঁত স্পষ্ট উচ্চারণ। শুনতে শুনতে আমার ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলুম না, কোথায় বসে আমি গান শুনছি। টোকিয়োয়, না কলকাতার কোনো অনুষ্ঠানে।

গান শেষ হল। নিঃশব্দে আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম। রাত হয়েছে। টোকিয়োর রাস্তায় আলো জ্বলছে। কিন্তু বৃষ্টি তখনও থামেনি। বিকাশ আর মালাব কাছে বিদায় নিয়ে আমরা স্টেশনে ঢুকলুম। ইচিকাওয়ার ট্রেন আসতে আর দেরি নেই।

এদিকে টোকিয়ো, ওদিকে ইচিকাওয়া। মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে খরস্রোতা, চওড়া একটা নদী। এদো।

আজুমা সান ইচিকাওয়ায় ঘর বেঁধেছেন। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় তাঁর বাইরে-বাইরেই কাটে। তিন-তিনটে শহর জুড়ে তাঁর রাজ্যপাট। তিনি অধ্যাপনা করেন ইয়োকোহামায়, সভাসমিতি করেন টোকিয়োয়, আর দিন ফুরালে রাত্রিকালে তিনি ইচিকাওয়ায় তাঁর কাঠের বাড়িতে ফিরে আসেন।

ভারী সুন্দর সেই কাঠের বাড়ি। সামনে একটুকরো বাগান থাকায় তার বাহার আরও খুলেছে।

বাগান পেরিয়ে আমরা বাড়িতে ঢুকলুম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীমতী আজুমা। মাথা হেলিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, "দোমো আরিগাতো গোজাই মাস্‌তা।" তারপর মাথা তুলে, আমাদের অবস্থা দেখে, তাঁর চক্ষুস্থির। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দু-প্রস্থ শুকনো পোশাক নিয়ে এলেন তিনি। পোশাক মানে ঢোলা-হাতা জাপানি ঝুল-কোর্তা। সেই কোর্তাদুটিকে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে উদ্‌বিগ্ন গলায় বললেন, "চটপট পোশাক পালটে নিন, নইলে নির্ঘাত অসুখ বাধিয়ে বসবেন।"

এতক্ষণে বুঝলুম, হোটেলে যে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলুম, তার আসল কারণ কী। নিঃস্পৃহ সেবা, নিষ্প্রাণ নৈপুণ্য ইত্যাদি সব জটিল ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু বুঝলেই হত যে, হোটেলের পরিচর্যায় আর যা-ই মিলুক, মমতার ছোঁয়া মেলে না।

শ্রীমতী আজুমা বললেন, "যান, এবারে ভিতরে গিয়ে বসুন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বাইরে থেকেই আন্দাজ করা গিয়েছিল, এবারে ভিতরে ঢুকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, পাশ্চাত্য রুচি এই বাড়িকে এখনও গ্রাস করতে পারেনি। রান্নাঘরে হাল ফ্যাশনের কুকিং রেঞ্জ রয়েছে বটে, কিন্তু বৈঠকখানা শয়নকক্ষ ইত্যাদি সবই পরিপাটি জাপানি কায়দায় সাজানো। গায়ে পুরু জাপানি কোর্তা, পায়ে হালকা জাপানি চটি, সদর থেকে আমরা অন্দরে গিয়ে ঢুকলুম। শুনেছিলুম জাপানিরা আসবাবপত্রের আড়ম্বর ভালোবাসেন না; এখন স্বচক্ষে দেখুলুম যে, সেটা ষোলো আনা সত্যি কথা। বৈঠকখানায় সোফা-কৌচের আড়ম্বর ছিল না। শয়নকক্ষেও খাটপালঙ্কের ঝঞ্ঝাট নেই। নিরহংকার, নিরলংকার গৃহরুচি। কাঠের মেঝে। সেই মেঝে জুড়ে মিহি জাপানি মাদুর পাতা। তার উপরে পাশাপাশি দুটি শয্যা রচনা করা হয়েছে।

আজুমা সান বললেন, "ওইখানে আপনি শোবেন, এইখানে আমি। লক্ষ করুন,

আপনার বিছানা পাতা হয়েছে গৃহদেবতার বেদির কাছে। এটাই আমাদের সাবেক কালের প্রথা।”

জিজ্ঞেস করলুম, “সাবেক কালের প্রথা আপনি মানেন?”

এক গাল হেসে আজুমা সান বললেন, “তা মানি বই-কি। কোট-প্যান্টালুন পরি বটে, কিন্তু সে তো বাইরের ব্যাপার, বাড়ির মধ্যে আমি আঠারো আনা জাপানি। এই দেখুন না, আমাদের বাক্স-প্যাঁটরা-আলমারি-দেরাজে তালা একটা থাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে চাবি লাগাবার নিয়ম নেই। বাইরের লোকের কথা ছেড়ে দিন, বাড়ির লোকের সামনেও আমরা বাক্স-প্যাঁটরায় চাবি লাগাই না। এ-ও সাবেকি প্রথা। প্রথা বলছে, কারও সামনে চাবি লাগালে সে হয়তো ভাবতে পারে যে, তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, অতএব খবরদার, ও-কাজ কক্ষনো করবে না, ওটা অসৌজন্য। ব্যাস, আমরা সেই বাক্যকে একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলছি। চাবির তোড়া যে নেই তা নয়, কিন্তু কাজে লাগে না তো, দু-দিন বাদেই হারিয়ে যায়। মুশকিল হয় সবাই মিলে কোথাও যাবার সময়ে। বাড়িতে তালা লাগাতে হবে, কিন্তু কোথায় চাবি? চাবির তোড়া খুঁজতেই তখন প্রাণান্ত।”

দুই শয্যার মধ্যবর্তী স্থানটা একটু উঁচু। তার উপরে পুরু কাপড় বিছানো। ঘর গরম রাখবার জন্যে তলায় একটা হিটার জ্বেলে রাখা হয়েছে, আর উপরের দিকটায় টেবিলের কাজ দিব্যি চলে। টেবিল না বলে চৌকি বললেই ঠিক হয়। আমরা তারই দু-দিকে যে যার বিছানায় জোড়াসন হয়ে বসে, চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে-দিতে জমিয়ে গল্প করছিলুম। পাতলা সবুজ চা। এঁরা বলেন ওচা। ‘ও’র প্রয়োগটা সম্মানসূচক। যেমন মিজু অর্থাৎ জলকে অনেকেই সমীহ করে বলেন ওমিজু।

চায়ের পরে এল স্যালাড। তারপরে এল ভাত, সবজি, মাছ, মাংস, মিষ্টি। আজুমা সান বললেন, “দেশে থাকতে শুনেছেন নিশ্চয় যে, জাপানিরা কাঁচা মাছ খায়। বলেন তো আপনাকেও একটু খাইয়ে দিতে পারি।”

সস্ মাখিয়ে খেতে হয়, চাকলা চাকলা কাঁচা মাছের স্বাদ যে নেহাত খারাপ, তা নিশ্চয় বলা যায় না।

মুশকিল বাধল কাঠির ব্যবহার নিয়ে। এঁরা পশ্চিমি কেতার পক্ষপাতী নন, তাই কাঁটাচামচ ব্যবহার করেন না, তার বদলে আছে কাঠ কিংবা বাঁশের তৈরি জোড়া কাঠি। তার উপরে আজ আবার ভারতীয় অতিথির সম্মানার্থে তোরঙ্গ থেকে কারুকার্য-করা হাতির দাঁতের কাঠি বার করা হয়েছিল। আমি যে ঘোর অস্বস্তিতে পড়েছি, আজুমা সানের বৃদ্ধা মা সেটা লক্ষ করেছিলেন। কাছে এসে হেসে বললেন, “বাছা, ইচ্ছে হলে স্বচ্ছন্দে তুমি হাত দিয়ে খেতে পারো। তবে কিনা, আমাদের দেশে যখন এসেছ, তখন কাঠির জোড়া হাতে নিয়ে একবার চেষ্টা করে

দেখতে তো আর ক্ষতি নেই। এই নাও, কীভাবে ধরতে হয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।”

কাঠির জোড়া হাতে নিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছি, ব্যাপার দেখে আজুমা-দম্পতির দুই কন্যা য়োসোকা আর সোনোকা তো হেসেই কুটিপাটি।

এ-বাড়িতে বাংলা ভাষার ছড়াছড়ি। আজুমা-দম্পত্তির তো কথাই নেই, প্রায় বাঙালির মতোই বাংলা বলেন, ছয় আর তিন বছরের এই শিশুদুটিও কম যায় না। উপরন্তু তারা লাজুক-লাজুক হাসতে পারে, এবং য়োসোকা দেখলুম গানও গায় চমৎকার। শান্তিনিকেতনে যখন ছিল, তখন মা আর বাবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের এই কন্যাটিও বিস্তর গান গলায় তুলে নিয়েছে।

শ্রীমতী আজুমা এতক্ষণ কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মৃদুগলায় রবীন্দ্রসংগীত গাইছিলেন, খাবার পাট চুকে যাবার পরে আমাদের ঘরে এসে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব হল। শান্তিনিকেতনের গল্প, কলকাতার গল্প, গল্পের আর শেষ নেই। তাঁদের কাছেই শুনলুম যে, একবার জাপানে এসে রবীন্দ্রনাথ একটি কোতো-যন্ত্র উপহার পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে সেই বাদ্যযন্ত্র বাজাবার কৌশল নাকি কারও জানা ছিল না। ফলে দীর্ঘদিন সেটি সংগীতভবনে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। শ্রীমতী আজুমা সে-কথা জানতে পারেন, এবং জীর্ণ যন্ত্রটিকে একটু মেরামত করে নিয়ে সবাইকে বাজিয়ে শোনান।

শোবার আগে সমবেত গলায় গান হল : আনন্দলোকে মঙ্গালালোকে বিরাজো...। গান শেষ হবার পরে কন্যাদুটিকে সঙ্গে করে বিদায় নিলেন শ্রীমতী আজুমা। যাবার আগে বলে গেলেন, “আর নয়, এবারে শুয়ে পড়ুন। কাল খুব ভোরে আপনাদের জাগিয়ে দেব। নইলে সময়মতো এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরতে পারবেন না।”

এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে হবে সকাল আটটায়। কিন্তু হনেডা এই ইচিকাওয়া থেকে অনেক দূরে। তাই অন্তত ছটার মধ্যে রওনা হওয়া দরকার। আলো নিবিয়ে, লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

মাঝরাত্তিরে একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, বাড়িটা যেন থরথর করে বারকয় কেঁপে উঠল। কাদের গলাও যেন শুনেছিলুম। কিন্তু সেই দারুণ শীতে বিছানা ছেড়ে উঠিনি। পাশ ফিরে যে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছি, আমার মনে নেই।

ঘুম ভাঙল শ্রীমতী আজুমার ডাকে। ঘড়িতে তখন পাঁচটা। চটপট উঠে বাইরে এসে দেখি আকাশ পরিষ্কার। কাল যে এত দুর্যোগ গেছে, আজকের এই টলটলে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে সে-কথা ঘুণাক্ষরেও বোঝা যাবে না। লেশমাত্র মেঘের মালিন্য কোথাও নেই।

আজুমা সান বললেন, "মুখহাত ধুয়ে নিন। ওচা তৈরি।"

শুধু চা কেন, শেষরাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে রাজ্যের খাবারদাবার তৈরি করে রেখেছেন শ্রীমতী আজুমা।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বললুম, "সময়মতো এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে পারব তো?"

আজুমা সান বললেন, "কিচ্ছু ভয় নেই। ট্রেন এখানে কাঁটায়-কাঁটায় চলে।"

ট্রেনের জানালা থেকেই ফুজিয়ামাকে দেখতে পেয়েছিলুম। আকটিমস্তক তুষারে ঢাকা আগ্নেয় পাহাড়, দূর দিগন্তে আকাশের গায়ে লগ্ন হয়ে আছে।

আজুমা সান বললেন, "আপনার কপাল ভালো। কাল সকাল থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনেক কিছুই দেখলেন। ঝড় দেখলেন, ফুজিয়ামা দেখলেন, কাল মাঝরাত্তিরে আবার ছোটোখাটো একটা ভূমিকম্পও হয়ে গেল। টের পেয়েছিলেন?"

বললুম, "বাড়িটা একটু কাঁপছে বলে মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা যে বসুন্ধরার কাঁপুনি, তা ঠিক বুঝতে পারিনি।"

ট্রেন পালটে, টোকিয়ো স্টেশনে নেমে, সুটকেসটা উদ্ধার করে, ট্যাক্সি নিয়ে যখন হনেডায় পৌঁছোলুম, তখন ঠিক আটটাই বাজে।

বিকাশও হাজির হয়েছিল এয়ারপোর্টে। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ইমিগ্রেশান কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আজুমা সান হঠাৎ বললেন, "এই দেখুন, একটা জরুরি কথাই আপনাকে বলা হয়নি। জনা কুড়ি রবীন্দ্রভক্তকে নিয়ে এই ডিসেম্বরেই আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি। আপনাদের শান্তিনিকেতন তাঁদের স্বপ্নের দেশ। সেই স্বপ্নলোক তাঁদের দেখিয়ে আনব।"

বললুম, "শান্তিনিকেতন শুধু আমাদের বুঝি?"

হোহো করে হেসে উঠলেন কাজুও আজুমা। বললেন, "না না, শুধু আপনাদের কেন, আমাদের সক্কলের।" তারপর এয়ারপোর্টের সেই ভিড়ের মধ্যেই গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন, "আমাদের শান্তিনিকেতন...।"

অগ্রহায়ণ ১৩৭৮

হঠাৎ ডিগবয়ে

জুলাইয়ের প্রথম হপ্তায় দিন তিনেকের জন্যে ডিগবয়ে গিয়েছিলুম। সেখানকার ইন্ডিয়া ক্লাব অনেক দিনের প্রতিষ্ঠান। শুনেছি, ফি বছরেই তাঁরা খুব যত্ন নিয়ে দুটি সভার আয়োজন করেন। একটি সভা রবীন্দ্রনাথের স্মরণে। অন্যটি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার। আমি গিয়েছিলুম রবীন্দ্রস্মরণসভার সূত্রে। গিয়ে কিছু নতুন বন্ধু পাওয়া গেল। দেখা গেল খোলা মনের এমন কিছু মানুষকে, খুব সহজেই পরকে যাঁরা আপন করে নিতে পারেন। তাঁদের সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন খুব আনন্দে কাটল। মূলত সেই কথাটা জানাবার জন্যেই এই স্মৃতিচারণা।

মোহনবাড়িতে যখন আকাশ থেকে ভূতলে নামি, ঘড়িতে তখন একটা বেজে দশ। জানালার ধারে আসন পেয়েছিলুম, কলকাতা থেকে গৌহাটি অবধি মেঘের শোভা কিছু কম দেখিনি; গৌহাটির পর থেকে সারাটা পথ নদীর শোভা দেখতে দেখতে এসেছি। নদী নয়, নদ। ব্রহ্মপুত্র। নীচের দিকে তাকালেই তার বিশাল বিস্তার চোখে পড়ে। বর্ষাকাল। আকাশে হরেকরকম মেঘের মেলা। কিন্তু সেই মেঘ একবারও বৃষ্টি ঝরায়নি। রোদ্দুরের ছোঁয়া লেগে মোহনবাড়ির গাছপালা খেতখামার ঝলমল করছিল।

সিটবেল্টের বাঁধন খুলে, ব্যাগটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে, স্টুয়ার্ডেসকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্লেন থেকে বেরিয়ে এলুম। ভিতরে ঠান্ডা ছিল, বাইরে গরম। সামনেই এয়ারপোর্টের ছোট্ট বাড়ি। রানওয়ের সীমানা পেরিয়ে সেই বাড়ির দিকে যাচ্ছি, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, "আপনিই তো মি. চক্রবর্তী? আমার নাম ডিকস্টা। মি. ফুকন আপনাকে এই চিঠি পাঠিয়েছেন।"

কে মি. ফুকন, আমি জানতুম না। চিঠি খুলে বুঝলুম, তিনি 'আসাম অয়েল'-এর জনসংযোগ অফিসার। ভদ্রলোক জানাচ্ছেন ডিগবয়ে "আমাদের বাড়িতেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমার স্ত্রী ও আমি তাতে খুব খুশি। আপনি তো মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যে এই অয়েল-টাউনে আসছেন; আশা করি, আপনার সময় খুব খারাপ কাটবে না।"

কলকাতার অতিথিকে ডিগবয়ে নিয়ে যাবার জন্যে মোহনবাড়ি এয়ারপোর্টে

গাড়ি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু শুধু ওইটুকুতেই খুশি থাকেননি শ্রীযুক্ত ফুকন। গাড়ির সঙ্গে চিঠি পাঠিয়ে তিনি আমাকে অগ্রিম অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু মেঘ জমেছিল। এই সাদর অভ্যর্থনায় সেটা কেটে গেল। মাঝেমধ্যে বাইরে যাই। বক্তৃতা দেবার নেশায় নয়, ওই উপলক্ষে যে একটা নতুন জায়গা আর কিছু নতুন মানুষ দেখা হয়ে যাবে, সেই লোভে। কিন্তু যাবার সময়ে সারাটা পথই একটা মৃদু অস্বস্তির মধ্যে থাকি। সভাসমিতির ব্যাপারে কোথাও যাওয়া মানেই তো সেখানে কারও অতিথি হওয়া, এবং কারও অতিথি হওয়া মানেই সেই ভদ্রলোকটিকে ব্যতিব্যস্ত করা, তাঁর নিত্যকারের মসৃণ জীবনযাত্রায় একটা ব্যাঘাত ঘটানো। বুঝতে পারি না, ব্যাপারটাকে তিনি কীভাবে নেবেন। বুঝতে পারি না, তাঁর অসুবিধে হবে কি না। সেইজন্যেই অস্বস্তি। সাগরদা অর্থাৎ শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ অবশ্য ডিগবয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেবার সময়ে খুব উৎসাহ-টুৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "যাও, যাও, ঘুরে এসো। দেখবে ওঁরা সক্কলেই খুব চমৎকার মানুষ। গত বছর আমি গিয়েছিলুম তো, ওঁদের ব্যবহারে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি।" কিন্তু সত্যি বলি, আমার অস্বস্তি তবু কাটছিল না। এবারে শ্রীযুক্ত ফুকনের চিঠি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অয়েল-টাউনের গাড়ি। পথ নেহাত কম নয়। তা প্রায় মাইল পঞ্চাশ। সেই দীর্ঘ পথ মোটরে পাড়ি দিতে হবে। পথে পড়বে তিনসুকিয়া, মাকুম। সঙ্গী ছিলেন ম্যাকনিল ব্যারির শ্রীযুক্ত [illegible] প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাপী মানুষ। নানান বিষয়ে জমিয়ে গল্প করতে পারেন। গৌহাটি এয়ারপোর্টে ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনিও ডিগবয়ে যাচ্ছেন। কী একটা সেমিনারের ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে বক্তৃতা দেবেন।

গল্পেগুজবে দীর্ঘ পথ যে কখন পেরিয়ে এলুম, টেরই পাওয়া গেল না। রাস্তাটিও চমৎকার। দুদিকে শুধু চা-বাগান আর চা-বাগান। সেই বাগানগুলির মধ্যে ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ ছায়াতরু। আসামে এর আগে একাধিকবার এসেছি, কিন্তু এ-অঞ্চলে এই প্রথম আসা। অথচ, এই দৃশ্যগুলি যে আমার অচেনা, তাও নয়। এক শুধু ওই চা-বাগানই আমার নিত্যকারের চেনা ব্যাপার নয়; বাকি যা-কিছু তা তো কলকাতার বাইরে পা বাড়ালেই চোখে পড়ে। মাঠে গোরু চরছে, পথের পাশে ছেলেমেয়েরা খেলছে, মাঝে-মাঝে কলাগাছের ঝোপ আর বাঁশঝাড়, ডোবা, পানাপুকুর, মফস্‌সলের যাত্রীবোঝাই বাস। দূরে কোথায় একটা রেলগাড়ির হুইস্‌লও যেন শোনা গেল।

ডিগবয়ে পৌঁছোলুম বেলা চারটে নাগাদ। ভূপ্রকৃতি এখানে এসেই হঠাৎ একেবারে পালটে গেছে। এতক্ষণ মাটি ছিল সমতল ; এবারে শুরু হল উঁচুনিচু

পাহাড়িয়া পথের চমক। ডিগবয়ের অবস্থান আসলে খুব উঁচুতে নয়, গরমও তাই সমতলের মতোই, কিন্তু এইখান থেকেই পাহাড়িয়া বৈচিত্র্যের শুরু। শহরের একটা অংশ সমতল, অন্য অংশ ঢেউ-খেলানো। বিশেষ করে বাজার-বসতির গণ্ডি ছাড়িয়ে, লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে পথ যেখানে অফিসারদের বাংলোর দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানে পৌঁছে হঠাৎ কেমন ধাঁধা লাগে। মনে হয়, শিলংয়ে এসেছি। ঘোরানো পথ, তার একদিকে খাদ, খাদের তলা থেকে উঠে এসেছে দীর্ঘ সরল গাছ, অন্যদিকে উঁচু উঁচু টিলা, তার উপরে ছবির মতো বাংলো-বাড়ি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে গেস্ট হাউসে নামিয়ে দিয়ে আমরা একটার পর একটা বাংলো ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলুম। শ্রীযুক্ত ফুকনের বাংলোটি একেবারে শহরের পুব প্রান্তে। বারান্দায় তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বসে ছিলেন। আমাদের গাড়ি গিয়ে বারান্দার সামনে দাঁড়াতেই চেয়ার ছেড়ে দুজনে এগিয়ে এলেন। সহাস্যে বললেন, "নমস্কার।"

বাংলোটি মনোরম। দুদিকে দুটি মস্ত বড়ো বেডরুম। মাঝখানে হল। তার একদিকে খাবার ব্যবস্থা, অন্যদিকে বসবার। আসবাবপত্রে কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই, বইপত্র সুন্দর করে সাজানো, গোটা বাড়ি জুড়ে একটি পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে।

বাড়ির সামনে প্রশস্ত বারান্দা। তার দুদিকে কেয়ারি-করা ফুলবাগান আর ক্যাকটাস। বারান্দার সিলিং থেকে হরেক রকমের অর্কিড ঝুলছে। সামনে ঘাসের জাজিম। তার পাশ দিয়ে চলে গেছে চওড়া ড্রাইভ। ড্রাইভের পাশে মস্ত-মস্ত মহীরুহ; তার কাণ্ড এতই সরল ও দীর্ঘ যে, হঠাৎ দেখলে পাথরের কলাম বলে ভ্রম হয়। নীচের দিকে তাকালে গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে কুচকুচে কালো একটা রাস্তার সর্পিল চেহারা চোখে পড়ে। ওই রাস্তাটাই আরও এগিয়ে গিয়ে ঐতিহাসিক স্টিলওয়েল রোডের সঙ্গে মিশেছে। বাঁয়ে গল্‌ফের মাঠ। সামনের দিকটা ধু-ধু ফাঁকা। দৃষ্টি একেবারে পাটকাই হিল্‌স-এ গিয়ে ধাক্কা খায়। সেই গিরিশ্রেণির ওপারেই ব্রহ্মদেশ।

বারান্দায় বসে পাহাড় দেখছিলুম। শ্রীযুক্ত ফুকন বললেন, "জানেন, আমার ছাত্রজীবনের কয়েকটা বছর কেটেছে কলকাতায়।"

"তাই নাকি? কোথায় পড়তেন?"

"সেন্ট পল্‌'স কলেজে।"

"বলেন কী, আমিও তো সেখানে বি.এ. পড়তুম। আপনি কোন্ সনের ছাত্র?"

"ছেচল্লিশে বি.এ. পাস করেছি।"

তার মানে আমাদের দু-বছর পরের ব্যাচ। আমি পাস করেছি চুয়াল্লিশে। তা

হোক, কলেজ তো একই। একই ঘরে ক্লাস করেছি, একই অধ্যাপকদের কাছে পাঠ নিয়েছি, একই লাইব্রেরিতে বইয়ের জন্যে ধরনা দিয়েছি, একই কমনরুমে আড্ডা মেরেছি। সুতরাং গল্প জমে উঠতে দেরি হল না।

জিজ্ঞেস করলুম, "মিলফোর্ড সাহেবকে মনে পড়ে?"

"তাঁকে তো আমরা পাইনি। আমরা গিয়ে কলেজে ঢুকবার আগেই তিনি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।"

"মহান্তি-সাহেবকে?"

"বিলক্ষণ। সুবিমলবাবু, আড্ডি-সাহেব, টমাস-সাহেব, কাউকেই ভুলিনি। যা-ই বলুন, অমন কলেজ আর হয় না।"

"ঠিক বলেছেন। কলেজ বলে মনেই হত না। অধ্যাপকেরা তো অনেকসময়ে নিজেদের বাড়িতেই ছেলেদের ডেকে পাঠাতেন, সেইখানেই ক্লাস নিতেন। খাওয়াতেনও প্রচুর।"

টেবিলে ইতিমধ্যে চা-জলখাবার এসে গিয়েছিল। শিঙাড়া আর মিষ্টির প্লেট-দুটোকে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে, পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে শ্রীমতী মীরা ফুকন বললেন, "গল্প পরে হবে। আপনি তো সেই সকাল দশটায় প্লেনে উঠেছেন। দুপুরে নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি?"

বললুম, "বিলক্ষণ হয়েছে! গৌহাটিতে ভাতের ব্যবস্থা ছিল। রাত্তিরের আগে চা ছাড়া আর কিছু খাচ্ছি না। আপনারা বরং দয়া করে একটু উপকার করুন। এই ডিগবয়ের কাছেই এক চা-বাগানে আমার এক বন্ধু থাকেন। আমি যে এখানে এসেছি, এই খবরটা তাঁকে দেওয়া যাবে? এতদূরে এলুম, এখন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা না করে যদি ফিরে যাই, তো সে বড়ো আক্ষেপের ব্যাপার হবে।"

শ্রীযুক্ত ফুকন বললেন, "বন্ধুর নাম কী?"

বললুম, "বীরেন্দ্রনাথ বরুয়া। হোলংহাবি টি এস্টেটের ম্যানেজার।"

শুনে শ্রীযুক্ত ফুকন সহাস্যে বললেন, "বরুয়া মশায় আমাদেরও অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর বাগান এখান থেকে খুবই কাছে। দাঁড়ান, এক্ষুনি তাঁকে ফোন করছি।"

অনেকে বলবেন, সস্তা দার্শনিকতা। হয়তো তাই। তবু এক-এক সময়ে মনে না হয়েই পারে না যে, এই জীবনটা যেন একটা ঘোরানো পাহাড়িয়া পথের মতো, সেই পথের কোন্ বাঁকে যে কখন কার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, এবং সেই আকস্মিক সাক্ষাৎ যে কীভাবে একটি স্থায়ী, অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সূচনা করবে, আগে থেকে তা বুঝবার উপায় নেই।

বরুয়া-দম্পতির সঙ্গেও ঠিক এইভাবেই আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। এবং দেখা হয়েছিল, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই, পথের মধ্যে। গত ফেব্রুয়ারি মাসের

কথা। দিন কয়েকের জন্যে পুরীতে ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফিরছি। সঙ্গে ছিলেন দুই তরুণ কবি। মৃণাল দত্ত আর কালীকৃষ্ণ গুহ। ট্রেন ছাড়বার মিনিট পনেরো আগে এক ভদ্রলোক আমাদের কামরায় এসে উঠলেন। দীর্ঘকান্তি, স্বাস্থ্যবান পুরুষ। সঙ্গে স্ত্রী। দুটি লোয়ার বার্থ পেলে ওঁদের ভালো হত, কিন্তু খুব সম্ভব শেষ মুহূর্তে রিজার্ভেশন করেছেন, তাই একটির বেশি লোয়ার বার্থ ওঁদের জোটেনি।

বললুম, "বেশ তো, আমারটা নিয়ে নিন।"

আলাপ জমে উঠতে দেরি হল না। শুনলুম, ওঁদের দুজনেরই খুব ঘুরে বেড়াবার নেশা, উত্তর ভারতের নানান জায়গায় সফর সেরে পুরী এসেছিলেন, এখন দিন দুই-তিন কলকাতায় কাটিয়ে ডিগবয়ে ফিরবেন। "আমরা মশাই সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি।"

স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। শ্রীমতী প্রতিভা বরুয়া কবিতা লেখেন। বললেন, "বাঙালি লেখকদের অনেকের লেখাই আমি পড়েছি।" সুবোধ ঘোষের গল্প-উপন্যাস ওঁর খুব ভালো লাগে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকের খবর জিজ্ঞেস করলেন। কে কী করেন, কোথায় থাকেন, এখন কী লিখছেন। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে শ্রীমতী বরুয়ার দেখলুম দারুণ আগ্রহ। "...*দেশ* রাখি। খুব ভালো লাগে। আজকালকার কবিতা অবশ্য ভালো বুঝতে পারি না। তবু মনে হয়, একটা-কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। নইলে এতটা প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারল কেন? সবাই এদিকে এতটা ঝুঁকছেনই বা কেন? তাই ভালো করে বুঝতে না পারলেও পড়ি। বুঝতে চেষ্টা করি।"

"সমুদ্র কেমন লাগল?"

"দারুণ। আচ্ছা, আপনি এইসময়ে পুরীতে এসেছিলেন কেন? স্রেফ সমুদ্র দেখতে?"

"না। কাজ করতে। একটা প্রবন্ধের বইয়ের কাজ কিছুটা বাকি ছিল। পুরীতে এসে তার পুরো প্রেস কপি তৈরি করে ফেললুম।"

স্বামী-স্ত্রীতে পলকে একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। বীরেন্দ্রনাথ বরুয়া বললেন, "পরের বারে ডিগবয়ে আসুন। আমার বাংলো একেবারে চা-বাগানের মধ্যে। নিরিবিলি জায়গা। থাকবার কোনো অসুবিধে নেই। এক মাসের ছুটি নিয়ে আসুন, আর-একটা বই তৈরি হয়ে যাবে।"

প্রতিভা দেবী বললেন, "আসবেন তো?"

বললুম, "আপনাদের নেমন্তন্নের কথাটা মনে রইল। এক মাসের ছুটি নিয়ে যেতে পারব কি না জানি না, তবে ওদিকে যদি যাই তো নিশ্চয়ই দেখা করব।"

সেই দেখা যে এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, ভাবিনি। ফোন নামিয়ে রেখে শ্রীযুক্ত ফুকন বললেন, "ওঁরা আসতে চাইছিলেন। আমি বললুম, আমরাই যাচ্ছি। চলুন, বেরিয়ে পড়ি। আপনারও এই ফাঁকে এখানকার পথঘাট আর-একবার দেখা হয়ে যাবে। মীরা, তুমিও তৈরি হয়ে নাও। আমি গারাজ থেকে গাড়ি বার করছি।"

শহর ছাড়িয়ে খানিক এগোলেই হোলংহাবি চা-বাগান। পৌঁছোতে আধ ঘণ্টাও লাগল না। বীরেন্দ্রনাথ আর প্রতিভা দেবী তাঁদের বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা দোতলায় উঠে গেলুম। এখানকার এই একটা মজা দেখছি। অনেক বাংলোরই একতলাটা ফাঁকা; কাঠের কিংবা ইস্পাতের খুঁটির উপরে পাটাতন বসানো। তার উপরে দোতলা। দেখে মনে হয়, বাড়িটা যেন গোটাকয়েক রণপা-র উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মীরা আর প্রতিভা গল্প করতে বসে গেলেন। বীরেন্দ্রনাথ বললেন, "চলুন, চট করে আপনাকে বাগানটা একবার দেখিয়ে আনি।"

তিনশো একরের বাগান। জিপে করে আমরা চক্কর দিয়ে এলুম। মাঝে-মাঝেই গাড়ি থামিয়ে বীরেন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন, এইটে আমাদের ইস্কুল, ওইটে আমাদের গেস্ট হাউস, ওই ঘেরা জায়গাটায় কোঅপারেটিভ বেসিসে চাষ চালিয়ে এবারে প্রচুর সবজি পাওয়া গিয়েছিল, আর ওই যে দেখছেন কাঁটাতারের বেড়া, ওইখানেই আমাদের সীমানা শেষ হয়ে গেল।

শ্রীযুক্ত ফুকন বাগান দেখছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি ছিল ছায়াতরুর শাখাপ্রশাখায় নিবদ্ধ। তিনি অর্কিড খুঁজছিলেন। ভদ্রলোকের দুটি নেশা। গল্ফ আর অর্কিড। অর্কিডের অন্বেষণে তাঁর ক্লান্তি নেই।

বাংলোয় ফিরে জমিয়ে চা খাওয়া হল। তারপর যখন বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন প্রতিভা দেবী বললেন, "কাল রাত্তিরে কিন্তু আপনারা সবাই এখানেই খাবেন।"

"কিন্তু কাল রাত্তিরে তো মিটিং। দশটার আগে তো মিটিং শেষ হবে না।"

"বেশ তো, দশটার পরেই আসবেন।"

ডিগবয়ে ফিরে দেখি, ইন্ডিয়া ক্লাবের দুই কর্মকর্তা আমাদের জন্যে বসে আছেন। শ্রীযুক্ত বরঠাকুর আর শ্রীযুক্ত তরুণ চক্রবর্তী। প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারি। বয়স অল্প, উৎসাহ প্রচুর, উদ্যমে-উদ্দীপনায় দুজনেই যেন টগবগ করছেন। দুই রাত্রির অনুষ্ঠান। তা ছাড়া দ্বিতীয় দিন সকালেও একটা বৈঠকের ব্যবস্থা রেখেছেন। তার কর্মসূচি ওঁরা আমাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন।

শ্রীযুক্ত ফুকনের বাংলোর বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। বারান্দার সিলিংয়ে লাইট জ্বলছে। মেঝের উপরে গোল হয়ে তার আলো পড়েছে। নীচের দিকে

তাকালে কিছুই আর এখন চোখে পড়ে না। শুধু অনেকক্ষণ পরে-পরে যখন হেডলাইট জ্বালিয়ে এক-একটা গাড়ি ছুটে যায়, তখন বুঝতে পারি, ওখানে একটা রাস্তা আছে।

বরঠাকুর আর চক্রবর্তী বিদায় নিলেন। শ্রীমতী ফুকন এসে বললেন, "চলুন, এবারে খেয়ে নিন।"

যে যার প্লেটে খাবার তুলে নিয়ে বসবার ঘরে এসে আয়েস করে বসা গেল। ফুকনদের বাড়িতে আজ আরও কয়েকজন অতিথি ছিলেন। খাবার ফাঁকে ফাঁকে গল্প চলতে লাগল। মীরা দেবী একবার অনুযোগের সুরে বললেন, "আপনি শুধু গল্পই করছেন। খাচ্ছেন না কেন?"

কথাটা ঠিক নয়। আমি গল্প করতে ভালোবাসি ঠিকই, কিন্তু খেতেও কিছু কম ভালোবাসি না। উপরন্তু, রান্নাও হয়েছিল চমৎকার। সবচাইতে ভালো লাগল 'ট্যাঙা'। অর্থাৎ ঢেঁকিশাক দিয়ে মাছের টক।

খাবার পর্ব যখন শেষ হল, তখন প্রায় দশটা বাজে। আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পরে অতিথিরা বিদায় নিলেন।

ঘরে এসে জানালার পর্দা সরিয়ে দিলুম। বাইরে এখন আর কিছুই চোখে পড়ে না। পাটকাই হিল্‌সও এখন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে। এমন গাঢ় এবং কোমল অন্ধকার আমি অনেকদিন দেখিনি।

শেষ রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। শুনতে পেয়েছিলুম, ঘন পত্রপল্লবের উপরে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। একটানা সেই শব্দ শুনতে-শুনতেই আবার আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

ঘুম ভাঙল সাতটায়। তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জল দিয়ে বাইরে এসে দেখি, শ্রীমতী ফুকন বারান্দায় বসে আছেন। বললুম, "কর্তা কোথায়?"

"দফতরে। এখানে সকাল থেকেই দফতর বসে যায়। তা ছাড়া, আর-একটা ব্যাপার জানেন তো? আপনাদের থেকে আমরা এখানে পুরো এক ঘণ্টা এগিয়ে চলি। আপনার ঘড়িতে এখন কটা বাজে? সাতটা? আমাদের ঘড়িতে সওয়া আটটা।"

"তার মানে কি আমাকে এক ঘণ্টা আগেই ঘুম থেকে উঠতে হবে নাকি?"

"না না। তিন দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন, অত কষ্ট করবার দরকার কী? তবে হ্যাঁ, আজ দুপুরে আপনার কপালে একটু কষ্ট আছে। দুপুরে আমরা বাড়িতে থাকছি না, একটা নেমন্তন্ন আছে, না গিয়ে উপায় নেই। আপনাকে তাই একা-একাই দুপুরের খাওয়া সারতে হবে।"

হেসে বললুম, "তাতে আবার কষ্ট কী? যা-কিছু রান্নাবান্না হচ্ছে, একাই সব খাব।"

শ্রীযুক্ত ফুকন বারোটা নাগাদ বাড়িতে ফিরলেন। তারপর, খানিক গল্পগুজবের পরে ওঁরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন বললুম, "খানদুয়েক বই দিয়ে যান।"

"কী বই দেব?"

"অসমিয়া বই।"

"পড়তে পারবেন?"

"পারব না কেন? হরফ তো প্রায় একই, শুধু দু-একটা ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম। দিয়ে যান, ঠিক পড়তে পারব।"

এ-বাড়িতে বই প্রচুর। সাহিত্য, শিল্প, খেলা, বিজ্ঞান, সব বিষয়ের বই। শোবার ঘর, বসবার ঘর, সর্বত্র বইয়ের ছড়াছড়ি। দেখে বুঝতে পারা যায়, কাজকর্মের চাপের মধ্যেও পড়াশুনোর চর্চাটা এঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। স্বামী আর স্ত্রী, দুজনেই শিক্ষানুরাগী পরিবারের সন্তান। লক্ষ্মীনাথ ফুকনের নাম তো বাংলা দেশেও অনেকেই জানেন। আসামের তিনি একজন অগ্রণী সাহিত্যিক। এই সেদিনই কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায় অসমিয়া কথাসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখলুম। উপরন্তু তিনি *আসাম ট্রিবিউন*-এর সম্পাদক ছিলেন। ডিগবয়ে তাঁরই পুত্রের বাড়িতে আমি উঠেছি। আর মীরা দেবীর পিতার জীবন কেটেছে অধ্যাপনায়; আসামেরই একটি কলেজের তিনি অধ্যক্ষ। বইয়ের প্রতি এঁদের এই অনুরাগে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই; সরস্বতীর সাধনা এঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যকে এঁরা সযত্নে লালন করছেন।

শ্রীযুক্ত ফুকন বললেন, "লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার নাম তো আপনারা সবাই জানেন। তাঁর সম্পর্কে একটি স্মারকগ্রন্থ বেরিয়েছে। পড়বেন?"

"নিশ্চয়!"

অসমিয়া সাহিত্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার দান যে কতখানি তা কারও অজানা নয়। উপরন্তু, বাংলা দেশের সঙ্গেও তাঁর একটি নিবিড় যোগসম্পর্ক ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি জামাতা। অসমিয়া সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি অজস্র ফুল ফুটিয়েছেন। স্যাটায়ারেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত; তাঁর তীক্ষ্ণ, তীব্র কৌতুকের যে দু-একটি নমুনা দেখেছি, তাতে মনে হয়, এক্ষেত্রে তাঁর কোনো তুলনা ছিল না।

স্মারকগ্রন্থটিতে আসামের কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শ্রীযুক্ত ফুকনের হাত থেকে সাগ্রহে বইখানি নিয়ে বললুম, "যান, আপনারা নেমন্তন্ন রক্ষা করে আসুন গে। আমার জন্য ভাববেন না, দুপুরটা আমার ভালোই কাটবে।"

শ্রীমতী মীরা দেবীর দিকে তাকিয়ে বললুম, "ঘুরে আসুন মেমসাহেব। আমি তো

এখন এই সংসারেরই লোক। দুপুরে আমার ঘুমুবার অভ্যেস নেই, সযত্নে আপনার ঘরদুয়ার পাহারা দেব, কুটোটিও খোয়া যাবে না।"

সন্ধ্যার খানিক বাদে গেলুম ইন্ডিয়া ক্লাবে। গিয়ে আমি অবাক। নাচগানের জমজমাট আসর তো নয়; একটি-দুটি রবীন্দ্রসংগীত আর আবৃত্তির পরে আছে *বাল্মীকি প্রতিভা*-র অভিনয়; আর তারপরেই শুধু হবে বক্তৃতা। তাও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেই বক্তৃতা দেবার জন্যে কলকাতা থেকে যাঁকে আনা হয়েছে, তিনি কষ্টেসৃষ্টে দু-চার লাইন যদি-বা লিখতে পারেন, বলতে একেবারেই পারেন না। সুতরাং আমি ধরেই নিয়েছিলুম যে, হলের মধ্যে বারো আনা জায়গাই ফাঁকা পড়ে থাকবে।

গিয়ে দেখি, হল ভরে গেছে, এবং ভিতরে জায়গা হয়নি বলে বেশ-কিছু লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ইন্ডিয়া ক্লাবের এই হলটি নেহাত ছোটো নয়। প্রায় পাঁচশো লোকের জায়গা হয়ে যেতে পারে। তাতেও কুলোয়নি দেখে বুঝতে পারলুম যে, আমার হিসেবে কোথাও গণ্ডগোল ছিল।

গণ্ডগোলটা শ্রীযুক্ত তরুণ চক্রবর্তীই ধরিয়ে দিলেন। বললেন, "আপনারা কলকাতায় থাকেন তো, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি এসব জায়গার মানুষদের মনে যে কতখানি টান আর মমতা, আপনারা তা বুঝতে পারেন না।"

"*বাল্মীকি প্রতিভা*-র অভিনয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হল অর্ধেকটা ফাঁকা হয়ে যাবে তো?"

"নিশ্চয়ই নয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত সবাই নিঃশব্দে সব দেখবেন, শুনবেন। আপনি কীরকম বক্তৃতা দেন, ভালো না খারাপ, আমরা জানি না। কিন্তু যেরকমই দিন না কেন, দেখতে পাবেন, যতক্ষণ না আপনার বক্তৃতা শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আসন ছেড়ে নড়েননি।"

উদ্‌বোধন-সংগীতের পরে শ্রীযুক্ত বরঠাকুর তাঁদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে দু-চার কথা বললেন। তারপর একটি-দুটি গান আর আবৃত্তি শুনলুম। আবৃত্তির পরে শুরু হল অভিনয়। *বাল্মীকি প্রতিভা*-র অভিনয় সেদিন সত্যিই খুব জমেছিল। যারা অভিনয় করল, তাদের বয়স খুব অল্প। অথচ তাদের চলায়-ফেরায়, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তিতে কিংবা প্রবেশে-প্রস্থানে কোথাও কিছুমাত্র জড়তা ছিল না।

অনুষ্ঠান শেষ হল রাত দশটায়। তারপরেই আমরা হোলংগাবি চা-বাগানের দিকে রওনা হয়ে গেলুম।

দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলুম, ডিব্রুগড়-ডিগবয় সড়কের পাশে চা-বাগানের সেই বাংলোবাড়ির দোতলা একেবারে আলোয়-আলো হয়ে আছে। বরুয়া দম্পতির আমন্ত্রণে সেদিন আরও কয়েকজন সেখানে এসেছিলেন। এসেছিলেন লেখক শ্রী

রবীন্দ্রনাথ বরুয়া। তাঁর স্ত্রী কবি শ্রীমতী সান্ত্বনা বরুয়া। আর শ্রী অমল হাজরিকা। এমন-কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের মুখের হাসি কখনও ম্লান হয় না। অনুমান করি, অমল হাজরিকা তাঁদেরই একজন। হয় নিজে হাসছেন, নয় অন্যকে হাসাচ্ছেন, ফুর্তিতে একেবারে টইটম্বুর, এমন মানুষ উপস্থিত থাকলে যে-কোনো আসর নিমেষে জমে যায়। আগের রাত্রে শ্রীযুক্ত ফুকনের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর ভাই কমল হাজরিকাও সেখানে হাজির ছিলেন। আজকের মিটিংয়েও তাঁদের দুজনকে দেখতে পেয়েছিলুম। অতঃপর এখানেও যে তাঁর দেখা মিলবে, এতটা আশা করিনি।

বললুম, "আরে আপনি?"

দুষ্টুমির হাসি হেসে শ্রীযুক্ত হাজরিকা বললেন, "নেমন্তন্ন-বাড়ির গন্ধে-গন্ধে এসে হাজির হয়েছি।"

"আসলে এসেছেন আড্ডার লোভে, তাই না?"

প্রতিভা দেবী বললেন, "শুধু আড্ডা দিলে হবে না, কবিতা শোনাতে হবে।"

হেসে বললুম, "তারপর কবিতা যদি পছন্দ না হয়, তো না খাইয়ে বিদায় দেবেন, এই তো? না, ওসব ঝুঁকি আমি নিচ্ছি না। তার চাইতে বরং আপনারাই কবিতা পড়ুন।"

কবিতায়-গানে-গল্পে সেদিনকার সেই মজলিশ সত্যি দারুণরকম জমে উঠেছিল। প্রথমেই সান্ত্বনা দেবী আর প্রতিভা দেবী তাঁদের কবিতা পড়ে শোনালেন। তারপর গান গাইল সুরভি দুয়ারা। "মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে।" সুরভি দুয়ারা আর পূরবী দুয়ারা দুই বোন। বীরেন্দ্রনাথের এই ভ্রাতুষ্পুত্রীদুটির এই একটা মস্ত গুণ দেখলুম যে, ওরা কথা হয়তো কম কয়, কিন্তু অকারণ সংকোচের ধার ধারে না। রবীন্দ্রসংগীতের পরে আসামের একটি পল্লিগীতি গাইল সুরভি। পল্লিগীতির পর গাইল কীর্তন। টানা ঝকঝকে, সুরেলা গলা, উচ্চারণ পরিষ্কার ; গানের কথাগুলি সবই যে আমি বুঝতে পারছিলুম, তা নয়, তবু খুব ভালো লাগছিল।

সুরভির গান শেষ হবার পরে বীরেন্দ্রনাথ বেহালা বাজালেন। তারপরে ভূপেন হাজরিকার গানের রেকর্ড বাজানো হল। সর্বশেষে শ্রী অমল হাজরিকা বললেন, "এবারে আমরা সবাই মিলে একটা গান আপনাকে শোনাব, যা আপনি কখনও শোনেননি।"

বললুম, "কীসের গান?"

শ্রীযুক্ত হাজরিকা বললেন, "বিয়ের গান। আসামে এখনও বিয়ের সময়ে দল বেঁধে গান গাওয়া হয়।"

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। তখন পূর্ববঙ্গের গ্রামে 'বিয়ের গান' শুনেছি।

কোনো বাড়িতে বিয়ে হলে পাড়ার বউ-ঝিরা সেই বাড়িতে এসে মিলিত গলায় গান গাইতেন।

হোলংহাবিতে যে-গান শুনলুম, তার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সেই গানের কিছু অমিল আছে ঠিকই, কিন্তু মিলও আছে অনেকখানি। অসমিয়া গানের কয়েকটা লাইন এখনও আমার মনে আছে।

"হাতি করে দলদোপ্,
ঘোরাই মারে ছাটি;
উঠক উঠক ভীষ্মক রজা
জোয়াই আছে রাতি।
আহক আহক শিব রজা
নেত্র ভরি চাও,
শুকুলা চামর লৈয়া
আগবাঢ়ি যাও।..."

সত্যি, সবাই সেদিন সেই গানে গলা মিলিয়েছিলেন। চারদিকে চা-বাগান। চারদিকে রাত্রির অন্ধকার। সেই অন্ধকার ক্রমেই আরও জমাট বেঁধে উঠছে। তার মধ্যে একটি বাংলোবাড়ির আলোর বৃত্তে বসে পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইছেন কয়েকটি নারী ও পুরুষ। গান গাইছেন নিজেরা আনন্দ পাবার জন্যে। গান গাইছেন দূরের অতিথিকে আনন্দ দেবার জন্যে।

খাওয়ার পর্ব শেষ হতে রাত্রি একটা বাজল। তারপর আরও দু-পাঁচ মিনিট গল্প করে, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা নীচে নেমে এলুম। বাগান থেকে রাস্তায় নেমে, বাঁয়ে মোড় নিয়ে, গাড়ি ছুটল ডিগবয়ের দিকে। মনে পড়ছে, হেডলাইটের খড়্গ দিয়ে পথের অন্ধকারকে দ্বিখণ্ডিত করতে-করতে যখন ডিগবয়ে ফিরে যাচ্ছি, তখনও সেই গানের রেশ আমার মন থেকে মিলিয়ে যায়নি। তখনও আমার কানে বাজছিল সেই গানের কলি : "আহক আহক শিব রজা নেত্র ভরি চাও।"

দেরিতে ঘুমিয়েছিলুম, অথচ ঘুম ভাঙল সাতসকালে। খানিক বাদেই আবার ইন্ডিয়া ক্লাবে যেতে হবে; সেখানে একটা প্রভাতি বৈঠকের ব্যবস্থা আছে। হাতমুখ ধুয়ে, স্নান সেরে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। দেখি, মীরাদেবী সেই কালকের মতোই বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। বললুম, "ব্যাপার কী? আজ তো রবিবার। কর্তা কি রবিবারেও দফতরে যান?"

"না।"

"তবে তাঁকে দেখছি না কেন?"

"গল্‌ফ খেলতে গেছেন। আমিও যাই। ছুটির দিনে দুজনেই গিয়ে মাঠে নামি। আজ আপনি রয়েছেন তো, তাই যাইনি।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি গেলেই পারতেন। মিছিমিছি ছুটির দিনটা নষ্ট করলেন কেন?"

বলতে বলতেই শ্রীযুক্ত ফুকন এসে হাজির। বললেন, "আরে, আপনি উঠে পড়েছেন? আমি তো ভেবেছিলুম, সকাল আটটার আগে আপনার ঘুম ভাঙবে না, তার মধ্যে আমি ঘুরে আসতে পারব। কই মীরা, চা দাও।"

চায়ের সরঞ্জাম তৈরিই ছিল। কাপে চা ঢেলে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে মীরা দেবী বললেন, "একটা কথা বলি। আপনি তো বলেছিলেন যে, ডিগবয়ের কাছাকাছি দু-একটা জায়গা একটু ঘুরে দেখতে চান। তা সেইমতো আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আমার ছোটো বোন নীতি থাকে দুলিয়াজানে। তার স্বামী সেখানে অয়েল ইন্ডিয়ার ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তা আজ সকালে নীতি আমাকে ফোন করেছিল। আমাদের সবাইকে তার ওখানে খেতে বলল। আমি বললুম, যাব। আপনার আপত্তি নেই তো?"

আমি বললুম, "কিছু না। খাবার প্রস্তাবে কারও আবার আপত্তি হয় নাকি?"

শ্রীযুক্ত ফুকন বললেন, "মীরা, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না। যাব ঠিকই, তবে তার আগে ওই দুলিয়াজানেই একটা গল্‌ফের ব্যাপার আছে, সেটা সেরে তবে যাব। ভাবছি, একটু বাদে ইন্ডিয়া ক্লাবে যে বৈঠক আছে, সেটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দুলিয়াজানের দিকে রওনা হব। তোমার তো অত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার নেই; তাই তুমি বরং একটা-দেড়টা নাগাদ আমাদের গেস্টকে নিয়ে আর-একটা গাড়িতে চলে যেয়ো।"

"আর-একটা গাড়ি পাচ্ছি কোথায়?"

"ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" শ্রীযুক্ত ফুকন বললেন, "এখন চলো, বৈঠকে যাওয়া যাক।"

ইন্ডিয়া ক্লাবের সেই ঘরোয়া বৈঠকে সেদিন জনা-পঁচিশ উৎসাহী সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এসেছিলেন বরুয়া-দম্পতিও। আগের দিন তাঁদের অত ধকল গেছে, তবু সকালবেলা চা-বাগান থেকে ছুটে এসে সাহিত্যের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।

বিষয় ছিল : কবির ভূমিকা। সামাজিক কাঠামোয় কবির স্থান কোথায়, তাঁর কাজ কী, সেই কাজ কীভাবে তিনি করতে পারেন। প্রশ্ন, উত্তর, যুক্তি, তর্কের ভিতর দিয়ে আলোচনা এগোতে লাগল। বৈঠক আর সভা তো এক বস্তু নয়। সভাটা নেহাতই একতরফা ব্যাপার। একজনে বলে যান, অন্যেরা রন নিরুত্তর। বৈঠকে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই বলবার অধিকার আছে; আলোচ্য বিষয়টাকে তাই নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। নানান দিক থেকে আলো পড়ে; যে-কোনো বিষয়বস্তুর সামগ্রিক চেহারা তার ফলে আরও স্পষ্ট হয়।

কিন্তু শুধু বলবার অধিকার থাকলেই তো হয় না, বিষয়বস্তুর উপরে অন্তত কিছুটা অধিকার থাকা চাই। দেখলুম, সেটা অনেকেরই আছে। ব্যাপারটা নিয়ে তাঁদের আগ্রহ আছে অনেকখানি; এবং বক্তব্যও কিছু কম নেই। একজন বললেন, "কবিকে যদি তাঁর দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে হয়, তবে সর্বাগ্রে তাঁকে সহজ হতে হবে। কবিতা যদি দুর্বোধ হয়, কবির সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ তাহলে সহজে সম্ভব হয় না, ফলে কবির ওই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমরা কবিতার কাছে যা চাই, এবং কবি আমাদের যা দিতে পারেন, তা তিনি কী করে দেবেন, যদি-না তাঁর কথাগুলিকে আমরা সহজে বুঝতে পারি?"

বললুম, "রবীন্দ্রনাথের কবিতা আপনি সহজে বুঝতে পারেন?"

"পারি।"

"*শ্যামলী*-র 'আমি' কবিতাটি? 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনি উঠল রাঙা হয়ে।' মনে পড়ছে? আপনি কি বলবেন, ওর তত্ত্বটি খুবই সহজ?"

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন।

বললুম, "অথচ এমন নয় যে, ওই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলি খুব খটোমটো। কবিতা যে কঠিন লাগে, তার কারণ কি শুধুই শব্দ? কখনও শব্দের জন্যে কবিতা দুরূহ *ঠেকে*, কখনও বিষয়বস্তুর জন্যে। এমন অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে, যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ নয়। যতই সহজে সেই বিষয়বস্তুর কথা বলা যাক, পাঠকদের অন্তত একাংশের কাছে তা কঠিন ঠেকবেই। সেক্ষেত্রে আমরা কী বলব? আমরা কি এই বলব যে, অমন কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লেখা যাবে না?"

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল। বললুম, "আজ রাত্তিরে তো আবার সভা আছে। আজকের সভায় না-হয় আধুনিক কবিতার বিষয়েই বলা যাবে। "

শ্রীযুক্ত ফুকন বৈঠক থেকেই দুলিয়াজানের পথে রওনা হয়ে গেলেন। আমি ও মীরা দেবী বাড়িতে ফিরে এলুম। ডিগবয়ের ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত পত্রনবিশ তাঁর গাড়িটি আমাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই গাড়িতে করে আমরা যখন দুলিয়াজানের দিকে যাত্রা করলুম, তখন দেড়টা বাজে। মাইল পঁচিশ পথ। দুদিকে কখনও অরণ্য, কখনও গ্রাম, কখনও প্রান্তর। দুপুর দুটো নাগাদ আমরা দুলিয়াজানে গিয়ে পৌঁছোলুম।

দুলিয়াজানে সেদিন ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের বেশি আমরা থাকতে পারিনি। অথচ আরও কিছুক্ষণ সেখানে কাটাতে পারলে ভালো লাগত। নীতি দেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত রঞ্জিতকুমার বরুয়ার কর্মজীবনের পরিচয় তো আগেই পেয়েছিলুম, দুলিয়াজানে তিনি ফিল্ডস ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট। এবারে তাঁর বাড়িতে এসে আর-একটি পরিচয় পাওয়া গেল, ভদ্রলোকের গানের গলা চমৎকার। শচীন দেববর্মণের প্রচুর গান তাঁর স্টকে; হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে একটার-পর-একটা শুনিয়ে যেতে

লাগলেন। বাড়িতে লোকজন কম। স্বামী, স্ত্রী আর ছোটো দুটি মেয়ে। নওমি আর মিমি। নীতি দেবী এই কিছুদিন আগেও গৌহাটিতে অধ্যাপনা করতেন। এখন অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে সংসার করছেন। গাছপালার শখ আছে। হরেক রকমের পত্রেপুষ্পে বাড়িটিকে একেবারে ছবির মতো সাজিয়ে রেখেছেন।

গান শুনে খাওয়ার পাট চুকিয়ে সদ্য একটু আরাম করে বসেছি, ভাবছি এবারে আর দু-একটা গান শুনলে মন্দ হয় না, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত ফুকন বললেন, "উঠে পড়ুন। বিকেলে আমাদের বাড়িতে জনাকয় সাংবাদিককে আসতে বলেছি, আর সময় নেই।"

গাড়ি আবার ঝড়ের বেগে ডিগবয়ের দিকে ছুটল। তখন বিকেল হয়ে এসেছে, মাঠে-মাঠে ছায়া নেমেছে, পিছনের আসনে বসে মীরা দেবী গুনগুন করে রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন, সব মিলিয়ে পথটা খুব মনোরম লাগছিল। মাঠ আর গ্রাম ছাড়িয়ে গাড়ি একসময়ে অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। পথের দু-দিকে নিবিড় অরণ্য। এক হাত স্টিয়ারিং হুইলে রেখে অন্য হাত সেই অরণ্যের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শ্রীযুক্ত ফুকন বললেন, "জানেন, ওই জঙ্গল থেকে মাঝে-মাঝে হাতি বার হয়। রাত্তিরে হয়তো গাড়ি চালাচ্ছেন, হঠাৎ দেখবেন, পথের ঠিক মাঝখানে একদঙ্গল হাতি দাঁড়িয়ে আছে।"

"তখন কী করবেন?"

"কিছু করবার উপায় নেই। শুধু হেডলাইট জ্বালিয়ে বসে থাকা। অপেক্ষা করা। যতক্ষণ না হাতিরা তাদের আপন ইচ্ছেয় পথ থেকে সরে যাচ্ছে, ততক্ষণ গাড়ি চালানো যাবে না।"

ডিগবয়ে পৌঁছোতে সেদিন মিনিট কয়েক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সাংবাদিকরা ভেবেছিলেন, আমরা হয়তো আটকা পড়ে গিয়েছি, বিকেলের মধ্যে ফিরতে পারব না। কেউ-কেউ উঠি-উঠি করছিলেন, এমন সময়ে আমরা গিয়ে পৌঁছোলুম।

সাহিত্য সমাজ রাষ্ট্রনীতি, হরেক বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা হল। কথা হল যে-বৃত্তিতে আমরা নিযুক্ত রয়েছি, সেই সাংবাদিকতার বিষয়েও। শ্রীযুক্ত ফুকনের প্রশ্ন ছিল : মফস্সলের সংবাদদাতাদের ভূমিকা ক্রমে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে কি না। মনে হল, অন্তত এই একটা বিষয়ে সকলেই একমত। মফস্সলের গুরুত্ব বাড়বে, তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বৈঠক শেষ হল। স্নান করে নিলুম। শ্রীযুক্ত ফুকন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাতটা পঁচিশ বাজে। সাড়ে সাতটায় মিটিং। চলুন বেড়িয়ে পড়ি।"

আজ আমার বলবার বিষয় আধুনিক কবিতা। সকালে যা বলেছিলুম, তারই জের টেনে ঘণ্টাখানের কথা বলা গেল। হল আমার চেনা হয়ে গেছে। আমার কাছে

এবং দূরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের সঙ্গে এমন একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক আমি অনুভব করছিলুম, আগের দিনে যা করিনি। ক্রমাগত মনে হচ্ছিল, এঁরা কবিতা ভালোবাসেন, কবিতার কাছে এঁদের অনেক প্রত্যাশা; আনন্দ এবং যন্ত্রণার মুহূর্তে এঁরা কবিতার কাছে হাত বাড়িয়ে দেন। আনন্দের সমর্থন পাবার জন্যে। শোকে সান্ত্বনা পাবার জন্যে। কিন্তু সেই সমর্থন কিংবা সান্ত্বনা কি আমরা দিই?

কবিদের তরফে কিছু বলবার নেই, তা নয়। অনেককিছুই বলবার আছে। ইচ্ছে করে কি কেউ কঠিন হন? তা নিশ্চয়ই হন না। উপরন্তু, সব কবিতা যে সব পাঠকের কাছে সমান কঠিন, তাও নয়। কবিতায়-কবিতায় ফারাক থাকে। তেমনই ফারাক থাকে পাঠকে-পাঠকেও। একজন পাঠক যে-কবিতা বাতিল করে দেন, আর-একজন পাঠককে সেই কবিতা থেকে আনন্দ পেতে দেখেছি। অথচ, তাঁদের দুজনেই সৎ পাঠক। কবি এক্ষেত্রে কী করবেন? তা ছাড়া অনেক কবিই তো এমন অনেক উপলব্ধির কথা বলেন, যা তাঁর সমকালীন সমাজের চেতনায় হয়তো সামগ্রিকভাবে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সে-ক্ষেত্রে কী করা? সমাজ যেহেতু তক্ষুনি তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারছে না, অতএব তিনি মুখ বন্ধ করে বসে থাকবেন? অর্থাৎ, কবি কি শুধুই উপস্থিত মুহূর্তের কথা বলবেন? তাঁর দৃষ্টি কি আর-একটু দূরে প্রসারিত হবে না?

আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যেসব আপত্তি সাধারণত ওঠে, এককথায় তাকে বাতিল করতে আমার দ্বিধা হয়; কিন্তু একই সঙ্গে আমি মনে না-করে পারি না যে, পাঠককেও আর-একটু কষ্ট করে কবির দিকে এগিয়ে আসতে হবে। দুরূহতার সবখানি দায় কবিদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়, চাপালে তাতে পাঠকেরই কি কিছু কম ক্ষতি?

সভার শেষে শ্রীযুক্ত বরঠাকুরের বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। সেখানে শ্রীযুক্ত চিত্ত দাস ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। শ্রীমতী বরঠাকুর যত্ন করে আমাদের খাওয়ালেন। খাবার শেষে আড্ডা। তারপর বাড়ি।

দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছিলুম। আজ আর কোনো কাজ নেই। শুধু শ্রীযুক্ত ফুকনের সঙ্গে একবার বেরোতে হবে। মাটির তলায় পাইপ চালিয়ে প্রায় একশো বছর ধরে যেখানে তেল তোলা হচ্ছে, ডিগবয়ের সেই পাহাড়িয়া অরণ্য-অঞ্চলে একবার চক্কর দিয়ে আসব। ব্যাস, তারপরেই আমার ছুটি। আজ দুপুরে আমি কলকাতায় ফিরব।

সকালবেলায় শ্রীযুক্ত চিত্ত দাসের বোন এসেছিলেন। চা খেতে-খেতে গল্প হল। তারপরে আমরা বেরিয়ে পরলুম। তেল কীভাবে তোলা হয়, সেই তেল কীভাবে শোধন করা হয়, তার থেকে আরও কত রকমের জিনিস কীভাবে তৈরি হচ্ছে,

শ্রীযুক্ত ফুকন সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। কর্মীদের দেখলুম। ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেরই মানুষ কর্মসূত্রে এখানে এসে ঘর বেঁধেছে। ডিগবয় যেন গোটা দেশেরই একটা ছোট্ট সংস্করণ।

বাড়িতে ফিরে চটপট খেয়ে নিলুম। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। এবারে আমাকে মোহনবাড়ির পথে রওনা হতে হবে। শ্রীমতী ফুকন বললেন, "এই বাড়িতে আমরা দুটিমাত্র মানুষ। ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে পড়াশুনো করে, ছুটিছাটায় এখানে আসে। তাই, হঠাৎ এক-আধজন অতিথি এলে আমরা খুব খুশি হই।"

শ্রীযুক্ত ফুকন বললেন, "আবার আসবেন।"

গাড়ি যখন বাড়ির হাতায় মোড় ফিরছে, তখন পিছন ফিরে তাকালুম। দেখলুম, ফুকন-দম্পতি চুপ করে তাঁদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

পাটকাই পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডিগবয় পিছনে পড়ে রইল। গাড়ি এখন মোহনবাড়ির দিকে ছুটছে। হোলংহাবি চা-বাগানের পাশে গাড়িটাকে একটু দাঁড় করিয়ে রেখে বরুয়া-দম্পতির কাছে বিদায় নিতে গেলুম। বীরেন্দ্রনাথ তখন সদ্য তাঁর বাগানে একটা চক্কর দিয়ে বাংলোয় ফিরেছেন। বললুম, "দাঁড়াব না। যাবার আগে একবার দেখা করতে এসেছি। আবার কবে আসব, তার তো ঠিক নেই।"

বীরেন্দ্রনাথ আর প্রতিভা দেবী আমার সঙ্গে নীচে নেমে এলেন। বাগান থেকে দুটি রজনিগন্ধা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "আবার আসবেন।"

শ্রীযুক্ত ফুকন তাঁর সংগ্রহ থেকে দুর্লভ একটি অর্কিডের ফুল উপহার দিয়েছিলেন। তার পাশে রজনিগন্ধার ফুল দুটিকে যত্ন করে রাখলুম। বললুম, "চলি।"

ডিগবয় থেকে দুই তরুণ বন্ধু আমাকে মোহনবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে প্লেনে উঠলুম। মানুষ আর নিসর্গের প্রীতির স্মৃতিতে মন তখনও পরিপূর্ণ হয়ে আছে। ভাবছিলুম বীরেন্দ্রনাথ আর প্রতিভা দেবীর কথা। শ্রীযুক্ত ফুকন আর মীরা দেবীর কথা। রঞ্জিতকুমার আর নীতি দেবীর কথা। শ্রীযুক্ত বরঠাকুর আর তরুণ চক্রবর্তীর কথা। পূরবী, সুরভি, নওমি, মিমি—সকলেই যেন মনের জানালায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই জানালার ফ্রেমে তাঁদের সমবেত মুখচ্ছবিও ধরা পড়েছে, যাঁরা জানতে চেয়েছিলেন, কবিতার কাছে মানুষ কী পেতে পারে।

সত্যিই তো, কী পেতে পারে। কিছুদিন আগেই ক্যানিংয়ের এক সভায় গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সভার শেষে হলের বাইরে এসে সাইকেল-রিকশার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে সেই মেয়েটি এসে সসংকোচে বলল, "আপনাকে দেখতে এসেছিলুম। বছর দুয়েক আগে আপনার একটা কবিতা পড়ে খুব সান্ত্বনা পেয়েছিলুম কিনা, তাই।"

কথার শেষে মেয়েটি আর দাঁড়ায়নি। যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনই দ্রুত আবার চলে গেল। নিরাভরণ দুটি হাত, পরনে একটা আটপৌরে শাড়ি, সেই মেয়েটির ম্লান মুখ এখনও মাঝে-মাঝে আমার মনে পড়ে।

কবিতার কাছে সে সান্ত্বনা চায়। ডিগবয়ের মানুষদের মুখেও সেই একই কথা শুনলুম। কবিতা যেন মানুষের আনন্দের মুহূর্তে সমর্থন জানায়, শোকের মুহূর্তে সান্ত্বনা দেয়।

আমরা কি তা দিতে পারছি? মনে হচ্ছে, গোটা ব্যাপারটাকেই আবার নতুন করে ভাবতে হবে।

ভাদ্র ১৩৭৭

ভয়

মৃণাল বলেছিল, "কিচ্ছু ভাববেন না, নীরেনদা। স্টেশনে নেমেই আমি জামাইবাবুকে ফোন করব। ফোন পেলেই জামাইবাবু জিপ পাঠিয়ে দেবেন। ব্যাস, আটটার মধ্যেই আমরা অয়েল-টাউনে পৌঁছে যাচ্ছি।"

ট্রেন লেট ছিল। বারৌনি স্টেশনে যখন পৌঁছোলুম, তখনই রাত আটটা বাজে। মৃণাল ফোন করতে ছুটল। আমি মালপত্তর নিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলুম। মিনিট পঁচিশেক বাদে মৃণাল ফিরে এল। সঙ্গে কুলি।

"ফোন করা গেল না। ব্যাটারা বলে কিনা ভায়া পাটনা ট্রাংককল করতে হবে, তাও লাইন কখন মিলবে তার ঠিক নেই। চলুন, একটা সাইকেল-রিকশা নিয়ে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়া যাক।" বলেই কুলির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়ল, "এই কোলি, হাঁ করকে কেয়া দেখতা? মাল উঠাও।"

ট্রাংককলের কথা শুনেই সন্দেহ হয়েছিল। কুলির মাথায় হোল্ডঅল আর সুটকেসটা তুলে দিতে-দিতে আমি জিজ্ঞেস করলুম, "হ্যাঁরে মৃণাল, অয়েল-টাউন এখান থেকে কদ্দুর?"

"মেরেকেটে মাইল দুই।"

কুলি বলল, "দো মিল? আপ ক্যা পাগল হো গয়ে; অইল-টৌন যঁহাসে কম্‌সে-কম দশ মিল তো হোগাই। আপ্ বাস্‌মে যাইয়ে। ট্যাক্সি ভি মিল সকতা।"

ওভারব্রিজ পেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসতে-আসতে নটা বাজল। লাস্ট বাস তার অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। ট্যাক্সিও পাওয়া গেল না।

অনায়াসে আমরা স্টেশনে ফিরে যেতে পারতুম। রিটায়ারিং রুমে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে যদি বাসে উঠতুম, কিচ্ছু ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কী যে হল, সামনে দিয়ে একটা সাইকেল রিকশা যাচ্ছিল, হাত তুলে সেটাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "এই রিকশা, অয়েল-টাউন যাওগে?"

"জরুর।"

স্টেশন-এলাকা ছাড়িয়ে এসেই বুঝতে পারলুম, কাজটা ভালো করিনি। এতক্ষণ আলো জ্বলছিল, সরাইখানা আর পানের দোকানে রেডিয়ো বাজছিল। এখন চতুর্দিক

অন্ধকার, নিস্তব্ধ। এই অন্ধকারে দশ মাইল পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। ধারেকাছে বসতির চিহ্ন নেই। ঝিঁঝি ডাকছে, আকাশে চাঁদ ওঠেনি, মস্ত চওড়া ন্যাশনাল হাইওয়ে, তার দু-পাশে ঝাঁকড়া-মাথা আমগাছের সারি, তার তলায় অন্ধকার আরও জমাট বেঁধেছে, মৃণালের পকেটে শ-আড়াই টাকা।

ভালো করিনি। মোটেই ভালো করিনি। ট্রেনের মধ্যে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, "বিহারে এবারে কী যে খরা গেল মশাই, সে আপনারা ভাবতেও পারবেন না। ডাকাতি অসম্ভব বেড়ে গেছে। সাত চড়ে যারা অ্যাদ্দিন রা কাড়েনি, সেইসব চাষাভুষোরাও এখন বাগে পেলে কাউকে ছাড়ে না। অ্যান্ড ইউ কান্ট অ্যাকিউজ দেম। তাদেরও বাঁচতে হবে তো।"

নভেম্বর মাস। শীত পড়েছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরালুম। তারপর, রিকশাওয়ালাকে উদ্দেশ করে, যথাসম্ভব মিষ্টিগলায় বললুম, "সিগারেট পিওগে?"

"নেহি।"

সিগারেট খেতে ওর আপত্তি কেন? কালো কুচকুচে শরীর, গালের উপরে বিচ্ছিরি একটা ক্ষতচিহ্ন, প্রথম যখন লোকটিকে দেখি, আমার বিশেষ ভালো লাগেনি। এখন একটু-একটু করে ওকে আমার আরও খারাপ লাগতে লাগল।

মৃণাল বলল, "দ্যাখ্ বাবা, এই আমরা প্রথম এদিকে আসছি, পথ চিনে ঠিকমতো আমাদের পৌঁছে দিতে পারবি তো?"

ইংরেজিতে বললুম, "মৃণাল, ভুল করলি। এখানকার পথঘাট যে আমাদের জানা নেই, সেটা ওকে জানিয়ে দিয়ে ভালো করলি না।"

মৃণাল চুপ করে গেল। আমি দেখতে লাগলুম, এখানে-ওখানে, গাছের নীচে, দু-চারটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে আছে। কেন, আমি জানি না। ওদের সঙ্গে রিকশাওয়ালার ষড় নেই তো? হঠাৎ কোনো গাছের নীচে রিকশাটা দাঁড়িয়ে যাবে না তো? উলটো দিক থেকে, অনেকক্ষণ পর-পর, হেডলাইটে চোখ ধাঁধিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে আসছে এক-একটা মোটরগাড়ি। একবার মনে হল, চিৎকার করে ওদের একটাকে থামিয়ে দিই; বলি, "আমরা স্টেশনে ফিরে যাব। দয়া করে একটা লিফট দেবেন?"

বলা হল না। ট্রেনের সেই ভদ্রলোকের কথা আবার মনে পড়ল। "খরায় সব জ্বলে গেল মশাই। দিজ ভিলেজ-পিপ্‌ল, এমনিতে দেখবেন খুব শান্ত, চাষবাস করে, ঠ্যালা চালায়, রিকশা টানে, সাত চড়ে রা কাড়ে না। কিন্তু, দুর্ভিক্ষের সময়ে ডেনজারাস। পাঁচ গন্ডা পয়সার জন্যে এরা তখন ছুরি মারবে। অ্যান্ড ইউ কান্ট অ্যাকিউজ দেম।"

ভয়ে কাঠ হয়ে রিকশার মধ্যে বসে রইলুম।

কতক্ষণ বসেছিলুম, জানি না। সম্ভবত ঘণ্টা দুই। সম্ভবত তিন। দপ করে একটা মস্ত বড়ো মশাল হঠাৎ জ্বলে উঠল। অয়েল-টাউনে পৌঁছে গেছি।

রিকশা থামিয়ে, গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে, লোকটা বলল, "আব একঠো সিগরেট দিজিয়ে মালিক।"

যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে থেকে জেগে উঠলুম। সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললুম, "তখনই তো দিতে চেয়েছিলুম; নিলে না কেন?"

"তখুন যে ভয় করছিল।"

"ভয়? কাকে?"

একগাল হেসে লোকটা বলল, "আপলোগোঁসে। শহর থেকে যেসব আদমি লোক ইধারে আসে মালিক, আমরা তাদের বহোত ভয় পাই। পরশু-রোজ একঠো সওয়ারি লিয়েছিলুম। শহরকা আদমি। একলা পেয়ে উ হামার পয়সা ছিনিয়ে লিয়েছে। এহি রাস্তার উপর।"

অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

আমি চঞ্চল হে

ছুটিতে কখনও কলকাতায় থেকেছি বলে আমার মনে পড়ে না। ছেলেবেলায় তো না-ই। ঠাকুরদার কর্মজীবন কলকাতায় কেটেছে, কিন্তু তিনিও বলতেন, "আরে রাম রাম, শহরে আবার থাকা যায় নাকি? ওখানে ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে হয়, চাকরি-বাকরি করতে হয়, লেখাপড়া শিখতে হয়, কিন্তু থাকতে হয় না।" আমাদের গ্রামের বাড়ি পুব বাংলায়। পুজোর ছুটি শুরু হতে যখন দিন দশ-পনেরো বাকি, তখন সেখান থেকে ঠাকুমা আমাকে চিঠি দিতেন, "তোমার বাবা-মার হয়তো কেনাকাটা সারিয়া রওয়ানা হইতে দেরি হইবে, তুমি কিন্তু তাই বলিয়া দেরি করিয়ো না, ইশকুল ছুটি হইবামাত্র কাকাদের কাহারও সহিত চলিয়া আসিবে।"

পত্রপাঠ বই-খাতা-জামা-জুতো গুছিয়ে নিতুম, যাত্রার আগের দিন রাত্তিরে টেবিলঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতুম, ভোর না হতেই চাপা-গলায় ডাকতুম, "কাকুন।" কাকুন অর্থাৎ মেজোকাকা তখন কলেজের ছাত্র, ডাক শুনেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসতেন। মুখহাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতে মিনিট দশেক, তারপরেই খুড়ো-ভাইপো টিনের সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তুম। কলকাতার গলিতে গ্যাসের বাতি তখনও নেভেনি। সেই ভোর-রাত্তিরে আমরা দৌড় লাগাতুম শেয়ালদা ইস্টিশানের দিকে।

ফি ছুটিতেই যে গ্রামের বাড়িতে যেতুম, তা নয়। সেই ছেলেবেলাতেও বার তিন-চার পশ্চিমাস্য হয়ে হাওড়া ইস্টিশানে গিয়ে রেলগাড়িতে উঠেছি। তবে খুব দূরপাল্লায় কখনও যাইনি। সাঁওতাল পরগনায় যেতে বাবার দারুণ উৎসাহ। আমার বয়স তখন বছর তিনেক, সেইসময়ে তাঁর সঙ্গে একবার দেওঘরে গিয়েছিলুম। উঠোনে একটা আতাগাছ ছিল, দিদি সেই আতাগাছের নীচে রান্নাবাড়ি খেলত। হাতির পিঠে উঠেছিলুম, ত্রিকূটে গিয়েছিলুম, কাকুন আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে মোষবলি দেখাতে নিয়ে গেলেন, ফিরতি পথে অন্ধকারেই একটা গাছের মাথা তাক করে বাবা বন্দুক ছুড়লেন— এইসব টুকরো-টুকরো ছবি এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই।

প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে এই রকমের কিছু ছবি থাকে। বর্ষা ফুরুবার সঙ্গে

সঙ্গেই পুরোনো, পোকায়-কাটা ছবিগুলি যেন আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনে হতে থাকে, আর কেন, এইবার একদিন বাক্স গুছিয়ে বেডিং বেঁধে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়।

বেরিয়ে অনেকেই পড়েন। কেউ প্লেনে, কেউ মোটরে, কেউ ট্রেনে—শহর-কলকাতার 'পুজা একসোডাস' ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। যাঁদের সংগতি বেশি, তাঁরা দূরপাল্লায় পা বাড়ান; যাঁদের কম, কাছেপিঠেই কোনো চলনসই জায়গা তাঁদের খুঁজে নিতে হয়। এমন কোনো জায়গা, সকালে ট্রেনে চেপে বিকেলে, কিংবা রাত্তিরে ট্রেনে চেপে সকালেই যেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়, যেখানে বাড়ি-ভাড়া খুব বেশি নয়, জলহাওয়া মোটামুটি স্বাস্থ্যকর, এবং যেখানে ছোটোখাটো দু-চারটে পাহাড় এবং তিরতিরে একটা নদী আছে। ঝাঁঝা, মধুপুর, গিরিডি, শিমুলতলা ইত্যাদি সেদিক থেকে আদর্শ। প্লেনে করে হুশ করে হিল্লি-দিল্লি চলে যাবার সুযোগ যেকালে ছিল না, কলকাতার বহু বনেদি পরিবার তখন ছুটি কাটাবার জন্যে এসব জায়গায় বাড়ি করেছিলেন। প্রতিটি ছুটিতে গৃহকর্তার আগমন ঘটত, ফলে বছরে দু-চারবার ঝাড়পোঁছ হত। তারপর সময় পালটেছে। শখ করে যে-সব বাড়ি করা হয়েছিল, উত্তরপুরুষ সেসব বাড়িতে যায় না। কিছু-বা ভাড়া খাটে, কিছু-বা বারো মাসই তালাবন্ধ, কিছু-বা দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

তা যাকগে, মধ্যবিত্ত মানুষদের পক্ষে এসব জায়গা কিন্তু অদ্যাপি স্বর্গভূমি। দাম কি আর বাড়েনি? বেড়েছে। দুধে ভেজাল ঢুকেছে, ঘিয়ে বনস্পতি, হাটে যাবার পথে দেহাতি মানুষকে আটকে দিয়ে এসব জায়গাতেও আর আজকাল জলের দরে মুরগি কেনা যায় না। তা না যাক, সবজিটবজি এখনও কিন্তু মোটামুটি টাটকা মেলে, উপরন্তু প্রকৃতি আজও চল্লিশ বছর আগের মতোই সুন্দরী।

ছোটোনাগপুর আর সাঁওতাল পরগনা সত্যিই খুব দূর নয়। তার চাইতেও কাছে কিন্তু দিঘা। স্লিপারকোচে জায়গা পাবার জন্যে হাওড়ায় গিয়ে মাথা খুঁড়তে হবে না, কলকাতা থেকেই দিব্যি আরামে বাসে চেপে আজকাল দিঘা যাওয়া যাচ্ছে। টলটলে সমুদ্র, ছোটো-ছোটো ঢেউ, ঝাউবন, সমুদ্রের ধারে কালো ফিতের মতো রাস্তা, যে যা-ই বলুক, কয়েকটা দিন মহানন্দে সৈকতাবাসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

অনেকেই ইতিমধ্যে দিঘা কিংবা দার্জিলিং কিংবা দিল্লির পথে বেরিয়ে পড়েছেন, অনেকে হয়তো আজকালের মধ্যেই যাত্রা করবেন, অনেকে এখনও মনঃস্থির করতে পারেননি। তাঁরা চুপচাপ বসে-বসে টাইমটেবিলের পাতা ওলটাচ্ছেন। কিন্তু টাইমটেবিলের নাম শুনলেই আমি ভয় পাই। অনেক বই-ই আমি পড়তে পারি না; সবচাইতে কম পারি টাইমটেবিল। স্রেফ ওই বইখানির পাতা উলটে, নির্দেশ দেখে, হুট করে একটা স্টেশনে নেমে পড়ে তারপর সেখান থেকে করেসপনডিং ট্রেন

ধরে, কলকাতার মানুষ যে কীভাবে কইম্বাটুরে চলে যায়, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। আমার তো মনে হয়, ওর চাইতে সাপলুডোর সিঁড়ি টপকে মোক্ষে পৌঁছে যাওয়া অনেক সোজা।

কিন্তু মোক্ষে নয়, কাছেপিঠে কোথাও যাবার কথা হচ্ছিল। যেতে হলে, বাঁধাছাঁদা করতে হয়। ওই কাজটিতে আমার কাকুনের চাইতে এক্সপার্ট আর কাউকে এযাবৎ আমি দেখিনি। কোথাও যে যাওয়া হচ্ছে, এই কথাটি শোনবামাত্র তিনি রাজ্যের দড়ি আর খান চার-পাঁচ শতরঞ্চি জোগাড় করে ফেলতেন। তারপর বলতেন, "কী কী যাবে, নিয়ে আয়।" তাঁর বেডিংয়ের মধ্যে শুধুই লেপ-তোশক-চাদর-বালিশ থাকত না, জামা-জুতো-ঘটি-বাটি-বালতি-ছাতা, মায় আমার ক্রিকেট ব্যাট, ছোটো-কাকার গ্রে'জ অ্যানাটমি আর রান্নাঘরের শিলনোড়া পর্যন্ত অবলীলাক্রমে স্থান পেয়ে যেত। আমার ছোটো ভাই একবার বায়না ধরেছিল, তার ক্যারামবোর্ডটাকেও বেডিংয়ের মধ্যে ঢোকাতে হবে। কাকুন তাতে রাজি হননি। ঢোঁক গিলে, মাথা চুলকে বলেছিলেন, ক্যারামবোর্ড ঢোকাতে গেলে বেডিংয়ের শেপ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। "তার চেয়ে বরং তোর ট্রাইসাইকেলটা দে, ঢুকিয়ে দিচ্ছি।"

কাকুনের বেড়িংয়ের সাইজ হত পেল্লায়। আর্ট একজিবিশনে গিয়ে ওস্তাদ-সমালোচকেরা যেভাবে ছবি দেখেন, সেইভাবে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে, কাকুন তাঁর রচনাটিকে নিরীক্ষণ করতেন। মা বলতেন, "ও সুধা, বেডিং যা একখানা বেঁধেছিস, রেলের দরজা দিয়ে ঢুকবে তো?" একবার সত্যিই আটকে গিয়েছিল। ময়ূরভঞ্জ থেকে ফিরছি। রূপসা জংশনে গাড়ি পালটাতে হয়, ট্রেন সেখানে মিনিট দুয়েকের বেশি থামে না। উঠতে গিয়ে দেখা গেল, বেডিং আটকে যাচ্ছে। সে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে, প্ল্যাটফর্মের উপরে বেডিং খুলে, একটা বেডিংকে চটপট দুটো বানিয়ে শেষে রক্ষে পাওয়া যায়।

যেমন আমার মায়ের, তেমন কাকুনেরও ধারণা ছিল, কলকাতার বাইরে কিচ্ছু পাওয়া যায় না। একটা সংসার চালাবার জন্যে যা-কিছু দরকার, তার সবকিছু তিনি তাই সঙ্গে নিতেন। চাল, ডাল, তোলা উনুন, তেল, নুন, লকড়ি, কুঁজো, হাতপাখা, মায় পেরেক পর্যন্ত তিনি বাদ দিতেন না। নোড়া নিতেন দুটো। একটা দিয়ে মশলা বাটা হবে! আর-একটা দিয়ে মশারি টাঙাবার পেরেক পোঁতা হবে। ট্রাংকে তিনি এত রাজ্যের জিনিস ঢোকাতেন যে, তার ডালা কিছুতেই বন্ধ হতে চাইত না। আমরা ভাইবোনেরা তখন ডালার উপরে চেপে বসতুম। তাতেও যখন সুবিধে হত না, তখন টেবিলে উঠে ট্রাংকের উপরে কালীঝাঁপ খেতুম।

বাক্স-বেডিং গোছাবার পর্ব সারা হয়ে যাবার পর কাকুন বলতেন, "এবারে

তাহলে গাড়ি ডাকা যাক।” গাড়ি মানে ঘোড়ার গাড়ি। তাতে উঠতে-উঠতে মা বলতেন, “দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।” কলকাতার বাসায় তালা ঝুলিয়ে আমরা হাওড়া স্টেশনের দিকে যাত্রা করতুম।

যে যা-ই বলুক, বাহন হিসেবে রেলগাড়ির কোনো তুলনাই হয় না। টেলিগ্রাফের তারে লেজ ঝুলিয়ে পাখি বসে আছে, দূরের গাছপালা ছবির মতো স্থির, অথচ কাছের গাছগুলি পরিত্রাহি উলটো দিকে দৌড় লাগাচ্ছে, ব্রিজের উপর উঠতেই চাকার আওয়াজ পালটে গেল, এতক্ষণ ছিল ঝক-ঝক-ঝক-ঝক, এখন কেমন গমগম গম্ভীর আওয়াজ দিচ্ছে, লাইনের ধারে ফুটবল-ম্যাচ হচ্ছে, খানিক বাদেই সূর্য হঠাৎ বাঁশঝাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ল— এরোপ্লেনের সাধ্য নেই এসব দৃশ্য দেখায় কিংবা এসব শব্দ শোনায়। ট্রেনের দোলানিকেই বা প্লেনের মধ্যে পাই কী করে? মাঝ-রাত্তিরে কখনও চলন্ত ট্রেনের মধ্যে আপনার ঘুম ভেঙে গেছে? জানালা দিয়ে হুহু করে হাওয়া আসছে, মাঠের উপরে মরা জ্যোৎস্না, কামরার মধ্যে নীলচে ম্লান আলো। সেই আলোর মধ্যে দেখতে পাবেন, বাংক আর বেঞ্চে শয়ান কিংবা উপবিষ্ট প্রতিটি যাত্রীই অল্প-অল্প দুলছেন। নিদ্রিত সেই মানুষগুলিকে তখন, কী জানি কেন, খুব নিরীহ, শান্ত আর নিষ্পাপ বলে মনে হয়। মাঝরাত্তিরে কোনো ছোটোখাটো স্টেশনে যখন ট্রেন থামে, তখন ভারী আশ্চর্য লাগে। দিনমানে হয়তো খুব ভিড় ছিল, এখন প্ল্যাটফর্ম একেবারে খাঁখাঁ করছে, জলের কলের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছ, তার পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে, এত রাতে কেউ চা খাবে না, তবু মস্ত একটা কেটলি হাতে নিয়ে ভেন্ডার তার ঘুম-জড়ানো গম্ভীর গলায় শুনিয়ে দিয়ে গেল ‘চা গরম’, তারপরেই ঠং ঠং ঘণ্টা পড়ল, গার্ডের বাঁশি বাজল, ইঞ্জিন হুইসল দিল, যান্ত্রিক হাড়পাঁজরায় ঠোকাঠুকির শব্দ শোনা গেল, যেন খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ট্রেন আবার আড়মোড়া ভেঙে মাঠে নামল, তারপর আবার সেই ধুধু প্রান্তর, প্রান্তরের শেষে ছায়ার মতো পাহাড়, মরা নদীর চড়ায় চিকচিক বালি, জানলায় মুখ রেখে মনে হয় যেন এই সবকিছুই একেবারে অন্য জগতের ব্যাপার।

ছুটি এসে গেছে। এখন সেই অন্য জগতে যাবার সময়। আপনারা যান। আমি যেতে পারছি না। বাচ্চা-মেয়েটাকে বলেছিলুম, আতা সত্যিই ফিরিওয়ালার ঝুড়ির মধ্যে জন্মায় না, গাছে ফলে, এবারে তাকে জশিডিতে নিয়ে দেখিয়ে দেব। তার বদলে তাকে এখন ঠোঁটের সামনে আঙুল তুলে ক্রমাগত কানাডিয়ান ইঞ্জিনের হুউউউ হুইসল শোনাচ্ছি।

আশ্বিন ১৩৭৫

এই মাস কার্তিক

কাল অনেক রাতে যখন শুতে যাই, আশ্বিন তখনও বিদায় নেয়নি। জেগে উঠলুম কার্তিকের সকালে। বাংলা ক্যালেন্ডারের আর-একটা পৃষ্ঠা রাতারাতি খসে গেল; চোখ বুজে ডুব-সাঁতারে আমি এক মাস থেকে অন্য মাসে পৌঁছে গেছি। শুধু তাই নয়, এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে। আশ্বিনের সঙ্গে শরৎও সহমরণে গেছে। আজ হেমন্তের সূচনা।

হেমন্ত! ভাবতেই যেন বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। জীবনানন্দের কথা মনে পড়ে। 'যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে', 'হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে শুধু শিশিরের জল', 'হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার...', 'স্মৃতির হাড়ের মাঠে কার্তিকের শীতে' ইত্যাদি সব শোকাচ্ছন্ন ভূতগ্রস্ত লাইন এসে মাথার মধ্যে ভিড় করতে থাকে; এবং, কী জানি কেন, শরৎ যে ফুরিয়ে গেছে, এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই অকস্মাৎ আমার ভয় হয় যে, আজ হয়তো বিকেলের মুখ আরও তাড়াতাড়ি অন্ধকার হবে, ঝুপ করে সন্ধ্যা নামবে, এবং রাত্রির আকাশে জ্যোৎস্নার বাহার এত স্পষ্ট হয়ে ফুটবে না।

অথচ কে না জানে, শেষ-শরতের সঙ্গে প্রথম-হেমন্তের সত্যি কিছু তফাত নেই। থাকলেও যৎসামান্য। থিয়েটার হলের প্রথম শ্রেণির শেষ সারির আসনের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম সারির আসনের যেটুকু তফাত, শেষ-আশ্বিনের সঙ্গে প্রথম-কার্তিকের তফাত বস্তুত তার চাইতেও কম। চোখের সামনে ওই-যে শিউলি গাছটা, কাল ওর শরীর ফুঁড়ে যত ফুল ফুটেছিল, আজ কি তার চাইতে কম ফুটবে? দূর দূর, তাই কখনও হয়? মাথার উপরে ওই-যে আকাশ, হেমন্তের কুয়াশা কি আজ সন্ধ্যায় ওকে আড়াল করে দেবে? বিশ্বাস হয় না।

আসলে কথাটা এই যে, মোটামুটি সমান মাপে বছরটাকে আমরা যদিও ছয় ঋতু আর বারো মাসে ফালা-ফালা করেছি, প্রকৃতি আমাদের বিধান মানতে প্রায়ই রাজি হন না। অঙ্কের হিসেবে মাস ফুরোয়, তবু ভাদ্রের প্রথম প্রভাতে জেগে উঠেই আমরা বলতে পারি না যে, শারদ প্রাতে আমাদের রাত পোহাল। হেমন্তের এই জন্মলগ্নে সম্ভবত শরৎ-দিবসেরই জের চলবে। রোদ্দুর তেমনই ঝাঁঝালো থাকবে; আকাশ তেমনই নীল। কার্তিক এসেছে, তবু আশ্বিনের হাসি এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

আর তা ছাড়া হেমন্ত যে বিষাদের ঋতু, এবং কার্তিকেই যে সেই বিষণ্ণ সময়ের সূত্রপাত, এসব কথা আমরা পরে জেনেছি, সবাই তা-ই জানে, বালক-বয়সে কারও চোখেই সম্ভবত আশ্বিনে-কার্তিকে তিলমাত্র ফারাক থাকে না। যে বারে আশ্বিনে পুজো, সে বারে আশ্বিনই ভালো; যে বারে কার্তিকে, সে বারে কার্তিক।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। যতদূর তাকাই, শুধু জল আর জল; মাঝেমধ্যে গ্রামগুলিকে দ্বীপের মতো দেখাচ্ছে; রেল-স্টেশনের পাশেই নদী; বাবা-কাকা-দাদারা নৌকো কেরায়া করছেন; আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব নিরীক্ষণ করছি; চাপা গলায় মা বলছেন, 'ও সুধা, ভালো করে পাটাতন তুলে দেখে নে, রামদা-টামদা লুকিয়ে রেখেছে কি না।' কার্তিক মাসে, পুজোর ছুটিতে, আমরা দেশের বাড়িতে ফিরছি। রেলের পথ ফুরিয়ে গেছে, এখন জলপথে পঁচিশ-তিরিশ মাইল। নদী থেকে খালে ঢুকব, খাল থেকে আলপথে। মাঠ এখন জলের তলায়, ফলন্ত দিঘা-ধানের গাছগুলি মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্য দিয়ে আলপথে যখন তিন-মাল্লাই নৌকো চলবে, পাশের গ্রাম থেকে চাষিরা তখন হাঁকার দিয়ে বলবে, কে যায়? 'ধান যদি নষ্ট করছ তো জলের তলায় পুঁইতা ফালামু।'

নৌকোয় উঠবার আগে গঞ্জের দোকান থেকে চিঁড়ে, মুড়ি, গুড়, সবরিকলা, রসগোল্লা, মাটির হাঁড়ি, ইলিশ মাছ ইত্যাদি সব কেনা হত। পাটাতনের উপরেই উনুন সাজিয়ে মা চটপট রান্না চুকিয়ে ফেলতেন। ঝোলের মধ্যে মাটির হাঁড়ির গন্ধ পাওয়া যেত। কিন্তু, সত্যি বলতে কী, সেই গন্ধটাও খুব খারাপ লাগত না।

মাঝেমধ্যে যে ডাকাতি হত না, তা-ও নয়। প্রায়ই শুনতুম, পুজোর সময়ে অমুক গ্রামের তমুক বাবুরা দেশে ফিরছিলেন, শশার চকে ডাকাতরা তাদের সর্বস্ব লুঠে নিয়ে গেছে। আমাদের নৌকোয় অবশ্য কখনও ডাকাত পড়েনি। এমনকি দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে ছিপ-নৌকোয় ছুটে এসে সন্দেহজনকভাবে কেউ কখনও প্রশ্ন করেনি, 'ও মাঝিভাই, এট্টু আগুন দিবার পারো?' তবু নৌকোয় উঠেই মা বলতেন, 'মাঝি, সন্ধের আগেই কিন্তু শশার চক পাড়ি দেওয়া চাই।'

শুনে আমাদের ভয়-ভয় করত। তারপর আকাশ-ভরা ঝকঝকে রোদ্দুর, মাঠ-ভরা জল, জলের মধ্যে সাদা আর লাল শাপলা ইত্যাদি দেখতে-দেখতে, এবং দূরের-গ্রাম-থেকে-ভেসে-আসা ঢাকের আওয়াজ, চিলের চিৎকার আর জলের বুকে হালের মোচড়ের শব্দ শুনতে-শুনতে নৌকোর দোলানিতে আমরা ঘুমিয়ে পড়তুম। ঘুম ভাঙত সন্ধ্যার পরে। শশার চক যে কখন এল, কখন গেল, আমরা টেরও পেতুম না।

মাঝ-রাত্রে গ্রামে পৌঁছোতুম। লণ্ঠন হাতে নিয়ে পুকুর-পাড়ে ঠাকুমা দাঁড়িয়ে আছেন,— কার্তিকের ভাবনা মাথায় ঢুকলেই এই দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে

ভেসে ওঠে। এক বৃষ্টি নাকি আর-এক বৃষ্টিকে মনে পড়িয়ে দেয়, বাংলা দেশের কোনো লেখক বলেছেন। এক কার্তিকও ঠিক তেমনি করেই আর-এক কার্তিকের দৃশ্যাবলিকে স্পষ্ট করে তোলে।

কার্তিকের বুকে যে কোনো বেদনা নেই, তা-ও নয়। পুজো যে-বারে তাড়াতাড়ি আসে, কার্তিকের দিনগুলি সে-বারে সত্যিই বড়ো বিষণ্ণ। ঢাকের বাজনা, বিসর্জনের দিনে ভাসান দেখে বাড়িতে ফিরে প্রণাম করে নারকোলের নাড়ু পাওয়া, কোজাগরি নিশার জাগর কলধ্বনি, নদীতে নৌকোর বাইচ ইত্যাদি সব চুকেবুকে গেছে, বাতাসে আর ধূপধুনোর গন্ধ মেলে না, বারান্দা জুড়ে বড়োকাকিমা যে-আলপনা এঁকেছিলেন, তাও প্রায় মুছে এল, এখন যেন আর নতুন কোনো প্রাপ্তি নেই। মস্ত বড়ো উৎসবের পরেই মস্ত বড়ো অবসাদ। কার্তিকের চেহারায় সেই অবসাদের চিহ্ন ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। কালীপুজোর নিশুতি রাত্রি ঢাক আর কাড়ানাকাড়ায় ঘা দিয়ে, মনে হয় যেন, সেই অবসাদ মরিয়া হয়ে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথা। নদীর ধারে কাশের বন যে আর সত্যিই ততটা সাদা নেই, কেমন যেন ময়লা আর রোগাটে হয়ে গেছে, এই দৃশ্য দেখবার পরে কার্তিককে আরও বিষণ্ণ আরও বুড়ো বলে মনে হয়।

গ্রামে এইসময়ে বক-মারা আসত। সন্ধ্যার অন্ধকারে তেঁতুলগাছটায় যখন পাখপাখালির ভিড় জমেছে, আর নীচে দাঁড়িয়ে আমরা তাদের ডানা-ঝটপটানির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তখন মাথায়-ছুরি-আটকানো বিশ-পঁচিশ হাত লম্বা একটা আঁকশি হাতে নিয়ে শান্ত পায়ে এগিয়ে আসত সেই বাবরি-চুল মানুষটি। গাছতলায় দাঁড়িয়ে ঠান্ডা গলায় আমাদের জিজ্ঞেস করত, 'কী খোকাবাবু, বকের মাংস খাবি?' গাছ থেকে লোকে যেভাবে ফল পাড়ে, সেইভাবে সে পাখি পাড়ত। ঘুমের মধ্যে অতর্কিতে ছুরির খোঁচা খেয়ে একটা বক হঠাৎ টুপ করে গাছতলায় খসে পড়েছে, টকটকে লাল রক্তে তার সাদা বুক ভেসে গেছে, হেমন্ত-চিন্তার সঙ্গে এই দৃশ্যটির স্মৃতিও এখন অঙ্গাঙ্গী। ঈশ্বর জানেন, বক-মারা সেই মানুষটাকে আমরা, গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা, আদপেই পছন্দ করতুম না। তবু রোজ সন্ধ্যায় তার হত্যালীলা আমরা দেখতে যেতুম কেন? নিষ্ঠুরতাও কি তাহলে মানুষকে টানে?

সম্ভবত টানত। তারপর মন খারাপ হত। মন খারাপ করে দেবার আয়োজন তো একটি-দুটি নয়, অনেক। মাঠের বুকে কুয়াশা, চাঁদ উঠেছে, কিন্তু জ্যোৎস্নায় তেমন জোর নেই, তারাগুলো ধোঁয়ার আড়ালে ঢাকা পড়েছে, পুকুরের জলের উপরে সাদা একটা চাদর পাতা, জল দেখা যাচ্ছে না, দিদি গিয়ে প্রত্যেকটা ঘরের অন্ধকারকে একবার করে লণ্ঠনের মুখ দেখিয়ে আনল, টিনের চালের উপরে টুপটাপ হিম ঝরছে, একটানা ঝিঁঝি ডাকছে, উঠোনের কোণে বসে কুকুরটা সেই থেকে হিমের

বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছে, ইত্যাদি সব দৃশ্য এবং শব্দের সমন্বয়ে কার্তিক-রাত্রির যে-চেহারা তৈরি হত, তা খুব উজ্জ্বল নয়। যেন চারদিক থেকে হেমন্তের অন্ধকার এসে বিষণ্ণ মুখে আমাদের ঘিরে দাঁড়াত। আমরা গল্প-টল্প বলে আসর জমাবার চেষ্টা করতুম। কিন্তু খানিক বাদেই কথা ফুরিয়ে যেত। আমরা অবসন্ন বোধ করতুম। মনে হত, এই রাত কখনও ফুরোবে না।

শহরের কার্তিক অন্য রকমের। এমনকি, যে-কার্তিকের আগেই দুর্গাপুজোর ঢাকের কাঠি থেমে যায়, সেও ততটা বিষণ্ণ নয়। অফিস থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই সন্ধ্যা নামে ঠিকই, কিন্তু তার আগেই রাস্তার দুদিকে বাতি জ্বলে ওঠে। তাও বিজলি-আলো। আকাশটা অন্ধকার; কিন্তু রক্তচক্ষু নিয়নের ধমকে সেই অন্ধকারের বিষণ্ণতা নীচে নামতে সাহস পায় না, ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলতে থাকে।

শুধু শহরতলির বাস যখন উত্তরে শ্যামবাজার কিংবা দক্ষিণে গড়িয়া ছাড়িয়ে ছুটতে থাকে, জানালার-ধারে-বসা মানুষটি তখন দেখতে পান যে, কার্তিকের মাঠে কুয়াশা ক্রমেই ঘন হয়ে উঠেছে। হেমন্তের কুয়াশা।

কার্তিক ১৩৭৩

কল্পলোকের কাহিনি

এইমাত্র আমি এমন এক আশ্চর্য লোকালয় থেকে বেড়িয়ে এলুম, যার তুলনা, আমার বিশ্বাস, একমাত্র রূপকথাতেই মিলতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, তার পাহাড়গুলি ক্ষোয়াক্ষীর দিয়ে বানানো। না, তা নয়। বস্তুত তার আশেপাশে আদৌ কোনো পাহাড় নেই। পাহাড় না থাক, তার পাশ দিয়ে খুব চওড়া আর খুব সুন্দর একটি নদী বয়ে গেছে। কিন্তু সেই নদীটিতেও দুধের তরঙ্গ ওঠে না। তবু যে সেই শহরটিকে দেখে হঠাৎ রূপকথার লোকালয়ের সঙ্গে তার তুলনা টানতে ইচ্ছে করল, তার কারণ, এমন কিছু ব্যাপার সেখানে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, আমাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাকে মেলাতে পারছি না।

আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলুম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে নটা। অফিস-টাইম। সুতরাং স্টেশনে নেমে আমি ধরেই নিয়েছিলুম যে, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। অথচ, আশ্চর্য, স্টেশনের চৌহদ্দি পেরিয়ে রাস্তায় নামতেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সির মিটারটি লাল কাপড়ে ঢাকা থাকতে পারত। ছিল না। ট্যাক্সি-ড্রাইভার অনায়াসে আমাকে বলতে পারত যে, তার গাড়িটি ডিফেকটিভ, কিংবা সে গারাজে যাচ্ছে, কিংবা—আদৌ কোনো কারণ না-দেখিয়ে—সে আমাকে খুব রুক্ষ গলায় বলতে পারত যে, এখন কোনো যাত্রী নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বলেনি। আঙুল তুলে ইশারা করতেই সে আমার সামনে এসে গাড়ি থামাল, এবং দরজা খুলে দিয়ে বলল, "আসুন।" ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্যের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং আমি যে রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়েছিলুম, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

সে যা-ই হোক, চলমান ট্যাক্সিতে বসেই আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝতে পারলুম যে, বাসে কিংবা ট্রামেও স্বচ্ছন্দে যাওয়া চলত। যদিও তখন অফিস-টাইম, কিন্তু তাতে কী, ট্রামে-বাসে কেউ ঝুলতে-ঝুলতে যাচ্ছে এমন দেখা গেল না। বরং দেখতে পেলুম যে, এক-আধজন যাত্রী দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু অন্য-সবাই রীতিমতো উপবিষ্ট। রাস্তাঘাটও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ও ফাঁকা মনে হল। লোকজন আসছে-যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ভিড় নেই। কোনোরকম গুঁতোগুঁতি কিংবা হুড়োহুড়ি হচ্ছে না, কারও গায়ের সঙ্গে অন্য-কারও গা ঠেকে যাচ্ছে না, কেউ

দৌড়ে গিয়ে বাসে-ট্রামে উঠছে না, হাত দেখালেই বাস-ট্রাম থেমে যাচ্ছে। ব্যাপার দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম।

বিস্ময়ের আরও অনেক-কিছুই তখনও বাকি ছিল। এখানে তার কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করব।

শহরের এক ছবিঘরে তখন নামকরা একটা বই দেখানো হচ্ছিল। ভেবেছিলুম, সেদিনকার টিকিট পাওয়া যাবে না। কিন্তু গেল।

হল থেকে বেরিয়ে আসবার পরে মনে পড়ল, গজ-তিনেক আদ্দির কাপড় কিনতে হবে। কিনবার জন্যে একটা দোকানের সামনে গিয়ে হাজির হতেই, আশ্চর্য ব্যাপার, দোকানি-ভদ্রলোক দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে 'আসুন আসুন' বলে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। শুধু তা-ই নয়, আমার সামনে একপ্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বললেন, "বলুন কী চাই।"

সত্যি বলতে কী, সমাদরের বহরে আমি তখন রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করছি। ঢোঁক গিলে বললুম, "মাত্র তিন গজ আদ্দি চাই।"

আমি ভেবেছিলুম, এই কথা শুনেই দোকানি ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে যাবেন, এবং সিগারেটের প্যাকেটটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে নেবেন। কিন্তু তার বদলে তিনি একগাল হেসে বললেন, "এক্ষুনি দিচ্ছি।"

সওদা নিয়ে যখন দোকান থেকে বেরিয়ে আসছি, তখন তিনি আবার হাসলেন। এবং কণ্ঠস্বরে রীতিমতো মধু ঝরিয়ে বললেন, "আবার আসবেন স্যার। তিন গজ আদ্দি কেন, যদি মাত্তর তিন গিরে মার্কিন কাপড়েরও দরকার হয়, তাহলেও স্যার আমার দোকানেই আসবেন।"

দোকানিও যে হাসতে পারে, তা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। আমার মনে হল, বাস্তব জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে আমি কল্পরাজ্যে এসে হাজির হয়েছি।

পরদিন সকালেও সেই একই কাণ্ড। বাজারে গিয়ে দেখি, মাছওয়ালা, সবজিওয়ালা, ফলওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকের মুখে হাসি লেগে আছে। খদ্দেরকে দেখে প্রত্যেকেই বলছে, "আসুন, আসুন, বলুন কী চাই।"

চাই তো মাত্র আধ সের মাছ। কিন্তু মাছের বাজারে ঢুকে সে কথা জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কেউ দেখলুম বিশেষ বেজার হচ্ছে না। বরং প্রত্যেকেই আমাকে ডেকে বলছে, "আমার এখানে মাছ নিন বাবু, খুব টাটকা মাছ।"

এবং প্রত্যেকেই হাসছে। যার কাছ থেকে আধ সের মাছ কিনলুম, তার মুখে হাসি; আবার যার কাছ থেকে এক ছটাক কাঁচালংকা কিনলুম, তার মুখেও হাসি। কারও মুখ গম্ভীর নয়; খদ্দের দেখে, দোকানিদের পক্ষে যা খুবই স্বাভাবিক, কেউই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না।

নেহাতই ঘুরবার জন্যে আমি এই শহরে গিয়েছিলুম। কিন্তু ব্যাপার দেখে মনে হল, থেকে যাই। কিন্তু স্থায়ীভাবে থাকতে হলে একটা বাড়ি দরকার। এবং, কে না

জানে, অন্তত মাস তিনেক হাঁটাহাঁটি না করলে, কিংবা জনাকয়েক দালাল না লাগালে, কিংবা হাজার কয়েক টাকা সেলামি দিতে না পারলে কোনো শহরে, বাড়ি পাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ি যে একটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে— এই আশাটা পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

অথচ আশ্চর্য, মাত্র আধ ঘণ্টার চেষ্টাতেই সেই আশ্চর্য শহরে, মাত্র একটা নয়, তিন-তিনটে বাড়ি আমি পেয়ে গেলুম। তখন সমস্যা দেখা দিল, কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা রাখি। প্রথমটার দক্ষিণদিক একেবারে খোলা; দ্বিতীয়টায়— দক্ষিণদিক যদিও খোলা নয়— প্রতিটি ঘরেই আলো আসে; তৃতীয়টায় ঘরের সংখ্যা বেশি। ভাড়াও দেখলুম তিনটিরই মোটামুটি সস্তা। তদুপরি প্রতিটি বাড়ির মালিকই রীতিমত বিনীত কণ্ঠে জানালেন যে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে ভাড়া তাঁরা আরও কিছু কমাতে রাজি আছেন।

তখন আমার সন্দেহ হল যে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু-একটা চালাকি আছে। ভাড়া এঁরা কমাতে চাইছেন বটে, কিন্তু সেলামি হিসেবে সম্ভবত মোটা টাকা দাবি করে বসবেন। কার্যত দেখা গেল যে, তাও নয়। বরং আমিই যখন সেলামির কথা তুললুম, তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "সেলামি! সে আবার কী! অমন কোনো কথা তো আমরা কখনও শুনিনি।"

অতঃপর তিনজন বাড়িওয়ালাই আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন, এবং তিনজনেই আমাকে নানা রকমের লোভ দেখাতে শুরু করলেন।

প্রথমজন বললেন, "আমার টেলিফোন আছে। আপনি সেটি যখন-ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারবেন। তার জন্যে আমি আলাদা কিছু চার্জ করব না।"

দ্বিতীয়জন বললেন, "আমার টেলিফোন নেই। কিন্তু আমার ভাই ডাক্তার। ঈশ্বর না করুন, আপনাদের বাড়িতে যদি কারও অসুখবিসুখ হয়, তাহলে বিনা পয়সায় আমার ভাই-ই তার চিকিৎসা করবে।"

তৃতীয়জন বললেন, "আমার টেলিফোন নেই, এবং আমার ভাই ডাক্তার নয়। কিন্তু আমার গিন্নি খুব চমৎকার কই-পাতুরি রান্না করেন। মাঝে-মাঝেই সেই রান্না আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। তা ছাড়া, ডাকঘর, বাজার আর ইস্কুল আমার বাড়ি থেকে দু-মিনিটের রাস্তা। সুতরাং আপনি আমার বাড়িটিই নিন।"

ইস্কুলের কথায় আমি উৎসাহ বোধ করলুম। কিন্তু শুধু ইস্কুল থাকাটাই যথেষ্ট নয়, সেখানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য একখানি সিট পাওয়া দরকার। এবং আমি যতদূর জানি, বড়ো-বড়ো শহরগুলিতে বড়ো-বড়ো অনেক ইস্কুল থাকে বটে, কিন্তু সুপারিশের জোর না-থাকলে তার একটাতে সিট পাওয়া যায় না।

সুতরাং ভয়ে-ভয়ে আমি প্রশ্ন করলুম, "ইস্কুল তো আছে, কিন্তু সেখানে সিট পাওয়া যাবে তো?"

শুনে আমার বাড়িওয়ালা বললেন, "নিশ্চয়ই যাবে। ছাত্র পেলে তো তারা বর্তে যায়।"

উত্তর শুনে আমার মুখে আর কোনো কথা সরল না।

পাঠক, বিশ্বাস করুন, এই রচনার সূত্রপাতে আমি রূপকথার তুলনা টেনেছি বটে, কিন্তু সত্যিই তাই বলে আমি কল্পলোকের কাহিনি শোনাতে বসিনি। আমি এই বাস্তব জগতেরই একটি শহরের কথা বলছি। এবং সেই শহর এই কলকাতা শহর। তবে কিনা, আজকের কলকাতা নয়, পঁচিশ বছর আগের কলকাতা। এইমাত্র মনে-মনে আমি পঁচিশ বছর আগের কলকাতা থেকে বেড়িয়ে এলুম।

কলকাতায় এখন দরকারের সময় ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। তখন যেত। কলকাতার ট্রামে-বাসে যাত্রীরা এখন ঝুলতে-ঝুলতে যায়। তখন যেত না। কলকাতার সিনেমা-হলে টিকিট কাটা এখন একটা গলদ্‌ঘর্ম ব্যাপার। তখন যে-কোনো সময়ে যে-কোনো ছবিঘরে গিয়ে টিকিট পাওয়া যেত। কলকাতার দোকানিরা এখন খদ্দেরদের সঙ্গে হেসে কথা বলেন না। তখন বলতেন। কলকাতার মাছের বাজারে এখন লাইন লাগাতে হয়, এবং লাইন লাগিয়েও মাছ পাওয়া যায় না। তখন লাইন লাগাতে হত না, এবং না লাগিয়েও মাছ পাওয়া যেত। কলকাতায় এখন খালি বাড়ি নেই, সেলামি আছে। তখন খালি বাড়ি প্রচুর ছিল, এবং সেলামি ছিল না। কলকাতার ইস্কুলে এখন সিট পাওয়া যায় না। তখন যেত।

মাত্র পঁচিশ বছর। তারই মধ্যে একটি শহরের ছবি একেবারে আমূল পালটে গিয়েছে। কেন গিয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে অনেক কথা বলবেন। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, বলাই বাহুল্য, এই পরিবর্তনের একটি প্রধান হেতু। তদুপরি লোকের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। তা ছাড়া আছে চাহিদা আর জোগানের অসামঞ্জস্য। জোগানও ইতিমধ্যে বেড়েছে বটে, কিন্তু চাহিদার অনুপাতে বাড়েনি। হেতু নিশ্চয়ই আরও অনেক আছে। আর সেইসমস্ত হেতুর নিট যোগফল এই দাঁড়িয়েছে যে, মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে কলকাতা রূপান্তরিত হয়েছে— অর্থনীতিকের ভাষায়— বৃহৎ একটি সেলারস্' মার্কেটে।

কিন্তু আমি বিক্রেতা নই, আমি ক্রেতা। সুতরাং আমি বায়ারস্' মার্কেটের পক্ষপাতী। এমন একটা অবস্থাই আমার ভালো লাগে, দোকানিরা যেখানে খদ্দের পেলে খুশি হন, এবং জিনিসপত্র বিক্রি করবার সময়ে এমন ভাব দেখান না যে, জনহিতার্থে নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই তাঁরা দোকান খুলেছেন।

সুতরাং, বাধ্য হয়েই, স্মৃতির সেতু বেয়ে আমাকে পঁচিশ বছর আগেকার সেই কলকাতায় মাঝে-মাঝে ফিরে যেতে হয়।

মাঘ ১৩৭২

8

নিরঞ্জন মজুমদার

নিরঞ্জন মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয়ের বয়স পঁচিশ পেরিয়ে গেছে। চৌরঙ্গি টেরাসে গোপাল ঘোষের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছিল। দেবরঞ্জন, নিরঞ্জনের ভাই, সেইখানে তাঁর দাদার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন। ছোটোখাটো, ছটফটে মানুষ, বুদ্ধিতে-মাজা কথাবার্তা, হাতে একগাদা বই, পুরু লেন্সের চশমা, প্রথম দর্শনেই নিরঞ্জনকে আমার ভালো লেগে যায়। কিন্তু নিরঞ্জন আমাকে বিশেষ পাত্তা দেননি। গোপাল ঘোষ আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন; আমার সঙ্গে কথা বন্ধ রেখে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'ছবিতে এবারে খুব সোনা আর সবুজ ঢেলেছেন দেখছি।'

নিরঞ্জনের বয়স তখনও তিরিশ হয়নি, কিন্তু তখনই তিনি, চলতি অর্থে, সফল মানুষ। একে তো আকাশবাণীর দুর্দান্ত ভাষ্যকার 'নাইরঞ্জন' মজুমদারকে তখন সবাই চিনত, তার উপরে তিনি তখন *ক্যাপিটাল* পত্রিকার ম্যানেজার। সর্বোপরি, তিনি *শীতে উপেক্ষিতা*-র লেখক। বইখানি তখন সদ্য বেরিয়েছে, এবং হুড়মুড় করে বিক্রি হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এ হল সেই সময়কার কথা, বছর ঘুরবার আগে কোনো বইয়ের হাজার কপি বিক্রি হয়ে যাওয়া যখন চমকপ্রদ ঘটনা বলে গণ্য হত। সেই অবস্থায় প্রথম চমক লাগায় *দৃষ্টিপাত* । দ্বিতীয় চমক আনে *শীতে উপেক্ষিতা* । বোঝাই যাচ্ছিল যে, বাঙালি পাঠক নতুন স্বাদের খাদ্যের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন। যাযাবর ও রঞ্জন সেই নতুন স্বাদের জোগান দিলেন।

অনেকে ভেবেছিলেন, এই দুই ছদ্মনাম আসলে একই লেখকের। গ্রন্থপ্রকাশের আগে নিরঞ্জনও সম্ভবত আঁচ করেছিলেন যে, এমনতরো একটা ভ্রান্তি ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। সম্ভাব্য ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা ছিল *শীতে উপেক্ষিতা*-র ভূমিকায়। উপরন্তু কিছুটা দম্ভও ছিল। যতদূর মনে পড়ছে বিখ্যাত এক বিদেশি লেখকের মন্তব্য উদ্ধার করে নিরঞ্জন সেখানে যা বলেছিলেন, তার মোদ্দা কথাটা এই যে, লোকে বরং তাঁর লেখাকে যাযাবরের লেখা বলে ভুল করুক, কিন্তু যাযাবরের লেখাকে কেউ যেন না তাঁর লেখা বলে ভাবে। এই দম্ভ নিরঞ্জনের সহজাত কি না জানি না। তবে চৌরঙ্গি টেরাসের এই প্রদর্শনীতে যখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখনই তাঁর কথায় ও আচরণে বেশ-কিছুটা অহংকার আমি ফুটতে দেখি। আমি তাঁকে একটা প্রশ্ন করেছিলুম। কিন্তু গোপাল ঘোষের সঙ্গে কথা শেষ

করে, আমার দিকে দৃকপাত না করে, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমি তাতে বিস্মিত হইনি। বস্তুত, *ক্যাপিটাল* পত্রিকার প্রথম ভারতীয় ম্যানেজার যে একজন উঠতি-পদ্যকারকে বিশেষ পাত্তা দেবেন না,— এই ব্যাপারটাকে আমি খুবই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিলুম।

পরে বুঝতে পারি, অহংকার তাঁর বর্ম মাত্র, যার আড়ালে খুবই নরম মনের একটি মানুষ নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। যে-মানুষটি অন্যকে ভালোবাসতে চান, এবং অন্যের ভালোবাসা পেলে খুশি হন। তাঁর সাহেবিয়ানাও আসলে আত্মরক্ষার বর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। যার আড়ালে একজন বিশুদ্ধ বাঙালি আত্মগোপন করে আছেন। যিনি সুট-বুট পরেন বটে, কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবিতে নিজেকে মুড়ে না নিয়ে নিমন্ত্রণ-বাড়িতে যেতে চান না। যিনি লেখায় এবং আলাপচারিতে ইংরেজির খই ফোটান বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার সঙ্গে গাঁটছড়া ছেঁড়ার কথা ভাবতে পারেন না। যিনি ষোলো-আনা সাহেব হবার স্বপ্ন দেখেন বটে, কিন্তু চাঁদপুরের স্মৃতিতে এখনও মগ্ন হয়ে আছেন।

নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাঁর ল্যান্সডাউন টেরাসের বাড়িতে। হিমালয় সম্পর্কে কয়েকটা বইয়ের দরকার হয়েছিল। অন্যত্র সন্ধান না পেয়ে তাঁকে ফোন করি। তিনি বলেন, "এখুনি চলে আসুন।" গিয়ে, বইয়ের সঙ্গে তাঁকেও কিছুটা পেয়ে যাই। এমন কথা বলব না যে, আমি তাঁর বন্ধুতা পেয়েছিলুম। বস্তুত, একমাত্র তাঁর মা ছাড়া আর কেউ যে তাঁর ষোলো আনা বন্ধুতা পেয়েছিলেন, এমন কথা কখনও আমার মনে হয়নি। আসলে এমন একটা বৃত্তের মধ্যে নিজেকে তিনি আবদ্ধ রেখেছিলেন, যেখানে সত্য-অর্থে কেউ কখনও কারও বন্ধু হয় না, প্রতিযোগিতার একটা ভাব সর্বদা জেগেই থাকে। তবে, স্নেহমিশ্রিত কিছুটা ভালোবাসা এবং অনেকখানি আগ্রহ পেয়েছিলুম অবশ্যই। পরে— তিনি যখন আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানে এসে যোগ দেন, তখন— আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে। মনে পড়ে, দিল্লির *হিন্দুস্থান টাইমস*-এ আমার একটি লেখা প্রকাশিত হবার পর, *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড*-এর জন্য তিনি আমাকে দিয়ে বেশ-কিছু সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও সমালোচনা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। নিজে তিনি *দেশ*, *হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড* ও *আনন্দবাজার পত্রিকা*, তিন কাগজেই লিখতেন। একবার তাঁর এক নিবন্ধে একটি প্রমাদ ঘটে যায়। লেখাটি *আনন্দবাজার*-এ বার হয়েছিল। তাতে, প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের গল্প 'জীবিত ও মৃত'-এর তিনি উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু, গল্পের নায়িকার নাম লিখতে গিয়ে, কাদম্বিনীর বদলে, ভুল করে লিখেছিলেন সৌদামিনী। ভুলটা ধরা পড়বার পরে নিরঞ্জন আবার দ্বিতীয় একটি নিবন্ধ লিখলেন, এবং তাতে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, ভুলটা কেন হয়েছিল। দুটি লেখা পড়েই আমরা খুব মজা পাই।

১৯৫৮ সালে হঠাৎ তিনি *স্টেটসম্যান*-এ চলে যান। কিন্তু *আনন্দবাজার*-এর সঙ্গো তাঁর হার্দ্য সম্পর্কে তাতে ভাটা পড়েনি। আমাদের কয়েকজনের সঙ্গোও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করা চলতেন। এমনিতে যে খুব দেখাসাক্ষাৎ হত, তা নয়। কিন্তু ফোনে প্রায়ই কথা হত। মনে হত, তিনি খুব সুখে নেই। কোনো একটা কষ্টের কাঁটা কোথাও খচখচ করছে। কষ্ট কি এইজন্য যে, সাহিত্যের মূল ধারা থেকে ইতিমধ্যে তিনি সরে গিয়েছিলেন? কষ্ট কি এইজন্য যে, এমন সমস্ত রচনাতেই তাঁর যাবতীয় উদ্যম ইদানীং ফতুর হয়ে যাচ্ছিল, যার আয়ু নেহাতই একদিন কি দুদিনের? উত্তরটা আমার জানা নেই। কিন্তু যদি শুনি যে, আটচল্লিশের সেই রঞ্জনের স্মৃতি পঁচাত্তরের এই নিরঞ্জনকে মাঝে-মাঝে উন্মনা করে তুলত, তবে আমি বিস্মিত হব না।

কে জানে, হয়তো সেই কারণেই 'রঞ্জন' নামে আবার নতুন করে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু যে-কারণে তাঁর জনপ্রিয়তা, নিরঞ্জনের ভাষার সেই খরশান দীপ্তি যে ইতিমধ্যে অনেকটাই নিভে এসেছিল, তাও স্বীকার্য। প্রসাদগুণের বদলে এসেছিল কাঠিন্য। লাবণ্যের বদলে এসেছিল এমন এক ধরনের দুরূহতা, পাঠককে যা কাছে না টেনে দূরে সরিয়ে দেয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যরীতি যে তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত, তা আমরা জানতুম। কিন্তু সেই গদ্য যে শ্রদ্ধারই সামগ্রী মাত্র, অনুসরণের যোগ্য নয়, রঞ্জন তা জানতেন না।

কিংবা, জেনেও হয়তো এই কারণে তিনি দুরূহতার পথে পা বাড়িয়ে দেন যে, অতিসারল্যকে তিনি অশিক্ষার সহোদর বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন; ফলত, জনপ্রিয়তা— একদা যা তিনি অক্লেশে অর্জন করেছিলেন— খোয়াবার ঝুঁকি নিয়েও দুর্গমের যাত্রী হতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রঞ্জনকে সেই প্রাচীনকালীন রাজাদেরই সগোত্র বলে মনে হয়, সত্যরক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগেও যাঁদের কুণ্ঠা হত না।

আমি অবশ্য রঞ্জনের ততটা অনুরাগী নই, যতটা নিরঞ্জনের। রঞ্জন যা রচনা করতেন, অনেকক্ষেত্রেই তা—রঞ্জনকেই নকল করে বলি—আমার চায়ের পেয়ালা নয়। কিন্তু নিরঞ্জনকে আমি ভালোবেসেছিলুম। তার অন্যতম কারণ এই যে, তিনি নিয়ম মেনে খেলতেন। তিনি আঘাত করতে ভালোবাসতেন, এবং প্রত্যাঘাতে মুষড়ে পড়তেন না। তিনি সমালোচককে শত্রু বলে গণ্য করতেন না, এবং প্রশস্তিবাচককে সন্দেহ করতেন। অধিকাংশ মানুষই তো চল্‌তি হওয়ার পন্থী। নিরঞ্জন সে-ক্ষেত্রে বিশ্বাস করতেন, যিনি বুদ্ধিজীবী, চলতি স্রোতের বিরুদ্ধে তাঁর সাঁতার কাটাই চাই, তা নইলে তাঁর ধর্মরক্ষা হয় না।

এমন মানুষের সংখ্যা কোনো কালেই খুব বেশি ছিল না। এখন আরও কমে আসছে।

পৌষ ১৩৮২

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেনদা একেবারে অকস্মাৎ চলে গেলেন। পরিবারের কর্তা হিসেবে তাঁর অনেকরকম কাজকর্ম যে বাকি পড়ে ছিল, তা অবশ্য নয়। কিন্তু লেখক হিসেবে আরও অজস্র উপহার দেবার ছিল। তিনি তো ফুরিয়ে-যাওয়া শিল্পী নন, জীবন্ত জিজ্ঞাসু কথাকার। এই সেদিনই *দেশ* পত্রিকার সাহিত্য-সংখ্যায় নিজের জীবন ও কাজের বিষয়ে যা লিখেছিলেন, তাতেও এ-কথার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। সন্দেহ নেই যে, আরও অনেকদিন ধরে তাঁর চারপাশের জীবনযাত্রাকে তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে পারতেন, এবং গল্প-উপন্যাসে তার ছবি ফোটাতে পারতেন। দেখবার আগ্রহ একটুও কমেনি, লিখবার ক্ষমতা ষোলো আনা অটুট ছিল, মৃত্যুর আগের দিনও নাকি বলেছিলেন যে, খুচরো লেখায় আর সময় নষ্ট করবেন না, এবারে খুব যত্ন করে ও খুব সুন্দর করে একখানা উপন্যাস লিখবেন।

লিখে যাবার সময় পেলেন না, কাজ অসমাপ্ত রইল, কিন্তু তার জন্যে আক্ষেপ না করে বরং জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় যে, যা তিনি লিখেছেন, তারই বা কোনো ব্যাপ্ত সমাদর কিংবা যথার্থ মূল্যায়ন হল কোথায়? পাঠকসমাজ লেবেনচুষের দিকে ঝুঁকেছেন, সমালোচকেরাও মৃত লেখকদের শবব্যবচ্ছেদে যতটা উৎসাহী, জীবন্ত লেখকদের চরিত্র বিচারে ততটা নয়। তার ফল যা হবার তা-ই হয়েছে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র কিছুটা নেপথ্যেই রয়ে গেলেন। অথচ, তরুণ লেখকদের মধ্যে এককালে যে তিনি দারুণ সাড়া জাগিয়েছিলেন, তাও ঠিক। সেই দিনগুলির কথা অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে, যখন *দেশ* পত্রিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'হরিবংশ' ধারাবাহিক ভাবে বার হচ্ছিল, কিংবা যখন তাঁর গোড়ার দিকের গল্পগ্রন্থ *অসমতল* আর *হলদে বাড়ি* তাঁদের হাতে এসে পৌছোয়। নরেন্দ্রনাথ নিজেও তখন তরুণবয়সি, এবং তরুণতর মহলে তাঁকে নিয়ে তখন শোরগোলের অন্ত ছিল না। মির্জাপুর স্ট্রিটের চায়ের দোকানের আড্ডাগুলিতে তাঁকে কেন্দ্র করে তখন দিনের পর দিন তর্ক চলেছে। প্রবীণদেরও অনেকে সেদিন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এই একজন নতুন লেখকের সন্ধান পাওয়া গেল, নতুন পথে যিনি আবার বাংলা কথাসাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবেন।

ঘুরিয়েছিলেন ঠিকই, এবং— তাঁর চেয়েও যেটা বড়ো কথা— ঘুরিয়েছিলেন খুব স্বাভাবিকভাবে। আসলে এইসব 'মোড় ঘোরাবার' ঘটনার মধ্যে তো অনেক ক্ষেত্রেই অনেক গিমিক, অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপার থেকে যায়, নরেনদার ক্ষেত্রে সেটা আদপেই ছিল না। তাঁর লেখায় যেমন কোনো জনতোষিণী প্রতিশ্রুতি নেই, তেমনই কোনো কিম্ভূত কল্পনাও নেই। মনে হয়, এই রকমের একটা বিশ্বাস খুবই সংগোপনে তিনি লালন করতেন যে, যা স্বাভাবিক, তা-ই সত্য। সেই সত্যের বাইরে তিনি কখনও পা বাড়ানিনি।

এই কথাটা এত সহজে বলতে পারলুম এই কারণে যে, নরেনদাকে আমি চল্লিশ বছর ধরে চিনি। পুব বাংলার যে-গ্রামে আমার জন্ম, নরেনদার গ্রাম তার থেকে মাত্রই মাইল-তিনেক দূরে। ফলে তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক গল্পের মানুষ আর পরিবেশকে খুব সহজে আমি শনাক্ত করতে পারি। তিনি যখন কলকাতায় বি.এ. পড়তে আসেন, তখন আমি ইস্কুলের ছাত্র। আমার পিতৃদেব ছিলেন তাঁর অধ্যাপক, উপরন্তু আমার এক পিতৃব্য ছিলেন তাঁর সহপাঠী। সেই সূত্রে প্রায়ই তিনি আমাদের কলকাতার বাসায় আসতেন। তখন তাঁকে দেখেছি। পরে দেখেছি তাঁর নারকেলডাঙা, লিনটন স্ট্রিট আর পাইকপাড়ার বাড়িতে। তাঁর দরিদ্র অবস্থাতেও তাঁকে দেখেছি, আবার সচ্ছল অবস্থাতেও তাঁকে দেখেছি। দেখেছি ট্রেনে, প্রবাসে, পার্কে, বাজারে, আড্ডায়। প্রতিবেশী আর সহকর্মী হিসেবেই কি তাঁকে কম দেখলুম? বস্তুত, এতবার করে এত জায়গায় দেখেছি বলেই জানি যে, যা স্বাভাবিক নয়, তার প্রতি কোনো আকর্ষণই তাঁর ছিল না।

লাজুক স্বভাবের মানুষ ছিলেন, বন্ধুমহলেও বিশেষ মুখ খুলতেন না, মুখ খুললেও কথা অনেকসময়ে আটকে যেত। *অভিবাদন* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে একটি অন্তরঙ্গ আড্ডা গড়ে উঠেছিল, সেখানেও তাঁকে ক্বচিৎ মুখ খুলতে দেখেছি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তো বিদায় নিয়েছেন, সন্তোষ-কুমার ঘোষ আর নবেন্দু ঘোষ যদি সেই আড্ডার কথা কখনও বিস্তারিত লেখেন, তাহলে নরেনদার একটা স্পষ্ট ছবি তাতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে-কথা থাক। মুখচোরা মানুষ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে যে তাঁর কৌতূহল কারও চেয়ে কিছু কম ছিল, তা নয়। যাঁরা তাঁর চেনা-মহলের মানুষ, তাঁদের অনেকেই এই কৌতূহলের খবর রাখতেন, এবং এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টাও নেহাত কম করতেন না। তবে সবাই জানতেন যে, এই কৌতূহল আসলে লেখকেরই কৌতূহল। বস্তুত, সেই কারণেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরমুহূর্তেই অনেকে অনুরোধ করতেন, "দেখবেন, এসব যেন আবার লেখার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন না।" অনুরোধের কারণ

ছিল। নরেনদার অনেক লেখার মধ্যেই অনেক চেনা মানুষের চিত্র ফুটেছে, এবং তাই নিয়ে তাঁদের অস্বস্তিও নেহাত কম ঘটেনি।

এ-ব্যাপারে এক বন্ধু একবার অনুযোগ করেছিলেন। এমনভাবে চেনা মানুষের ছবি আঁকা, এ কি ভালো? তাতে তিনি বললেন, "আমার কোন্ চরিত্রটাই বা তোমাদের অচেনা?" যদি বলি, প্রশ্নচ্ছলে এই-যে জবাব তিনি দিয়েছিলেন, তাঁর সাহিত্যের একেবারে মূলকথাটি এর মধ্যে রয়ে গেছে, তাহলে নিশ্চয় ভুল বলা হবে না। নাম-ঠিকানা যা-ই হোক, তাঁর আঁকা সব চরিত্রই আমাদের চেনা চরিত্র। একদিকে চাষি গেরস্ত, অন্যদিকে শিক্ষক-অধ্যাপক-দোকানি-কেরানি ইত্যাদি নিম্ন আর মধ্যবিত্ত মানুষ, শুধু এঁদেরই তিনি চিনতেন। চিনি আমরাও। সেই কারণেই তাঁর চরিত্রগুলিকে এত সহজে আমরা শনাক্ত করতে পারি।

এই-যে চেনামহল, এর বাইরে পা বাড়াবার শক্তি তাঁর অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইচ্ছা ছিল না বিন্দুমাত্র। মহারাষ্ট্রের পথে-পথে একবার তাঁর সঙ্গে দিনকয়েক খুব ঘুরেছিলুম। সেইসময়ে এক পাহাড়িয়া পথে বাসে যেতে-যেতে নরেনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "ওই যে মারাঠি চাষিরা ঘাম ঝরিয়ে খেতের কাজ করছে, ওদের নিয়ে আপনার লিখতে ইচ্ছে করে না?" উত্তরে নরেনদা বললেন, "করে বই-কি। কিন্তু কী করে লিখব? ওদের আমি চিনি না যে!"

যাকে নিয়ে লেখা, তাকে চিনতে হবে, তা নইলে তাকে নিয়ে লেখা যাবে না। খুবই সহজ কথা। কিন্তু চতুর্দিকে যখন গিমিকের ছড়াছড়ি, তখন এই সহজ কথাটাই বা কজন বোঝে।

ভাদ্র ১৩৮২

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল বিকেলে খুব প্রবলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। রাত্তিরে কিন্তু আকাশ জুড়ে অগুনতি তারা উঠল। আজ সকালেও সেই একই দৃশ্য। টলটলে রোদ্দুর উঠেছে, কোথাও এতটুকু মেঘ নেই, আকাশটা একবারে ঝকঝকে নীল। আষাঢ় মাসে এমনটা প্রায় দেখাই যায় না; হঠাৎ দেখলে শরৎকালের আকাশ বলে ভ্রম হয়। এরই মধ্যে শান্তিরঞ্জন চলে গেল।

শান্তি আমার প্রথম-যৌবনের বন্ধু। বয়সে আমার চাইতে বছর চারেকের বড়ো ছিল; কিন্তু তাই নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র 'অভিমান' ছিল না। ফলত, প্রথম-আলাপের কয়েকটা দিন বাদেই আমরা পরস্পরকে 'তুই' বলতে শুরু করি। তখন আমি সদ্য বি.এ. পাস করেছি, আর শান্তি তখন *সওগাত*-এ কাজ করত। মাইনে পেত যৎসামান্য। বলতে গেলে আমরা দুজনেই তখন বেকার, খুবসম্ভব সেই কারণেই বন্ধুত্বটা খুব জমে গিয়েছিল।

পরে ওকে সহকর্মী হিসেবেও পেয়েছি। প্রথমে *স্বরাজ*-এ, তার পরে *সত্যযুগ*-এ, তার পরে *আনন্দবাজার পত্রিকায়*। একই অফিসে, একই টেবিলে, সামনাসামনি বসে দিনের-পর-দিন কাজ করেছি। নাইটডিউটির পরে দুটো টেবিল জোড়া লাগিয়ে ডিকশনারি মাথায় দিয়ে রাতের-পর-রাত পাশাপাশি শুয়ে গল্প করেছি। সাহিত্য থেকে রাজনীতি—সব রকমের গল্প। কাজেকর্মে ওর দক্ষতা ছিল অসামান্য। টেলিপ্রিন্টার-যন্ত্রের মুখ দিয়ে অষ্টপ্রহর যে-খবরের স্রোত গড়ায়, তার থেকে ছাঁটাই করে, বাছাই করে, নির্যাসটুকু বার করে আনতে ওর তুলনা ছিল না। দ্রুত হাতে নির্ভুল তরজমা করত, খবরের শিরোনামাও দিত দারুণ সুন্দর, অনেক ক্ষেত্রে রীতিমতো চমকপ্রদ। তার চাইতেও বড়ো কথা, যেমন তরজমা, তেমনই শিরোনামা— দুয়েতেই একটু সাহিত্যের ছোঁয়া লাগিয়ে দিত। তরজমার তলায় তো আর অনুবাদকের নাম লেখা থাকে না; কিন্তু সকালবেলায় কাগজ খুলেই আমরা বুঝতে পারতুম কোন্ তরজমা আর কোন্ হেডলাইনটা শান্তিরঞ্জন করেছে।

আজ অবশ্য সাংবাদিক শান্তিরঞ্জনের চেয়ে সাহিত্যিক শান্তিরঞ্জনের কথাই বেশি করে মনে পড়ছে। কবিতা দিয়ে শুরু করেছিল, পরে গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে চলে যায়, কিন্তু কবিতাই যে ওর স্বভূমি, তাতে আমার সন্দেহ নেই। মানুষকে ধাক্কা দেবার মতো, সমাজকে চমকে দেবার মতো বেশ-কিছু গল্প ও লিখেছে; তা ছাড়া গল্প-উপন্যাসের ভাষা নিয়েও ওর ভাবনা কিছু কম ছিল না। সাফল্যও ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন বিষয়ে তেমনই ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাকে ও আরও-একটু এগিয়ে আনতে পেরেছিল। তবু বলি, কবিতায় ও নিজেকে যতটা উন্মোচিত উন্মীলিত করে দেখাতে পারত, এমন আর-কিছুতে নয়। শান্তি মূলত কবি। সঞ্জয়দা অর্থাৎ সঞ্জয় ভট্টাচার্যও তা-ই বলতেন। তাঁর সম্পাদিত *নিরুক্ত* পত্রিকায় তো আমরা দুজনেই নিয়মিত লিখতুম; শান্তির কবিতা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ তখন লক্ষ করেছি।

শান্তি নিজেও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করত। *অভিবাদন*। সেই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আমাদের মজলিশ খুব জমে উঠেছিল। তারাশঙ্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ— ঘুরে-ঘুরে এক-একজনের বাড়িতে আড্ডা বসত। হাওড়ায় শান্তির বাড়িতে যেদিন আড্ডা বসেছিল, সেদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "চলুন, গঙ্গা পেরিয়েই এবারে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে যাব।" *অভিবাদন*-এর কথায় বলি, প্রবীণ ও নবীনের এমন মিলন বড়ো-একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু শান্তির তবু দুঃখ ছিল। নবীনদের যে যথেষ্ট জায়গা দেওয়া হচ্ছে না, সেই দুঃখ।

শান্তি আসলে বরাবরই নবীনদের দিকে। যেমন সাংবাদিক হিসেবে, তেমনই সাহিত্যিক হিসেবে। বয়সে যারা ওর চাইতে অনেক ছোটো, তাদের সঙ্গেই ওর আড্ডা জমত বেশি। আড্ডা দিত, হাসত, হাসাত,— তখন ওর সেই টগবগে চেহারা দেখে কে বলবে যে, ও পঞ্চাশ পার হয়েছে। আমরা তো অনেকেই যৌবনে পৌঁছে শৈশবকে ভুলি, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যৌবনকে। শান্তি কিন্তু শৈশবকে কখনও ভোলেনি। এক হিসেবে ও যেন ছিল সেই দৈব শিশু, যাদের বয়স কখনও বাড়ে না। কিংবা বয়স বাড়লেও যাদের হাসিটি সর্বদা অম্লান থাকে। ডালমুটে ও ভূতের গল্পে যাদের কখনও অরুচি হয় না।

শান্তির সঙ্গে কতবার কত জায়গায় আড্ডা মেরেছি। মির্জাপুর স্ট্রিটের প্রতিটি রেস্টুরেন্টের প্রতিটি মুখ আমাদের চেনা হয়ে গিয়েছিল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের প্রতিটি ঘাস আমরা চিনতুম। সবুজ রঙের প্রাইভেট বাসের দোতলায় (তখনও স্টেট বাস

চালু হয়নি) জানালার ধারে বসে কলেজ স্ট্রিটের গাছপালার এগিয়ে-আসা ডালের বাড়ি খেতে-খেতে কতবার ওর সঙ্গে অকারণে শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জে গিয়েছি। সারাটা পথ ও হাসতে-হাসতে যেত।

সেই হাসির শব্দ এখনও কানে বাজে। ভোর পাঁচটায় খবর পেয়ে যখন হাসপাতালে যাই, শান্তি তার খানিক আগেই আরও দূরের পথে যাত্রা করেছে। কিন্তু ওর ঠোঁটের কোণে তখনও একটুকরো হাসি লেগে ছিল।

আষাঢ় ১৩৭৯

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

নিতান্ত ঝোঁকের মাথায় *নিরুক্ত* পত্রিকায় একটি কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

অনেক বছর আগেকার কথা, আমার বয়স তখন সতেরো, সেন্ট পল্‌স কলেজে বি.এ. পড়ি, লেখাপড়ায় একদম মন নেই, মিলফোর্ড সাহেব গ্রিক ইতিহাস পড়ান, অ্যালসিবিয়াডিসের রণকৌশলের বর্ণনা দেন, সেসব কথা আমার কানেই ঢোকে না, আমি জানালার দিকে তাকিয়ে থাকি। মাঝেমধ্যেই ক্লাস কাটতুম, সারা দুপুর টো-টো করে পথে-পথে ঘুরে বেড়াতুম, সদ্য তখন *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পড়েছি, মাথার মধ্যে তারই দুর্বহ বেদনা, রাত জেগে কবিতা লিখি, ইতিপূর্বে *দেশ* পত্রিকায় তার একটি-দুটি ছাপা হয়েছে, অন্যত্রও পাঠাতুম, কিন্তু একমাত্র *দেশ* ছাড়া আর কেউ আমার কবিতা বিশেষ ছাপত না।

নিরুক্ত-ও ছাপবে না, আমি ধরেই নিয়েছিলুম। আশ্চর্য, লেখা পাঠাবার তিন-দিনের মধ্যেই সম্পাদকের চিঠি এল। নিতান্ত এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যে নয় যে, লেখাটি মনোনীত হয়েছে। সম্পাদক আমাকে ডেকে পাঠালেন। সংক্ষিপ্ত তবু সহৃদয় সেই আহ্বানলিপি। "আপনার কবিতা পাইয়াছি। ছাপা হইবে। অবিলম্বে যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, সুখী হইব।" নীচে স্বাক্ষর : সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বয়স তখন কত? বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি নয়। ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, একটু বা হলুদ-ঘেঁষা ফরসা গায়ের রং, মাথার সামনের দিকটায় চুল তখনই পাতলা হয়ে এসেছে, হালকা চাপা ঠোঁট, চোখদুটি অসম্ভব রকমের ধারালো, অথচ এক ধরনের ঔদাস্যও সেই চোখের মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলুম। স্পষ্ট যখন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, তখনও আমার তাই মনে হয়েছিল যে, আমাকে তিনি দেখছেন না, বস্তুত কোনোকিছুই তিনি দেখছেন না, উপর থেকে নীচে নামবার আগে একটা-কিছু বিষয় নিয়ে হয়তো ভাবছিলেন, এখনও সেই ভাবনার মধ্যে তিনি মগ্ন হয়ে আছেন।

নিরুক্ত সম্পাদক সম্পর্কে মনে-মনে একটা ধারণা করে রেখেছিলুম। বাস্তবের সঙ্গে সেই ধারণা সেদিন মেলেনি। চিঠি পাবার আগে ভেবেছিলুম, আমার লেখা

তিনি ছাপবেন না। ছাপলেন। চিঠি পাবার পরে ভেবেছিলুম, বিস্তর প্রশংসাবাক্য শোনা যাবে। গেল না। একমুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, "আপনার লেখাটি আমি ছাপব ঠিকই, কিন্তু বড্ড সেকেলে ধাঁচের লেখা, ধাঁচটা এবারে পালটাবার চেষ্টা করুন, তা নইলে কিন্তু ভবিষ্যতে আর ছাপতে পারব না।"

তখন আমার বয়স কম, বুকের মধ্যে ভীষণ অভিমান, কেউ আমাকে উপেক্ষা করছে এমন কথা মনে হবামাত্র রেগে যাই, কানের মধ্যে ঝাঁঝাঁ করে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, "এটাই বা তাহলে ছাপছেন কেন? নতুন লেখককে দয়া দেখাবার জন্যে?"

গাম্ভীর্যের খোলস একমুহূর্তে খসে পড়ল। খোলা গলায় হোহো করে হেসে উঠলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। বললেন, "না। উৎসাহ দেবার জন্যে।"

এই হচ্ছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। কবির সম্পর্কে আর-কেউ লিখবেন, আমি বরং সম্পাদকের বিষয়ে লিখি। আমি বরং সেই মানুষটির বিষয়ে দু-চার কথা বলি, শুধু বিখ্যাত লেখকদের লেখা সাজিয়ে কাগজ বার করতে যাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না, যিনি নতুন লেখক তৈরি করতে চাইতেন, তৈরি করতেনও; লেখা ভালো না লাগলে যিনি এতটাই তিরস্কার করতেন না, লেখার উৎসাহই যাতে নিভে যেতে পারে; আবার কোনো লেখা ভালো লাগলেও যিনি এতটাই প্রশংসা করতেন না, নবীন লেখকের মাথা যাতে ঘুরে যাবার আশঙ্কা। তিনি যখন তিরস্কার করতেন, তখনও তাঁর কথায় কিছু সহানুভূতি থাকত। আবার যখন প্রশংসা করতেন, তখনও তাঁর কথায় কিছু সতর্কতা থাকত। নিজের কথা বলতে পারি, আমার ভাগ্যে প্রশংসা বিশেষ জোটেনি, অধিকাংশ দিনই গালাগাল খেয়ে বাড়ি ফিরতে হত। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ ছিল না। আমি জানতুম, আমাকে তিনি স্নেহ করেন।

সেই স্নেহের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেই উতরোল দিনগুলির কথা, বিকেল হবামাত্র যখন আমরা গণেশ অ্যাভিনিউয়ের দিকে দৌড় লাগাতুম। কলেজে পড়তে-পড়তেই দৈনিক পত্রিকায় ঢুকেছিলুম। কলেজ থেকে বেরিয়েও সেই কাজে লেগে রইলুম। *প্রত্যহ, মাতৃভূমি* ইত্যাদি কাগজ ঘুরে তখন আমি *স্বরাজ*-এ এসেছি। কাজটা সন্দাই জুটিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রিক রো থেকে গণেশ অ্যাভিনিউ পাঁচ মিনিটের রাস্তা। গণেশ অ্যাভিনিউয়ের দফতর তখন বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত যেন গমগম করত। শুধু *নিরুক্ত*-ই তো তখন বার হত না, নতুন পর্যায়ে *পূর্বাশা*-ও তখন বেরুচ্ছে। একদিকে *কবিতা*, অন্যদিকে *নিরুক্ত*। আধুনিক বাংলা কবিতার দুই সম্ভ্রান্ত মুখপত্র। ত্রৈমাসিক *নিরুক্তর* সঙ্গে এবারে যুক্ত হল মাসিক *পূর্বাশা*।

আমি একা নই, সঞ্জয় ভট্টাচার্য আর সত্যপ্রসন্ন দত্তের (সত্যবাবুর ডাকনাম বাচ্চু, আমরা বলতুম বাচ্চুদা) চেষ্টায় আরও কয়েকজন লেখক *স্বরাজ*-এ কাজ পেয়েছিলেন। আমি উঠতি-লেখক, তাঁরা খ্যাতিমান। ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ছিলেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিলেন নারায়ণ চৌধুরী। সর্বোপরি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি ছিলেন রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক। বরিশালে অধ্যাপনা করতেন, দেশ-বিভাগের আগে বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে আসেন। আসা সহজ হয়েছিল সন্দার চেষ্টায়। অন্তত আমরা তা-ই শুনেছিলুম। শান্ত তন্ময় মগ্ন প্রকৃতির মানুষ— খবরের কাগজে কাজ করবার জন্যে যে-চটপটে প্রস্তুতি না-থাকলেই নয়, জীবনানন্দের সেটা একবারেই ছিল না। বিকেল চারটে না-বাজতেই নিজের ঘর থেকে ডাক পাঠাতেন, কিংবা নিজেও অনেকসময়ে বার্তা-বিভাগে চলে আসতেন, মৃদুগলায় বলতেন, "চলুন, এবারে যাওয়া যাক।"

কোথায় যেতে চান, বুঝতে আমাদের অসুবিধে হত না। সঞ্জয়দার ওখানে। ক্রিক রো দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে পৌঁছোলুম, পার্কে ঢুকলুম, দুদিকে পামগাছের সারি, তার মধ্যে দিয়ে চলে এলুম ওয়েলিংটন স্ট্রিটে— ছবিটা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। এখনও মনে পড়ে, ওই পর্যন্ত এসেই জীবনানন্দ কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়তেন। একবার এগোন, একবার পেছোন, একবার আমাদের দিকে তাকান একবার রাস্তার দিকে, ট্রামরাস্তা তিনি কিছুতেই পার হতে চাইতেন না, অনেক কষ্টে পার হবার পর নিশ্বাস ফেলে বলতেন, বাঁচলুম। *পূর্বাশা*-র দফতরে ঢুকে সেই তিনিই আবার অন্য মানুষ। খুব-যে কথা বলতেন তা নয়, কিন্তু, মনে হত, এতক্ষণ যেন তিনি পরবাসে ছিলেন, এইবারে নিজভবনে এসে স্বস্তি পেয়েছেন।

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র কবি স্বস্তি পেতেন, আমরা পেতুম উত্তেজনা। উত্তেজনা অকারণ নয়। বাংলা দেশের দিকপাল সব সাহিত্যিক সেখানে আসতেন। কেউ প্রত্যহ, কেউ মাঝেমধ্যে। তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, *পূর্বাশা*-র দফতরে এঁদের দেখেছি। অচিন্ত্যকুমার মফস্‌সলে থাকতেন, ছুটিছাটায় কলকাতায় আসতেন, আর কলকাতায় এসেই পা বাড়াতেন গণেশ অ্যাভিনিউয়ের দিকে। কবির-সাহেবকেও *পূর্বাশা*-র আড্ডায় দেখা যেত। তরুণদের মধ্যে আসতেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরী। সন্তোষকুমার ঘোষ এর আগের পর্যায়ের *পূর্বাশা*-তেও গল্প লিখেছেন, এবারে নতুন পর্যায়ের *পূর্বাশা* আবার নতুন করে তাঁকে কাছে টানল। দারুণ আড্ডা জমত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চলত। সাহিত্য নিয়ে তর্ক, রাজনীতি নিয়ে তর্ক, শিক্ষা নিয়ে তর্ক, সমাজনীতি নিয়ে তর্ক। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হত, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত, কিন্তু কারও সেদিকে খেয়াল নেই। ক্রমাগত

চা আসছে, সিগারেট পুড়ছে। সঞ্জয়দার পানের ডিবে নিমেষে ফতুর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তর্ক তবু থামছে না। আমরা, বয়সে যারা আরও তরুণ, একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে বসতুম। আমাদের মনে হত, প্রত্যেকের মনের মধ্যেই যেন বিস্তর কথা জমে ছিল, *পূর্বাশা*-র আড্ডায় এসে সেই কথাগুলি এবারে মুক্তি পেয়েছে। তর্কের ফাঁকে-ফাঁকে আমাদের দিকেও চোখ ফেরাতেন সঞ্জয়দা। বলতেন, "কী হে, ইয়ং ব্যাচ, চুপ করে আছ কেন? কিছু বলো।" আমাদের কুণ্ঠা নিমেষে কেটে যেত, তর্কের যুদ্ধে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়তুম। আজ বুঝতে পারি, সম্পাদক হিসেবে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সবচাইতে বড়ো কৃতিত্ব এইখানে যে, *পূর্বাশা*-কে কেন্দ্র করে তিনি চিন্তা-বিনিময়ের একটি মুক্ত পরিবেশ রচনা করতে পেরেছিলেন। ও কাজ সবাই পারে না।

চিন্তায় আচরণে চাপল্য তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি চাইতেন, তরুণ লেখকেরা জীবনকে আরও-একটু গভীরভাবে দেখুন, বিশ্ব-চিন্তার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ফসল, তার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হোক। নিজে প্রচুর পড়াশোনা করতেন; ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি— সর্ব বিষয়ে। শিক্ষার প্রসারেও পূর্বাশা প্রকাশনের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক বই সেখান থেকে বেরিয়েছে। এই ব্যাপারেও সঞ্জয়দার আগ্রহের অন্ত ছিল না।

স্বরাজ থেকে *ভারত*-এ চলে গিয়েছিলুম, কিন্তু *পূর্বাশা*-র সঙ্গে যোগসূত্র তাতে শিথিল হয়নি। সেই *ভারত* হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, দুম করে একদিন উঠে গেল। আমি তখন পরিপূর্ণ বেকার। বিপদে পড়ে ছুটে গেলাম সন্‌দার কাছে। তিনি বললেন, "ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ায় কাজ করবি? তা হলে যা, বাচ্চু তোকে বিধুবাবুর কাছে নিয়ে যাবে।" ইউ.পি.আই.-এর দফতরও ওই একই রাস্তায়, *পূর্বাশা*-র মাত্রই কয়েকটি বাড়ি পরে। বাচ্চুদা তো তক্ষুনি আমাকে বিধুবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। বিধুবাবু গম্ভীর মানুষ। পরিচয় শুনলেন, কাজ দেখলেন, তারপর হপ্তাদুয়েক বাদে বললেন, "যদি পাটনা যেতে রাজি থাকো, তো কাজ দিতে পারি।" সন্‌দাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "যাব?" তিনি বললেন, "থাক গে, তার চাইতে বরং একটা চিঠি দিচ্ছি, থিয়েটার রোডে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা কর্।"

সেদিনকার কথাও আমি ভুলিনি। চিঠি নিয়ে থিয়েটার রোডে ছুটলুম। প্রথমে ভিকটোরিয়া স্মৃতিসৌধের পাঁচিলে ঘণ্টাখানেক, তারপর সাহেবপাড়ায় একটি পার্কের ভিতরকার পুকুরের পাশে আরও ঘণ্টাখানেক বসে থেকে, তারপর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে চাকরির প্রতিশ্রুতি নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন রাত প্রায় দশটা। ফিরে শুনি সন্‌দা লোক পাঠিয়েছিলেন। তক্ষুনি আবার গণেশ অ্যাভিনিউতে ছুটলুম। সন্‌দা আর বাচ্চুদাকে জানিয়ে এলুম, চাকরি হয়েছে।

এত কথা বলবার কোনো দরকার ছিল না? ছিল বই-কি। না বললে সেই মানুষটার জীবনের অন্তত একটা দিকের পরিচয় মেলে না। শুধু সম্পাদকই তো তিনি ছিলেন না। তরুণ লেখকদের মস্ত একজন শুভার্থীও ছিলেন। খোঁজ রাখতেন, কার কী অবস্থা, কে কী করছে, কেউ অসুবিধেয় পড়ল কি না। অসুবিধে যাতে কেটে যায়, তার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। তিনি যদি না সাহায্যের হাত বাড়াতেন, তাহলে আমরা অনেকেই হয়তো সহজে আবার উঠে দাঁড়াতে পারতুম না।

অন্য সকলের খোঁজখবর নিতে যাঁর এত আগ্রহ— আশ্চর্য, নিজের সম্পর্কে তিনি নীরব থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ অংশ কেটেছে কুমিল্লায়। সেই অংশ সম্পর্কে তিনি নিজে কখনও কিছু বলতেন না। আমরা অনুমান করতুম, তাঁর জীবনে কোথাও বিরাট একটা বেদনা আছে। কিন্তু তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করবার সাহস আমাদের ছিল না। এত যে খোলামেলাভাবে মিশতেন আমাদের সঙ্গে, তবুও বুঝতে পারতুম একটা বর্ম তাঁকে ঘিরে আছে। আভিজাত্যের বর্ম। সেই আভিজাত্যকে শুধু আমরা কেন, প্রতিষ্ঠাবান লেখকেরাও সমীহ করে চলতেন। আমাদের ভয় ছিল, ব্যক্তিগত বেদনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে গেলেই তাঁর আভিজাত্যে ঘা লাগবে।

কখনও কোনো প্রশ্ন করিনি। *পূর্বাশা*-র অবস্থা যখন পড়ে আসছে, তখনও না। গণেশ অ্যাভিনিউ থেকে সন্‌দা আর বাচ্চুদা যখন মনোহরপুকুর রোডে চলে গেলেন, তখনও না। আবার মনোহরপুকুর থেকে তাঁরা যখন ঢাকুরিয়ায় উঠে গেলেন, তখনও না। মনোহরপুকুর রোডের বাসায় তাঁকে দেখেছি, দেখেছি ঢাকুরিয়াতেও। দেখে মনে হত, এ তাঁর প্রবাস-জীবন। দেখে বুঝতে পারতুম, গণেশ অ্যাভিনিউয়ের মানুষটিকে আর কোথাও মানাচ্ছে না। মানানো সম্ভব নয়। যিনি শুধু সাহিত্যিক নন, সাহিত্যনায়কও, নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে কী করে মানাবে? অনেকের সাহিত্য-প্রয়াসের কেন্দ্রে তিনি আসন নেবেন, কেন্দ্রে বসে সাহিত্য নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন, কাউকে বলবেন, "বাঃ, বেশ লিখেছ," কাউকে তিরস্কার করবেন, তিরস্কার করে শব্দের রহস্য সম্পর্কে আর-একটু সচেতন করে দেবেন, বলে দেবেন, কোন্ পথে কার যাওয়া দরকার— একমাত্র তাহলেই তাঁকে মানায়।

শ্মশানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছি, ওই তিনি আসছেন। মনে পড়ছে তাঁর স্নেহ, তাঁর সাহায্য, তাঁর পরামর্শ, তাঁর তিরস্কার পাবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল, আমি তাদেরই একজন। কবিতা আমি আগেও লিখতুম, কিন্তু কবিতায় আধুনিকতা বলতে যা বোঝায়, তাতে তাঁরই কাছে আমার হাতেখড়ি।

ফাল্গুন ১৩৭৫

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কবিকে আমরা শ্রদ্ধা দান করি; ব্যক্তিকে ভালোবাসা। ভালোবাসা প্রায়ই শ্রদ্ধাকে ছাপিয়ে যায়। একালের একজন কবির ক্ষেত্রে তা-ই গিয়েছে। তিনি সুধীন্দ্রনাথ। তাঁর মৃত্যুর পর বিগত কয়েক মাসের মধ্যে এমন অনেক রচনা আমাদের চোখে পড়েছে, নানাগুণান্বিত এই মানুষটি যার বিষয়বস্তু। সেসব রচনার প্রত্যেকটিই যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এমন কথা বলি না; কিন্তু লক্ষ করেছি, কবিকে নিয়ে আলোচনা করাই যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরাও শেষপর্যন্ত মানুষটির কথা ভুলে থাকতে পারেননি। কবির কথা বলতে-বলতে প্রায় অনিবার্যভাবেই তাঁরা ব্যক্তিমানুষের কথায় এসেছেন; এবং ব্যক্তির কথায় আসবার পরে আর কবির কথায় ফিরে যাননি।

ফলত, যা কিনা খুবই স্বাভাবিক, এইসমস্ত রচনা পাঠের পর, পাঠকের চোখে, কবির চাইতে ব্যক্তি সুধীন্দ্রনাথের চেহারাই আরও স্পষ্ট, আরও সত্য হয়ে উঠেছে। অনেকে মনে করতে পারেন, এমনটি হওয়া সংগত ছিল না। সংগত ছিল— তাঁর উপরে নয়— তাঁর কবিতার উপরে দৃষ্টি রাখা। আমি তা মনে করি না। তার কারণ, আমি জানি যে, সার্থক কবিকৃতি যদিও সর্বকালেই অতি দুর্লভ ঘটনা, সার্থক ব্যক্তিত্বও বিশেষ সুলভ নয়। বিশেষত এই সর্বনাশা সময়ে, সবার রঙে রং মেশাবার প্রবণতাই যখন, বিকৃত অর্থে, প্রবল হয়ে উঠেছে; স্বাধীন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মানুষমাত্রেই যখন অসহায় বোধ করছেন; এবং—জনতা-জনার্দনের পায়ের তলায়—ব্যক্তিত্ব নামক বস্তুটাই যখন গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে।

এই যখন অবস্থা, তখন সুধীন্দ্রনাথের মতো এত নিঃসঙ্গ, এবং নিঃসঙ্গ বলেই এমন মহিমান্বিত, একটি ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে যে-কোনো মানুষের পক্ষেই ঈষৎ বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক । বিস্মিত এবং আবিষ্ট। স্বীকার করব, আমি আবিষ্ট হয়েছিলুম। স্বীকার করব, এখনও প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় যখন অসামান্য সেই মানুষটির কথা আমার মনে পড়ে, তখন, প্রধানত, তাঁর মনুষ্যত্বের কথাই আমার মনে পড়ে। সহৃদয়, সচ্ছল সেই মনুষ্যত্বের কথা, বড়ো বেশি স্বাভাবিক বলেই যা এই যুগের পক্ষে বড়ো অস্বাভাবিক ছিল। না, তাঁর কবিতার কথা তত প্রবলভাবে আমার মনে পড়ে না। অন্তত তাঁর জীবদ্দশায় যতখানি মনে পড়ত, তার চাইতে

বেশি নয়। এবং একথা যে তাঁর অসংখ্য অনুরাগীর মধ্যে একমাত্র আমার ক্ষেত্রেই সত্য, এমনও আমি মনে করি না। সুতরাং, আমি কেন বিস্মিত হব, সুধীন্দ্রনাথ- সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনায় যদি আজ তাঁর কবিকৃতির চাইতে তাঁর ব্যক্তিত্বের উপরে, অথবা তাঁর মেধার চাইতে তাঁর মনুষ্যত্বের উপরে, বেশি আলো পড়ে?

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গো আমার পরিচয় খুব বেশি দিনের ছিল না। বড়োজোর বছর পাঁচেকের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের এক আবৃত্তিসভায় তাঁকে আমি প্রথম দেখি। তাঁর বয়স তখন পঞ্চান্ন। আমার একত্রিশ। মাঝখানে প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যবধান। এই ব্যবধানকে আমি সম্ভ্রমের চোখে দেখেছিলুম; তিনি স্নেহের চোখে। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর, অনায়াসেই তাই, বয়সের বাধা পেরিয়ে, তিনি আমার কাছে এলেন (যেমন আরও অনেকের কাছেই তিনি সেদিন গিয়েছিলেন); বসলেন (যেমন আরও অনেকের কাছেই তিনি সেদিন বসেছিলেন); এবং সেদিনকার আবহাওয়া নয়, তখনকার কবিতা সম্পর্কে, আমার অপ্রতিভ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমাকে দিয়ে দু-চার কথা বলিয়ে নিলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, "আমার ওখানে আসবেন— যখনই ইচ্ছে হয়।"

ইচ্ছে প্রতিনিয়তই হত। কিন্তু স্বীকার করা ভালো, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গো সেই প্রথম পরিচয়ের পর, বিগত পাঁচ বছরে, মাত্র বার দশেক তাঁর রাসেল স্ট্রিটের বাসায় আমি গিয়েছি। ভুল হল। মাত্রই বার দশেক নয়, অন্তত বার দশেক। 'অন্তত' শব্দটা এখানে এই কারণে ব্যবহার করছি যে, সংখ্যা হিসেবে দশও এ-ক্ষেত্রে সামান্য নয়; এই কারণে যে, সুধীন্দ্রনাথ যে কেমন মানুষ, তা বোঝার জন্যে, দশ বার কেন, পাঁচ বার যাবারও কোনো দরকার ছিল না। এমন কিছু-কিছু মানুষ থাকেন, প্রথম দর্শনেই যাঁদের চিনে নেওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথকে যেত।

কথাটা একটু দাম্ভিক শোনাচ্ছে, আমি জানি। জানি যে, মানুষমাত্রেরই চরিত্র একালে শতধাখণ্ডিত। প্রথম দর্শনে সুতরাং মানুষ চেনা যায় না। চেনার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। একটু-একটু করে তাঁর কাছে গিয়ে, একটি একটি করে তাঁর অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নিতে হয়। এবং অনেক মাস, অনেক বছর কেটে যাবার পরে, সবে যখন সেই মানুষটিকে আমার চেনা-চেনা লাগছে, ঠিক তখনই হয়তো আবিষ্কার করতে হয় যে, তখনও তাঁকে, সমগ্র তাঁকে, চেনা যায়নি। এ সবই আমি জানি। জেনেও তবে কেন সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এত অনায়াসে আমি বলতে পারলুম যে, প্রথম দর্শনেই তাঁকে চেনা যেত? স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথই তার কারণ। বলতে পেরেছি, কেন-না তাঁকে দেখামাত্রই মনে হত যে, তাঁকে চেনার জন্যে কাউকে প্রতীক্ষায় থাকতে হবে না। মনে হত যে, তাঁর ইচ্ছাগুলিকে কারও আলাদা-আলাদা

করে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখবার কোনো দরকার নেই। মনে হত, তাঁর সমগ্র সত্তাই যেন তাঁর দৃষ্টিতে এসে ধরা দিয়েছে। কিংবা বলতে পারি নিঃশব্দ নির্মল সেই হাসির মধ্যে, তাঁর চোখে—প্রায় অশ্রুর মতোই—যা টলটল করত।

কেমন মানুষ ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ? তাঁকে যাঁরা দেখেননি, কিংবা দূর থেকে দেখেছেন, তাঁদের কেউ যদি আজ এই প্রশ্ন তোলেন, তবে—তাঁর চরিত্রের মৌল লক্ষণ সম্পর্কে যেহেতু আজ আর বিন্দুমাত্র সংশয় আমার নেই—একটিমাত্র কথায় আমি তার জবাব দেব। বলব, তিনি শ্রদ্ধাশীল মানুষ ছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক কথা, তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য মেধা ইত্যাদি সম্পর্কে আরও অসংখ্য কথাই হয়তো বলা যায়। কিন্তু সেসব আমি বলব না, তার কারণ, এই গুণাবলির মধ্যে যদিও প্রত্যেকটিই আমাদের সবিস্ময় সম্ভ্রম উৎপাদনের যোগ্য, এর একটিকেও আমি তাঁর চরিত্রের আদি অভিজ্ঞান বলে গণ্য করি না। তাঁর চরিত্রের, তাঁর ব্যক্তিত্বের আদি অভিজ্ঞান ছিল শ্রদ্ধা, এবং সেই শ্রদ্ধা কোনো ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ ছিল না।

না, নির্বাচিত কয়েকটি মানুষকে নয়, সকলকেই তিনি শ্রদ্ধা করতেন। স্বজন, বন্ধু, সঙ্গী, সতীর্থ সহকর্মী—সকলকেই। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইসব তরুণ ছাত্র, যাঁরা তাঁর কাছে পাঠ নিতে যেতেন, অথবা অল্পবয়সি সেইসব কবি, রাসেল স্ট্রিটে সন্ধ্যাযাপন যাঁদের যৌবন বয়সের অন্যতম আনন্দ ছিল, তাঁদেরও প্রায় প্রত্যেকেই—প্রায় প্রত্যহ—তাঁর শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত হয়েছেন।

কেন?—এই প্রশ্নটা এখানে না-উঠেই পারে না। সত্যিই তো সবাই কিছু শ্রদ্ধালাভের যোগ্য নয়। তবু কেন, যে-কোনো বয়সের, যে-কোনো বৃত্তির, যে-কোনো বিদ্যার মানুষকে উপলক্ষ করে, তাঁর শ্রদ্ধা এত অনায়াসে ক্ষরিত হত? ক্ষরিত হত তাঁর প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কর্মে। নিজে তিনি রাজার চালে চলতেন? অবশ্য। কিন্তু আশ্চর্য, এমন কথা কখনও কারও মনে হয়নি যে, আর-কাউকে তিনি প্রজার ভূমিকায় দেখতে চান। অন্যেরা যখন কথা কইত, তিনি শান্ত হয়ে শুনতেন। নিজে যখন কথা কইতেন, তাঁর গভীর কণ্ঠস্বরে এক আশ্চর্য নম্রতার স্পর্শ ঘটত। ভেবে এখন বিস্ময় লাগছে যে, তাঁকে কখনও উত্তেজিত হতে দেখিনি। বিতৃষ্ণ, বিরক্ত কণ্ঠে কথা বলতে শুনিনি। বরং সাহিত্য কিংবা সমাজ-বিষয়ক কোনো আলোচনার অন্ত্য অধ্যায়েও যখন আমাদের অস্থিরতার অবসান হত না, সেই অস্থিরতাকে যখন আমরা তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করতুম, ব্যক্ত করে বিদায় নিতে চাইতুম, তখন—অস্বস্তিকর সেই মুহূর্তটিতেও—তিনি সহাস্য উঠে দাঁড়াতেন; দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে শান্ত সহিষ্ণু গলায় বলতেন, "কথা কিন্তু শেষ হল না। আর-একদিন এ নিয়ে আলোচনা করা চাই। ইতিমধ্যে আপনার যুক্তিগুলিকে আমি আবার ভেবে দেখব।"

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার কথায় মনে পড়ল, এই প্রত্যুদ্‌গমনও আসলে আর

কিছুই নয়, তাঁর রাজকীয় নম্রতারই একটি প্রতীক। মস্ত বড়ো কোনো অতিথি না এলে কি আমরা প্রত্যুদ্‌গমন করি? বিদায়দান অথবা অভ্যর্থনার জন্য খানিকটা পথ এগিয়ে যাই? সুধীন্দ্রনাথ যেতেন। যে-কেউ তাঁর কাছে যাক, খবর পেলেই তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতেন, এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসতেন, এবং আগন্তুক যতক্ষণ না আসন গ্রহণ করছেন, নিজে তিনি আসন গ্রহণ করতেন না। অনেকে একে সৌজন্য বলবেন; আমি একে শ্রদ্ধা বলি। লক্ষ করেছি, এবং লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছি যে, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়ে এই শ্রদ্ধা ক্ষরিত হত। এবং ক্ষরিত হত নির্বিচারে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় দু-একটি মানুষের জন্য নয়, সর্বজনের জন্য।

সকলকেই শ্রদ্ধা করতেন সুধীন্দ্রনাথ। কেন করতেন?

হয়তো এইজন্যে যে, না করে তাঁর উপায় ছিল না। উপায় ছিল না, কেন-না তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যিনি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের জন্যেই তাঁকে শ্রদ্ধা পোষণ করতে হয়। কেন-না, তিনি জানেন যে, প্রতিটি মানুষই আসলে স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—একটি অস্তিত্বের প্রতীক। স্বতন্ত্র একটি আকাঙ্ক্ষা এবং স্বতন্ত্র একটি সমগ্রতার প্রতীক। কেন-না, তিনি জানেন যে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই এক্ষেত্রে একের শূন্যতাকে কখনও আর-কাউকে দিয়ে ভরাট করা যায় না। কোনো দিনই না। নব-নব জন্মের মধ্য দিয়ে যদিও নিয়ত আরও অসংখ্য অস্তিত্বের সূচনা হয়ে চলেছে, নব-নব পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যদিও নিয়ত আরও অসংখ্য অস্তিত্বের আমরা সান্নিধ্য পাচ্ছি, তবুও না। একের সৃষ্ট সেই শূন্যতা তবু থেকেই যায়।

প্রতিটি মানুষকেই যে শ্রদ্ধা করতেন সুধীন্দ্রনাথ, আমার মনে হয়, সে শুধু এই কারণেই। এই প্রবল বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে যে, কারও অভাবই অন্য কারও দ্বারা পূর্ণ হয় না। "কারও অভাবই অন্য কারও দ্বারা পূর্ণ হয় না।"— কথাটা আমি তাঁরই কাছে শুনেছি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মানুষমাত্রেই মহৎ। মহৎ, কেন-না অ-বিকল্প। মহৎ, কেন-না স্বতন্ত্র। এবং সন্দেহ নেই যে, সর্বজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, বস্তুত, সর্বজনের এই স্বাতন্ত্র্যকেই তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে গিয়েছেন।

১৩৬৭

কবিতার কী ও কেন

কবিতা কী

ধরা যাক, আমরা শিকার করতে বেরিয়েছি। ধরা যাক, আমরা একটি সিংহ শিকার করব। কিন্তু যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সিংহ সেখানে সত্যি-সত্যি আছে তো? কীভাবে বুঝব যে, সে আছে? ধরা যাক, একটু আগেই আমরা তার গর্জন শুনেছি। কিংবা নরম মাটিতে দেখেছি তার পায়ের ছাপ। সেই শোনা কিংবা সেই দেখার উপরে নির্ভর করে আমরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। দূরের একটা ঝোপ যেন একটু নড়ে উঠল। সিংহ? চকিতে একটা ছায়া যেন আমাদের চোখের সামনে থেকে সরে গেল। সিংহ? আমাদের প্রত্যেকেরই স্নায়ু একেবারে টানটান হয়ে আছে। হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছে মুখের মধ্যে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বুকের ধকধক খুব স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছি। আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি যে, আর দেরি নেই, এইবারে হয়তো যে-কোনও মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

ধরা যাক, ঠিক এইভাবেই একটি কবিতার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। আমরা শুনেছি যে, কবিতা কিছু অসম্ভব শশবিষাণের ব্যাপার নয়, কবিতা বলে সত্যিই কিছু আছে, এবং আমাদের ধারেকাছেই আছে। তাই আমরা আশা করছি যে, আমাদের অন্বেষণ বিফলে যাবে না, যে-কোনও মুহূর্তে আমরা তার দেখা পাব।

কিন্তু দেখা পাওয়াই যথেষ্ট নয়, দেখা যখন হবে, তখন তাকে চিনে নিতে পারব তো? প্রশ্নটা আমাদের নয়, বিদেশি এক কবি-সমালোচকের। কিন্তু আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ যখন এই প্রশ্ন তোলেন, তখন তাঁর সমস্যাটা যে কী, তা খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি। আসলে, সিংহ কিংবা বাঘ কিংবা টেবিল কিংবা চেয়ার কিংবা কলম কিংবা বই কিংবা এই রকমের আরও অজস্র প্রাণী অথবা বস্তুকে যত সহজে চিনে নেওয়া যায়, কবিতাকে চিনে নেওয়া তত সহজ ব্যাপার নয়।

কেন নয়? ম্যাকলিশ এই প্রশ্নের একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি যা বলেছেন, তার মোদ্দা কথাটা এই যে, ইতিপূর্বে আমরা যদি সিংহ না-ও দেখে থাকি, তবু যে তাকে দেখবামাত্র আমরা চিনে নিতে পারি, তার কারণ আর কিছু নয়, নানা জনের কাছে এই প্রাণীটির যে-বর্ণনা আমরা শুনেছি, তার মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। গল্পের অন্ধেরা যখন হাতির বর্ণনা দিয়েছিল, তখন তাদের

একজন বলেছিল, হাতি হচ্ছে সাপের মতো; একজন বলেছিল, হাতি হচ্ছে কুলোর মতো; একজন বলেছিল, হাতি হচ্ছে থামের মতো; আর যে অন্ধটি হাতির শুঁড়, কান বা পা ছোঁয়নি, শুধু— হাতি যখন তার পাশ দিয়ে চলে যায়, তখন— আন্দোলিত বাতাসের একটা ঝাপটা খেয়েছিল মাত্র, সে বলেছিল যে, হাতি হচ্ছে একটা ঝড়ের মতো ব্যাপার। কিন্তু তেমন কোনও বিভ্রাট এক্ষেত্রে ঘটছে না। সিংহের বর্ণনা যাঁরা দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তাঁরা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। সুতরাং তাঁদের দেওয়া সেই বর্ণনার উপরে নির্ভর করেই সিংহকে শনাক্ত করা যায়। পক্ষান্তরে, কবিতা নামক ব্যাপারটাকে যে তেমন করে আমরা শনাক্ত করতে পারি না, তার কারণ, তার বিষয়ে যেসব বর্ণনা আমরা পেয়েছি, অনেকক্ষেত্রেই সেইসব বর্ণনার মধ্যে কোনও মিল নেই। এমনকি, প্রায়শ তারা পরস্পরের বিরোধী। রামের দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে শ্যামের বর্ণনা মেলে না। যদুর বর্ণনা ও মধুর বর্ণনার মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যায়। নবীনের দেওয়া বর্ণনায় আবার রাম শ্যাম যদু ও মধু, প্রত্যেকেরই আপত্তি ঘটে। ফলে, তাকে শনাক্ত করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দুই মহাজন যার বর্ণনায় একমত হতে পারেন না, কীভাবে তাকে আমরা খুঁজে ফিরব? এবং দেখা হয়ে গেলেই বা কীভাবে, কোন্ কোন্ লক্ষণ মিলিয়ে চিনে নেব তাকে?

সর্বসম্মত কোনও বর্ণনা কিংবা সংজ্ঞা না-পাবার যে অসুবিধা, কবিতার আলোচক-মাত্রেই কখনও-না-কখনও তার সম্মুখীন হন। তখন কীভাবে তাকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করেন তাঁরা? তাঁদের কেউ-বা কোনও পূর্বাচার্যের দেওয়া সংজ্ঞাকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে অতঃপর তারই আলোয় চিনবার চেষ্টা করেন যে, কোন্‌টা কবিতা আর কোন্‌টা নয়। কেউ-বা সে-ক্ষেত্রে, কোনও পূর্বাচার্যের সংজ্ঞাকে একেবারে পুরোপুরি হয়তো মেনে নেন না, কিন্তু তারই সূত্র ধরে চেষ্টা করেন অন্য কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণের। আবার কেউ-বা, অন্য কারও সংজ্ঞার মুখাপেক্ষী না-হয়ে, একান্তভাবে অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে, অন্য পথে এগিয়ে যেতে চান। চেষ্টা করেন, পূর্বলব্ধ যাবতীয় সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কহীন, কোনও নূতন সংজ্ঞা খুঁজে নিতে। কিন্তু সেই নূতন সংজ্ঞা যখন খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তা নিয়েও আবার নূতন করে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। কাকে কবিতা বলে, এই প্রারম্ভিক প্রশ্নেরই কোনও সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য, কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ ও লক্ষণ নির্ণয়ের এই যে নব-নব প্রয়াস, এবং তার থেকে সঞ্জাত এই যে বিরোধ, এই নিয়েই আমরা এখানে প্রশ্ন তুলতে পারি। বলতে পারি যে, নূতন করে আবার এতসব বাদবিসংবাদের মধ্যে জড়িয়ে যাবার দরকার নেই, তার চেয়ে বরং প্রাচীন মতামতগুলির দিকেই আর-এক বার

চোখ ফেরানো যাক। দেখা যাক, তা-ই দিয়েই আমাদের প্রয়োজন মেটে কি না। অর্থাৎ তারই উপরে নির্ভর করে আমরা বুঝে নিতে পারি কি না যে, কবিতা নামক ব্যাপারটা আসলে কী।

মুশকিল এই যে, কবিতা-সংক্রান্ত আমাদের এই জিজ্ঞাসা সেখানেও কোনও চূড়ান্ত উত্তর খুঁজে পায় না। বিসংবাদের ক্ষেত্রটি বস্তুত সেখানেও বেশ বড়ো মাপের। বামনাচার্য যখন বলেন, কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ, তখন প্রতিবাদীরা বলেন, তা কেন হবে, অলংকৃত বাক্যমাত্রেই কিছু কাব্যের মর্যাদা পেতে পারে না; উপরন্তু, বাক্যবন্ধ নিরলংকার হলেই তা যে কাব্য বলে গ্রাহ্য হবে না, এমনও নয়। বস্তুত, কাকে আমরা অলংকার বলব, এবং কাকে নয়, বিরোধ ঘটে তা নিয়েও। বিশ্বনাথ অবশ্য অলংকৃত বাক্যবন্ধের উপরে জোর দেন না, গুরুত্ব আরোপ করেন রসের উপরে। কিন্তু, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্, এই সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাটিও যে আমাদের চূড়ান্ত সন্তোষ উৎপাদন করে না, তার কারণ, সেক্ষেত্রে আমরা আবার নূতন জিজ্ঞাসার জালে জড়িয়ে যাই। কাব্যজিজ্ঞাসাকে মুলতুবি রেখে তখন আবার সন্ধান করতে হয় যে, রস কাকে বলে।

আনন্দবর্ধন সম্পর্কে, আরও অনেক কথার মতো, এই কথাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কাব্যের ব্যাপারটাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি একেবারেই বিপরীত বিন্দু থেকে অগ্রসর হয়েছেন। কাব্য কী, তা জানাবার জন্যই তিনি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, কাকে আমরা কাব্য বলতে পারি না। আমরা যাকে 'এলিমিনেশন পদ্ধতি' বলি, বস্তুত তারই আশ্রয় নিয়েছেন তিনি; এবং বলছেন যে, যে-বাক্যবন্ধ থেকে নিতান্ত আক্ষরিক অর্থ ছাড়া আর কিছুই আমাদের লভ্য নয়, কাব্য বলে গণ্য হবার কোনও যোগ্যতাই তার নেই।

ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াল? মোটামুটি এই দাঁড়াল যে, বাক্য যখন কাব্য বলে গণ্য হতে চায়, তখন তার মধ্যে নিতান্ত শব্দার্থের অতিরিক্ত কোনও অর্থের কিংবা তাৎপর্যের আভাস থাকা চাই। এই যে তাৎক্ষণিক অর্থের অতিরিক্ত অর্থ, এরই প্রসঙ্গে আসবে ব্যঞ্জনার কথা। কিন্তু তার আগে একবার পাশ্চাত্যের কাব্যতত্ত্বের সন্ধান নেওয়া যাক, এবং দেখা যাক যে, কাব্যবিচারের কোনও সহজ সূত্র সেখানে মেলে কি না।

আরিস্টটলের কথাই ধরা যাক। কাব্য-বিষয়ে তাঁর অতিবিখ্যাত যে-প্রস্তাবের কথা সবাই জানেন, এবং গিলবার্ট মারের সিদ্ধান্ত[১] মেনে নিলে যে-প্রস্তাবকে আমরা কবিতা নামক ব্যাপারটার প্রতি প্লেটোর উগ্র উষ্মার উত্তর বলে গণ্য করতে

১. "it looks as if his [Aristotle's] treatise on poetry was an answer to Plato's challenge." (আরিস্টটলের *কাব্যতত্ত্বর* ইনগ্রাম বাইওয়াটার-কৃত অনুবাদের ভূমিকা।)

পারি, সেখানে কিন্তু আমাদের প্রারম্ভিক জিজ্ঞাসার কোনও জবাব মেলে না। কবিতাকে সেখানে হরেক শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন আরিস্টটল, এবং বর্ণনা করেছেন তাদের ইতিহাস ও লক্ষণাবলি, কিন্তু কবিতা বলতে যে ঠিক কী বোঝায়, কোনও স্পষ্ট সংজ্ঞার মাধ্যমে তা তিনি নির্দেশ করেননি।

কবিতার জন্মরহস্য সম্পর্কে অবশ্য তিনি নীরব নন। রাজশেখরের 'কাব্য মীমাংসা'য় আছে "পুরাকালে সরস্বতী পুত্র কামনা করিয়া হিমালয়পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। সন্তুষ্ট মনে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন— 'আমি তোমার পুত্র সৃষ্টি করিতেছি।' তাহার পর সরস্বতী কাব্যপুরুষকে প্রসব করিলেন।" [২] আরিস্টটল কিন্তু তেমন কোনও দৈব উৎসের উল্লেখ করেন না। বরং বেশ স্পষ্ট করেই তিনি আমাদের জানিয়ে দেন যে, কবিতা আসলে বাস্তব জীবন কিংবা ঘটনারই এক ধরনের অনুকৃতিমাত্র। তাঁর বক্তব্য, "মানুষ হচ্ছে অনুকরণপ্রিয় প্রাণী, সে সবকিছুকে অনুকরণ করে দেখাতে পারে, যা কিনা অন্যান্য প্রাণী পারে না," এবং তার এই অনুকরণস্পৃহা থেকেই জন্ম নিয়েছে কবিতা।

বলা বাহুল্য, আরিস্টটলের এই উক্তি আমাদের ভাবায়, কিন্তু আমাদের কৌতূহল শুধু এইটুকু জেনে তৃপ্ত হয় না। তার কারণ, গ্রিক দার্শনিকের ভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটবার দরুন ইতিমধ্যে আমরা এ-ও জেনেছি যে, শুধু কবিতা নয়, সর্বরকমের সুকুমার শিল্পই হচ্ছে বাস্তবের অনুকরণ। অর্থাৎ কোনও শিল্পকেই মৌল কোনও রচনা বলে গণ্য করা চলে না, সবই আসলে মূলের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। সে-ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, চিত্রকলার সঙ্গে কবিতার তবে আর পার্থক্য কোথায়, কিংবা কীসের উপরে ভিত্তি করে তা হলে ভাস্কর্য কিংবা সংগীত থেকে কবিতাকে আমরা আলাদা করে চিনে নেব?

আরিস্টটল যে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি, তা অবশ্য নয়; তিনি আমাদের বলেই দিচ্ছেন যে, সব শিল্পই যদিও বাস্তব অথবা সত্যের অনুকৃতিমাত্র, তবু বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যম, বিষয় ও রীতি বা পদ্ধতি তো এক নয়, সে-ক্ষেত্রে তারা পরস্পর থেকে পৃথক। বস্তুত, মাধ্যম, বিষয় ও রীতির বিশিষ্টতা থেকেই বিভিন্ন শিল্পকে আমরা আলাদা করে চিনতে পারি।

কোনও শিল্পকে পৃথকভাবে শনাক্ত করবার এই যে উপায়, এরই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে চিত্র ভাস্কর্য কিংবা সংগীতকলা থেকে কবিতাকে একেবারে আলাদা করে চিনে নেবার একটি সহজ সূত্র। চিত্রের মাধ্যম যদি রং ও রেখা, ভাস্কর্যের মাধ্যম যদি ত্রিমাত্রিক শিলাখণ্ড এবং সংগীতের মাধ্যম যদি ধ্বনি, কবিতার মাধ্যম

২. *রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা* । শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

তাহলে শব্দ। কবিতা কী, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তবে আর চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলবার দরকার কী? খুব সহজেই তো এখন তা হলে আমরা বলতে পারি যে, কবিতা হচ্ছে শব্দ। মুশকিল এই যে, কেউ-কেউ শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হন না, আরও খানিকটা এগিয়ে যান। তাঁদের বক্তব্য, শব্দকে এক্ষেত্রে শুধু 'মাধ্যম' বলাটাই যথেষ্ট নয়, শব্দের ভূমিকা এক্ষেত্রে আরও বড়ো। যার ভিতর দিয়ে একটি কবিতা প্রকাশ পাচ্ছে, সেই শব্দগুলিকে যদি আমরা সরিয়ে নিই, কবিতাটিরও কোনও অস্তিত্ব তাহলে থাকে না। সেই বিচারে আমাদের বলতে হয় যে, কবিতা হচ্ছে শব্দ, এবং শব্দই হচ্ছে কবিতা।

তা কি আমরা বলতে পারি? না, পারি না। কেন পারি না, একটু বাদেই সে-কথায় আবার আসা যাবে। তার আগে বলা দরকার যে, কাব্যজিজ্ঞাসার এই সহজ সমাধানকেও অনেকে একেবারে অগ্রাহ্য করছেন না। এবং তাঁদেরই মধ্যে একজন, চার্লস হুইলার, আমাদের জানাচ্ছেন যে, যে-সমাধান সবচেয়ে সরল, স্রেফ ওই সারল্যের জন্যেই অনেকক্ষেত্রে সেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।[৩] প্রসঙ্গত তিনি এডগার অ্যালান পো'-র সেই গল্পের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্যে একখানা চোরাই চিঠিকে আসামি যেখানে পুলিশের একেবারে চোখের সামনেই ফেলে রেখেছিল। বলা বাহুল্য, চোখের সামনে ছিল বলেই পুলিশ সেটা দেখতে পায়নি, কিংবা দেখতে পেলেও গুরুত্ব দেয়নি, হরেক গোপন জায়গায় তারা সেই চিঠির জন্য গলদ্‌ঘর্ম তল্লাশ চালিয়েছে। শুধু পো'-র ওই একটি গল্প কেন, এমন আরও অনেক রহস্যকাহিনি আমরা পড়েছি, লেখক যেখানে পাঠকের সামনে একটি সহজ সমাধান ঝুলিয়ে রেখে দেন, অথচ সহজ বলেই পাঠক সেটাকে গুরুত্ব দিতে চায় না, তার নজর স্বতই চলে যায় সম্ভাব্য আরও হরেক সমাধানের দিকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বোকা বনতে হয়, কেন-না শেষ পরিচ্ছেদে লেখক জানিয়ে দেন যে, ওই সহজ সমাধানটিই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। কিন্তু সে-কথা থাক। দরকারি কথাটা হচ্ছে এই যে, কবিতা-বিষয়ক এই সহজ সমাধানটিকে হুইলারও আসলে তাঁর আলোচনাকে এগিয়ে নেবার সুবিধার জন্য গ্রাহ্য করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনিও একে চূড়ান্ত সমাধান বলে মানেননি।

মানছি না, বলা বাহুল্য, আমরাও। কেন-না, আমাদের চিত্তে ইতিমধ্যে অন্য-একটি জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে। কবিতা অবশ্যই শব্দ। কিন্তু নিতান্ত সেই কারণেই কি শব্দকে আমরা কবিতা বলে গ্রাহ্য করব? যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত শব্দকে? তাহলে তো যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত রং ও রেখাকে চিত্র বলে, যে-কোনওভাবে ব্যবহৃত ত্রিমাত্রিক শিলাখণ্ডকে ভাস্কর্য বলে এবং যে-কোনওভাবে

৩. *The Design of Poetry.* Charles B. Wheeler.

ব্যবহৃত ধ্বনিকে সংগীত বলে আমাদের গ্রাহ্য করতে হয়। কিন্তু তা তো আমরা করি না। শুধু তা-ই নয়, ইতিমধ্যে আবার আর-এক দিক থেকেও এই সমস্যাটিকে আমরা দেখতে শুরু করেছি। আমরা ভাবছি যে, শুধু কবিতা কেন, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার— উপন্যাসের, গল্পের কি নাটকের— মাধ্যমও তো শব্দই। শুধু মাধ্যম নয়, তার চেয়ে বেশি-কিছু। কেন-না, সে-ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যার মাধ্যমে সেগুলি রচিত হচ্ছে, সেই শব্দগুলিকে যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, উপন্যাস, গল্প কী নাটকেরও কোনও পৃথক অস্তিত্ব তাহলে থাকে না। সুতরাং শব্দ আর কবিতাকে যদি আমরা তুল্যমূল্য বলে মনে করি, তবে শব্দ আর উপন্যাস, শব্দ আর গল্প, কিংবা শব্দ আর নাটককেও তুল্যমূল্য জ্ঞান করতে হয়। এবং তা যদি আমরা করি, অবস্থাটা তা হলে এইরকম দাঁড়ায় :

কবিতা হয় শব্দ
শব্দ হয় উপন্যাস,
(সুতরাং) কবিতা হয় উপন্যাস।

অর্থাৎ, ব্যাপারটা একেবারে যৎপরোনাস্তি হাস্যকর হয়ে ওঠে।

তাহলে আমরা কী বুঝব? আমরা কি এটাই বুঝব যে, এক্ষেত্রে যে প্রেমিস অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য বা হেতুবাক্যের সোপান বেয়ে আমরা সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছিলুম, তারই মধ্যে একটা ভ্রান্তি থেকে গিয়েছিল, এবং সেই ভ্রান্ত আশ্রয়বাক্যই একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের ঠেলে দিয়েছে? বলা বাহুল্য, তা-ই আমাদের বুঝতে হবে! আমাদের ধরেই নিতে হবে যে, শব্দ যদিও কবিতার মাধ্যম, এমনকি কবিতার অস্তিত্ব যদিও শব্দের অস্তিত্বের উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল, তবু কবিতা ও শব্দকে তুল্যমূল্য কিংবা সমার্থক বলে গণ্য করা চলে না!

কোনও কালেরই কোনও কবি কিংবা সমালোচক যে তা করেছেন, তা-ও নয়। কবিতার আলোচনায় এই অভিমত তবে প্রাধান্য পেয়েছিল কেন যে, পোয়ট্রি ইজ ওয়ার্ডস? প্রাধান্য যাঁরা দিয়েছিলেন, কবিতাকে যে তাঁরা মুখ্যত একটি ভাষাশিল্প বলে গণ্য করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, নিতান্ত ভাষাশিল্প না-ভেবে, কবিতাকে যাঁরা বিশেষ এক ধরনের ভাষার শিল্প বলে মনে করতেন, প্রতিপত্তি তাঁদেরও কিছু কম ছিল না। তাঁরা এমনও ভাবতেন যে, কবিতা হচ্ছে এমনই সুকুমার একটি শিল্প, যা তার উপাদান হিসেবে শুধু সুকুমার শব্দই দাবি করে। সমস্ত শব্দই যে কবিতায় ব্যবহৃত হবার যোগ্য, এবং যোগ্যজনের হাতে পড়লে, কোনও শব্দকেই যে কবিতার মধ্যে অনধিকার-প্রবেশকারীর মতো অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না, এই উদার ধারণা তাঁদের কাছে প্রশ্রয় পায়নি। 'পোয়েটিক ডিকশন' বলে যে-ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত, তার প্রতি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের অত্যধিক আসক্তির কথা আমরা

শুনেছি। সেইসঙ্গো জেনেছি যে, শেকসপিয়রের রচিত একটি সংলাপ কেন পরবর্তীকালের একজন বিখ্যাত সমালোচকের অনুমোদনলাভে ব্যর্থ হয়েছিল। ম্যাকবেথের উক্তির মধ্যে 'নাইফ' শব্দটা ড. স্যামুয়েল জনসনের পছন্দ হয়নি; বস্তুত তাঁর এমনও মনে হয়েছিল যে, ওই শব্দটা থাকার ফলে গোটা সংলাপটাই একেবারে ঝুলে গেছে। মনে হবার কারণ আর কিছুই নয়, 'নাইফ' নামক অস্ত্রটি কসাই ও পাচকেরা ব্যবহার করে থাকে, এবং— ড. জনসনের বিবেচনায়— এই 'ইতরজনসংসর্গের' ফলে তার শুচিতা নষ্ট হয়েছে, সুতরাং কবিতায় তার উল্লেখ নিষেধ। শেকসপিয়রের কপাল ভালো, ড. জনসনের পাল্লায় তাঁকে পড়তে হয়নি, স্বদেশীয় সাহিত্যের শব্দরুচি অত্যধিক সভ্যভব্য হয়ে উঠবার অনেক আগেই তিনি ধরাধাম পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

কাব্যিক শব্দের প্রতি এই যে পক্ষপাত, এটা কিন্তু একান্তভাবেই অষ্টাদশ শতকের ব্যাপার নয়, কিংবা বিশেষভাবে ইংরেজি সাহিত্যেরও ব্যাপার নয়। এই সেদিনও বাংলা কাব্যসাহিত্যের যা ছিল প্রধান স্রোতোধারা, এবং মুখ্যত যা ছিল রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে উৎসারিত, গত শতাব্দীর অন্ত্য অধ্যায় ও এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে তার মধ্যেও এই একই পক্ষপাত আমরা দেখতে পাই। আমরা লক্ষ করি যে, সাধারণ মানুষেরা তাদের কথাবার্তায় যেসব শব্দ প্রায়শ ব্যবহার করে থাকে, সেই আটপৌরে শব্দগুলি সেখানে বিশেষ প্রশ্রয় পায় না, এবং সাধারণ মানুষদের নিত্যব্যবহার্য নানা সাংসারিক জিনিসপত্র সম্পর্কেও সেই কবিতা বড়ো বিস্ময়করভাবে নীরব থাকে।

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবি টমাস গ্রে বলেছিলেন, কবিতা কখনও তার সমকালীন ভাষায় রচিত হয় না। গ্রে-র এই উক্তিকেই বাংলা কবিতা পরবর্তী শতকে তার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল কি না, তা আমার জানা নেই। তবে, উনিশ শতকের অন্ত্য অধ্যায় থেকে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি যিনি ছিলেন বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষ, সেই রবীন্দ্রনাথের, অন্যবিধ সাহিত্যকর্মে না হোক, কবিতায়— এমনকি, এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে রচিত কবিতায়— যে-শব্দরুচির সঙ্গো আমাদের পরিচয় ঘটে, তাতে আমরা বুঝতে পারি যে, কবি হিসেবে তিনিও ছিলেন 'কাব্যিক' শব্দের পক্ষপাতী। তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক নিবন্ধাবলিতেও এই সত্যটা গোপন থাকেনি। সেখানে তিনি দাবি করছেন বটে, "আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই,"[৪] কিন্তু পরক্ষণেই বলছেন, "বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেণুবন বলে সামলে নিতে হয়।"[৫] শুনে কি গ্রে-র কথাটাই মনে পড়ে না? আবার যখন শুনি, "বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়োফুল, এই-সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে,"[৬] তখন সেই

৪. ৫. ৬. সাহিত্যধর্ম। *সাহিত্যের পথে*।

জনসনের কথাই আমাদের মনে পড়ে যায়, যিনি বিশ্বাস করতেন যে, কসাই ও পাচকের সংসর্গদোষ নাইফ শব্দটার জাত মেরে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে সেই পর্যায়ে রচিত তাঁর কবিতায় কোথাও আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেননি, কিংবা নামোল্লেখ করেননি আমাদের নিত্যব্যবহার্য বস্তুসামগ্রীর, তা অবশ্য নয়। এক্ষুনি আমার মনে পড়ছে গত শতকের অন্ত্য দশকে রচিত তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার[৭] কথা, যেখানে 'হাঁড়ি' 'সরা' থেকে শুরু করে 'গুড়ের পাটালি' আর 'ঝুনা নারিকেল' পর্যন্ত এমন-সমস্ত শব্দের উল্লেখ ঘটেছে, হেঁশেল আর উদরের সঙ্গে যাদের 'সংসর্গদোষের' কথা আমরা সবাই জানি। উপরন্তু সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে আটপৌরে বাগ্‌ভঙ্গিমাও। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা লক্ষ না-করে পারি না যে, এই জাত-যাওয়া বস্তুসামগ্রীর নাম আর আটপৌরে বাগ্‌ভঙ্গিমা আসছে কবিতাটির শুধু সেই অংশেই, যেখানে তিনি একটু রঙ্গরসের লঘু আবহ গড়ে তুলতে চান। আমরা বুঝতে পারি, আটপৌরে শব্দ আর আটপৌরে বাগ্‌ভঙ্গিমা সেখানে তাঁর কৌতুকের উপকরণমাত্র। তার বেশি মর্যাদা তিনি তখনও তাদের দিচ্ছেন না। এমনকি তার অনেক বছর পরে লেখা, প্রায় একই রকমের বিখ্যাত, আর-একটি কবিতাতেও[৮] না। সেখানে রুগ্‌ণা নারীটি যখন বলে, "রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা / বাইশ বছর এক চাকাতে বাঁধা", তখন সেই বক্তব্যের সূত্র ধরে কত অনায়াসেই তো নিত্যব্যবহার্য নানা তৈজসপত্রের উল্লেখ ঘটতে পারত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা ঘটতে দেন না, হেঁশেলের আভাসমাত্র দিয়েই তাঁকে— তাঁরই ভাষায় বলি— "সামলে নিতে হয়।" অথচ ওসব জিনিসের উল্লেখ ঘটলে কবিতাটির বেদনার দিকটা যে কিছুমাত্র চাপা পড়ত, এমন কথা বিশ্বাস করবার কোনও যুক্তি নেই।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ইংরেজি সাহিত্যের হঠাৎ-ভব্য-হয়ে-ওঠা পরিবেশের মধ্যে স্যামুয়েল জনসন যখন 'অকাব্যিক' শব্দের দিকে তাঁর নিষেধের তর্জনী তুলে ধরছিলেন, টমাস গ্রে যখন সমকালীন ভাষা থেকে কবিতার ভাষাকে একেবারে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিচ্ছিলেন[৯] এবং অলিভার গোল্‌ডস্মিথ যখন তার এই প্রত্যয়কে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টায় ছিলেন যে, সব শব্দ নয়, প্রতিটি ভাষাতেই আসলে কবিতায় ব্যবহৃত হবার যোগ্য আলাদা এমন-কিছু শব্দ রয়েছে, যা আমাদের কল্পনাকে দীপিত করে ও কর্ণকে আরাম দেয়'[১০] তখন অন্যদিকে ধীরে-ধীরে তৈরি

৭. যেতে নাহি দিব (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)। *সোনার তরী*।

৮. মুক্তি (১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। *পলাতকা*।

৯. "The language of the age is never the language of poetry." Thomas Gray.

১০. "There are certain words in every language particularly adapted to the poetical expression ; some from the image or idea they convey to the imagination ; and some from the effect they have upon the ear." Oliver Goldsmith.

হয়ে উঠছিল বিদ্রোহের পটভূমি। আমরা জানি যে, এর কিছুদিন বাদেই আবির্ভাব ঘটবে ওয়র্ডসওয়র্থের। জানি যে, পোশাকি শব্দকে নির্বাসনে পাঠাবার আহ্বান জানাবেন তিনি। বলবেন যে, শুধু সেই ভাষাতেই কবিতা লেখা উচিত, যা কিনা মানুষের নিত্যব্যবহার্য মুখের ভাষা।[১১]

বলা বাহুল্য, ঝোঁকটা এক্ষেত্রে বিপরীত বিন্দুতে পড়ছে বটে, কিন্তু এ-ও আসলে চরম পন্থাই, এক ধরনের শব্দকে যা সমূহ গ্রহণ করতে বলে ও অন্য ধরনের শব্দকে যা সমূহ বর্জন করতে শেখায়। বুঝতে চায় না যে, কবিতার উপাদান হিসেবে সমস্ত শব্দই গ্রাহ্য, কিন্তু নির্বিচারে কোনও শব্দই গ্রাহ্য নয়। আসলে, কোনও কবিতার মধ্যে কোনও শব্দকে অনধিকার-প্রবেশকারী বলে মনে হবে কি না, সেটা একেবারে সর্বতোভাবেই নির্ভর করছে শব্দগুলিকে যিনি ব্যবহার করেন, তাঁর যোগ্যতার উপরে। বস্তুত, কোনও কবিতার মধ্যে কোনও শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছ যখন আড়ষ্ট, অপ্রতিভ ও অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং কবিতাটিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করে না, তখন এটাই আমাদের বুঝতে হবে যে, শব্দ-নির্বাচনে— অন্তত সেই কবিতাটিকে নির্মাণ করে তুলবার সময়ে— তিনি যথেষ্ট রকমের যোগ্যতা দেখাতে পারেননি।

আটপৌরে-শব্দ-সংবলিত কথ্যভাষায় কবিতা লিখবেন, ওয়র্ডসওয়র্থের এই প্রতিজ্ঞায় তাঁর সমসাময়িক অন্য-এক বিশিষ্ট কবির, কোলরিজের কিছুমাত্র সায় ছিল না। তার কারণ, 'কাব্যিক শব্দসুষমা'র প্রতি তাঁরও আস্থা ছিল আত্যন্তিক। আপন প্রত্যয়ের সপক্ষে সেদিন অতিশয় জোরালো রকমের তর্কও তিনি চালিয়েছেন। পরবর্তীকালের সাহিত্য-আলোচনার উপরে সেই তর্কবিতর্কের ছায়া যখন বারে বারে সঞ্চারিত হচ্ছিল, তখন, তারই মধ্যে, স্যার ওয়ালটার রলির মুখে আমরা এমন একটা কথা শুনতে পেলুম, যা কিনা একটা মীমাংসা-সূত্রের আভাস এনে দেয়। কবিতার আলোচনায় শব্দের গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা তিনি অস্বীকার করলেন না, কিন্তু একই সঙ্গে বললেন যে, ওয়র্ড-অর্ডার বা শব্দ-বিন্যাসের গুরুত্বও কিছু কম নয়।[১২]

সম্ভবত আরও বেশি। রলি অবশ্য তাঁর স্বদেশীয় কবিতার শব্দ-বিন্যাসের কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু শুধু ইংরেজি কবিতা নয়, সমস্ত ভাষার কবিতা সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। শব্দের সুষ্ঠু বিন্যাস আসলে কবিতামাত্রকেই সেই সামর্থ্য জোগায়, যা থাকলে তবেই একটি কবিতা, কিংবা তার একটি অংশ, সবচেয়ে জোরালোভাবে

১১...."the real language of men." W. Wordsworth.

১২. *Wordsworth.* Sir Walter Raleigh.

আমাদের চিত্তে এসে আঘাত করে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ছন্দের দিক থেকে যে-পঙ্‌ক্তিটিকে বিচার করে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ,[১৩] এবং বলেছিলেন যে, "ছন্দের ঝংকারের মধ্যে" দুলিয়ে দেবার ফলেই এই পঙ্‌ক্তিটি এমন একটা স্পন্দন পেয়ে যাচ্ছে, যা "কোনো দিনই শান্ত হবে না", সেই "কেবা শুনাইল শ্যামনাম"কে আরও কতভাবে আমরা সাজিয়ে নিতে পারি, নীচে সেটা দেখানো হল :

ক) শুনাইল কেবা শ্যামনাম
খ) শ্যামনাম কেবা শুনাইল
গ) কেবা শ্যামনাম শুনাইল
ঘ) শ্যামনাম শুনাইল কেবা
ঙ) শুনাইল শ্যামনাম কেবা।

বলা বাহুল্য, মূল পঙ্‌ক্তিটিকে পুনর্বিন্যস্ত করে এভাবে সাজিয়ে নিলেও তার অর্থ একই থাকে, এবং ছন্দের যেটা মূল কাঠামো, তারও কোনও হানি হয় না। কিন্তু নবতর এই বিন্যাসগুলি ঠিক ততটাই জোর পায় না, পঙ্‌ক্তিটির মূল বিন্যাসের মধ্যে যতটা জোর আমরা লক্ষ করি। মূল বিন্যাসকে সেদিক থেকে 'ধ্রুব বিন্যাস' বলতে হয়। ধ্রুব এই অর্থে যে, তার আর কোনও নড়াচড়া হবার উপায় নেই।

একটু বাদেই এই বিন্যাসের প্রসঙ্গে আমাদের ফিরতে হবে। কিন্তু তার আগে আর-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সেটা এই যে, শব্দকে প্রাধান্য দেবার এই যে প্রবণতা, এরই সমান্তরালভাবে আর-একটি প্রবণতাও যে ভিন্নতর একটি সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গেছে, তা-ও আমরা লক্ষ না করে পারি না। আমরা দেখতে পাই যে, একদিকে যখন শব্দ ও ভাষার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তখন, অন্যদিকে, ভাষার উপরে আসন দেওয়া হচ্ছে ভাবনাকে। শেলির 'এ ডিফেন্স অব পোয়্ট্রি' খুব স্পষ্ট করেই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, কবিতার যা কিনা সারাৎসার, ভাষার মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেন-না শব্দকে তা অতিক্রম করে যায়। শৃঙ্খলা (অর্ডার), সৌন্দর্য (বিউটি) ও সত্যের (ট্রুথ) সঙ্গে তার তুলনা টেনেছেন শেলি। বলছেন, শব্দ দিয়ে যা আমরা বানিয়ে তুলি, শুধু সেইটুকুর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়।

শেলির এই বক্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, কবিতার শরীর ও কাব্য-ভাবনাকে শেলি আসলে পৃথক করে দেখতে চাইছেন। নিতান্ত শব্দের মধ্যে যেটুকু ধরা পড়েছে, আমরা যখন তারই উপরে নিবন্ধ করছি আমাদের আগ্রহ, তখন তার দিক থেকে আমাদের চিন্তাকে তিনি ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন সেই

১৩. *ছন্দ*। রবীন্দ্রনাথ।

ভাবনার দিকে, ঠান্ডা ও কঠিন গুটিকয় শব্দের মধ্যে যার অনেকটা অংশই ধরা পড়েনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, কবির ভাবনার যে-অংশকে তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে ধরিয়ে দিতে পারেননি, আমাদেরই কি তা ধর্তব্য? সত্যি বলতে কী, তা-ও যদি আমাদের ধর্তব্য হয়, কবিতা নিয়ে তাহলে আর বিতণ্ডার অন্ত থাকে না। প্রেম ভালোবাসা বিদ্বেষ বিরহ যুদ্ধ রক্তপাত কিংবা এই রকমের যে-কোনও বিষয় নিয়ে নিতান্ত দায়সারা গোছের গুটি চার-ছয় লাইন লিখেও তো যে-কোনও কবি সে-ক্ষেত্রে অক্লেশে আমাদের বলতে পারেন যে, ওই চার-ছয় লাইনের মধ্যে যা পাওয়া যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে যেন কবিতাটিকে আমরা বিচার করতে না যাই, কেন-না, ওর মধ্যে যেটুকু ধরা পড়েছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো করে, অনেক নিবিড় করে ওই বিষয়টিকে তিনি ভেবেছিলেন। বলা বাহুল্য, শিল্পীমাত্রেই তা-ই ভেবে থাকেন, এবং কোনও শিল্পীই তাঁর ভাবনাকে একেবারে সর্বাংশে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিম্বিত করে দেখাতে পারেন না। কবি পারেন না, চিত্রকর পারেন না, ভাস্কর পারেন না। ভাবনা ও রূপের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য সর্বক্ষেত্রে থেকেই যায়। শুধু কবি বলে কথা নেই, তৃপ্তিহীনতা তাই শিল্পীমাত্রেরই নিয়তি।

অন্যান্য শিল্পের কথা থাক। কবিতার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কবির ভাবনার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হবার কোনও উপায় যদি আমাদের থাকত, তাহলে তো— স্থূলভাবে দেখতে গেলে— কবিতা পড়বার কোনও দরকারই আমাদের হত না। কিন্তু তেমন কোনও উপায় আমাদের নেই। ফলে, তাঁর ভাবনার যেটা ব্যক্ত অথবা বাস্তব রূপ, শব্দ-রূপ, তারই সাহায্য নিতে হয় আমাদের। এবং খুশি থাকতে হয় কবির ভাবনার শুধু সেইটুকুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে, যেটুকু তাঁর কবিতার মধ্যে বিম্বিত ও আভাসিত হয়েছে। কীভাবে বিম্বিত ও আভাসিত হয়েছে, শুধু সেইটুকুই আমাদের বিচার্য। যখন আমরা কবিতা পড়ি, তখন আমরা কবিতা-ই পড়ি; ভাবনার ওই শব্দ-রূপ ছাড়া আর কিছুই তখন আমাদের বিচার্য নয়।

কিন্তু ওই শব্দ-রূপের ভিতর দিয়েই যে শব্দাতীতের আভাস পেয়ে যাই আমরা, তা-ই-বা কী করে অস্বীকার করি? বস্তুত, গদ্যের সঙ্গে কবিতার এখানেই মস্ত পার্থক্য। গদ্যও এক ধরনের শব্দ-রূপই, আমাদের ভাবনাকে সে-ও মূর্তি দেয়, কিন্তু শব্দ সেখানে তার তাৎক্ষণিক বা আভিধানিক অর্থের বেশি-কিছু আমাদের বলে না। কবিতার শব্দ সে-ক্ষেত্রে তার তাৎক্ষণিক অর্থকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, ছাড়িয়ে প্রায়শ যায়ও, ইঙ্গিত করতে থাকে অন্যতর কোনও অর্থ কিংবা তাৎপর্যের দিকে।

এই যে তাৎক্ষণিক অর্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া, একেই আমরা বলি ব্যঞ্জনা, আর এই ব্যঞ্জনাকেই আমরা কাব্যের একটি ধ্রুব অভিজ্ঞান বলে গণ্য করতে পারি।

প্রশ্ন উঠবে, শব্দ কীভাবে তার তাৎক্ষণিক অর্থকে ছাড়িয়ে যায়। উত্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে, তার একক শক্তিতে সেটা সম্ভব হয় না। প্রতিটি শব্দেরই একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, এবং, বাক্যের ভিতর থেকে সরিয়ে এনে, শব্দগুলিকে যখন আমরা পৃথক-পৃথকভাবে দেখি, তখন সেই সুনির্দিষ্ট অর্থের আশ্রয়েই তাদের নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। পক্ষান্তরে, বাক্যের ভিতরে প্রবিষ্ট হবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে তাদের নিশ্চলতার অবসান ঘটে, তা-ও নয়। ঘটে একমাত্র তখনই, ঠিকমতো-নির্বাচিত দুই বা ততোধিক শব্দ যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে দাঁড়ায়। এই যে পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়ানো, একে আমরা 'বিদ্যুন্ময়' সান্নিধ্য বলতে পারি। আমরা লক্ষ করি যে, এই সান্নিধ্য অর্জিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই শব্দের সেই অর্থগত নিশ্চলতার অবসান ঘটেছে, তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এবং পরস্পরের সহযোগে তারা তাদের ধরাবাঁধা অর্থকে অতিক্রম করে অন্যতর কোনও অর্থ অথবা তাৎপর্যকে আভাসিত করতে চাইছে। অর্থাৎ, অর্থের বিচারে, যা ছিল নেহাতই একমাত্রিক বা 'ওয়ান-ডাইমেনশনাল' ব্যাপার, সহসা সে একটি বাড়তি মাত্রা পেয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা যখন পড়ি :

হে হংসবলাকা
ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি *আনন্দের অট্টহাসে*
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।....[১৪]

অথবা জীবনানন্দের কবিতায়

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক *বিপন্ন বিস্ময়*
আমাদের *অন্তর্গত রক্তের* ভিতরে
খেলা করে...[১৫]

তখনই আমরা শব্দের সেই বিদ্যুন্ময় সান্নিধ্যের ক্রিয়াফল উপলব্ধি করতে পারি। একটু আগে আমরা যে ওয়র্ড-অর্ডার বা শব্দ-বিন্যাসের কথা শুনেছিলুম, এইখানেই তার গুরুত্ব।

কিন্তু সঠিক বিন্যাস থেকে জাত এই যে ক্রিয়াফল,— ধরাবাঁধা অর্থের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য এবং অন্যতর অর্থকে আভাসিত করার জন্য শব্দের এই

১৪. বলাকা। *বলাকা*।
১৫. আট বছর আগের একদিন। *মহাপৃথিবী*।

যে চঞ্চলতা, শুধু কবিতার মধ্যেই যে একে আমরা দেখতে পাই, তা-ও নয়। দেখতে পাই অনেক গদ্যরচনার মধ্যেও। তখন আমরা বলি যে, সেই গদ্যরচনা—অন্তত সেই রচনার সেই অংশটুকু—যেন কবিতা হয়ে উঠেছে।

কবিতা কী, এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে, কবিতা আসলে শব্দ নয়, বরং শব্দকে ব্যবহার করবার এক রকমের গুণপনা। ভাষার মধ্যে যা কিনা অন্যবিধ একটি দ্যোতনা এনে দেয়। (উদ্ধৃত দুটি কবিতাংশে বাঁকা হরফে মুদ্রিত দুই বা ততোধিক শব্দ যেমন দিয়েছে।) অথবা বলতে পারি, কবিতা আসলে ভাষার একটি স্তর, কবিতা বলে গণ্য হতে হলে আমাদের ভাবনার শব্দ-রূপকে যে-স্তরে উত্তীর্ণ হতে হবেই; আবার, অন্যদিকে, গদ্যরচনাও যে-স্তরকে মাঝে-মাঝে স্পর্শ করে যায়।

কবিতা কেন

সত্যিই তো, কেন?

আমাদের চতুর্দিকে অহোরাত্র যে অসংখ্যা রকমের কর্মকাণ্ড চলেছে, এবং যার উপরে নির্ভর করছে আমাদের বৈষয়িক ভালোমন্দ, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, তার সঙ্গে যদি কবিতা রচনা ও পাঠের ব্যাপারটাকে কার্যকারণের সূত্রে যুক্ত করে দেখানো যেত, এবং যদি বলা যেত যে, কিছু লোক কবিতা লেখেন ও কিছু লোক কবিতা পড়েন বলেই এত-সব কাজ অবাধে চলতে পারছে, নইলে এসব কাজের চাকা কবেই অচল হয়ে পড়ত, তাহলে আর কথাই ছিল না, একেবারে নিশ্চিত হয়ে সে-ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারতুম যে, এই তো, এরই জন্যে কবিতা।

কিন্তু সেইসব কর্মকাণ্ডের কোনওটার সঙ্গেই কবিতার ঠিক তেমন কোনও যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই না। রাতারাতি জলাভূমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ধাপে-ধাপে লাফিয়ে উঠছে অভ্রংলিহ অট্টালিকা, বিশাল বনস্পতিকে লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে বুলডোজার, কারখানার চিমনি গিয়ে মেঘের বালিশে মাথা রাখছে, নদীর গর্ভ থেকে উঠে আসছে মস্ত-মস্ত পিলার, তার উপরে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে কংক্রিটের সড়ক, চায়ের পেটি কিংবা আলুর বস্তা ঘাড়ে নিয়ে হাইওয়ে কাঁপিয়ে ট্রাক ছুটছে, জাহাজের উদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে গম, তেল, যন্ত্রপাতি কিংবা নিউজপ্রিন্ট, মাটির তলায় পাতা হচ্ছে রেলের লাইন, রানওয়ে থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যাচ্ছে এরোপ্লেন,—এই যে এত-সব বৃহৎ ঘটনা, এর প্রত্যেকটিকে নিয়েই কবিতা লেখা যায় বটে, কিন্তু কবিতাকে এর একটিরও হেতু হিসেবে নির্দেশ করা চলে না। অর্থাৎ, এক কথায়, এসব কাজের কোনওটার সঙ্গেই কবিতার কোনও কার্য-কারণের সম্পর্ক নেই। এমনকি, নিতান্ত জীবিকার্জনের জন্য ন্যূনতম যেটুকু উদ্যোগ আমাদের না থাকলেই নয়, তার সঙ্গেও না। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে কেউ কখনও কবিতা লিখতে বসেনি।

জীবিকার্জনের উদ্যোগের সঙ্গে কবিতার এই যে সম্পর্কহীনতা, রবীন্দ্রবর্ণিত কবি-গৃহিণী একেবারে সরাসরি এর দিকে আঙুল তুলেছেন। ভদ্রমহিলার উক্তি খুবই স্পষ্ট। স্বামীর উদ্দেশে তিনি যখন বলেন :

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম;
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।[১]

তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে একমত হই। আমরা বুঝতে পারি যে, এই গঞ্জনা একটা মস্ত বড়ো অভিমান থেকে উঠে আসছে বটে, কিন্তু তাঁর কথাটা তাই বলে মিথ্যে নয়।

প্লেটো অবশ্য অন্য দিক থেকে তাঁর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। 'রিপাবলিক'-এর দশম গ্রন্থে কবিতার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, ক) এমন-সমস্ত বস্তুকে সে অনুকরণ করে দেখায়, যারা নিজেরাই অনুকরণ বা প্রতিচ্ছবিমাত্র; উপরন্তু খ) আমাদের হীন ও দুর্বল প্রবৃত্তিগুলিকে সে উসকে দেয়, এবং বশবর্তী হতে শেখায় এমন-সমস্ত আবেগ-বাসনার, যেগুলিকে দমন করা দরকার।[২]

এই ধরনের আপত্তি যে এ-দেশে কখনও ওঠেনি, তা-ও নয়। রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসায়* যেসব আপত্তির উল্লেখ করেছেন, তা হল এই যে, ক) কাব্যে মিথ্যা বিষয়ের বর্ণনা থাকে, খ) অসৎ বা গ্রাম্য বিষয়ে উপদেশ থাকে, এবং গ) অশ্লীল বিষয়ের বর্ণনা থাকে।[৩] (সুতরাং তার অধ্যয়ন বা আলোচনা অনুচিত।) রাজশেখর অবশ্য এসব আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু সে-কথা আবার পরে আসবে। আপাতত প্লেটোর প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

কবিতাকে প্লেটো যে কেন 'ছায়ার অনুকৃতি' বা 'অনুকরণের অনুকরণ' বলে গণ্য করেন, তা আমরা জানি। বস্তুত, শুধু কবিতা কেন, যাবতীয় শিল্পকর্মই তাঁর কাছে 'অনুকরণের অনুকরণ'মাত্র, তার বেশি মর্যাদা তিনি তাদের দেন না। কেন দেন না, *রিপাবলিক*-এ নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মোদ্দা কথাটা এই যে, জাগতিক যেসব বস্তু আমাদের চতুর্দিকে আমরা দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকটিরই পিছনে রয়েছে সেই বস্তু সম্পর্কিত ধারণা, এবং সেই ধারণাই হচ্ছে মূল সত্তা, বস্তু যার অনুকরণমাত্র। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, ছুতোর-মিস্ত্রি

---

১. পুরস্কার। *সোনার তরী*।

২. "...Poetry, the false Siren, the imitator of things which themselves are shadows, the ally of all that is low and weak in the soul against that which is high and strong, who makes us feed the things we ought to starve and serve the things we ought to rule..." আরিস্টটলের *কাব্যতত্ত্ব*-র ইনগ্রাম বাইওয়াটার-কৃত তরজমার ভূমিকা। গিলবার্ট মারে।

৩. *রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা*। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

যে-টেবিল বানাচ্ছেন, সেই টেবিলও আসলে টেবিল-সংক্রান্ত ধারণা বা টেবিলের মূল সত্তার অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলত, কোনও শিল্পী যখন সেই টেবিলটিকে এঁকে দেখান, তখন সেটা অনুকরণের অনুকরণ হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটো বলছেন, বস্তুত মূল সত্তার স্রষ্টা হচ্ছেন ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর যদি স্বয়ং একটা টেবিল বানাতেন, তা হলে তাঁর বানানো সেই টেবিল একটি মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য হতে পারত। কিন্তু, যেজন্যেই হোক, তা তিনি বানাননি। টেবিল বানিয়েছেন সূত্রধর, এবং শিল্পী সেই টেবিলের ছবি এঁকেছেন। শিল্পীর টেবিল অতএব টেবিলের মূল সত্তা থেকে তৃতীয় ধাপের দূরত্ব রয়েছে।[৪]

ঠিক ততটাই দূরে রয়েছে কবিতাও। যেমন শিল্পীর ছবি, তেমন হোমারের কাব্যও অনুকরণের অনুকরণ, অর্থাৎ মূল সত্তা থেকে অনেক দূরবর্তী ব্যাপার। প্লেটো অন্তত এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন। তাঁর যুক্তি : কবিদের দৃষ্টি মূল সত্যের প্রতি নিবদ্ধ নয়, তাঁরা তার প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবিটিকেই শুধু দেখেন। এমনকি, সেই প্রতিচ্ছবিটিরও নির্মাতা তাঁরা নন। তাঁরা শুধু সেই প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবি রচনা করেন। তাঁরা না-যোদ্ধা, না-জনসেবী, না-চিকিৎসক, না-পণ্ডিত। হোমারের কাব্যে যেসব বৃহৎ কর্মের বর্ণনা আমরা পাই, তিনি নিজে তার নায়ক নন। *রিপাবলিক*-এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে, হোমারের কালের এমন কোনও যুদ্ধের কথা কি কেউ জানে, যে-যুদ্ধের সাফল্য তাঁর নেতৃত্বে অথবা পরামর্শে অর্জিত হয়েছিল? মানুষের উপকার হয়, এমন কোনও বাস্তব কৌশলের কি তিনি উদ্ভাবক? কিংবা এমন কোনও শিক্ষাকেন্দ্র কি তাঁর দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল, শিক্ষার্থীরা তাঁর উপদেশ শ্রবণের জন্য যেখানে সমবেত হত? এসব প্রশ্নের প্রত্যেকটিরই উত্তর হচ্ছে 'না'। অর্থাৎ, অন্যে পরে কা কথা, হোমারের মতো মহাকবিও নিজে কিছু ঘটান না, অথবা নিজে কিছু করেন না। অন্যের দ্বারা আয়োজিত ঘটনার অথবা অন্যের কৃতকর্মের বর্ণনা দেন মাত্র।[৫]

---

৪. "...the work of the artist is at the third remove from the essential nature of the thing..." প্লেটোর *রিপাবলিক*-এর এফ.এম. কর্নফোর্ড-কৃত তর্জমা।

৫. হোমার যে কবিমাত্র, আর কিছু নন, এত জোর দিয়ে এ কথা বলবার হেতু নাকি এই যে, বিশেষভাবে হোমারকে ও সাধারণভাবে ট্র্যাজেডি-রচয়িতাদের সেই সময়ে— সফিস্ট ও হোমার-আবৃত্তিকারদের পক্ষ থেকে— সর্বগুণান্বিত মানুষ হিসেবে প্রচার করা হত। বলা হত, তাঁরা পদ্মভুক মানুষ নন, মালবাহী শকট নির্মাণ ও রথচালনা থেকে শুরু করে সমরকৌশল-নির্ধারণ পর্যন্ত অসংখ্য বিদ্যা তাঁদের অধিগত; উপরন্তু নীতি ও ধর্মের ব্যাপারেও 'সর্বসাধারণ'কে তাঁরা সঠিক পন্থার নির্দেশ দিতে সক্ষম। প্লেটো বস্তুত এই দাবিটিকেই অসার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন; যে-দাবি কবিকে দার্শনিকের আসনে বসায়, এবং দর্শনচর্চার পরিবর্তে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করে মানুষকে, তা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। (প্লেটোর *রিপাবলিক*-এর কর্নফোর্ড-কৃত তরজমায় দশম গ্রন্থের সূচনায় সন্নিবেশিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

তা-ই যদি হয়, তাহলে আমরা কবিতা পড়ব কেন? মূল সত্তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কেন আমাদের আগ্রহকে সংহত করব সেই রচনার উপরে যা আসলে ছায়ার ছায়ামাত্র? প্লেটো বলছেন, সত্যিই তা করা উচিত নয়। বলছেন, শুধু হোমার কেন, সত্য সম্পর্কে কোনও কবিরই কোনও যথার্থ জ্ঞান নেই। সুতরাং কবিতার উপরে আমাদের আগ্রহকে তো আমরা সংহত করবই না, বরং মানবজীবনে কাব্যের প্রভাব যে কত অনিষ্টকর, অন্যদেরও তা জানিয়ে দেব।

বলা বাহুল্য, অন্যদের জানিয়ে দেবার ব্যাপারে প্লেটোর উদ্যোগে কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাঁর চেতাবনি সত্ত্বেও যে কবিতা রচনা ও পাঠের আগ্রহ এতাবৎকাল অব্যাহত থেকেছে, তা আমরা জানি। জানি যে, প্লেটো তাঁর কল্পরাজ্য থেকে কবিতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের কল্পনাকে দীপিত করবার ব্যাপারে তার ভূমিকার কোনও অবসান তবু ঘটেনি, মানুষের চিত্তভূমিতে তার আসন চিরকাল অটুটই ছিল। উপরন্তু আমরা এ-ও জানি যে, কবিতার প্রতি প্লেটো নিজেও কিছু কম আসক্ত ছিলেন না। বস্তুত, *রিপাবলিক*-এর ওই দশম গ্রন্থেই হোমারের প্রতি তাঁর আশৈশব অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথাটা তিনি অকপট ব্যক্ত করেছেন।

প্লেটো তাহলে আর কবিতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন কেন? উত্তরটা আমরা প্লেটোর মুখেই শুনেছি। তিনি সত্যসন্ধ দার্শনিক; তাঁর দৃষ্টি সর্বোপরি সত্যের দিকে নিবদ্ধ। এবং কবিতা যেহেতু সত্যের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাই—হোমারের রচনার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সত্ত্বেও—এই শিল্পকে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে তিনি স্থান দিতে পারেন না। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, আবেগনির্ভর কবিতাকে তিনি যুক্তিনির্ভর দর্শনের বিরোধী একটি শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন। কবিতা সম্পর্কে তাঁর অন্যবিধ আপত্তি, বলা বাহুল্য, এই মৌল আপত্তির সূত্র ধরেই এসেছে।

কিন্তু কবিতা কি সত্যিই সত্যের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়? নাকি সে তার নিজস্ব পথে পৌঁছোতে চায় দ্বিতীয় কোনও সত্যের ক্ষেত্রে, যাকে আমরা শিল্পের নিজস্ব সত্য বলে গণ্য করতে পারি? এই যে প্রশ্ন, এর উত্তর খুঁজে নেবার প্রয়াসে আমরা প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটলের কাছ থেকে সাহায্য পাব, যাঁর কাব্য-বিষয়ক প্রস্তাবকে অনেকে— আমরা আগেই বলেছি— কবিতার প্রতি প্লেটোর উগ্র উষ্মার উত্তর বলে গণ্য করে থাকেন।

যেমন অন্যবিধ শিল্পকে, তেমনই কাব্যকেও আরিস্টটল যে অনুকরণ বলে মনে করতেন, কিন্তু অনুকরণের অনুকরণ নয়, তার কারণ, বস্তুজগৎ তাঁর কাছে নিতান্ত ছায়ামাত্র ছিল না, তাকে তিনি সত্য বলে মানতেন। ফলত, বস্তুজগৎকে যা অনুকরণ

করে দেখায়, সেই কাব্যকে তিনি কখনও সত্য থেকে তৃতীয় ধাপের দূরত্বে অবস্থিত ব্যাপার বলে মনে করেননি। কাব্যবিচারে গুরুশিষ্যের মতামতে আর-একটি পার্থক্যও আমরা লক্ষ না করে পারি না। আমাদের চিত্তের উপরে কাব্যের ক্রিয়া সম্পর্কে গুরু ও শিষ্য দুজনেই অবহিত ছিলেন; কিন্তু, তাঁর গুরুর মতো, আরিস্টটল কখনও এমন সিদ্ধান্ত করেননি যে, কাব্যের কাজ হচ্ছে নেহাতই আমাদের দুর্বল প্রবৃত্তিগুলিকে উসকে দেওয়া। বরং তাঁর কাব্য-বিষয়ক প্রস্তাবে তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলছেন যে, কাব্যের আবেদন আমাদের চিত্তের গভীরে গিয়ে সাড়া জাগায়। শুধু তা-ই নয়, কাব্য যে দর্শনবিরহিত ব্যাপার, এমন কথাও তিনি মানলেন না। ইতিহাস ও কাব্যের তুলনাপ্রসঙ্গে বরং জানালেন যে, ইতিহাসের চেয়ে কাব্য আরও দার্শনিক ও তার তাৎপর্য আরও দূরপ্রসারী, কারণ, কাব্য যে-ক্ষেত্রে সর্বজনীন সত্যের কথা বলে, ইতিহাস সে-ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কথা শোনায় মাত্র।[৬]

কাব্যের বিরুদ্ধে অনৈতিকতার যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তাকে আমল দেননি আরিস্টটল। বলেছেন, কোনও উক্তি অথবা আচরণকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে এক্ষেত্রে চলবে না; দেখতে হবে, কথাটা কে বলছে অথবা কাজটা কার। সেইসঙ্গে দেখতে হবে যে, সেই উক্তি অথবা আচরণের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিই-বা কে।...উক্তি অথবা আচরণের উদ্দেশ্য অথবা অভিপ্রায় কী, সেটাও হিসেবের মধ্যে ধরা চাই। ভেবে দেখতে হবে যে, বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, অথবা বৃহত্তর অমঙ্গলকে এড়াবার জন্য, কথাটা বলা হচ্ছে কি না অথবা কাজটা করা হচ্ছে কি না।[৭]

এই যে কোনও উক্তি অথবা আচরণকে বিচ্ছিন্ন করে না-দেখে, উদ্দেশ্য তাৎপর্য ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করে দেখা, সাহিত্যবিচারে এই পদ্ধতির মূল্য যে কতটা, তা আমরা জানি। কিন্তু শুধু এই পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না আরিস্টটল, এই সঙ্গে তিনি আরও একটা কথা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, কাব্যবিচারের ব্যাপারে যা কিনা আরও জরুরি। ইতিপূর্বে তিনি আমাদের বলেছেন যে, কাব্য

---

৬. "...poetry is something more philosophic and of greater import than history, since its statements are of the nature rather of universals, whereas those of history are singulars." আরিস্টটলের *কাব্যতত্ত্ব*-র ইনগ্রাম বাইওয়াটার কৃত তরজমা।

৭. কবিতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে রাজশেখরও পরবর্তীকালে অনেকটা এই ধরনের কথাই বলেছেন। কাব্যের অন্তর্ভুক্ত যে-উপদেশ বা আলোচনাকে সমালোচকেরা অনৈতিক (অসৎ বা গ্রাম্যতা-দোষযুক্ত) মনে করেন, তাকে সমর্থন করতে গিয়ে রাজশেখরও তুলেছিলেন উদ্দেশ্যের কথা। বলেছিলেন, "এমন উপদেশ অথবা আলোচনা আছে ঠিকই, কিন্তু তার তাৎপর্য নিষেধমুখী, বিধিমুখী নয়।"

কীভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ সত্যকে অতিক্রম করে সর্বজনীন সত্যের ক্ষেত্রে পৌঁছে যায়। এবারে তারই সূত্র ধরে তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে এলেন। কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা নির্ভুল, তার বিচারের প্রসঙ্গে এসে বললেন, কাব্যশিল্প ও অন্যবিধ সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি এক নয়, সুতরাং তাদের (বিচার করবার) মানদণ্ডও হবে আলাদা।

কবিতা কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে প্লেটোর কাছে আমরা শুনেছিলুম যে, কবিতা কেন নয়। এবারে আরিস্টটলের কাছে পালটা উত্তর শোনা গেল। শিল্পকর্ম সম্পর্কে প্লেটোর অভিমতকে অবশ্য অন্যভাবেও খণ্ডন করা যায়। তাঁর কাছে আমরা তিন রকমের টেবিলের কথা শুনেছি। ঈশ্বরের টেবিল (অর্থাৎ টেবিলের মূল সত্তা), ছুতোর-মিস্ত্রির টেবিল ও চিত্রকরের টেবিল। আরও শুনেছি যে, ছুতোরমিস্ত্রির টেবিল ও চিত্রকরের টেবিলকে মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য করা যায় না। কেন না, টেবিলের মূল সত্তা থেকে তারা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের দূরত্বে অবস্থান করছে। দ্বিতীয়টি মূল সত্তার অনুকরণ ও তৃতীয়টি মূল সত্তার অনুকরণের অনুকরণ। এই যে তিন রকমের টেবিল, এদের মধ্যে প্রথমটিকে অর্থাৎ টেবিলের মূল সত্তা বা ঈশ্বরের টেবিলকেই প্লেটো সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যায় যে, তিনটি টেবিলের উপযোগিতাও তিন রকমের। ঈশ্বরের টেবিল বা টেবিল-সংক্রান্ত বিশুদ্ধ ধারণা ব্যতিরেকে সূত্রধরের টেবিল নির্মিত হতে পারত না, এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায় যে, সেই বিশুদ্ধ ধারণার উপরে কি আমরা ভাতের থালা রাখতে পারি? তা আমরা পারি না। তার জন্য সূত্রধরের টেবিলই আমাদের চাই। আবার সূত্রধরের টেবিল আমাদের নান্দনিক ক্ষুধা মেটায় না। সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য চাই চিত্রকরের আঁকা টেবিল। অর্থাৎ প্লেটো যাদের 'অনুকরণ' ও 'অনুকরণের অনুকরণ' বলছেন, উপযোগিতার বিচারে গুরুত্ব তাদেরও কিছু কম নয়।

প্লেটোর আপত্তিকে, বলাই বাহুল্য, সেদিক থেকে বিচার করেননি আরিস্টটল। কিন্তু নানাবিধ শিল্পকর্মের প্রেরণা ও শ্রেণিবিভাজন[৮] সম্পর্কে সাধারণভাবে নানা

---

৮. আরিস্টটলের *কাব্যতত্ত্ব* যে কাব্যের অন্তঃস্থ ঐশ্বর্য সম্পর্কে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে না, তা নয়, তবে অধিকতর উৎসাহ দেখায় নানাবিধ কাব্যের শ্রেণি, কুল ইত্যাদির পরিচয়-নির্দেশে। অর্থাৎ, তত্ত্বের তুলনায়, তথ্যের উপরেই সেখানে বেশি জোর পড়ে; *কাব্যতত্ত্ব*-র আলোচনা, সেদিক থেকে, মূলত বহিরঙ্গাভিত্তিক। *সমালোচনা সাহিত্য* গ্রন্থের ভূমিকায় (গ্রন্থ-পরিচিতি) ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, "...গ্রিক সমালোচনাকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়া মনে হয়।" এক্ষেত্রে তিনি অবশ্য আলাদা করে আরিস্টটলের নামোল্লেখ করেননি, কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই মন্তব্য যখন করেন, তখন, প্রধানত, *কাব্যতত্ত্ব*-র কথাই তিনি ভাবছিলেন।

কথা বলে নিয়ে অতঃপর বিশেষভাবে কবিতা সম্পর্কে তিনি যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর যুক্তিজাল, যেভাবে ইঙ্গিত করেছেন এই শিল্পের ধ্রুব ভূমিকার দিকে, ভবিষ্যৎকালের সাহিত্যচিন্তাকে যে তা কতটা প্রভাবিত করেছিল, আরিস্টটলের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরে— খ্রিস্টীয় ষোড়শ ও উনবিংশ শতাব্দীতে— রচিত কবিতা-বিষয়ক দুটি অতিবিখ্যাত নিবন্ধ তা আমাদের জানিয়ে দেয়। সেখানে, সেই নিবন্ধদুটির উপরে, আরিস্টটলীয় কাব্যভাবনার ছায়াকে আমরা বারে-বারে সঞ্চারিত হতে দেখি। বলা বাহুল্য, আমরা সিডনির *অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি* এবং শেলির *এ ডিফেন্‌স অব পোয়েট্রি*র কথা বলছি, পরে যাকে আমরা সংক্ষেপে শুধুই 'অ্যাপোলজি' ও 'ডিফেন্‌স' বলে উল্লেখ করব।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, কবিতাকে প্লেটো যে-ক্ষেত্রে দর্শনের বিরোধী-শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন (অন্তত দেখেছিলেন বলেই আমরা অনুমান করে থাকি), 'অ্যাপোলজি' অথবা 'ডিফেন্‌স'— কোনওটিরই লেখক সে-ক্ষেত্রে দর্শন ও কবিতার এই পারস্পরিক বিরোধের ব্যাপারটাকে মানতে চান না। 'অ্যাপোলজি'র লেখক, তাঁর নিবন্ধের সূচনাতেই, প্রাচীনকালের এমন অনেক দার্শনিক ও চিন্তানায়কের কথা আমাদের জানিয়ে দেন, যাঁরা—অন্তত প্রথক দিকে—কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতেন তাঁদের চিন্তালব্ধ শস্যসম্ভারকে, এবং সেই কারণে, সমকালীন জনসাধারণ যাঁদের, মূলত, কবি বলেই জানত।[৯] অর্থাৎ, যেটা তাঁদের বলবার কথা, সেটাকে তাঁরা কবিতার পোশাক পরিয়ে বলতেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁরা ছিলেন ছদ্মবেশী দার্শনিক। 'অ্যাপোলজি'র লেখকের এই বক্তব্য যে কবিতা ও দর্শনের মধ্যবর্তী পাঁচিলটাকে বেশ জোরালো রকমের একটা ধাক্কা মারে, তাতে সন্দেহ নেই। সে-ক্ষেত্রে, 'ডিফেন্‌স'-এর লেখক সেই পাঁচিলটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য বললেন যে, কবিতার প্রতি যাঁর 'ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা'র কথা আমরা শুনে আসছি, সেই প্লেটোও আসলে একজন ছদ্মবেশী কবিই। বলা বাহুল্য, কবিতা ও গদ্যের কোনও কৃত্রিম বিভাজনকে শেলি কখনও মেনে নেননি। কবিতাকে শনাক্ত করতে গিয়ে তাঁর শারীরিক গঠনবিন্যাসের উপরে চোখ রাখতেন না তিনি, গুরুত্ব আরোপ করতেন আমাদের ভাবনার যেটা ব্যক্ত রূপ, তার অন্যবিধ লক্ষণের উপরে। প্লেটোর রচনায় সেই লক্ষণগুলিকে যখন তিনি

৯. "...the philosophers of Greece durst not a long time appear to the world but under the masks of poets. So Thales, Empedocles and Parmenides sang their natural philosophy in verses. So did Pythagoras and Phocydides their moral counsels. So did Tyrtaeus in war matters and Solon in matters of policy." *An Apology for Poetry.*

দেখতে পেলেন, তখন প্লেটো যে বস্তুত কবি, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হল না।[১০]

দার্শনিকেরা কিংবা ঐতিহাসিকেরা যে কেন কবিতার মাধ্যমে তাঁদের তত্ত্বকথা অথবা ইতিবৃত্ত প্রচার করতেন, 'অ্যাপোলজি'র লেখকের কাছে তা-ও আমরা শুনেছি। তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, অন্য মাধ্যমের প্রতি সাধারণ মানুষের ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা ছিল কবিতার প্রতি। ফলত, সাধারণ মানুষদের কাছে কোনও বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে হলে কবিতার মাধ্যমেই সে-কাজ করতে হত, তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। (কবিতার মাধ্যমকে স্যার ফিলিপ সিডনি আসলে 'a great passport' বা 'মস্ত একটি ছাড়পত্র' আখ্যা দিয়েছেন, যা থাকলে তবেই জনচিত্তে প্রবেশ করা যায়।) অতঃপর তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে যান, এবং বলেন যে, দার্শনিকের চেয়ে কবির ভূমিকা আরও বড়ো, এবং তাঁর ক্ষেত্রও আরও ব্যাপক। দার্শনিকের কথা তো শুধু মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোকে বোঝে, অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে, তিনি তাদের শিক্ষক। আর কবির কথা সেই তুলনায় অনেক সহজপাচ্য (তাঁর গ্রাহ্যতার ভূমিও তাই অনেক বড়ো), এবং সেদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হয় যে, কবিই হচ্ছেন জনগণের প্রকৃত দার্শনিক।[১১]

আর অনৃতভাষিতা? ঠাট্টা করে সিডনি বলছেন, পৃথিবী থেকে নানা গ্রহতারার দূরত্ব যাঁরা মেপে দেখান, সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মিথ্যের বহরটা কি আরও বড় নয়? কিংবা চিকিৎসকদের? কবিরা বরং সবচেয়ে কম মিথ্যাবাদী। মিথ্যুক কারা? না যেটা সত্য নয়, সেটাকে যারা সত্য বলে জোরগলায় জাহির করে, তারাই হচ্ছে মিথ্যুক। কিন্তু কবিরা (দ্বিধায়, কুণ্ঠায়, সন্দেহে, সংশয়ে সারাক্ষণ যাঁরা পীড়িত, এবং 'যেন' ও 'হয়তো'র রাজ্যে যাঁরা ঘুরে বেড়ান) তো তেমন জোরগলায় কিছুই জাহির করেন না। মিথ্যেটাকে সত্যি বলে 'অ্যাফার্ম' করবার কোনও প্রশ্নই এক্ষেত্রে উঠতে পারে না, কেননা, সিডনি বলছেন, 'অ্যাফার্ম' করাটাই তাঁদের ধাতে নেই। ("....the poet never affirmeth.")

অনৃতভাষিতার যে অভিযোগ, তার উত্তর অবশ্য অন্যভাবেও দেওয়া যায়। বলা

---

১০. "The distinction between poets and prose writers is a vulgar error. The distinction between philosophers and poets has been anticipated. Plato was essentially a poet—the truth and splendour of his imagery, and the melody of his language, are the most intense that it is possible to conceive." *A Defence of Poetry.*

১১."...the philosopher teacheth, but he teacheth obscurely, so as the learned only can understand him, that is to say, he teacheth them that are already taught ; but the poet is the food for the tenderest stomachs ; the poet is indeed the right popular philosopher," *An Apology for Poetry.*

যায় যে, যাকে আমরা 'অসত্য' ভাবি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অতিশয়োক্তি মাত্র। এই যে অতিশায়োক্তি বা বাড়িয়ে বলা, যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন যে, এর প্ররোচনা কোত্থেকে আসে, তো উত্তরে আমরা শিল্পীর আবেগোচ্ছ্বাসের সঙ্গে একে যুক্ত করে দেখাতে পারি। বিজ্ঞানে কি ন্যায়শাস্ত্রে অতিশয়োক্তির কোনও অবকাশ নেই। তার কারণ, আবেগোচ্ছ্বাসেরও কোনও ভূমিকা নেই সেখানে। সেখানে যা-কিছু দাঁড়ায়, তা শুধু তথ্যভিত্তিক নিপাট যুক্তির উপরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, ইংরেজিতে যাকে 'ক্রিয়েটিভ আর্জ' বলা হয়, শিল্পসৃষ্টির সেই আন্তর তাগিদের সঙ্গে আবেগোচ্ছ্বাস একেবারে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর তাই, কিছু-না-কিছু অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জন সেখানে ঘটেই। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি:

"আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেই কো পুষ্পে পাতায়
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে"[১২]

তখন আমরা বুঝতে পারি যে, অতিরঞ্জনের এই ব্যাপারটাকে তিনি প্রকৃতির সৃষ্টিলীলার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর মানুষের সৃষ্ট শিল্পমালা তো সে-ক্ষেত্রে অসংখ্য অতিরঞ্জনে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু এই অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি যে শিল্পেরই অঙ্গ, সে-কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। বায়রন যখন বলেন :

"Maid of Athens, ere we part,
Give, oh give me back my heart!
Or, since that has left my breast,
Keep it now, and take the rest!"[১৩]

কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন

"একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী"[১৪]

কিংবা আমাদের তরুণ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন বলেন :

"অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের
মুখে-মুখে রটে যায় নীরার খবর
বকুলমালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি"[১৫]

---

১২. অতিবাদ। *ক্ষণিকা* ।

১৩. Maid of Athens, ere we part. *Occasional Pieces.*

১৪.শাশ্বতী। *অর্কেস্ট্রা* ।

১৫. নীরার অসুখ। *বন্দী, জেগে আছো* ।

তখন যুক্তিবাদী তার্কিক হয়তো বলবেন যে, এসব একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা, বায়রন মোটেই তাঁর বক্ষ থেকে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে সেটি আথেন্সের কোনো ললনার হাতে সমর্পণ করেননি, সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে (শুধু সুধীন্দ্রনাথ বলে কথা কী, কোনও মর্ত্যমানবের পক্ষেই) সম্ভব নয় ইন্দ্রপুরীর আনন্দ আন্দাজ করা, এবং, সুনীল যা-ই বলুন, লক্ষ-লক্ষ মানুষের মুখে নীরা-নাম্নী একটি বালিকার খবর রটে যাওয়াটা একেবারে আদ্যন্ত অসম্ভব একটা ব্যাপার; কিন্তু আমরা যারা অতিবাদকে শিল্পের অঙ্গ বলে জেনেছি, তারা এইসব উক্তির মধ্যে কোনও দোষ দেখব না, বরং শিল্পের রসে রঞ্জিত এই অতিশয়োক্তিগুলিকে আমরা কবিতার এক-একটি মহার্ঘ অলংকার বলেই চিনে নেব।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তো বটেই, গানেও এই ধরনের অলংকার আমরা প্রচুর দেখতে পাই। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ছে "একদা তুমি, প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে" গানটির কথা। ফুলসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কবির তরুমূলে যে-মেয়েটি একদা উপবেশন করেছিল, তাকে সম্বোধন করে কবি বলছেন যে, সেদিনকার কথা তার হয়তো মনে নেই, কিন্তু নদী তাকে ভোলেনি; এমনকি, নদী তার স্রোতের মধ্যে সেই মেয়েটির বেণির ছবিটিকে আজও ধরে রেখেছে।[১৬] শুনে সত্যান্বেষী তার্কিক হয়তো এক্ষেত্রেও বলবেন যে, এটা একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা, নদী কাউকে মনে রাখে কিংবা আপন স্রোতোধারার মধ্যে ধরে রাখে কারও বেণির চিত্র, এই সংবাদ আদৌ বিশ্বাসজনক নয়। কিন্তু আমরা সে-কথা বলব না। আমরা ঠিকই বুঝে নেব যে, কবিই সেই মেয়েটিকে আজও ভুলতে পারেননি, এবং, নদীর বাঁকা স্রোতের দিকে চোখ পড়বামাত্র, কবিরই আজও সেই মেয়েটির বঙ্কিম বেণির কথা মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই সত্য কথাটা সরাসরি না বলে কবি যে তাঁর স্মৃতিকে এক্ষেত্রে নদীর উপরে আরোপ করেছেন, এতেই বরং আরও সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তাঁর গানের বাণী। এটা অবশ্য অতিশয়োক্তি নয়, ঘুরিয়ে কথা বলবার ব্যাপার, কিন্তু অলংকার হিসেবে এর মূল্যও অপরিসীম।

কিন্তু আর নয়। কবিতার বিরুদ্ধে হরেক অভিযোগের ফিরিস্তি আমরা শুনেছি, এবং জেনেছি যে, কেন সেগুলি ধোপে টেকে না। সওয়াল-জবাবের মধ্য দিয়ে এই কথাটা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, কবিতার প্রতি বিরূপ হবার সত্যি কোনও কারণ নেই। কিন্তু এটা হল নঞর্থক কথা, উলটো-দিক থেকে বিচার করবার ব্যাপার। এবারে সোজাসুজি আমরা কবিতার দিকে তাকিয়ে জেনে নিতে চাই যে, কোন্

---

১৬. "সেখা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি,
তারি যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী..."

সদর্থক (পজিটিভ) গুণ রয়েছে তার। বুঝতে চাই, তাকে আমরা সময় দেব কেন। অর্থাৎ, কেন আমরা কবিতা পড়ব।

কিন্তু তার আগে একটা সহজ কথা বোধ হয় স্বীকার করে নেওয়া ভালো। সেটা এই যে, কবিতা না-পড়লেই যে মানবজীবন একেবারে অচল হয়ে পড়বার আশঙ্কা, তা কিন্তু নয়। এমন একটা রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথা অনেকেই কল্পনা করেছেন, যেখানে কোনও মানুষেরই খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট থাকবে না। তা ছাড়া, কাউকে সেখানে নিরাশ্রয় হয়ে দিন কাটাতে হবে না, বিনাচিকিৎসায় মরতে হবে না, এবং প্রত্যেকেই সেখানে লেখাপড়া করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু, অন্তত এখনও পর্যন্ত, এমন কোনও রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথা কেউ কল্পনা করেননি, যেখানে সবাই দিনের মধ্যে অন্তত কিছুটা সময় গান শুনতে কিংবা ছবি দেখতে চাইবে। ঠিক তেমন, সর্বজনে যেখানে কবিতা পড়তে চাইবে, এবং পড়বার সুযোগ না পেলে ভাববে যে জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল, এমন কোনও রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথাও কেউ কল্পনা করেননি।

কেন করেননি, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। কবিতাপাঠ আমাদের ন্যূনতম চাহিদা বলে গণ্য হয় না। হবার কোনও কারণও নেই। অন্ন বস্ত্র আশ্রয় কর্মসংস্থান চিকিৎসা সাক্ষরতা ইত্যাদি যে আমাদের ন্যূনতম চাহিদা বলে গণ্য হয়, তার কারণ, এগুলি ছাড়া কারও চলে না। কিন্তু যেমন গান কিংবা ছবি, তেমনই কবিতা ব্যতিরেকেও অসংখ্য মানুষের দিন দিব্যি কেটে যায়।

সত্যি বলতে কী, তেমন মানুষ আমাদের চারপাশেই আমরা অহরহ দেখতে পাই। কবিতার প্রসঙ্গে বলি, আমাদের প্রত্যেকেরই এমন বিস্তর প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব রয়েছেন, যাঁরা প্রতিবেশী আত্মীয় কিংবা বন্ধু হিসেবে হয়তো খুবই ভালো ও নির্ভরযোগ্য, কিন্তু কবিতা নামক ব্যাপারটার ছায়াও পারতপক্ষে মাড়ান না। কখনও যে তাঁরা কবিতা পড়েননি, তা হয়তো নয়, ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয়ই পড়েছিলেন, কিন্তু সে তো নেহাতই পরীক্ষায় পাস করবার জন্যে নোট মিলিয়ে পড়া, পরীক্ষার পাট চুকে যাবার পরে কবিতার সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক তাঁরা চুকিয়ে দিয়েছেন, এবং তার জন্যে যে তাঁদের জীবন কোথাও ঠেকে থাকছে, তা-ও নিশ্চয় নয়। একদা তাঁরা দায়ে ঠেকে, বাধ্য হয়ে গুটিকয় কবিতা পড়েছিলেন, কিন্তু সেই বাধ্যবাধকতার পর্ব শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং আর-কখনও তাঁরা কবিতা পড়বেন না।

অনেকেই পড়েন না। এবং তা সত্ত্বেও তাঁদের দিন দিব্যি কেটে যায়। যেমন, গান না-শুনে এবং ছবি না-দেখেও অনেক মানুষেরই দিন দিব্যি কাটতে থাকে, এ-ও তেমনই ব্যাপার, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং ধরে নেওয়াই ভালো যে, কবিতা নামক ব্যাপারটা সকলের জন্য নয়।

কারও-কারও জন্য। জীবনানন্দ বলেছেন, সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা। সকলেই পাঠক নয়, কেউ-কেউ পাঠক।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পাঠক? কবিতা কি সত্যিই তাঁদের কিছু দেয়? যদি দেয় তো সেটা কোন্ বস্তু? কী সেই প্রাপ্তি, যার প্রত্যাশায় তাঁরা কবিতার দিকে, আবহমান কাল ধরে, হাত বাড়িয়ে আছেন?

একটা প্রাপ্তির কথা আমরা 'ডিফেন্স'-এর লেখকের কাছেই শুনি। তিনি বলেছেন, কবিতা আমাদের চিত্তকে জাগিয়ে তোলে ও তার প্রসার ঘটায়। পৃথিবীর গোপন সৌন্দর্যকে অনবগুণ্ঠিত করে দেখায়, এবং এমনভাবে দেখায় যে, যে-বস্তুজগৎকে আমরা চিনি, তাকেও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে।[১৭]

আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।"[১৮] সেদিক থেকে যদি দেখি, তা হলে বুঝতে হবে যে, কবির অনুভূতি এই যে ভাষার মধ্যে, অর্থাৎ রূপের মধ্যে, নিজের নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করছে, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই পাঠকের পক্ষে একটা মস্ত প্রাপ্তি।

কবিতা কেন, এই প্রশ্নের আরও অনেক-অনেক উত্তর নিশ্চয় খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু আপাতত তার দরকার নেই, অন্য-কোনও উত্তরের সন্ধানে ব্যাপৃত হবার আগে বরং এই দুটি উক্তিকেই আর-একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শেলি বলছেন বস্তুজগতের কথা (কবিতা যার গোপন সৌন্দর্যের নির্মোকটাকে খসিয়ে দেয়) আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন আন্তর অনুভূতির কথা (রূপের মধ্যে যে-অনুভূতির নিত্যতা নিজেকে 'প্রতিষ্ঠিত করতে' চাইছে)। হঠাৎ শুনলে এই উক্তি দুটিকে— যার একটিতে দৃশ্যজগতের উপরে জোর পড়েছে ও অন্যটিতে আন্তর অনুভূতির উপরে— পরস্পরের বিরোধী বলে মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তা যে নয়, বরং এই উক্তি দুটি যে পরস্পরের পরিপূরক, একটু বাদেই তা আমরা ধরতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, যা দিয়ে কবিতা তৈরি হয়ে ওঠে, সেই অপরিহার্য দুটি অংশের কথাই দুই কবি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। একজন বলছেন বিষয়বস্তু বা উপকরণের কথা। অন্যজন উপলব্ধির।

বলা বাহুল্য, কবিতার যেটা বিষয়বস্তুর দিক— কোনও কাহিনি কিংবা কোনও ঘটনা কিংবা কোনও দৃশ্য— সরাসরি তার কাছ থেকেও আমরা অনেকেই

---

১৭. "It [poetry] awakens and enlarges the mind itself. ...Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be as if they were unfamiliar." *A Defence of Poetry.*

১৮. আধুনিক কাব্য। *সাহিত্যের পথে*।

অনেক-কিছু পেয়ে যাই। দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি কবিতার উল্লেখ আমরা করতে পারি। রাত্রি যখন আসন্ন, গর্জিত মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে সঙ্গীহীন একটি পাখি তখন উড়ে চলেছে, তাঁর 'দুঃসময়' কবিতার এই যে বিষয়বস্তু, শুধু এরই গুণে এই কবিতা যে কারও-কারও চিত্তে সাহসের সঞ্চার করে, আবার কারও-কারও চিত্তে প্রেরণা জোগায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও পরিণামের কথা চিন্তা না করে আপন ভূমিকায় সুস্থিত থাকতে, সে-কথা স্বীকার্য। ঠিক তেমনই 'বর্ষশেষ' কবিতার বিষয়বস্তু আমাদের জানিয়ে দেয় যে, ভয়ংকর বিপর্যয়ের ভিতর দিয়েই সম্ভব হতে পারে, হয়ে থাকে, নবীনতার অভ্যুদয়। আবার, একইভাবে, 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি থেকে আমরা আমাদের শোকার্ত সময়ে কিছু সান্ত্বনা পেতে পারি, এবং 'দুই পাখি' কবিতাটির বিষয়বস্তু থেকে বুঝে নিতে পারি যে, সুখ ও স্বাধীনতা কেন, আত্যন্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।

এই যে সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষা এই কবিতাগুলির ভিতর থেকে অনেকে পেয়ে আসছেন, এবং আরও অনেক কাল ধরে আরও অনেকে পাবেন, এসব প্রাপ্তির কোনওটিরই মূল্য কিছু কম নয়। কবিতাপাঠের খুবই মূল্যবান কয়েকটি পুরস্কার বলে এদের আমরা গণ্য করতে পারি। কিন্তু, বিষয়বস্তুর সঙ্গে এদের সরাসরি যোগ-সম্পর্ক সত্ত্বেও, এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ওঠে। সেটা এই যে, কবিতার নিজস্ব প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যদি-না পাঠকের কাছে এসে পৌঁছোত, তাহলে এই সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষার ব্যাপারটা ঠিক এতটাই জোর পেত কি না। তা যে কিছুতেই পেত না, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই তা আমরা বলতে পারি। আমরা জানি যে, এই ধরনের সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষার কথা নানা নীতিগল্পের মধ্য দিয়েও আমাদের শোনানো হয়ে থাকে, কিন্তু এই কথাগুলি সেখানে এর সিকির সিকি জোরও পায় না।

কেন পায় না, সেটা বুঝবার জন্যে শেলির কাছেই আবার আমাদের ফিরতে হবে, এবং আর-একটু নজর করে দেখতে হবে তাঁর উক্তিটিকে। শেলি বলেছেন, কবিতা এই বস্তুপৃথিবীর গোপন সৌন্দর্যকে গুণ্ঠনমুক্ত করে দেখায়, এবং এমনভাবে দেখায় যে, যেসব বস্তুকে আমরা চিনি, তাদেরও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যার সৌন্দর্যকে গোপন বলা হচ্ছে, সেই বস্তুপৃথিবী নিজে কিন্তু গোপন নয়, আমাদের চোখের সম্মুখেই সে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এমনকি, কবিতার সাহায্য ব্যতিরেকে যে তার সৌন্দর্যসম্ভার কারও চোখে পড়ে না, তা-ও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বস্তুত, যাঁরা কবিতা পড়তে অভ্যস্ত নন, তাঁরাও তার অরণ্যের শ্যামশোভা, পর্বতের ধূমল বিস্তার, নদীর তরঙ্গভঙ্গ ও সমুদ্রের সফেন উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। সে-ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, তা-ই

যদি হয়, তবে আর এই বস্তুপৃথিবীর সৌন্দর্যকে 'গোপন' বলবার অর্থ কী, এবং এমন কথাই-বা আমরা কী করে মানব যে, কবিতা সেই সৌন্দর্যকে গুণ্ঠনমুক্ত করে দেখায়?

শেলির উক্তির দ্বিতীয়াংশে এসে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই আমরা। সেখানে তিনি বলছেন, সৌন্দর্যের গুণ্ঠনমোচন করে কবিতা তাকে "এমনভাবে দেখায় যে, যেসব বস্তুকে আমরা চিনি, তাদেরও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে।" এই যে উক্তি, বস্তুত এটি একটি ধ্রুব ইঙ্গিত, এবং এরই সূত্র ধরে আমরা বুঝতে পারি যে, শেলি যাকে সৌন্দর্যের গুণ্ঠনমোচন বলছেন, আসলে তা বিভিন্ন বস্তুরই এমন এক ধরনের উপস্থাপনা, আমাদের প্রাত্যহিক পরিচিতির স্পর্শে মলিন নানা বস্তু যার ফলে কিছুটা রহস্যময়তা পেয়ে যায়। পুরোনো, পরিচিত বস্তুসম্ভারকে সেই রহস্যময়তাই আবার নবীন করে তোলে।

তবে কি এসব বস্তুকে আমরা যেখান থেকে যেমনভাবে দেখি, কবিরা ঠিক সেখান থেকে দেখেন না বলেই তেমনভাবে দেখেন না? ঠিক তা-ই। তাঁদের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন বলেই আলোছায়ার বদল ঘটে ও বস্তুগুলির তাৎপর্য অনেকটা পালটে যায়, এবং, কবিতা পড়বার সময়ে তাঁদের চোখ দিয়ে দেখি বলেই, আমাদের কাছেও সেই বস্তুগুলি কিছুটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, নির্দিষ্ট যে রূপের সীমার মধ্যে যাকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, শুধু তারই মধ্যে তার রূপগত সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি, অন্যতর রূপও তার মধ্যে নিহিত হয়ে ছিল, এবং কবি আমাদের দেখিয়ে না-দিলে সেই অন্যতর রূপ আমাদের চোখে কখনও ধরাই পড়ত না।

বলা বাহুল্য, যেমন বস্তু সম্পর্কে, তেমনই বিষয় সম্পর্কেও এ কথা সত্য। কবি তাঁর আপন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর আপন অনুভূতি অথবা উপলব্ধির আলোয় যখন দেখেন, তখন তাঁর সেই দেখার গুণে আমাদের পরিচিত নানা বিষয়ের তাৎপর্যও অনেকখানি পালটে যায়, এবং তারই ফলে আমাদের চিত্তে সেইসব বিষয়ের অভিঘাত আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

সত্যি বলতে কী, সেই অভিঘাত যদি সাহস, প্রেরণা, শিক্ষা কিংবা সান্ত্বনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়ে না উঠত, তাতেও কোনও ক্ষতি ছিল না। কেন-না, কবিতার কাছে আমদের প্রাপ্তি শুধু এইটুকুই নয়, আরও বেশি। সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি সৌন্দর্যদর্শন। যার অভিঘাত আরও ব্যাপ্ত হয়ে, বস্তুত আমাদের সমগ্র চিত্ত জুড়ে কাজ করতে থাকে। শেলি যে বলেছেন, কবিতা আমাদের চিত্তকে জাগিয়ে তোলে ও তার প্রসার ঘটায়, এ-ই হচ্ছে তার তাৎপর্য। তিনি যে আসলে বস্তুজগতের উপরে জোর দেননি, জোর দিয়েছেন কবির চোখে চোখ মিলিয়ে তাকে দেখবার

উপরে, তা আমরা জেনেছি। জেনেছি যে, যাকে তিনি সৌন্দর্যের গুণ্ঠনমোচন বলেছিলেন, আসলে সেটা আমাদের প্রতিদিনের দেখা সৌন্দর্যের অতিরিক্ত কোনও সৌন্দর্য আবিষ্কারের ব্যাপার। কবি তাঁর আপন উপলব্ধির আলোয় তাকে খুঁজে নেন, এবং আমাদের চোখের সামনে তাকে তুলে ধরেন।

সৌন্দর্যের সঙ্গে এই যে পরিচয়, প্রাপ্তি হিসেবে এরই মূল্য হয়তো সর্বাধিক। কবিতা এই পরিচয়ের ক্ষেত্র রচনা করে দিচ্ছে; একের উপলব্ধিকে সে সর্বজনের করে তুলছে। শুধু তা-ই নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা ছিল একটি বিশেষ মানুষের একটি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতি, তাকে সে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে নিত্যকালের দুয়ারে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়", তখন কবিতার এই নিত্যকালীন আবেদনের কথাটাই তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন।

কবিতা কোথায়

কবিতাকে সাধারণত দুটি দিক থেকে দেখা হয়ে থাকে। তার ভাষা ও তার ভাবনা। কিন্তু ভাষা যেমন ভাবনাকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে, তেমনই ভাবনারও একটা অবলম্বন চাই। বিষয়বস্তু সেই অবলম্বন। ফলত, আমরা যখন কাব্যবিচার করতে বসি, তখন, ভাষা ও ভাবনার মতো, বিষয়বস্তুও আমাদের বিচার্য বৃত্তের মধ্যে এসে যায়। বাংলা কবিতায়, এই তিন দিক থেকেই, রবীন্দ্রনাথ এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন।

শুধু সূচনা করেছিলেন বললে অবশ্য খুবই কম বলা হয়। কেন-না, এ-ব্যাপারে তাঁর আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ও তাৎপর্যময় একটি পরিণতির ক্ষেত্রে পৌঁছে দেবার দায়িত্বভারও, অনেক পরিমাণে, তিনি নিজেই বহন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতা যে তাঁর সমকালীন সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে অনেকেরই প্রশংসা পায়নি, বরং ধোঁয়াটে, কষ্টকল্পিত কিংবা অর্থহীন বলে নিন্দিত হয়েছিল, তার অন্তত একটা কারণ এই যে, এইসব কবিতার ভাষা, ভাবনা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই কোনও পূর্ব-পরিচয় ছিল না। "রবি অস্ত যায়।/ অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।"[১] —ভাষার এই যে বিন্যাস, রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাংলা কাব্যভাষার বিন্যাসের সঙ্গে এর পার্থক্য নেহাত অল্প নয়। আবার "অন্ধকারে নিকট করে, আলোতে করে দূর",[২]—এই ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাংলা কাব্যভাবনার কোনও মিল আমাদের চোখে পড়ে না। ঠিক তেমনই, সুখ ও স্বাধীনতার চিরন্তন বিচ্ছেদকে বিষয়বস্তু করে তিনি যখন 'দুই পাখি' কবিতাটি লেখেন, তখন যেমন ভাষা ও ভাবনা, তেমনই বিষয়বস্তুর দিক থেকেও রবীন্দ্রপূর্ব যুগের কবিতার সঙ্গে তাঁর এই কবিতার কোনও যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বিচার করতে বসে তাঁর সমকালীন সমালোচকদের অনেকেই যে পদে-পদে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, তাতে অতএব বিস্ময়ের কিছু নেই। রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা, ভাবনা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন আদ্যন্ত একটি নবীনতা ছিল,

---

১. নিষ্ফল কামনা। *মানসী*।

২. অপেক্ষা। ওই।

রবীন্দ্রপুর্ব যুগের বাংলা কাব্যভাষা, কাব্যভাবনা ও কাব্যবিষয়ের মধ্যে যার জন্মসূত্রটিকে খুঁজে পেলে তাঁর সমালোচকরা অবশ্যই স্বস্তিবোধ করতেন। কিন্তু তা তাঁরা খুঁজে পাননি। যাতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না ও যার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না, তার সম্মুখীন হয়ে তাঁরা ধাঁধায় পড়ে যান। প্রসঙ্গত আমরা সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উল্লেখ করতে পারি। 'পসারিনী' কবিতা সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র লিখেছেন, "সমগ্র কবিতাটির উদ্দেশ্য বা অভিধেয় কী, তাহা বুঝিতে পারিলাম ন।"[৩] 'শেষ খেয়া' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিও তাঁর কাছে "হেঁয়ালির মত"[৪] ঠেকেছিল। বিভ্রান্তির ধরনটা যে কী, এর থেকেই তা আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

একা সুরেশচন্দ্রকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এবং এমন কথাও ভাববার কোনও হেতু নেই যে, রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনার প্রথম পর্যায়ে যে বিচারবিভ্রাট আমরা দেখতে পাই, তা একেবারেই নজিরবিহীন একটা ব্যাপার। আসলে সাহিত্যে যখনই কোনও সর্বাঙ্গীণ নবীনতার অভ্যুদয় ঘটে, তখনই তার বিচারে এই ধরনের বিভ্রম ও বিভ্রাট দেখা দেয়। যেমন বঙ্গসাহিত্যে, তেমনই অন্যত্রও সেটা লক্ষণীয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি যে, মার্কিন দেশের সমালোচনা-সাহিত্যেও ওয়াল্‌ট হুইটম্যানের কবিতাকে কেন্দ্র করে, এই বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছিল। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হুইটম্যানের কাব্যসংকলন *লিভ্‌স অব গ্রাস*। মার্কিন সাহিত্যের প্রধান পুরুষ ইমার্সন তখন এই যুগান্তকারী গ্রন্থের প্রণেতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন[৫] ঠিকই, কিন্তু, অন্যদিকে, আকাশ কালো করে দেখা দিয়েছিল আক্রোশের ঝড়। সাহিত্যের আঙিনায় ধিক্কারের ধুলো সেদিন কম ওড়েনি। *বস্টন ইন্‌টেলিজেন্‌সার* পত্রিকার সমালোচক লিখেছিলেন, "মনুষ্যত্ব যেখানে সম্মান দাবি করে, সেখানে এই গ্রন্থের স্থান হওয়া উচিত নয়। এর লেখক বস্তুত পশুরও অধম একটি জীব; সুতরাং সভ্যসমাজ থেকে একে লাথি মেরে বার করে দেওয়া উচিত। খাপছাড়াভাবে বিস্তর বক্‌বক্ করেছে লোকটা। সেই বক্‌বকানির মধ্যে না আছে কোনও বুদ্ধিমত্তার ছাপ, না কোনও শৃঙ্খলা। আমাদের ধারণা, লোকটা একেবারেই গারদ-থেকে-পালানো একটি উন্মাদ, তারস্বরে প্রলাপ বকে যাচ্ছে।"[৬]

---

৩. *সাহিত্য*, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

৪. ওই, ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

৫. ইমার্সন বলেছিলেন, "I greet you at the beginning of a great career."

৬. "This book should find no place where humanity urges any claim to respect, and the author should be kicked from all decent society as below the level of the brute. There is neither wit nor method in his disjointed babbling, and it seems to us he must be some escaped lunatic, raving in pitiable delirium." *Boston Intelligencer.* May 3, 1856.
(*লিভ্‌স অব গ্রাস*-এর মডার্ন লাইব্রেরি-সংস্করণে কার্ল স্যান্ডবার্গ লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

হুইটম্যানের কবিতার ভাষা সম্পর্কে এক মার্কিন সমালোচক এই যে 'বকবকানি' (ব্যাবলিং) কথাটা ব্যবহার করেছেন, এইটে শুনে একেবারে অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মন্তব্য :

"উড়িসনে রে পায়রা-কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা,
বক্‌বকম্ আর ফোঁসফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব-মাখা,
তাও ছাপালি গ্রন্থ হল
নগদ মূল্য একটাকা।"[৭]

কালীপ্রসন্নের এই ছত্র-কটি রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতার কয়েকটি ছত্রের বিদ্রূপাত্মক অনুকৃতি হিসেবে রচিত হয়েছিল। উপরন্তু 'বক্‌বকম্' আর 'ফোঁসফোঁসানি' শব্দদুটিও এসেছিল রবীন্দ্রনাথেরই ব্যবহৃত ওই শব্দযুগলের সূত্র ধ'রে। তবু এই প্যারডি থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষাকে কাব্যবিশারদ বস্তুত অর্থহীন হট্টগোল বলেই মনে করতেন। কেন মনে করতেন, তা-ও আমরা অনুমান করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, কাব্যবিশারদের অন্য যত গুণই থাক, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে আদ্যন্ত নবীন যে ভাষারুচির সূচনা সেদিন দেখা গিয়েছিল, অন্তত সে সম্পর্কে তিনি বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন না। তার তাৎপর্য তিনি আদৌ ধরতে পারেননি।

চণ্ডালিকার কথা মনে পড়ে। মা সেখানে মেয়ের কথা শুনে বলেছিলেন, "আমি যে তোর ভাষা বুঝিনে।" সমালোচকদের অবস্থাও অনেকসময়ে প্রকৃতির মায়ের মতোই করুণ হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা, ভাবনা কিংবা বিষয়ের তাৎপর্য তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না। তখন তাঁদের অনেকে যেমন অস্বস্তি বোধ করেন, তেমনই অনেকে আবার রেগেও যান। মার্কিন সমালোচনা-সাহিত্যে, হুইটম্যানের কবিতাকে কেন্দ্র করে, সেই রাগের আগুন কীভাবে জ্বলেছিল, আমরা দেখেছি। এবারে ফরাসি সমালোচনা-সাহিত্যের দিকে চোখ ফেরালেও সেই একই দৃশ্য আমরা দেখতে পাব। দেখব যে, বদলেয়ারের কবিতার ভিতর দিয়ে যখন এক সর্বাঙ্গীণ নবীনতার সূচনা হচ্ছিল, এবং প্রবর্তনা ঘটছিল নূতন ভাবনা ও নূতন বিষয়বস্তুর, সমকালীন সমালোচকদের ক্রোধের আগুন তখনও কিছু কম জ্বলেনি। শিরার্ তখন মন্তব্য করেছিলেন, "ভয়ংকরের সীমানা যখন শেষ হয়ে যায়, মানুষ

৭. 'মিঠে-কড়া'। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

তখন ন্যক্কারজনকতার তল্লাটে গিয়ে ঢোকে। আঁকতে থাকে নোংরা বিষয়ের ছবি। নোংরামিই তখন তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়; তারই মধ্যে সে গড়াগড়ি দেয়। কিন্তু সেই নোংরামির নূতনত্বও ফুরিয়ে যায় একসময়ে; শবদেহ পচে-গলে গিয়ে ছড়াতে থাকে দুর্গন্ধ, এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটা অকথ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, কোনও ভাষাতেই যার কোনও নাম নেই। বাস্, এই যে অকথ্য অবস্থা, এ-ই হচ্ছে বদলেয়ারের কাব্য। Voila' Baudelaire."[৮]

শিরার্ যে নেহাত ঝোঁকের মাথায় এই মন্তব্য করেছিলেন, তা-ও নয়। বস্তুত, এই সমালোচনা লিখবার বেশ কয়েক বছর পরেও তাঁকে আমরা একই কথা বলতে শুনি। একই রকমের ঝাঁজালো ভাষায় তখনও তিনি রায় দেন যে, বদলেয়ার ভালো কবি কি মন্দ কবি, এই প্রশ্নটাই একেবারে অর্থহীন, কেন-না বদলেয়ার আদৌ একজন শিল্পী কিংবা কবি নন। তাঁর মন নেই, আত্মা নেই, রুচি নেই, প্রতিভা নেই। তাঁর মধ্যে এমন প্রবণতা একটিও নেই, যাকে আন্তরিক, সরল কিংবা মানবিক বলা যেতে পারে। আসলে তিনি একটি বর্বর।[৯] শুনে 'বস্টন ইনটেলিজেন্সার'-এর অসহিষ্ণু সমালোচকের কথাই আবার মনে পড়ে যায় আমাদের, 'লিভ্স অব গ্রাস'-এর লেখক সম্পর্কে যিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, লোকটা আসলে "পশুরও অধম একটি জীব।"

এই যে অসহিষ্ণুতা আর ক্রোধ, আমরা জানি যে, ইংরেজি সমালোচনা-সাহিত্যেও বারে-বারে এর সম্মুখীন হব আমরা। দেখতে পাব, সাহিত্যে যাঁরা নূতন ভাবনা কিংবা নূতন বিষয়বস্তুর দিশারি, সেখানেও তাঁরা ক্ষমাহীন আক্রোশের লক্ষ্য হচ্ছেন। শেলি যার উত্তরে তাঁর 'ডিফেন্স' লিখেছিলেন, টমাস লভ পিককের সেই চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধটির[১০] কথাই ধরা যাক। পিকক সেখানে অবশ্য একেবারে উলটো দিক থেকে চালিয়েছিলেন তাঁর আক্রমণ। ওয়র্ডসওয়র্থ, কোলরিজ, বায়রন এবং আরও অনেকের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ্য অভিযোগটা এই ছিল যে, 'এঁদের কবিতার বিষয়বস্তু বড্ডই সেকেলে, ফলত পাঠকদের এঁরা অতীতের অন্ধকারেই বন্দি করে রাখছেন, তার থেকে আর আধুনিক ও সুসভ্য পৃথিবীর আলোকোজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছেন না। সমকালীন ও সদ্য-বিগত যুগের কবিদের সম্পর্কে, সাধারণভাবে, এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, ফ্রান্সে, উনিশ শতকের শেষার্ধে, বদলেয়ারকে 'বর্বর' আখ্যা দিয়েছিলেন সমালোচক শিরার্। কিন্তু তিনি যে নতুন কিছু করেননি, সেটা আমরা তখনই বুঝতে পারি, এই

৮. ৯. *A History of Modern Criticism : 1750–1950*. Rene Wellek. (পৃ ৮২-৮৩)

১০. *The Four Ages of Poetry.*

প্রবন্ধ পড়তে-পড়তে যখন আমরা দেখি যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তাঁর সময়কার ইংরেজ কবিদের গায়ে পিককও মোটামুটি এই একই লেবেল সেঁটে দিয়েছিলেন। পার্থক্যটা শুধু এই যে, পিকক তাঁদের পুরো-বর্বর বলেননি, বলেছিলেন, 'আধা-বর্বর'।[১১]

শুনে আমরা বিস্মিত হই যে, টমাস লভ পিকক নিজেও ছিলেন একজন কবিই। একজন কবি আর-একজন কবির মানস প্রক্রিয়াকে, অন্য অনেকের তুলনায়, সহজে চিনে নিতে পারবেন, এটাই তো প্রত্যাশিত। পিকক তা হলে, নিজে কবি হয়েও, তাঁর সময়ের বিশিষ্ট কয়েক জন কবির মানস প্রক্রিয়াকে চিনতে পারলেন না কেন? ওয়র্ডসওয়র্থ, কোলরিজ আর বায়রনের কবিতার বিষয়বস্তুকে কেন নেহাতই অতীতাশ্রয়ী বলে মনে হল তাঁর? যাকে তিনি অতীতাশ্রয়ী ভেবেছিলেন, আধুনিক চিত্তের কাছেও যে তার রেলিভ্যান্স্ বা প্রাসঙ্গিকতা কিছুমাত্র নষ্ট হয়ে যায়নি, তা তিনি কেন বুঝে উঠতে পারলেন না? তবে কি আমরা এই সিদ্ধান্ত করব যে, কাব্যবিচারে কবির কথাও সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়? ঘুলিয়ে যায় তাঁরও বিচারবুদ্ধির স্বচ্ছতা?

পরবর্তীকালের একজন সমালোচক— এইচ. এ. নিডহ্যাম—ঠিক এই ইঙ্গিতই করেছেন। শেলির 'ডিফেন্স্'-এর পশ্চাৎপটের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন যে, পিককের এই প্রবন্ধ— অন্তত অংশত— উৎপন্ন হয়েছিল অসূয়া থেকে। যাঁদের তিনি (পিকক) তাঁর চেয়ে অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন কবি বলে জ্ঞান করতেন, তাঁদের অনেকেই তাঁর তুলনায় অনেক বেশি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। পিকক সেটা সহ্য করতে পারেননি। তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল এমন কয়েক জন কবির দিকে, যাঁদের ক্রমবর্ধমান খ্যাতি তাঁর গাত্রদাহের কারণ ঘটিয়েছিল, এবং যাঁদের সমাদর ও প্রতিষ্ঠাকে তিনি সহজ চিত্তে মেনে নিতে পারছিলেন না।

হয়তো তা-ই। অনেকক্ষেত্রেই ঈর্ষা কিংবা বিদ্বেষ যেমন অকারণ নিন্দাবাদে অনেককে উৎসাহিত করে, তেমনই এক্ষেত্রেও হয়তো করেছিল। কিন্তু, একটা প্রশ্ন তবু থেকে যায়। সেটা এই যে, ঈর্ষা-অসূয়া-বিদ্বেষের স্পষ্ট কোনও কারণ যে-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, সে-ক্ষেত্রেই কি একজন কবি অন্য কবির রচনায় উৎকীর্ণ নবীনতার লক্ষণগুলিকে সর্বদা চিনে নিতে পারেন? তা-ও যে পারেন না, সর্বদা পারেন না, হুইটম্যান সম্পর্কে সুইনবার্নের বিমুখতাই তার প্রমাণ। হুইটম্যানের কবিতায় যে বিদ্রোহের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল, এবং প্রচলিত নানা প্রথা, ব্যবস্থা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্ত হয়েছিল যে অনাস্থা, প্রথম দিকে তা খুব ভালোই

১১. "A poet in our times is a semi-barbarian in a civilized society."

লেগেছিল সুইনবার্নের; এমনকি ১৮৭২ সনের একটি রচনায়[১২] তিনি হুইটম্যানের দুটি দীর্ঘ কবিতার[১৩] অনর্গল প্রশংসাও করেছিলেন, কিন্তু, অন্যদিকে, হুইটম্যানের কবিতার বহিরঙ্গ বিন্যাস তিনি মেনে নিতে পারেননি। আমরা জানি যে, এ-ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ক্রমে আরও প্রবল হবে। জানি যে, প্রথম দিকে যিনি হুইটম্যানের অনুরাগী ছিলেন, শেষের দিকে তিনি বিপুল বিতৃষ্ণায় ফিরিয়ে নেবেন তাঁর মুখ। অমসৃণ আঙ্গিক এবং ছন্দের বিশৃঙ্খল বিন্যাসের দরুন হুইটম্যানের কবিতাকে তখন আর সহ্যই করতে পারবেন না তিনি। নিজে একজন খাঁটি কবি হয়েও তিনি ধরতে পারবেন না যে, আর-একজন খাঁটি কবি তাঁর কবিতাকে ঠিক কোন্‌খানে নিয়ে পৌঁছে দিতে চাইছেন, কিংবা তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছেন কোন্ কাজ। বুঝতে পারবেন না যে, এই অমসৃণতা আর এই বিশৃঙ্খলা অদক্ষতার ফসল নয়। কবিতার কাঠামো আর ছন্দ সম্পর্কে তখনকার যেটা স্বীকৃত, প্রচলিত অভ্যাস, সেই অভ্যাসকে যে হুইটম্যান আসলে ভাঙতেই চান, প্রথার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চান কবিতাকে, এই সহজ সত্যটাই তাঁর চোখ এড়িয়ে যাবে। ফলে, সুইনবার্নও তখন বিদ্রুপ করবেন হুইটম্যানকে, এবং তাঁর প্রবর্তিত কাব্যরীতি যে কারও আগ্রহ আকর্ষণের যোগ্য নয়, নিতান্তই একটা বাতিকের ব্যাপারমাত্র, এইটে ধরে নিয়ে, ১৮৭৭ সালে লিখবেন তাঁর 'হুইটম্যানিয়া'।

কবিতার সমালোচনায় কেন যে এই ধরনের বিভ্রাট ঘটে, পরবর্তীকালে যা অসংখ্যজনের আনন্দে সমর্থন, শোকে সান্ত্বনা ও বিপর্যয়ে সাহস জোগাবে, কিংবা—তা যদি না-ও জোগায়—অনাবিষ্কৃত নানা সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবে অসংখ্যজনের, আপনকালের সমালোচকদের অনেকের কাছ থেকেই যে অনেকক্ষেত্রে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কিংবা তিরস্কার কুড়োতে হয় কেন, এবং—এমন কী—আপন কালের কবিরাও যে কেন অনেকক্ষেত্রে তাকে তার সত্য-পরিচয়ে চিনে উঠতে পারেন না, এই নিবন্ধের সূচনাতেই তার আভাস আমরা দিয়েছি। বিভ্রাট ঘটে, কেন-না আমরা অধিকাংশ মানুষই অভ্যাসের দাস, এবং যা একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে নূতন, তাতে আমরা অভ্যস্ত নই বলেই আমাদের চিত্তে তা একটা ভয়ংকর রকমের অস্বস্তি জাগিয়ে দেয়। ভালো করে তাকে বিচার করি না আমরা। তার আগেই তাকে আমরা বর্জন করে বসি।

নূতন সম্পর্কে এই যে অস্বস্তি ও আতঙ্ক, শুধু সাহিত্য বলে কথা নেই, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর একটা মস্ত ভূমিকা রয়েছে। অন্যদিকে, মনুষ্যেতর

১২. *Under the Microscope.*

১৩. "Out of the Cradle Endlessly Rocking" ও "When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed".

প্রাণীসমাজও এই অস্বস্তি ও আতঙ্ক থেকে মুক্ত নয়; বরং, হরেক ব্যাপারে, নানা প্রাণীর জীবনে এর প্রভাব আরও বেশি মাত্রায় ক্রিয়াশীল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি, মানুষ যত সহজে তার নব-নব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, অন্যান্য অনেক প্রাণীই তত সহজে সেটা পারে না। না পারবার কারণ আর কিছুই নয়, নূতন পরিবেশ সম্পর্কে তাদের অস্বস্তি ও আতঙ্ক, মানুষের তুলনায়, অনেক বেশি প্রবল। কিন্তু এই অস্বস্তি যে তাদের পক্ষে সুফলপ্রসূ হয় না, বরং তাদের অস্তিত্বকেই ক্রমে বিপন্ন করে তোলে, জীববিজ্ঞানীরাই সে-কথা আমাদের জানিয়ে দেবেন। উদ্‌বর্তন-প্রক্রিয়ায় যারা টিকে থাকতে পারেনি, সেইসব প্রাণীর অপারগতার সঙ্গে এই অস্বস্তিকে তাঁরা কার্যকারণের সূত্রে যুক্ত করে দেখাবেন। তাঁরা বলবেন যে, যে-সমস্ত কারণে বিস্তর প্রাণী এই ধরাধাম থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, তার মধ্যে একটা মস্ত কারণ হচ্ছে 'নিয়োফোবিয়া'।

কিন্তু আমরা যখন 'নিয়োফোবিয়া'র কথা বলি, তখন মানস প্রক্রিয়ার মাত্র একটা দিকের কথাই আমরা বলি। অন্যদিকে রয়েছে 'নিয়োফিলিয়া', অর্থাৎ নূতন সম্পর্কে একটা আগ্রহ, আকর্ষণ বা প্রীতির ভাব। মানবজীবনে এই আগ্রহ যে তার অস্বস্তিকে প্রায়শ ছাপিয়ে যায়, তা আমরা জানি। আমরা জানি যে, তা যদি না যেত, নব-নব পরিস্থিতির সঙ্গে মানুষ তাহলে এত অনায়াসে সংগতি রক্ষা করতে পারত না।

সত্যি বলতে কী, মানুষের জীবনে পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিবর্তন যত দ্রুত ঘটেছে, এমন আর অন্য কোনও প্রাণীর জীবনে নয়। মানুষের বয়স মোটামুটি দশ লক্ষ বছর হল। অন্যদিকে, কৃষিকর্মের ভিতর দিয়ে যদি তার সভ্যজীবনের সূচনা হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে, সেই সভ্যতার বয়স মোটামুটি দশ হাজার বছর। অর্থাৎ তার সভ্যতার বয়স তার মোট বয়সের একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, মোট বয়সের এই যে অতি ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ, মানুষের যা-কিছু অগ্রগতি, সেটা এরই মধ্যে ঘটেছে। এরই মধ্যে সে সাদাসিধে কৃষিজীবন থেকে জটিল যন্ত্র-জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে, এরই মধ্যে সে গ্রাম থেকে নগরের পথে পা বাড়িয়েছে, এরই মধ্যে সে মস্ত-মস্ত মন্দির, হর্ম্য, সেতু, দুর্গ আর কলকারখানা বানিয়েছে; এরই মধ্যে সে তৈরি করেছে জাহাজ-রেলগাড়ি-মোটর-এরাপ্লেন, এবং এরই মধ্যে তার ক্রমাগ্রসরমান সভ্যজীবনের আরও অসংখ্যবিধ অনুষঙ্গ সে সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ জটিল থেকে ক্রমে আরও জটিল হয়েছে তার জীবন-ব্যবস্থা। আমরা এখানে এক নিশ্বাসে এসব কথা বললুম বটে, কিন্তু আজকে আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেইখানে এসে পৌঁছোবার জন্য মানুষের সভ্যতাকে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে যে মস্ত-মস্ত বাঁক নিতে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা এই যে, যত বার তার সভ্যতা বাঁক

নিয়েছে, একটি খাতকে পরিত্যাগ করে প্রবাহিত হয়েছে অন্য খাতে, ততবারই মানুষকে সম্মুখীন হতে হয়েছে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশ ও নূতন পরিস্থিতির। সেই নূতনতার সঙ্গে তার জীবনের সংগতি রক্ষা করে চলতে পেরেছে বলেই নিরবচ্ছিন্ন থেকেছে তার অগ্রগতি; নূতনকে বারবার আবাহন ও আত্মস্থ করতে না পারলে সেটা সম্ভব হত না।

বলা বাহুল্য, সামগ্রিক মানবসভ্যতার গতিবিভঙ্গ এখানে আমাদের বিবেচ্য নয়; এমনকি, সামগ্রিকভাবে তার শিল্প-সংস্কৃতির দিকেও আমরা এখানে চোখ রাখিনি। কবিতা, শুধু কবিতাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু কবিতার যে স্রোতোধারা, বাল্মীকি কিংবা হোমারের কাল থেকে তাকেও কি নিতান্ত কম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে? দেশে-দেশে, যুগে-যুগে তাকেও বাঁক নিতে হয়েছে অসংখ্য বার, এবং— তার চেয়েও যেটা বড়ো কথা— যতবার সে আকস্মিকভাবে বাঁক নিয়েছে, তত বারই তার পাঠক আর সমালোচককে সম্মুখীন হতে হয়েছে অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত, এবং সেই কারণেই অস্বস্তিজনক, এক-একটি পরিস্থিতির।

অস্বস্তি ভাষা নিয়ে, অস্বস্তি ভাবনা নিয়ে, অস্বস্তি বিষয়বস্তু নিয়ে। এবং সেই অস্বস্তির সবচেয়ে বড়ো কারণ এই যে, কবিতার ভাষা, ভাবনা ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যখন যুগান্তকারী এক-একটা পরিবর্তন ঘটে যায়, তখন তার গুরুত্ব পরিমাপের যোগ্য কোনও মানদণ্ড কিংবা মূল্য যাচাইয়ের যোগ্য কোনও নিকষ আমাদের হাতে থাকে না। নূতন কোনও মানদণ্ড কিংবা নিকষ যে খুঁজে নেওয়া দরকার, তা-ও আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না। যা আমাদের হাতে থাকে সেই পুরোনো মানদণ্ড আর পুরোনো নিকষের সাহায্যেই আমরা কবিতার ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ভূত সেই নূতন পরিস্থিতির গুরুত্ব পরিমাপের ও মূল্য যাচাইয়ের চেষ্টা করি। তাতে আমাদের বিভ্রান্তি ও বিড়ম্বনা আরও বাড়ে মাত্র।

বিদেশি লেখক তাঁর লেখার মধ্যে অনেকটা এই রকমের বিড়ম্বনার একটি প্রতীকচিত্র পেশ করেছেন। পথের এক ধারে একটি বাতিস্তম্ভ, সেই বাতিস্তম্ভ গোটাপথের অন্ধকার দূর করতে পারেনি, শুধু অল্প একটুখানি জায়গা জুড়ে ছোট্ট একটি আলোর বৃত্ত রচনা করে রেখেছে, আর সেই বৃত্তের মধ্যে আতিপাতি করে কী যেন খুঁজছে একটি লোক। যে-বস্তু খুঁজছে, তা কিন্তু ওই বৃত্তের মধ্যে হারায়নি, হারিয়েছে বৃত্তের বাইরে অন্ধকারের মধ্যে। তাহলে বৃত্তের বাইরে গিয়ে সে খুঁজছে না কেন, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে লোকটি বলেছিল, "কী করে খুঁজব, ওখানে যে আলো নেই!"

কাব্যবিচারের ক্ষেত্রেও এই একই সমস্যা দেখা দেয়। সেখানে যখন

সর্বাঙ্গীণভাবে নূতন কোনও সৃষ্টির সম্মুখীন হই আমরা, এবং নূতনত্বের জন্যই যখন তাকে বড়ো রহস্যময় ঠেকতে থাকে, তখন আমরাও এই একই কাজ করি, কাব্যের সঙ্গে আমাদের পূর্বপরিচয়ের যে একটি পুরোনো বৃত্ত রয়েছে, তারই মধ্যে খুঁজতে থাকি এই সদ্যোজাত রহস্যের সমাধান। সমাধান, বলা বাহুল্য, মেলে না। আমরাও, বলা বাহুল্য, পারতপক্ষে সেই বৃত্তের বাইরের অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়াতে চাই না। তার পরিবর্তে, আমাদেরই উদ্যমের অভাবে যা আমাদের উপলব্ধির অগম্য থেকে যাচ্ছে, ব্যঙ্গবিদ্রুপের ভিতর দিয়ে তাকে আমরা বর্জন করি। কোনও রচনার মধ্যে যখন আমাদের কবিতা-সংক্রান্ত পূর্ব-ধারণার সমর্থন মেলে না, তখন বলি যে, তার মধ্যে কবিতা নেই। যা বুঝি না, ধরেই নিই যে, তা বুঝবার যোগ্য নয়। এবং এইভাবেই এক-একটি নবজাত কাব্যরীতিকে অবহেলা অথবা বিদ্রুপের অস্ত্র দিয়ে হত্যা করবার প্রয়াস পাই আমরা।

কিট্‌সের হত্যাকারী কে? 'হু কিল্‌ড জন কিট্‌স?' বায়রনের কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে উত্থাপিত এই যে প্রশ্ন, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতেই এর উত্তর মিলে যায়। 'কোয়ার্টার্লি' পত্রিকাকে দিয়ে বায়রন সেখানে কবুল করিয়ে নেন যে, সে-ই কিট্‌সের হত্যাকারী। অর্থাৎ, আরও অনেকের মতো, বায়রনও বিশ্বাস করতেন যে, নিন্দামন্দে 'কোয়ার্টার্লি'র রসনা যদি না অত প্রখর হয়ে উঠত, তাহলে হয়তো আরও কিছুদিন বাঁচতেন কিট্‌স, নিতান্ত ছাব্বিশে তাঁকে বিদায় নিতে হত না। কিন্তু শুধু 'কোয়ার্টার্লি' বলে কথা নেই, প্রতিষ্ঠিত একাধিক কবিও যে সেদিন কিট্‌সের কাব্যরীতিকে তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলেছিলেন, তা-ও নিশ্চয় স্বীকার্য। যদি প্রশ্ন ওঠে, সেই কাব্যরীতির তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পারেননি কেন, তাহলে তার উত্তর নিশ্চয় এই হবে যে, আত্মতৃপ্ত তাঁরাও তাঁদের পুরোনো বৃত্তের মধ্যেই বসে ছিলেন। তাঁদের হাতে ছিল কাব্যবিচারের পুরোনো মানদণ্ড, একটি নূতন কাব্যরীতির তাৎপর্য-বিচারে যা কিনা কোনও কাজে লাগে না।

অনেককাল আগে শোনা দুটি পঙ্‌ক্তির কথা মনে পড়ে :

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরি,
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি মরি!

এ হচ্ছে একেবারে চূড়ান্ত রকমের বিড়ম্বনার একটি চিত্র। যা দিয়ে সে সোনার শুদ্ধতা যাচাই করে থাকে, তাই দিয়ে যে পদ্মফুলের শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব নয়, জহুরি সে-কথা জানে না।

কিন্তু এই জহুরিকে যে নির্বোধ বলব, এমন সাহস আমাদের কোথায়? বস্তুত, তাকে নিন্দা করলে সেটা আত্মনিন্দা হয়ে দাঁড়াবে। কেন-না, কষ্টিপাথর দিয়ে ফুলের শুদ্ধতা যাচাই করতে গিয়ে যে-ভুল সে করেছে, কবিতার শুদ্ধতা যাচাই

করতে গিয়েও অনেকক্ষেত্রে সেই একই ভুল আমরা করে থাকি। আমরা পুরোনো কষ্টিপাথর কিংবা পুরোনো মানদণ্ড দিয়ে এমন কবিতাকে বিচার করতে যাই, ভাষায় ভাবনায় ও বিষয়বস্তুতে যা একেবারে আদ্যন্ত নবীন। ফলে, নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো আমাদের পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ভাষা, ভাবনা ও বিষয়, এই তিনটি ক্ষেত্রেই ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছই আমরা।[১৪] যে-ভাষা, যে-ভাবনা ও যে-বিষয়বস্তুকে কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, শুধু তারই মধ্যে আটকে থাকে আমাদের দৃষ্টি। তার বাইরে আমাদের নজর চলে না। আমরা বুঝতে পারি না যে, কবিতা কোনও বিশেষ ভাষা, বিশেষ ভাবনা কিংবা বিশেষ বিষয়বস্তুর মধ্যে আটকে থাকবার ব্যাপার নয়। কবিতা তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। যায়ও।

আংশিক ভ্রান্তির দৃষ্টান্তও নেহাত কম নয়। বরং প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, কোনও কবির রচনাকে বিচার করতে বসে এক ক্ষেত্রে যিনি পুরোনো মানদন্ড পরিত্যাগ করতে পারছেন, অন্য ক্ষেত্রে তিনি পুরোনো অভ্যাস বা সংস্কারের মায়া কাটাতে পারছেন না। সুইনবার্নের কথা আগেই বলেছি। প্রচলিত নানা বিধান-ব্যবস্থা সম্পর্কে হুইটম্যানের কবিতায় যে 'হেরেসি' বা বিদ্রোহভাবের দেখা মেলে, সুইনবার্ন সেটা পছন্দ করছিলেন। এই বিদ্রোহ যে স্বাগত, এবং কবিতার স্বাস্থ্য যে এতে নষ্ট হবে না, বরং এরই ফলে যে তার রক্ত আরও শুদ্ধ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা, সে-কথা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ভাবনাগত বিদ্রোহের সঙ্গে কবিতার ভাষা আর ছন্দেও হুইটম্যান যে-বিদ্রোহ ঘটিয়ে দিলেন, সুইনবার্ন তার প্রয়োজনীয়তাকে মানতে পারলেন না। 'ফ্রি ভর্স' তাঁর কানে বড়োই বেখাপ্পা ঠেকল। তিনি বুঝলেন না যে, বিদ্রোহটাকে শুধুই ভাবনা কিংবা বিষয়বস্তুর মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব নয়, এক ক্ষেত্রের বিদ্রোহ স্বতই আর-এক ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে ও সেখানেও আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঠিক এর উলটো-দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সিদ্ধান্তে। রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদার* ভাষা-ছন্দ যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তিনি নিজেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমা-ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর বোধ হয় আর কেহই

---

১৪. ম্যাথু আর্নল্ডের মতো ডাকসাইটে কবি-সমালোচকও যে অন্তত শেলির কাব্যবিচারে, সার্বিক ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তাঁর একটি উক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে। পলগ্রেভের *গোলডেন ট্রেজারিতে* সন্নিবেশিত শেলির কবিতামালা সম্পর্কে আর্নল্ডের বক্তব্য : "...a gallery of his failures."।

লিখিতে পারেন নাই।"[১৫] কিন্তু এত কথা বলার পরেও যে তিনি মন্তব্য করেছেন, "তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত",[১৬] তার কারণ আর কিছুই নয়, 'চিত্রাঙ্গাদা'র বিষয়বস্তু তার কাছে অশ্লীল ঠেকেছিল। অর্থাৎ সেই নূতন বিষয়বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেননি।

বুঝতে না-পারার মূলে রয়েছে সংস্কার, রয়েছে অভ্যাস, রয়েছে সাহিত্য-বিচারের প্রচলিত মানদণ্ডের প্রতি আসক্তি।

এতক্ষণ সেই আসক্তির কথা বলেছি। এবারে বলা দরকার যে, পুরাতনের প্রতি আসক্তির অবসানও মাঝে-মাঝে ঘনিয়ে ওঠে। একদিকে যখন পুরোনো অভ্যাস আর পুরোনো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরি আমরা, অন্যদিকে তখন নূতন সম্পর্কে একটা আগ্রহবোধও আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। যেমন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে, তেমনই সাহিত্য সম্পর্কেও একথা সত্য। নইলে সাহিত্যের অগ্রগতি কবেই স্তব্ধ হয়ে যেত। জীবনের আর-পাঁচটা ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই পাঁচালি আর মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকতুম আমরা। তার চেয়ে নবীন কিছুকে আমরা গ্রহণ করতুম না।

নবীনমাত্রেই যে গ্রাহ্য কিংবা বরণীয়, তা অবশ্য নয়। সাহিত্যেও নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "কোনো-একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গি বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয়নি, সেজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হল, সেও অসংগত,"[১৭] তখন তাঁর এই কথাটাকে মেনে না নেবার কোনও কারণই দেখতে পাই না আমরা। কিন্তু একই সঙ্গে বলি, কোনও কিছু নিতান্ত নূতনতার কারণেই যেমন গ্রাহ্য নয়, তেমনই আবার নূতন বলেই যে সে বিনাবাক্যে বর্জনীয়, তা-ও নয়। আসল কথা, অভ্যাসের দাসত্ব কাটিয়ে তাকে বিচার করে দেখা চাই।

বিচার করবার জন্যই দরকার হয় নূতন মানদণ্ডের। নূতনের প্রতি আমাদের আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সেই মানদণ্ড ক্রমে গড়েও ওঠে। বাংলা সাহিত্যেও গড়ে উঠেছে। নইলে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেই আমরা আটকে থাকতুম, রবীন্দ্রকাব্যের আহ্বানে আর এত বিপুলভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব হত না। প্রখ্যাত একজন বাঙালি সমালোচকের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "বাঙ্গালী সাহিত্যিক যেমন একদিকে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ বাঙ্গালী

১৫. ১৬. *সাহিত্য*, ২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

১৭. সাহিত্যরূপ। *সাহিত্যের পথে*।

সমালোচকও এই নবজাত সাহিত্যের রসাস্বাদন ও মূল্য নির্ধারণের জন্য যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত....নূতন মানদণ্ড উদ্‌ভাবন করিয়াছে।"[১৮]

উদ্ভাবনা যে অসম্ভব হয় না, তার কারণ, নূতন সাহিত্য, নূতন কবিতা সম্পর্কে আমাদের ভিতরকার যে-বাধা, কিছুকালের জন্য তার কাছে নতি স্বীকার করলেও, শেষ পর্যন্ত তাকে আমরা জয় করতেও পারি। যদি বলি, কবিতার অগ্রগতির প্রতি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের যে-ইতিহাস, এক হিসেবে তা কবিতার ভাষা, ভাবনা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাদের ভিতরকার বাধাগুলিকেই বারবার পেরিয়ে আসবার ইতিহাস, তাহলে নিশ্চয় বাড়িয়ে বলা হবে না।

১৮. গ্রন্থ-পরিচিতি। *সমালোচনা সাহিত্য*। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিতা কীভাবে

কীভাবে তৈরি হয়ে ওঠে কবিতা? অর্থাৎ, একটি শব্দের আহ্বানে কীভাবে আর-একটি শব্দ তার পাশে এসে দাঁড়ায়, কোনও দৃশ্য উক্তি পরিস্থিতি কিংবা ঘটনা সম্পর্কে কবির অনুভূতি কিংবা মানস প্রতিক্রিয়া কীভাবে পরস্পরের-সঙ্গে-অবিচ্ছেদ্যভাবে-আবদ্ধ শব্দমালার মধ্য দিয়ে উন্মীলিত হতে থাকে, সেই শব্দমালা কীভাবে—ভিতর থেকে ঠেলা খেয়ে—একটি পঙ্‌ক্তি থেকে আর-একটি পঙ্‌ক্তিতে গড়িয়ে যায়, দশ বিশ তিরিশ কি পঞ্চাশটি পঙ্‌ক্তির সমবায়ে কীভাবে গড়ে ওঠে একটি ফ্রেম, এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবনার মুখশ্রী কীভাবে উঁকি দেয়— এই প্রশ্নের উত্তর জানা কি একান্তই জরুরি?

আমাদের সংশয় ঘটছে এইজন্যে যে, কবিতার নির্মাণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য না হয় আহরণ করা গেল, কিন্তু সেই তথ্যগুলিকে যে কোনও ব্যাবহারিক কাজে আমরা লাগাতে পারব, এমন সম্ভাবনা নাস্তি। একটি দেশ যে আর-একটি দেশে গুপ্তচর পাঠায়, তার গবেষণাগারে গিয়ে উঁকি দেয়, চুরি করতে চায় তার নবতম নির্মাণের ব্লু-প্রিন্ট, জেনে নেবার চেষ্টা করে যে, দ্বিতীয় দেশটি কীভাবে তৈরি করেছে তার সর্বাধুনিক ডুবোজাহাজ, তার কারণ ডুবোজাহাজের নির্মাণ-প্রক্রিয়ার রহস্যটাকে বুঝতে পারলে সে নিজেও ঠিক সেইরকমের একটি ডুবোজাহাজ বানিয়ে তুলতে পারবে। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে কি সেটা সম্ভব?

ধরা যাক, কবিতা যেখানে তৈরি হচ্ছে, সেইখানে গিয়ে উঁকি দিলুম আমরা, বুঝে নিলুম যে, কোন্ পশ্চাৎপট থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার প্রেরণা, কিংবা কোন্ দৃশ্য উক্তি পরিস্থিতি কিংবা ঘটনা উসকে দিয়েছে তার ভাবনাকে, জেনে নিলুম যে, ভাবনা কীভাবে শব্দের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে, এবং ধ্বনি ছন্দ উপমা উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে পরিগ্রহ করছে একটি সুন্দর, সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল, সংহত মূর্তি। ধরা যাক, এই সবই আমরা করলুম, এবং এইভাবে বিস্তর জ্ঞানও অর্জন করলুম আমরা। কিন্তু এই যে জ্ঞান, এটা আমাদের কোন্ কাজে লাগবে?

সত্যি বলতে কী, যাকে আমরা কবিতা বলি, সেই নির্মাণকর্মের কোনও ব্লু-প্রিন্ট যদি থাকত, তবে সেটাও আমাদের কাজে লাগত না। ডুবোজাহাজ কি

ইস্পাত-কারখানা কি তৈল-শোধনাগারের ব্লু-প্রিন্ট দেখে একেবারে আদ্যন্ত সেইরকম আর-একটি ডুবোজাহাজ কি ইস্পাত-কারখানা কি তৈল-শোধনাগার বানিয়ে নেওয়া যায়, এবং এই বানিয়ে নেওয়াটা যে পণ্ডশ্রমের ব্যাপার হয় না, তার কারণ, দ্বিতীয়টি যদিও ছাঁচে-ঢালা অনুকরণমাত্র, তবু প্রথমটির মতোই সে কাজে লাগে। কবিতার ব্যাপারে কিন্তু ব্লু-প্রিন্ট কোনও কাজে লাগে না। কেন-না, ছাঁচে-ঢালা হুবহু অনুকৃতির কোনও চাহিদা অথবা সমাদর এক্ষেত্রে নেই। এবং একটু ভেবে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব যে, শুধু কবিতা নয়, সবরকমের শিল্প সম্পর্কেই একথা সত্য। মিকায়েলেঞ্জেলোর 'প্লাবন', রঁদার 'ভাবুক', কিংবা মোৎসার্টের 'ফিগারোর বিবাহ' (মোৎসার্টের জীবদ্দশায় যা কিনা 'জার্মন আবর্জনা' বলে নিন্দিত হয়েছিল) যে বারেবারে আমাদের আগ্রহ আকর্ষণ করে, এবং আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগায়, তার একটা মস্ত কারণ অবশ্যই মৌলিকতা। কবিতার প্রসঙ্গে বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কিংবা জীবনানন্দের 'সিন্ধুসারস' যদি না মৌলিক সৃষ্টি হত, তবে প্রথম পাঠের সঙ্গে-সঙ্গেই ওই কবিতাদুটি সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের অবসান ঘটত, দ্বিতীয় বার আর তাদের কাছে আমরা ফিরে যেতুম না।

বলা বাহুল্য 'পৃথিবী' ও 'সিন্ধুসারস' কবিতার ভিতরেও লুকিয়ে রয়েছে দুইরকম ভাবনা ও দুইরকম শব্দ-শিল্পের দুটি নকশা। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই নকশা দুটিকে খুঁজে নিতে পারলেই, এবং কোন্ কোন্ মালমশলার কতটা মিশেল ঘটিয়ে কীভাবে সেই নকশার উপরে গড়ে তোলা হয়েছে অবিনশ্বর দুটি কবিতা, সেটা বুঝে নিতে পারলেই কি আমরাও ঠিক ওই রকমেরই মৌলিক দুটি নতুন কবিতা গড়ে তুলতে পারব? তা আমরা পারব না। মৌলিক নকশার ভিত্তিতে আমরা, বড়োজোর, নকল 'পৃথিবী' ও নকল 'সিন্ধুসারস' বানাতে পারি। কিন্তু মূল 'পৃথিবী' ও মূল 'সিন্ধুসারস' যখন অলভ্য নয়, তখন সেই নকল নির্মাণদুটি কোন্ কাজে লাগবে?

সুতরাং প্রশ্ন উঠবে যে, কবিতার জন্মরহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে তবে আর আমাদের লাভ কী? কী লাভ তার সাজঘরে উঁকি দিয়ে? তার নেপথ্যবর্তী ইতিহাসের সন্ধান নিয়ে? তার পশ্চাৎপট, উপকরণ, মিশ্রণ-ক্রিয়া অথবা শারীর সন্ধিবিদ্যা সম্পর্কে খুঁটিনাটি নানা খবর জেনে? লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি আমরাও না মৌলিক কিছু কবিতা বানিয়ে তুলতে পারি, তবে আর জেনে আমাদের কোন্ চতুর্বর্গ ফললাভ হবে যে, কোন্ কবি তাঁর মৃত্যুঞ্জয় কোন্ কবিতাটিকে ঠিক কীভাবে বানিয়ে তুলেছিলেন, কিংবা কোন্ দৃশ্য ঘটনা অথবা পরিস্থিতি থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা?

উত্তরে শুধু একটা কথাই আমরা বলতে পারি। সেটা এই যে, কবিতার

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য যখন আমরা পেয়ে যাই, তখন সেই তথ্যগুলি, কবিতা রচনার ব্যাপারে না হোক, কবিতা উপলব্ধির ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে। আমরা যখন জানতে পারি যে, কোন্ পশ্চাৎপট কীভাবে একজন কবির চিত্তকে স্পন্দিত করে ও সৃষ্টিকর্মের দিকে তাঁকে এগিয়ে দেয়, এবং কীভাবে একজন কবির হাতে তৈরি হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা, তখন এক হিসেবে, তাঁর মানস প্রক্রিয়ার সঙ্গেই আর-একটু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে যায় আমাদের, এবং, তার ফলে, আর কিছু না হোক, তাঁর পাঠক হিসেবে আমরা আরও খানিকটা সমর্থ হয়ে উঠি। অন্যদিকে, আমরা যখন জেনে যাই যে, একই বিষয়ে এবং একই সময়ে তিন জন কবি, শেলি কিট্‌স ও লে হান্ট, যে-তিনটি কবিতা রচনা করেছিলেন,[১] তার পিছনে আন্তর কোনও তাগিদ অথবা স্বাভাবিক কোনও অনুপ্রেরণা কাজ করেনি, ওটা আসলে পরস্পরের সঙ্গে চুক্তি করে কবিতা লেখার ব্যাপারমাত্র, তখন কবিতার অন্তরালবর্তী এই সংবাদটুকুও পাঠক হিসেবে কিছু-না-কিছু সাহায্য করে আমাদের। আর-কিছু না হোক, আমাদের বুঝে নিতে সাহায্য করে যে, তিনটি কবিতার একটিও কেন স্বচ্ছন্দ ভাবে উন্মীলিত হয় না, এবং অন্তত দুটির— শেলি ও কিট্‌সের কবিতার—ভাবনাসূত্র কেন ঠিকমতো বিস্তারিত হবার আগেই অতর্কিতে ছিঁড়ে যায়।

কবির সঙ্গে তাঁর পাঠকের সম্পর্ক আসলে স্রষ্টা ও ভোক্তার। কবি স্রষ্টা, তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন, আর আমরা, পাঠকেরা, সেই সৃষ্টির রস আস্বাদন করছি। কিন্তু এই সহজ সত্যটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, যেমন সৃষ্টিকর্মের জন্যে, তেমনই সেই সৃষ্টিকে শনাক্ত করে তার রস আস্বাদনের জন্যেও একটা মানসিক প্রস্তুতির দরকার। বস্তুত, সমস্ত পাঠকের প্রস্তুতি সমান নয় বলেই তাঁরা দুটি সৃষ্টির তারতম্যকে চিনে উঠবার ব্যাপারে যেমন সমপরিমাণ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন না, অন্যদিকে তেমন তাঁদের আস্বাদন অথবা সম্ভোগের মাত্রাতেও অল্পবিস্তর তারতম্য ঘটে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনা' থেকে একজন পাঠক যতটা রস নিষ্কাশন করে নেন, আর-একজন পাঠক ঠিক ততটাই নিতে পারেন না। জীবনানন্দের 'হাওয়ার রাত'-এর মধ্যে একজন পাঠক ঠিক ততটাই ডুবে যেতে পারেন না, আর-একজন পাঠক যতটা পরেন। তার রহস্য, ব্যঞ্জনা কিংবা ইঙ্গিতগুলি হয়তো একজন পাঠকের কাছে ততটাই ধরা পড়ে না, আর-একজন পাঠকের কাছে যতটা পড়ে। দুই পাঠকই ভোক্তা, কিন্তু দুজনের সম্ভোগের প্রকৃতি

১. তিনটি কবিতারই বিষয়বস্তু হল 'নীল নদ'। রচনার কিছুদিন বাদে কিট্‌স তাঁর ভাইকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "The Wednesday before last (Feb. 4, 1818) Shelley, Hunt and I wrote each a sonnet on the river Nile."।

ও মাত্রায় কিছু-না-কিছু ব্যবধান যে ঘটে যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছু নয়, তাঁদের প্রস্তুতির তারতম্য। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, পাঠক হিসেবে যাঁর প্রস্তুতি যত বেশি, তিনি তত যোগ্য পাঠক। এই অর্থে যোগ্য যে, কবিতার গুণবিচার ও রস-সম্ভোগের ব্যাপারে, অন্য অনেকের তুলনায়, নিজেকে তিনি আরও বেশি পরিমাণে তৈরি করে তুলেছেন।

তৈরি হবার প্রসঙ্গে একটি বিদেশি প্রাজ্ঞবচনের কথা আমাদের অনেকেরই মনে পড়তে পারে। তাতে বলা হয়েছে যে, কবিরা কবি হয়েই জন্মান, তাঁদের তৈরি করে তোলা যায় না।[২] এই উক্তির মধ্যে অর্জিত ক্ষমতার উপরে আদৌ জোর পড়ছে না, সমস্তটুকু জোর পড়ছে সহজাত শক্তির উপরে। বলা হচ্ছে যে, যিনি কবি, তিনি তাঁর সহজাত শক্তির কারণেই কবি। অর্থাৎ কাব্যরচনার শক্তি হচ্ছে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো। কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু তাই বলে যে পুরোপুরি সত্য, তা নয়। একজন কবির জীবনের যেটা সূচনাপর্ব, সহজাত ক্ষমতার একটা মস্ত ভূমিকা সেখানে রয়েছে বটে, কিন্তু পরবর্তী পর্বগুলিতে— অর্থাৎ সেই কবির দৃষ্টিকোণ যখন ক্রমশ পালটে যাচ্ছে, নানান বস্তু অথবা বিষয় সম্পর্কে বদলে যাচ্ছে তাঁর ভাবনা, ভাষার বিবর্তন ঘটছে, এবং একটু-একটু করে নিজেকে ভাঙতে-ভাঙতে যখন আবার নতুন করে নির্মাণ করে নিচ্ছেন তিনি, তখন— তাঁর অর্জিত ক্ষমতার ভূমিকাও বেশ বড়ো হয়েই দেখা দেয়। সত্যি বলতে কী, যে-কবি শুধু সহজাত ক্ষমতার উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল, সারা জীবন যেন শুধু একই ভাবনা আর একই ভাষার উপরে দাগা বুলিয়ে-বুলিয়ে লিখে যান তিনি, যে-ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন, তার ক্ষেত্রকে আর বাড়িয়ে নেন না বলেই তাঁর কবিতারও আর বিশেষ-কোনও পরিবর্তন ঘটে না, কবি হিসেবে তিনি আর বেড়ে ওঠেন না। অন্যদিকে, কবি হিসেবে আমৃত্যু যিনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছেন না, ক্রমাগত উত্তীর্ণ হতে চাইছেন ও উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন ভাবনা ও ভাষার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে, অর্থাৎ নিজেকে যিনি ক্রমেই আরও ব্যাপ্ত, বিকীর্ণ ও বিকশিত করছেন, এবং— ধারাবাহিক এই উন্মীলনের ফলেই— নূতন প্রজন্মের পাঠকের কাছেও যাঁর কবিকর্মের রেলিভ্যান্স্ বা প্রাসঙ্গিকতা চট্ করে ফুরিয়ে যাচ্ছে না, আমরা বুঝতে পারি যে, শুধুই সহজাত ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে তিনি নিশ্চিন্ত থাকেননি, ক্রমাগত তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন তাঁর অর্জিত ক্ষমতাকে, এবং এইভাবে তাঁর তূণীরের অস্ত্রসংখ্যা তিনি দিনে-দিনে আরও বাড়িয়ে নিয়েছেন। এক কথায় বলতে পারি, কবি হিসেবে নিজেকে তিনি ক্রমেই আরও বেশি মাত্রায় তৈরি করে তুলেছেন।

২. " Poeta nascitur, non fit."

ঠিক তেমনই, পাঠকেরও দরকার হয় নিজেকে যথাসম্ভব তৈরি করে তুলবার। একথা আমরা আগেই বলেছি। আমরা আরও বলেছি যে, যেমন কবিতারচনার জন্য, তেমন তার রস-সম্ভোগের জন্যও কিছু ক্ষমতা ও প্রস্তুতি থাকা চাই। যা কিনা সকলের থাকে না। আবার, যাঁদের থাকে, তাঁদেরও সেই সম্ভোগক্ষমতার সবটুকুই যে সহজাত, তা নয়। তাঁদের খানিকটা রসবোধ জন্মসূত্রে লব্ধ অবশ্যই, কিন্তু বাকিটুকু তাঁদের অর্জন করে নিতে হয়; এবং এই অর্জনের পরিমাণ যে-পাঠকের যত বেশি, কবিতা থেকে তত বেশি পরিমাণে রস আহরণ করে তাঁর নান্দনিক ক্ষুধা তিনি মিটিয়ে নিতে পারেন।

কবিতা কীভাবে, এই প্রসঙ্গের একেবারে সূচনায় যে এত কথা আমাদের বলতে হল, তার কারণ আর কিছু নয়, গোড়াতেই এই বক্তব্যকে আমরা পরিষ্কার করে নিতে চাইছি যে, একটি কবিতাকে— তার জন্মসূত্র অথবা পশ্চাৎপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, এবং তার গঠনকৌশলের রহস্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী না হয়ে— একেবারে সরাসরি পাঠ করবার মধ্যেও আনন্দ আছে অবশ্যই, কিন্তু তার জন্মসূত্র অথবা পশ্চাৎপটেরও কিছু আভাস যখন আমরা পাই, এবং, উপরন্তু, জানতে পারি যে, ঠিক কীভাবে সেটি— কিংবা তার অংশবিশেষ— তৈরি হয়ে উঠেছিল, তখন, বলা বাহুল্য, সেই কবিতার সঙ্গে, সাধারণ একজন পাঠকের তুলনায় আর-একটু বেশি ঘনিষ্ঠতার সূত্রে যুক্ত হই আমরা, এবং, তারই ফলে, সেই একই কবিতা থেকে আর-একটু বেশি আনন্দ আমরা নিষ্কাশন করে নিতে পারি।

দৃষ্টান্ত হিসেবে, রবীন্দ্রকাব্যের উন্মেষপর্বের প্রতীক হিসেবে যে-কবিতাটিকে অনেকে চিহ্নিত করতে ভালোবাসেন, সেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র কথাই ধরা যাক।[৩] ঠিক কীভাবে ও কোন্ চেহারা নিয়ে যে এই কবিতাটি তৈরি হয়ে উঠেছিল, তা আমরা জানি। আমরা এ-ও জানি যে, একবার তৈরি হয়ে উঠবার পরে নানা সময়ে এর নানা সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, কোন্ পশ্চাৎপট থেকে সংগৃহীত হয়েছিল এর অনুপ্রেরণা, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা খুব স্পষ্ট করে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "সদর স্ট্রিটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন

৩. অন্য আরও অনেক কবিতা নিয়েই এক্ষেত্রে আলোচনা করা যেত, কিন্তু আপাতত সেগুলিকে সরিয়ে রেখে *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ*-র উপরেই যে চোখ রাখছি আমরা, তার কারণ, এই কবিতাটির সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত; ফলে, যে-অনুপ্রেরণা এই কবিতাটির পিছনে কাজ করেছিল, এবং যে-নির্মাণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই কবিতাটি তৈরি হয়ে উঠেছে, তার তাৎপর্যকে ধরতে পারা আমাদের সকলের পক্ষেই সহজ হবে।

সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের সমস্ত আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।"[৪] সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে ও ভাসিয়ে *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ* কবিতাটি যেন নির্ঝরের মতোই তাঁর চিত্ত থেকে সেদিন উৎসারিত হয়ে আসে।

এই যে পশ্চাৎপট, এর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেও এই কবিতাটি আমরা পড়তে পারি। বলা বাহুল্য, বাল্যে, কৈশোরে ও প্রথম-যৌবনে আমরা প্রায় সকলেই তা-ই পড়েছি, মধ্যকলকাতার একটি অলৌকিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে এই কবিতার যোগসূত্রের কথা আমাদের কারও তখন জানা ছিল না। কিন্তু তাই বলে যে এই কবিতা থেকে আদৌ কোনও আনন্দ আহরণ করা আমাদের পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি, তা-ও নয়। (বস্তুত, অনেক বয়স্ক পাঠকও পশ্চাৎপটের কোনও খবর না-রেখেই অদ্যাবধি এই কবিতাটি পড়ে থাকেন, এবং তাতেও তাঁদের চিত্তে নিতান্ত কম আনন্দের সঞ্চার হয় না। *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ*-র মধ্যে যে একটি বিমুক্ত উল্লাসের বার্তা ও ব্যঞ্জনা রয়েছে, স্বতই তাঁদের চিত্ত তাতে স্পন্দিত, ঝংকৃত হয়; এর দ্রুতলয় ছন্দ ও ধ্বনিগত ঐশ্বর্যের উন্মাদনাও খুব সহজেই তাঁদের ভাসিয়ে নেয়।) কিন্তু এর পশ্চাৎপটের খবর যখন আমরা জেনে যাই, এবং তার সঙ্গে যুক্ত করে এই কবিতাটিকে যখন আবার নতুন করে পড়ি আমরা, তখন যে এর মধ্যে নতুন আর-একটি মাত্রা বা ডাইমেনশন আমরা খুঁজে পাই, তা-ও স্বীকার্য। বস্তুত, সেই মাত্রাটিকে খুঁজে পাবার ফলেই এই কবিতা আমাদের কাছে আরও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রকাব্যের সামগ্রিক পটভূমিকার উপরে স্থাপন করে এই কবিতাটিকে তখন আমরা দেখতে শিখি, এবং একমাত্র তখনই এর যথার্থ গুরুত্ববিচার আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

গুরুত্ব যে কতখানি, দুদিক থেকে সেটা বিচার্য। প্রথমে এর ভাবনার উপরে চোখ রাখা যাক। *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ*-র প্রেরণা কীভাবে এসেছিল, একটু আগে স্বয়ং কবির কাছেই তা আমরা শুনলুম। প্রসঙ্গত, তিনি আমাদের বলেছেন যে তাঁর 'হৃদয়ে স্তরে স্তরে' তখন একটা 'বিষাদের আচ্ছাদন' ছিল। শুনে আমাদের মনে স্বতই একটি প্রশ্ন

৪. *জীবনস্মৃতি* ।

জাগে। তাঁর শব্দরুচি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সতর্ক ছিল বলেই আমরা জানতে ইচ্ছুক হই যে, 'আচ্ছাদন' শব্দটিকে এখানে কেন ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রনাথ? তবে কি এই শব্দটি ব্যবহার করে তিনি এটাই আমাদের জানিয়ে দিতে চান যে, ইতিপূর্বে-রচিত তাঁর কবিতাবলির মধ্যে যে-ভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল আমাদের, বস্তুত তা ভিতর-থেকে-ঘনিয়ে-ওঠা কোনও বিষাদভাবনা নয়, নেহাতই সুপার-ইম্‌পোজ্‌ড বা বাইরে-থেকে-চাপিয়ে-দেওয়া একটা আবরণমাত্র? অর্থাৎ তাঁর মানস প্রবণতার সঙ্গে সেই বিষাদের কোনও স্বাভাবিক যোগসম্পর্ক ছিল না? রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে—অন্তত তখনও পর্যন্ত—দুঃসহ কোনও দুঃখের ঘটনা ঘটেনি, সে-কথা জানবার পরে আমাদের সন্দেহটা, বলা বাহুল্য, আরও শক্ত রকমের একটা ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে যায়, এবং তার পরে যখন আবার নতুন করে ওই 'আচ্ছাদন' শব্দটির উপরে আমরা চোখ রাখি, তখন আমরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে জেনে যাই যে, *সন্ধ্যাসংগীত*-এ যে বিষণ্ণ সুর আমরা শুনেছিলুম, তার মূলে কোনও সত্যিকারের বিষাদ ছিল না, সেই সুর আসলে প্রথম তারুণ্যের বিষাদবিলাস থেকে উদ্ভূত।

বানিয়ে-তোলা এই বিষাদের দুর্গ থেকেই বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ, উত্তীর্ণ হতে চাইছিলেন তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতার রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভূমিতে, শোনাতে চাইছিলেন—সর্বজনের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে থাকার নয়—সর্বজনের সঙ্গে যুক্ত হবার বার্তা, যে-বার্তা আমরা জানি যে, অতঃপর সারা জীবন ধরে তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি শুনিয়ে যাবেন। কিন্তু এই চাওয়ার সঙ্গে যদি সদর স্ট্রিটের বারান্দা থেকে দেখা সেই বিখ্যাত সূর্যোদয়কে আমরা কার্যকারণের সূত্রে গেঁথে গ্রহণ করি, তবে সেটাও সম্ভবত ঠিক হবে না। কেন-না, যার সঙ্গে সেই সূর্যোদয়কে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র পশ্চাৎপটকে আর-একটু ভালোভাবে বুঝে নেবার তাগিদে আরও একটু পিছনে ইতিমধ্যে চোখ রেখেছি আমরা, এবং তারই ফলে দেখতে পাচ্ছি যে, বিষাদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হবার এই যে বাসনা, *সন্ধ্যাসংগীত*-এরও নানা স্থানে এটা একেবারে অপ্রকট নয়। সেখানেও একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

"জাগ্ জাগ্ জাগ্ ওরে গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য গেল তোর গ্রহ তারা
গেল তোর আত্ম আর পর।
এইবেলা প্রাণপণ কর।

এইবেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিসনে আর।"[৫]

এবং আর-একটি কবিতায় :

"আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম
ফিরে নেব কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম।
ফিরে নেব রবিশশীতারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।"[৬]

এমনকি, 'প্রভাতসংগীত'-এর একেবারে প্রথম কবিতাটিতেও নিজের-গড়া কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সর্বজনের সঙ্গে যুক্ত হবার বাসনা অতিশয় প্রবল হয়ে ফুটে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথকে সেখানেও আমরা বলতে শুনি :

"মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস
হাহুতাশ করে সারা,
কোণে বসে শুধু ফেলিস নিশাস,
ঢালিস বিষের ধারা।
... ...
আর কতদিন কাটিবে এমন,
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়।"[৭]

---

৫. পরাজয়-সংগীত। *সন্ধ্যাসংগীত* ।
৬. সংগ্রাম-সংগীত। *সন্ধ্যাসংগীত* ।
৭. আহ্বান-সংগীত। *প্রভাতসংগীত* ।

শুনে আমাদের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না যে, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র মধ্যে যে-বিস্ফোরণের চিত্র দেখি আমরা, সেটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। বুঝতে পারি যে, বিষাদের যে-অবরোধ তিনি তাঁর নিজের হাতেই বানিয়ে তুলেছিলেন, তাকে চূর্ণ করবার বারুদও ইতিমধ্যে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল তাঁর মনের মধ্যে। সদর স্ট্রিটের সূর্যোদয়কে সেদিক থেকে একটি অনিবার্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলে গণ্য করতে পারি আমরা,—বারুদের ওই স্তূপের সঙ্গে সহসা যার সংযোগ ঘটে যায়।

অতঃপর বিস্ফোরণ। পাহাড়ে ফাটল ধরেছে, রন্ধ্রপথে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রমত্ত জলধারা। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র মধ্যে একদিকে যখন সেই বিশাল নিষ্ক্রান্তির গর্জন শুনি আমরা, তখন, অন্যদিকে, তার অমোঘ তাৎপর্যেরও একটা ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই। প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই বিস্ফোরণ না-ঘটলেই কি রবীন্দ্রনাথের মুক্তিবাসনা ব্যর্থ হয়ে যেত, এবং, কবি হিসেবে, আমৃত্যু তাঁকে বন্দি হয়ে থাকতে হত আপন-হাতে-বানিয়ে-তোলা বিষাদের দুর্গের মধ্যে? তা নিশ্চয় নয়। একথা বলবার কারণ এই যে, সদর স্ট্রিটের সেই সূর্যোদয়—একটু আগেই যাকে আমরা একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছি—আসলে একটি প্রতীকমাত্র, এবং ভিতরে-ভিতরে যেভাবে তিনি তৈরি হয়ে উঠেছিলেন, তাতে—ঠিক সেদিন না-হলেও—অচিরকালের মধ্যে ওই রকমের আর-একটি শুভপ্রতীক সন্দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হতই। কিন্তু ইতিমধ্যে এই একটা মস্ত বড়ো ক্ষতি হয়ে যেত আমাদের যে, অবিস্মরণীয় ওই কবিতাটি সে-ক্ষেত্রে আর লেখাই হত না।

কেন হত না, সেটা বুঝতে হলে দুই ধরনের কবিতার পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে। এক ধরনের কবিতা লেখা হয় আবেগের অভিঘাত কেটে যাবার পরে; তার মধ্যে বস্তুত আবেগের সেই অভিঘাতকেই আবার ধীরেসুস্থে নতুন করে বানিয়ে তোলা হয়। "...ইমোশান রিকালেকটেড ইন ট্রাংকুইলিটি"—কবিতা-নামক ব্যাপারটার রচনা-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিদেশি কবির এই যে উক্তি,[৮] এটি আসলে এই ধরনের কবিতা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আর এরই অন্য প্রান্তে রয়েছে কোলরিজের *কুবলা খান* ও রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র মতো কবিতা, কবিকে যা তাঁর আবেগের চেহারা ও চরিত্রকে ঠিকমতো বুঝে নেবারও সময় কিংবা সুযোগ দেয় না। অর্থাৎ এসব কবিতা কোনও পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরেসুস্থে তৈরি হয়ে ওঠে না, প্রবল কোনও ঘটনা অথবা উপলব্ধির অভিঘাতে কবি যখন মুহ্যমান,

৮. *লিরিক্যাল ব্যালাড্স*-এর মুখবন্ধে ওয়র্ডসওয়র্থ কবিতাকে "Spontaneous overflow of powerful feelings" হিসেবেই দেখেছিলেন বটে, কিন্তু একই সঙ্গে বলেছিলেন... "...it takes its origin from emotion recollected in tranquillity."

তখন, তাঁর সেই বিবশ ও আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেই, জন্ম নেয়। যা ঠিক সেই মুহূর্তে সেই অবস্থার মধ্যে রচিত নাহলে আর কোনও-দিনই রচিত হয় না, চিরকালের মতোই হারিয়ে যায়।

কিন্তু সে-কথা থাক। আসল কথাটা এই যে, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' যে শুধু ভাবনার দিক থেকেই তাৎপর্যময় একটি কবিতা, তা নয়, তার গঠন-তাৎপর্যও লক্ষ করবার মতো। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, যে-চেহারায় এই কবিতাটি তৈরি হয়ে উঠেছিল, পরে নানা সময়ে তার অনেক পরিবর্তন ঘটানো হয়। মূল পাঠে এর পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ছিল আড়াইশোরও বেশি। একটি পরিবর্তিত পাঠে—যে-পাঠ আমরা *সঞ্চয়িতায়* পাই, এবং ভিন্নপ্রকার দাবি সত্ত্বেও যাকে চূড়ান্ত পাঠ বলে গণ্য করবার সংগত কারণ বর্তমান—সেই সংখ্যা তেতাল্লিশে নেমে আসে। সেইসঙ্গে, কিছু-কিছু পঙ্‌ক্তির বিন্যাসও কবি পালটে দেন।[৯] পরিবর্জন ও পরিবর্তনের কারণ কী, সেটা অনুমান করা অবশ্য শক্ত নয়। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, একদিকে এর বিস্তর পঙ্‌ক্তি ছেঁটে দিয়ে ও অন্যদিকে এর পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটিকে আরও ঋজু ও সংহত করে তুলতে চাইছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কী চমকপ্রদভাবে সফল হয়েছিল, মূল পাঠের সঙ্গে *সঞ্চয়িতার* এই পরিবর্তিত পাঠকে মিলিয়ে নিলেই সেটা ধরতে পারা যায়। মূল পাঠের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু একই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, তার বিন্যাস খুবই শিথিল। পরিবর্তিত পাঠে সেই শৈথিল্য আমাদের চোখে পড়ে না।

কিন্তু এক্ষেত্রে যে শুধু সংহতিই তিনি অর্জন করতে চাইছিলেন, তা হয়তো নয়। হয়তো এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আরও বড়ো ও আরও অর্থবহ একটি লক্ষ্য তিনি অর্জন করতে চাইছিলেন। কথাটা আমরা এই জন্যে বলছি যে, মূল পাঠ পড়ে নেবার পরে যখন *সঞ্চয়িতায়* প্রকাশিত এই সংশোধিত পাঠ আমার পড়তে বসি, তখন, একেবারে সূচনাতেই, একটা ব্যাপার আমাদের চমকে দেয়। আমরা দেখতে পাই যে, মূল পাঠে যা ছিল অনেক পরে, সেই পঙ্‌ক্তিগুচ্ছকে কবিতাটির একেবারে গোড়ায় নিয়ে এসেছেন তিনি, ফলে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র ভিতরকার সংঘাত, বিস্ময়, আলোড়ন ও উল্লাস একেবারে সূচনা থেকেই এর শব্দধ্বনির মধ্যে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। ভাবনার সঙ্গে ধ্বনির এই যে সংগতি, প্রথম পাঠের সূচনায় এটা একেবারেই ছিল না।

সংশোধিত পাঠের প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ যে কোন্ কৌশলে এই সংগতিকে অর্জন করে, একটু বাদেই সেটা আমরা বুঝে নেবার চেষ্টা করব। তার আগে 'নির্ঝরের

---

৯. মূল পাঠের কোনও শব্দ যে পরে পালটে যায়নি, তা-ও নয়। আগে যা ছিল 'প্রাণের বাসনা', পরে তা হয়েছে 'প্রাণের বেদনা'।

স্বপ্নভঙ্গ’-র ছন্দ নিয়ে এখানে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা দরকার। এই কবিতার যেটি মূল পাঠ, সূচনার অংশে স্পষ্টভাবে ধরা না গেলেও, খানিক বাদেই বোঝা যায় যে, সেটি অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দে লেখা। *সঞ্চয়িতায়* প্রকাশিত সংশোধিত পাঠটি কিন্তু আদ্যন্ত মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্তের চালে চলে। অর্থাৎ পাঠ-সংশোধনের সময়ে অক্ষরবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ সমূহ বর্জন করেছিলেন। কেন করেছিলেন, সেটা আমরা অনুমান করতে পারি। অক্ষরবৃত্তের চাল মাত্রাবৃত্তের তুলনায় অনেক মন্থর। ফলে, রবীন্দ্রনাথ হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন যে, এই কবিতার ভাবনার মধ্যে যে একটা সংঘাতময় তীব্র গতির দ্যোতনা রয়েছে, অক্ষরবৃত্তে তাকে ফুটিয়ে তোলা যাবে না, কবিতার ভাবনা ও চলনে একটা বিরোধ ঘটে যাবে।

কিন্তু ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’-র মূল পাঠের, সবটা না হোক, গোড়ার দিকের বেশ-খানিকটা অংশ যে মাত্রাবৃত্তের চালেই পড়া যায়,[১০] তা-ও স্বীকার্য। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে যে, পাঠ-সংশোধনের সময়ে কেন সেই অংশ নিয়েও আপত্তি হল রবীন্দ্রনাথের? কেন সূচনার পঙ্‌ক্তিগুলিকে বর্জন করলেন তিনি, এবং সেই জায়গায় কেন পিছনের একটি পঙ্‌ক্তিগুচ্ছকে এনে বসিয়ে দিলেন? একটু বাদেই অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই আমরা। প্রথম পাঠের সূচনার সঙ্গে যখন সংশোধিত পাঠের সূচনাকে আমরা মিলিয়ে দেখি, তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, এই পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। প্রথম পাঠের সূচনা ছিল এইরকম :

“আজি এ প্রভাতে প্রভাতবিহগ
কী গান গাইল রে!
অতিদূর দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে!”

এই যে পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়, টানা দুটি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতেও আমরা এদের সাজিয়ে নিতে পারি। তখন এদের চেহারা দাঁড়াবে এইরকম :

“আজি এ প্রভাতে প্রভাতবিহগ কী গান গাইল রে।
অতিদূর দূর আকাশ হইতে ভাসিয়া আইল রে!”

বলা বাহুল্য, পঙ্‌ক্তির এই পুনর্বিন্যাসে ছন্দের কোনও হেরফের হবে না। কিন্তু

১০. আমরা জানি যে, এই কবিতা যখন লেখা হয়, বাংলা কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রশ্নাতীত প্রবর্তনা তখনও ঘটেনি। সেটা প্রথম ঘটে *মানসীর* কবিতায়। তবে মাত্রাবৃত্তে-র চাল তার আগেও অনেক সময়ে কবিতার মধ্যে উঁকি দিয়ে যেত। ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’-র যেটা মূল পাঠ, তার প্রথম দিকের বেশ খানিকটা অংশে যেমন দিয়েছে। পরের অংশে যখন আমরা যুক্তাক্ষরের সম্মুখীন হই, এবং দেখতে পাই যে, শব্দের মধ্যবর্তী যুক্তাক্ষরের আশ্রিত রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌কে দু-মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না, তখন অবশ্য হোঁচট খেয়ে আমাদের বুঝে নিতে হয় যে, গোড়ার দিকে যা-ই মনে হয়ে থাকুক, এর ছন্দ আসলে সেই সনাতন অক্ষরবৃত্তই।

এটা কোন্ ছন্দ? যদিও আমরা জানি যে, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র মূল পাঠ অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই লেখা হয়েছিল, তবু, আমরা আগেই বলেছি, তার এই সূচনার অংশকে মাত্রাবৃত্ত বলে ধরে নিতেও আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। ধরা যাক, এটা মাত্রাবৃত্ত-ই। সে-ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দুই পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটিতে আছে ছ-মাত্রার তিনটি করে পর্ব ও এক-মাত্রার একটি করে ভাঙা-পর্ব। কিন্তু একে তো ছ-মাত্রার মাত্রাবৃত্তে কোনও সংঘাতের দ্যোতনা আনা খুবই শক্ত ব্যাপার, উপরন্তু পঙ্‌ক্তি-শেষে মুক্ত সিলেব্‌ল্ থাকার ফলে সেখানেও কোনও ধাক্কা বেজে ওঠে না, দুটি পঙ্‌ক্তিই একটা নিস্তরঙ্গ মসৃণতার মধ্যে এলিয়ে যায়।

এই এলিয়ে-যাবার আমেজটাকেই ঘুচিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। পিছনের পঙ্‌ক্তিগুচ্ছকে যখন সামনে নিয়ে এলেন তিনি, তখন একেবারে সূচনা থেকেই গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এই কবিতা, ধ্বনির সঙ্গে সংগতি ঘটল ভাবনার, এবং নির্ঝরেরও তখন সত্যিকারের স্বপ্নভঙ্গ হল। এটা এই জন্যে হল যে, সংশোধিত পাঠের সূচনায় যে-পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ আমরা পচ্ছি, তার গড়ন একেবারে অন্য ধাঁচের।

সংশোধিত পাঠের সূচনা এইরকম :

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।"

এ-ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি এখানেও সেই ছ-মাত্রার তিনটি করে পর্ব ও একটি করে ভাঙা-পর্ব দিয়ে গড়া (ভাঙা-পর্বটি এক্ষেত্রে দু-মাত্রার)। কিন্তু পঙ্‌ক্তি-শেষে মুক্ত সিলেব্‌ল্-এর বদলে এখানে আছে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এর পাঁচিল। ফলে, লাইনদুটি এক্ষেত্রে আদৌ এলিয়ে যাচ্ছে না, বরং রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এ আটকে গিয়ে বেশ জোরদার দুটি ধাক্কা তারা বাজিয়ে তুলছে।

কিন্তু তার চেয়েও বড়ো জাদু রয়েছে প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তিতে, আগে থাকতেই যারা ওই ধাক্কার একটা প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির গড়নটা লক্ষণীয়। তাদের প্রত্যেকটিকেই গড়া হয়েছে দুটি পর্ব দিয়ে। কিন্তু দুটি পর্বকে সমান মাপের রাখা হয়নি। একটি ছ-মাত্রার পর্ব, অন্যটি পাঁচ-মাত্রার। উপরন্তু দুটি পঙ্‌ক্তিরই প্রথম পর্বের শেষে আছে মুক্ত সিলেব্‌ল্ ও দ্বিতীয় পর্বের শেষে আছে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, ছয়- পাঁচ ও স্বর-ব্যঞ্জনের টানাপোড়েনে একেবারে প্রথম থেকেই একটা সংঘর্ষের আবহ তৈরি হয়ে যায়। বস্তুত এই টানাপোড়েন যেন সেই রুদ্ধগতি জলস্রোতেরই এক-একটা ঘূর্ণির মতো, ছোটো-ছোটো পঙ্‌ক্তির মধ্যে ঘুরপাক খেতে-খেতে যা এগিয়ে যায়, এবং বড়ো পঙ্‌ক্তির মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু তাতেও তার মুক্তি নেই। প্রথম দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির

শেষে বুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌-এর পাঁচিল ডিঙিয়ে সে দ্বিতীয় দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিতে নেমে আসে বটে, কিন্তু সেখানেও—পঙ্‌ক্তির শেষে—তাকে বুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌-এ প্রতিহত হতে হয়, এবং তখনই বেজে ওঠে আরও বড়ো রকমের একটা ধাক্কা। কবিতার স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন বা গঠনভঙ্গিই যেন কবিতার বিষয়বস্তুকে তার মুঠোর মধ্যে তখন ধরে নেয়; ভাবনায় ও ধ্বনিতে কোনও বিরোধই আর থাকে না।

অবরুদ্ধ জলস্রোতের চিত্রটি যে প্রতীকী, এবং সেই প্রতীকের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর নিজেরই কথা বলেছেন, তা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি। ইতিমধ্যে আমরা এ-ও বুঝেছি যে, যা তিনি ভাঙতে চান, সেই অবরোধের প্রাকারও তাঁর নিজেরই হাতে নির্মিত। পরে আরও অনেক রচনায় অনেকভাবে তাঁকে আমরা নিজের-হাতে-বানিয়ে-তোলা অবরোধের কথা বলতে শুনব। 'রাজা'কে দেখব আত্মঅবরোধের আড়ালে আশ্রয় নিতে। গানের মধ্যেও ধ্বনিত হবে আর্তি : "আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ!" সেই আবরণকে আপন হাতে ছিন্ন করবারও মন্ত্রণা দেবেন তিনি। আহ্বান জানাবেন, স্বেচ্ছা-অবসৃতি বা নির্বাসনের পালা চুকিয়ে, অবরোধের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু ইতিমধ্যে যেহেতু 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র সঙ্গে আমাদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে, এবং বড়ো একটি পটভূমির উপরে স্থাপনা করে এই কবিতাটিকে গ্রহণ করতে শিখেছি আমরা, তাই আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারব যে, পরবর্তীকালের এই মন্ত্রণা আর আহ্বান আসলে সেই একই থিম্‌ কিংবা ভাববস্তুর সম্প্রসারণমাত্র, এর ক্ষেত্র অনেক আগেই রচিত হয়ে গিয়েছিল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-কে রবীন্দ্রনাথ যে কেন তাঁর "সমস্ত কাব্যের ভূমিকা" বলে বর্ণনা করেন,[১১] এটাও বুঝে নিতে তখন আর আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

আর গঠনভঙ্গিমা? *ঝুলন* কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে যখন আমরা বলতে শুনব, "এ-মহাসাগরে তুফান তোল্‌", এবং স্বকণ্ঠে আবৃত্তির সময়ে পঙ্‌ক্তিশেষের বুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌-এর উপরে যখন বারে-বারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তিনি, তখনও আমরা ঠিকই বুঝতে পারব যে, কবিতার ধ্বনির ভিতর দিয়ে প্রলয়রোলের ব্যাপারটাকে বাজিয়ে তুলবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আবারও সেই মাত্রাবৃত্তের ছয়-পাঁচ ও স্বরব্যঞ্জনের টানাপোড়েনকে কাজে লাগিয়েছেন, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-র মধ্যেই যার অসামান্য ক্ষমতার কথা তিনি টের পেয়ে গিয়েছিলেন।

একটি কবিতাকে যে নানান দিক থেকে দেখতে হয়, নজর রাখতে হয় তার

---

১১. "একটি অভূতপূর্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্তির দিনে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে!"—*জীবনস্মৃতির খসড়া*। *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০। পুলিনবিহারী সেন প্রণীত *রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী*, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ইতিহাস ও উৎসের উপরে, এবং জেনে নিতে হয় তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার নানা রহস্য, সেটা এই জন্যেই। কিন্তু এইভাবে যখন একটি কবিতাকে আমরা দেখতে চাই, তখন তার বিষয়বস্তু, ভাবনা, ভাষা ও শারীর সন্ধি-কৌশলগুলিকে যথাসম্ভব বিশ্লিষ্ট করে দেখতে হয় আমাদের। এবং, তারই ফলে, যা কিনা একটি অখণ্ড শিল্পবস্তু, তার জোড়গুলি যেন আমাদের চোখের সামনে তখন একে-একে খুলে যেতে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, কবিতার সামগ্রিক আস্বাদন ও উপলব্ধির পথে এটা একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় কি না। আমরা জানি যে, অনেকেই এটাকে মস্ত বাধা বলে গণ্য করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই পদ্ধতিকে খুব পছন্দ করেননি। সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়াসকে নিরুৎসাহিত করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "...কী সংগ্রহ করার জন্য বিশ্লেষণ। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান-অংশগুলি? আমি বলি সেটা অত্যাবশ্যক নয়, কারণ উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি তার আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি।"[১২] আর ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচক বলছেন, "...those whose thinking and teaching go no farther than a knowledge and exposition of rhyme schemes, scansions, authors, story and even style of a poem are almost certainly missing the true essence of poetry."[১৩]

সন্দেহ নেই যে, একেবারে অমূলক নয় এই আশঙ্কা। গাছগুলিকে আমরা যখন আলাদা-আলাদা করে দেখে নিচ্ছি, তখন অরণ্য হয়তো সত্যিই আমাদের দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিক থেকে যখন এই সমস্যাটির দিকে তাকাই আমরা, তখন অন্য-একটি প্রশ্ন আমাদের চিত্তে এসে উঁকি দেয়। আমরা ভাবি যে, যে-পটভূমি থেকে, যে-যোগাযোগের ভিতর দিয়ে, যে-সমস্ত উপাদানের সমবায়ে তৈরি হয়ে উঠছে সেই সমগ্র, তার বিষয়ে যদি আমরা আদৌ উৎসুক না হই, তবে সমগ্রতার সম্পর্কেও আমাদের ধারণা কি নিতান্ত ঝাপসা থেকে যায় না?

বলা বাহুল্য, বিপদের আশঙ্কা রয়েছে দু-দিক থেকেই। আর তাই, দু-দিকেই চোখ রাখতে হবে আমাদের। অরণ্যকে ভালোবাসি বলেই, এবং তার সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে যথাসম্ভব স্বচ্ছ করে নিতে চাই বলেই, চিনতে হবে তার ভূ-প্রকৃতিকে, তার বৃক্ষরাজিকে, তার পত্রপুষ্পকে। আবার একইসঙ্গে সজাগ থাকতে হবে যে, উপাদানগুলিকে যখন বিশ্লিষ্ট করে দেখছি আমরা, তখন সেই উপাদানগুলির সমবায়ে যা তৈরি হয়ে ওঠে, সেই সামগ্রিক শিল্পবস্তুটি যেন আমাদের ভাবনা থেকে হারিয়ে না যায়। কেন-না সামগ্রিক শিল্পবস্তুটি তো বিভিন্ন উপাদানের যোগফলমাত্র নয়। সত্যিই তার চেয়ে বেশি-কিছু, বড়ো-কিছু।

---

১২. সাহিত্য-বিচার। *সাহিত্যের পথে*।

১৩. P. Gurrey. *The Appreciation of Poetry.*

কঠিন কবিতা

ইংরেজিতে এই রকমের একটি প্রাজ্ঞবচন আছে যে, কবিরা তাঁদের নিজেদেরই সঙ্গে কথা বলেন, আর আমরা, পাঠকেরা, আড়াল থেকে সেই কথাগুলি শুনে ফেলি। অর্থাৎ কবিতা আর কিছুই নয়, কবিদের স্বগত-সংলাপমাত্র।

প্রশ্ন হচ্ছে, যাঁদের সম্পর্কে এই উক্তি, সেই কবিরা এ কথা মানেন কি না। মানলে, বলা বাহুল্য, গোল মিটে যায়; অন্তত, কবিতা কেন কঠিন, পাঠকদের এই প্রশ্নের জবাব দেবার কোনও দায়দায়িত্বই কবিদের তখন থাকে না। নিজের সঙ্গে কে কী কথা বললেন না-বললেন, তা নিয়ে তো কেউ কোনও কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। কবিরাও নন। আর তাই, কবিতার কাঠিন্য নিয়ে পাঠকদের তরফে যদি কোনও নালিশ ওঠে, তো কবিরা খুব নির্বিকারভাবেই সে-ক্ষেত্রে বলতে পারেন, 'বাপু হে, আমি তো তোমার সঙ্গে কথা বলছিলুম না, আমি কথা বলছিলুম আমার নিজেরই সঙ্গে। সেসব কথা শোনার জন্য কেউ তোমাকে মাথার দিব্যি দেয়নি। তবু তুমি আড়ি পেতে সেই কথাগুলো শুনতে গেলে কেন? তুমি তো আমন্ত্রিত অতিথি নও, রবাহূত মানুষ। সুতরাং, আমার নিজেরই উদ্দেশে উচ্চারিত কথা যদি তোমার কঠিন লেগে থাকে, তো তা নিয়ে নালিশ জানাবার কোনও অধিকারই তোমার নেই। যা-ই হোক, এর থেকে তোমার একটা শিক্ষা হওয়া উচিত। যে-কথা তোমার উদ্দেশে উচ্চারিত নয়, ভবিষ্যতে আর কখনও তা তুমি শুনতে যেয়ো না।'

পক্ষান্তরে, কবিরা তাঁদের কবিতাকে যদি নিতান্ত স্বগত-সংলাপ বলে মেনে না নেন, অর্থাৎ যদি তাঁরা স্বীকার করেন যে, কবিতায় যেসব কথা তাঁরা বলে থাকেন, তা শুধু নিজেদেরই উদ্দেশে উচ্চারিত শব্দাবলি নয়, অন্য-অনেকের কাছেও সেই শব্দগুলিকে তাঁরা পৌঁছে দিতে চান, তাহলে কিন্তু গোল এত সহজে মেটে না; কবিতার কঠিনতা কিংবা দুরূহতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে তার একটা জবাব দেবার দায়িত্ব তখন স্বতই তাঁদের উপরে এসে বর্তায়।

একেবারে গোড়াকার প্রশ্নটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, কবিতাকে নিতান্ত স্বগত-সংলাপ বলে মানা চলে কি না।

মানা খুবই শক্ত। এমনকি, কবিদের পক্ষেও। বিশেষ করে সেই কবিদের পক্ষে,

নিজেদের লেখা কবিতা যাঁরা অন্যদের পড়ে শোনান, কিংবা পত্রপত্রিকায় ছাপতে দেন, কিংবা নিজেদের কবিতাকে যাঁরা বই হিসেবে ছাপিয়ে বার করেন।

একথা এই জন্যে বলছি যে, কবিতা যদি নেহাতই কারও নিজের-উদ্দেশে-ব্যক্ত শব্দসমষ্টি হত, তাহলে তো ব্যক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার কাজ ফুরোত, এবং কবিও তাঁর সদ্যোজাত কবিতাটিকে সে-ক্ষেত্রে বাতাসে উড়িয়ে দিতে, জলে ভাসিয়ে দিতে, আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে কিংবা বাক্স-প্যাঁটরায় বন্দি করে রাখতে কোনও দ্বিধা করতেন না। কিন্তু সত্যিই কি তা তিনি করেন? মোটেই না। তিনি তাঁর কবিতাকে উড়িয়েও দেন না, ভাসিয়েও দেন না, পুড়িয়েও ফেলেন না, কিংবা বাক্স-প্যাঁটরায় বন্দি করেও রাখেন না। তার বদলে তিনি সেটিকে ছাপতে দেন।

কেন ছাপতে দেন? কারণটা নিশ্চয় এই যে, আরও অনেকের কাছে তাঁর কবিতাকে তিনি পৌঁছে দিতে চাইছেন। হতে পারে, কবিতাটি তিনি তাঁর নিজেরই জন্য রচনা করেছিলেন, তার কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর নিজেরই উদ্দেশে; কিন্তু এখন— যখন তিনি তাঁর কবিতাটিকে সর্বসমক্ষে পাঠাচ্ছেন, তখন— আমরা ধরেই নিতে পারি যে, নিজের কথা শুধু নিজেকে শুনিয়েই তিনি খুশি থাকতে পারছেন না, তিনি চাইছেন যে, সেই কথাগুলি অন্যেরাও শুনুক।

অর্থাৎ, কবিতা তাহলে আর নিতান্ত আত্মকথন কিংবা স্বগতোক্তির ব্যাপার নয়, একইসঙ্গে সেটা অন্যের সঙ্গে কথা বলবার ব্যাপারও বটে।

কিন্তু তা-ই যদি হয়, তো খুব জরুরি একটা প্রশ্নের সম্মুখীন না-হয়ে আমাদের উপায় থাকে না। প্রশ্নটা এই যে, এমন কোনও ভাষায় কি কারও সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি, যার অর্থ বুঝতে গিয়ে তাঁর গলদ্‌ঘর্ম হবার সম্ভাবনা?

না, তা আমরা পারি না। তা আমরা বলিও না। আমরা খুব ভালোই জানি যে, কারও সঙ্গে কথা বলবার কতকগুলো শর্ত আছে। এ-ব্যাপারে যেটা সবচেয়ে জরুরি শর্ত, সেটা এই যে, সেই ভাষাতেই কথা বলতে হবে, শ্রোতার পক্ষে যা বোধগম্য। শর্তটা, বলা বাহুল্য, আমরা পালনও করে থাকি।

একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বাংলা তো আমাদের মাতৃভাষা। শৈশব থেকে আমরা বাংলা বলছি, সুতরাং এই ভাষায় কথা বলতে আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। ধরা যাক, হিন্দিটাও আমরা জানি, কিন্তু সে-জানা নেহাতই অল্পস্বল্প, বাংলায় যত সহজে আমাদের মনোভাব আমরা ব্যক্ত করতে পারি, হিন্দিতে তত সহজে পারি না। তবু, এমন কারও সঙ্গে যখন আমাদের কথা বলবার দরকার ঘটে, যিনি হিন্দি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও ভাষারই বিন্দুবিসর্গও বোঝেন না, তখন— হিন্দি ভাষাটা তত ভালোভাবে না-জানা সত্ত্বেও— হিন্দিরই শরণ আমাদের নিতে হয়। ঠিক সেইরকম, ইংরেজিতে আমাদের দখল যে-ক্ষেত্রে পাকাপোক্ত নয়, সে-ক্ষেত্রেও দেখা যাবে

যে, আদৌ বাংলা-না-জানা কোনও ইঙ্গভাষীর সঙ্গে কথা বলবার দরকার হলে, যতই অসুবিধে হোক, ইংরেজিরই শরণ আমরা নিয়ে থাকি।

শেকসপিয়রের নাটকের সেই দৃশ্যটির কথা মনে পড়ছে, পরস্পরের ভাষা না-বোঝার দরুন ইংরেজ রাজা ও ফরাসি রাজকুমারীর মধ্যে যেখানে হৃদয়-বিনিময়ের পর্বটা ঠিক জমে উঠতে পারছিল না। দোভাষীর মারফতে নয়, ফরাসিভাষিণী ক্যাথারিনের নিজের মুখেই ভালোবাসার কথা শুনতে চান ফরাসি-না-জানা হেনরি, কিন্তু তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনার উত্তরে ক্যাথারিন বলছেন, 'আই কান্ট স্পিক ইয়োর ইংল্যান্ড।'[১] এই উক্তিই অবশ্য ফাঁসিয়ে দিল ক্যাথারিনকে। হেনরি বুঝলেন, ক্যাথারিন যে আদৌ ইংরেজি জানেন না, তা নয়, ভাঙা-ভাঙা জানেন, এবং সেই ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতেই শ্রোতার কাছে তাঁর ভালোবাসার কথাটা পৌঁছে দিতে পারেন তিনি। বেশ তো, তাহলে তা-ই করুন। অশুদ্ধ, খঞ্জ ইংরেজিতেই তাঁর বিশুদ্ধ ও সমর্থ ভালোবাসার কথাটা তিনি জানিয়ে দিন। '...আই উইল বি গ্ল্যাড টু হিয়ার য়ু কনফেস ইট ব্রোকেনলি উইথ ইয়োর ইংলিশ টাং।'[২]

তা এই হচ্ছে ব্যাপার। একজন যখন আর-একজনকে কিছু বলছেন, তখন এমন ভাষায় সেটা বলতে হবে, শ্রোতা যা শুনে বুঝতে পারেন যে, বক্তব্যটা কী। ভাষাটা ভাঙা-ভাঙা হলেও চলবে, শুধু শ্রোতার সেটা বোঝাই চাই। ফলত, কবিতার ভাষা যখন কঠিন ঠেকে, পাঠক তখন স্বতই সিদ্ধান্ত করেন যে, কথা বলবার এই প্রধান শর্তটাই এক্ষেত্রে রক্ষিত হচ্ছে না।

শুনে কবি নিশ্চয় বিস্ময় প্রকাশ করবেন। বলবেন, 'এর মধ্যে আবার হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি সব ভাষার কথা উঠছে কেন? আমার ভাষা কি আমার পাঠকের ভাষার থেকে আলাদা? আমি তো আমার পাঠকের ভাষাতেই কথা বলছি, সেই ভাষাতেই তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আমার বক্তব্য। তবু যদি আমার কবিতার ভাষা তার কাছে কঠিন ঠেকে, তবে তো বুঝতেই হবে যে, নিজের মাতৃভাষাটাও সে জানে না।'

কিন্তু সত্যিই কি তাই? নীচের পঙ্‌ক্তিগুলি লক্ষ করুন :

১. সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে...[৩]

২. কদাচ দৈবাৎ যদি বাস্তবিক ভূমিকায়ও ঢুকি,
কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে সাজি তবে ঘুমন্ত কঞ্চুকী।[৪]

১,২. *King Henry the Fifth*, Act 5, Scene 2

৩. *মেঘনাদবধ কাব্য,* দ্বিতীয় সর্গ। মধুসূদন।

৪. কঞ্চুকী, *সংবর্ত* । সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

কবিতার ভাষা এখানে বাংলা। এর পাঠকও বঙ্গভাষী। কিন্তু আপন ভাষায় তাঁর মোটামুটি দখল থাকলেই যে এই পঙ্‌ক্তিগুলির বক্তব্য সেই পাঠকের কাছে অনায়াসে পৌঁছে যাবে, তা-ও নয়।

কেন পৌঁছোয় না?

সমস্যাটা কি তাহলে এই যে, পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য ভাষা আছে, তেমনই আবার বিভিন্ন ভাষার আপন এলাকার মধ্যেও রয়েছে একাধিক স্তর? এটাকে সমস্যা বলছি, কেন-না, ভাষার বিভিন্নতার মতো, স্তরের বিভিন্নতাও অনেকসময়ে অর্থোপলব্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রাম ও শ্যামের ভাষা একই হতে পারে, কিন্তু শুধু এই কারণেই যে রামের যাবতীয় কথা শ্যামের হৃদয়ঙ্গম হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে, না-ও হতে পারে। হলে বুঝতে হবে, রাম এক্ষেত্রে সেই স্তরের ভাষা ব্যবহার করেছিল, যে-স্তর শ্যামেরও অনধিগম্য নয়।

বস্তুত, কারও সঙ্গে যখন আমরা কথা বলি, তখন আমাদের ঠিক করে নিতেই হয় যে, কোন্ স্তরের ভাষা ব্যবহার করলে সে খুব দ্রুত তার অর্থটাকে ধরতে পারবে। আমরা বললুম বটে 'ঠিক করে নিতে হয়', কিন্তু স্তর-বিষয়ক এই যে সিদ্ধান্ত, এর পিছনে আমাদের সজ্ঞান প্রয়াস থাকে কি না, সেটা সন্দেহের ব্যাপার। অনেকক্ষেত্রেই থাকে না। বরং প্রায়-ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যেখানে যে-স্তরের ভাষা ব্যবহার করলে শ্রোতার পক্ষে আমাদের বক্তব্য উপলব্ধি করার সম্ভাবনা সর্বাধিক, সেখানে—যেন-বা নিজেরই অজান্তে—ঠিক সেই স্তরটাই আমরা নির্বাচন করে নিয়েছি। লক্ষ করলেই ধরা পড়বে, একজন অধ্যাপক তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলবার সময়ে ভাষার যে-স্তরে বিচরণ করেন, বাজারে গিয়ে সবজিওয়ালার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে ঠিক সেই স্তরে তিনি বিচরণ করেন না। আবার, বাজার থেকে বাড়িতে ফিরে যখন শিশুপুত্রের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর ভাষার স্তর তখন পুনশ্চ পালটে যায়। (ভঙ্গি আর উচ্চারণও পালটায় বইকি। যে-শিশুর মুখে ভালো করে বোল ফোটেনি, তার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে অনেকেরই উচ্চারণে যে একটা 'লিসপিং'-এর ভাব এসে যায়, এটা লক্ষণীয়।)

সেই পাদরি-সাহেবের গল্পটা তো সকলেই জানেন। খেয়ানৌকার মাঝিকে তিনি বলেছিলেন, "ওহে কর্ণধার, দ্রুত তোমার তরণি তীরে আনয়ন করো।" মাঝি যে তাঁর বক্তব্য উপলব্ধি করতে পারেননি, এ কথা শুনে সাহেব নাকি বড়ো বিস্ময় বোধ করেন। "সে কী, মাঝি তো বাঙালি, আর আমিও তো বাংলা ভাষাই বলছি, তবে আর ওর না-বুঝবার কারণ কী?" কারণ, বলা বাহুল্য, স্তর-বিভ্রাট। পাদরি-সাহেব যে-স্তরের বঙ্গভাষা ব্যবহার করেছিলেন, সে-স্তর, আর-যারই হোক, খেয়াঘাটের মাঝির অধিগম্য নয়।

বিভ্রাট ঘটে কবিতার ক্ষেত্রেও। কবি অনেক সময় সেই স্তরের ভাষা ব্যবহার করেন, যে-স্তরে অনায়াস-বিচরণের প্রস্তুতি তাঁর অনেক পাঠকেরই নেই। 'সূর্য' বললে যে-পাঠক ব্যাপারটা তক্ষুনি বুঝতে পারেন, 'ত্বিষাম্পতি' বললে তাঁর হয়তো অসুবিধে হয়। 'প্রহরী' বললে যে-পাঠক অর্থটা তক্ষুনি ধরতে পারেন, 'কঞ্চুকী' বললে তাঁর বিড়ম্বনার হয়তো অবধি থাকে না।

এই যে অসুবিধে, এ হল নেহাতই শব্দার্থ না-জানার অসুবিধে। কবি পৌঁছতে চান তাঁর পাঠকের কাছে। কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দের অর্থ যেহেতু পাঠকের জানা নেই, তাই পাঠকের কাছে তিনি পৌঁছতে পারেন না। দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। মাইকেল ও বাঙালি পাঠকের মধ্যে এই ব্যবধান ছিল, আছে সুধীন্দ্রনাথ ও বাঙালি পাঠকের মধ্যেও। এমন পাঠক একালে অনেক দেখি, যাঁরা কবিতা পড়তে ভালবাসেন, এবং কবিতার ভিতর থেকেই নিষ্কাশন করে নিতে চান তাঁদের আনন্দের সমর্থন ও শোকের সান্ত্বনা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, বড্ড দুরূহ। তাঁরা শুনেছেন যে, সুধীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের যে-রাজ্যপাট, নেহাতই শব্দগত দুরূহতার কারণে সেখানে তাঁরা ঢুকতে পারেননি।

ঢোকা নাকি সম্ভব হত, যদি আর-একটু সহজ সরল শব্দ দিয়ে তাঁর কবিতা গড়তেন সুধীন্দ্রনাথ ; ব্যবহার করতেন শুধু সেইসব শব্দ, যার একটাও তাঁদের অচেনা নয়। একটু আগেই আমরা সুধীন্দ্রনাথের যে-দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছি, আলোচনার সুবিধের জন্য তারই উপরে আর-একবার চোখ রাখা যাক :

কদাচ দৈবাৎ যদি বাস্তবিক ভূমিকায়ও ঢুকি,
কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে সাজি তবে ঘুমন্ত কঞ্চুকী।

কী বলবেন এই পঙ্‌ক্তিদুটি সম্পর্কে একজন সাধারণ বাঙালি পাঠক? 'কঞ্চুকী' শব্দটার অর্থ তাঁকে জানিয়ে দেবার পরে হয়তো এই কথাই তিনি বলবেন যে, 'কঞ্চুকী'র বদলে যদি 'প্রহরী' শব্দটি ব্যবহৃত হত, অনেক পাঠকেরই তাহলে হয়তো অস্বস্তিবোধের কোনও কারণ ঘটত না।

কিন্তু সত্যিই কি তা-ই? একে তো 'কঞ্চুকী' শব্দটিকে বর্জন করলে এক্ষেত্রে অন্ত্যমিলের দাবি মেটে না, তার উপরে আবার এমনও সম্ভব যে, ধ্বনির প্রয়োজনে (কবিতায় যে-প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা সবাই স্বীকার করে থাকেন) কবি এক্ষেত্রে, অন্য-কোনও শব্দ নয়, 'কঞ্চুকী'কেই চাইছিলেন। আর তা ছাড়া, 'কঞ্চুকী' ও 'প্রহরী' যে একেবারে ষোলো-আনা সমার্থক শব্দ, তা-ও নয়। কবি তাহলে কী করবেন? তিনি কি অন্ত্যমিলের দাবি মেটাবেন না, ধ্বনির গুরুত্ব স্বীকার করবেন না, এবং অর্থের বিচারেও যেটি যথাশব্দ, পাঠকের অসুবিধার কথা ভেবে তাকে বর্জন

করবেন? তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে, তা-ই তিনি করলেন; অন্ত্যমিলের ব্যাপারটাকে অন্যভাবে সাজিয়ে নিয়ে, ধ্বনির প্রয়োজনকে প্রাধান্য না দিয়ে, এবং অর্থের বিচ্যুতি সম্পর্কেও নির্বাক থেকে গিয়ে 'কঞ্চুকী'র বদলে 'প্রহরী'কেই স্থান করে দিলেন ওই কবিতায়। কিন্তু, হায়, তাতেও সমস্যা মেটে না, তারও পরে থেকে যায় একটি প্রশ্ন। সেটা এই যে, 'কঞ্চুকী'র বদলে 'প্রহরী' শব্দটি ব্যবহার করলেই যে সর্বজনের সুবিধে ঘটবে, এমন নিশ্চয়তাই-বা কোথায়? 'কঞ্চুকী'র অর্থ যাঁরা জানেন, তাঁদের তুলনায় হয়তো আরও বেশিসংখ্যক পাঠক জানেন 'প্রহরী'র অর্থ, কিন্তু তাঁদের পরেও থেকে যেতে পারেন, থেকে যান, এমন আরও অসংখ্য পাঠক, 'প্রহরী' শব্দটারও অর্থ যাঁদের জানা নেই।

তাঁদের কী হবে? তাঁদের সমস্যাটাকে মেটাবার জন্যে কবি কি তাহলে ভাষার আরও নীচের স্তরে নেমে আসবেন, এবং 'প্রহরী'কেও বিদায় দিয়ে ডেকে আনবেন সর্বজনগ্রাহ্য 'পাহারাদার'কে? এমন হাস্যকর প্রস্তাবকে নিশ্চয় প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

অন্যদিকে, শব্দার্থ জানলেই যে সকল পাঠকের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তা-ও কিন্তু নয়, একই সঙ্গে তাঁকে বুঝে নিতে হয় অনুষঙ্গের তাৎপর্য। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার যে-পঙ্ক্তিটিতে ওই 'কঞ্চুকী' শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে, সেই একই পঙ্ক্তিতে আমরা পাচ্ছি 'কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে'— এই বাগ্‌বন্ধটিকে। শব্দদুটির একটিও আমাদের অচেনা নয়; কিন্তু কথা হচ্ছে, 'কামাখ্যা' বলতে এখানে কাকে বুঝব আমরা? দেবীকে, না পীঠস্থানকে? এবং ষড়যন্ত্রটাই-বা কীসের? কবি কি এখানে একটা জরুরি সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের? 'কঞ্চুকী'র ভূমিকাতেও যে তিনি কতটা অসহায়, কিংবা দায়িত্ব পালনে কতটা অক্ষম, সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই কি আভাস দিচ্ছেন কোনও পৌরাণিক গল্প কিংবা কিংবদন্তির? বলা বাহুল্য, এসব প্রশ্নের উত্তরও আমাদের জানা চাই। কেন-না, তা না-জানা পর্যন্ত, শব্দার্থ জানা সত্ত্বেও, গোটা ব্যাপারটাই আমাদের কাছে একটা প্রহেলিকার মতন ঠেকতে থাকে, এবং কবিতার মর্মস্থলে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

নিতান্ত শব্দার্থ অবশ্য সহজেই জেনে নেওয়া যায়। হাতের কাছে একটা শব্দকোশ থাকলেই তার পাতা উলটে চটপট আমরা জেনে নিতে পারি যে, 'কঞ্চুকী' শব্দের অর্থ কী। কিন্তু মজা এই যে, এইটুকু কষ্টও স্বীকার করতে চান না অনেক পাঠক; এমনকি কবিতাপাঠের সঙ্গে যে শব্দকোশের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে, এটাই তাঁরা মানতে চান না। তাঁদের বক্তব্য, অন্য কারও কবিতা বুঝবার জন্য যখন শব্দকোশের সাহায্য নিতে হচ্ছে না, তখন সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই-বা হবে কেন?

কার ক্ষেত্রে হয় না?

মাইকেলের ক্ষেত্রে যে হয়, এই আলোচনায় উদ্ধৃত তাঁর কবিতার 'ত্বিষাম্পতি' শব্দটাই তো তার প্রমাণ দিচ্ছে। এমন অসংখ্য অপরিচিত, অপ্রচলিত এবং জোর-করে-বানিয়ে-তোলা শব্দ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতায়। বিষয়গত গাম্ভীর্যের কারণে কিংবা প্রার্থিত ধ্বনির স্বার্থে যেগুলি হয়তো তিনি অকুণ্ঠ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু শব্দকোশের সাহায্য না নিলে যাদের অর্থ-উপলব্ধির কোনও আশাই আমাদের নেই।

তবে কি রবীন্দ্রনাথ? হায়, তাঁর কবিতা বুঝতে হলেও— অন্তত একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে— শব্দকোশের সাহায্য না নিয়ে উপায় থাকে না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা'[৫]— রবীন্দ্রনাথের এই পঙ্‌ক্তিটিতে 'রসনা'-শব্দের অর্থ যে মোটেই জিহ্বা নয়, এক ধরনের অলংকার (যা কিনা এদেশের রমণীরা এককালে কটিদেশে ধারণ করতেন), শব্দকোশের সাহায্য না-নিলে সে-কথা আমরা বুঝব কী করে? অথবা কী করেই-বা জানব যে, বনভূমির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি যখন বলেন, 'কানন পরেছে শ্যামল দুকুল'[৬]— তখন 'দুকুল' বলতে তিনি পট্টবস্ত্র বা ক্ষৌমবস্ত্রের কথা বোঝাচ্ছেন? জানলে কিন্তু তাঁর কবিতার মর্মগ্রহণ করা আমাদের পক্ষে আরও সহজ হয়; আর কিছু না হোক, সালংকারা ওই নর্তকী ও বসন্তকালের ওই সবুজ বনভূমির (যাকে দেখে সবুজ রঙের-পট্টবস্ত্র-পরিহিতা বনদেবী বলেই ভ্রম হয়) ছবিটি আমাদের মনশ্চক্ষে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শব্দকোশের সাহায্য অতএব নেওয়াই ভালো। সুধীন্দ্রনাথের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু অন্তত এই পরামর্শই দিচ্ছেন। বলছেন, "সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াসসাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন; তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হল একমাত্র বিঘ্ন। বলা বাহুল্য অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয়, যখন আমরা পুলকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে, আমাদের

---

৫. বর্ষামঙ্গল, *কল্পনা*। 'রসনা' শব্দের দুই অর্থ। জিহ্বা ও কটিভূষণ। বিকল্প বানান 'রশনা'। প্রথম বানানই অবশ্য বেশি প্রচলিত। সম্ভবত সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ যখন কটিভূষণ বোঝাতে চান, জিহ্বার সঙ্গে পার্থক্যটাকে স্পষ্ট করে দেখাবার জন্য *রবীন্দ্ররচনাবলী*তে (পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) এই কবিতায় তখন 'রশনা' বানান গ্রাহ্য হয়েছে। *সঞ্চয়িতায়* (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৫৩) কিন্তু কটিভূষণ-অর্থেও 'রসনা' বানানই আমরা দেখতে পাই।

৬. "প্রেম" পর্যায়ের গান, *গীতবিতান* (প্রথম পঙ্‌ক্তি: কাহার গলায় পরাবি...)

অজানা শব্দসমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথাযথ হয়েছে, পরিবর্তে অন্য কোনও শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না।”[৭]

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথকেই-বা আলাদা করে চিহ্নিত করা কেন? সাধারণ্যে অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করার প্রবণতা তো আরও অনেক কবির মধ্যেই দেখতে পাই আমরা। হতে পারে যে, সেকালে যেমন মাইকেল, একালে তেমন সুধীন্দ্রনাথের মধ্যেই সেই প্রবণতা ছিল অতিমাত্রিক; কিন্তু অন্য অনেকের ক্ষেত্রেও যে শব্দকোশের সাহায্য নেবার দরকারটা— প্রায়শ না হোক— মাঝে-মাঝে খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, তাতেও সন্দেহ নেই। এবং সাহায্যটা নিলে যে শুধু শব্দ-প্রয়োগের নির্ভুলতা ও যাথার্থ্য দেখেই মুগ্ধ কিংবা পুলকিত হই আমরা, তা-ও নয়। সত্যি বলতে কী, কবিতার পাঠকের পক্ষে সেটাই যে একটা মস্ত প্রাপ্তি, তা-ও আমাদের মনে হয় না। আসলে, শব্দকোষের পাতা ওলটাবার যে পরিশ্রম, সেটুকু স্বীকার করে নেবার ফলেই কঠিন শব্দের দরজা খুলে তাঁদের কবিতার ভিতরমহলে প্রবেশ করা আরও সহজ হয় আমাদের পক্ষে, এবং সেটাই সেই পরিশ্রমের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

বিভিন্ন ভাবানুষঙ্গের তাৎপর্য বুঝে নেবার ব্যাপারে অবশ্য স্বদেশি-বিদেশি কোনও অভিধানই বিশেষ সাহায্য করে না আমাদের। বিষ্ণু দে-র কবিতায় আমরা যখন পড়ি, ‘বলো কাসাণ্ড্রা, এত দুর্যোগ ছিল কোথায়’,[৮] তখন লেমপ্রায়ারের পৌরাণিক অভিধান মাত্র এইটুকুই জানিয়ে দেয় আমাদের যে, কাসাণ্ড্রা ছিলেন অ্যাপোলোর প্রণয়িনী, কিন্তু— সেই প্রণয়ের সূত্রে— নির্ভুল ভবিষ্যদ্‌বাণী করবার ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি অ্যাপোলোকে প্রদত্ত তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করেননি, তাই তাঁর উক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। অভিধান এর বেশি-কিছু আমাদের বলে না! কী করবেন তাহলে কৌতূহলী পাঠক? তাঁর তো জানতে ইচ্ছে করবে যে, কাসান্ড্রার কথা এখানে উঠছে কেন, এবং দুর্যোগটাই বা কীসের। বস্তুত, সেটা না-জানা পর্যন্ত এই কবিতার নেপথ্যবর্তী প্ররোচনার খবর যেমন তিনি পাবেন না, তেমনই এর লক্ষ্য অথবা অভিপ্রায়ের খবরও তাঁর অজ্ঞাত থেকে যাবে।

কৌতূহল নিরসনের উপায় তাহলে কী? একমাত্র উপায়, নিজের জানার পরিধিকে নিজেরই চেষ্টায় আরও বাড়িয়ে নেওয়া। মানবিক নানা উদ্যম ও যত্ন, আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম, সংকট ও বিপর্যয়ের ইতিহাস সম্পর্কে আর-একটু অবহিত হওয়া। এটা এইজন্যই জরুরি যে, দেশকাল সম্পর্কে একেবারে অনবহিত থেকে গেলে, যেমন বিষ্ণু দে-র এই কবিতা, তেমনই স্বদেশ ও বিদেশের আরও অনেক

---

৭. ভূমিকা। *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ* ।

৮. ‘কাসান্ড্রা’। *সন্দীপের চর* ।

কবিরই অনেক জরুরি কবিতাকেও তার নিজস্ব পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সন্দেহ নেই যে, পাঠককে আরও পরিশ্রমী হতে হবে। সুধীন্দ্রনাথ একদা এই রকমের একটি কথা বলেছিলেন যে, কবিতার দুরূহতার মূলে রয়েছে পাঠকের আলস্য। তিনি খুব ভুল বলেননি।

২

যে-দুরূহতা শব্দগত, আলস্য পরিহার করলেই তার কপাটগুলিকে আমরা খুলে ফেলতে পারি। একটু পরিশ্রমী হলেই বুঝতে পারি স্বদেশি-বিদেশি নানা নামোল্লেখের তাৎপর্য। সেইসঙ্গে, যেটা আমাদের চেনাজানার এলাকা, তার সীমানাকে যদি আমরা আর-কিছুটা বাড়িয়ে নিই, নানা অনুষঙ্গের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধারও তাহলে আমাদের পক্ষে খুব শক্ত হয় না।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে প্রযত্ন কিংবা পরিশ্রম, এরই পরিণামে কি আমরা কবিতার—সর্ব রকমের কবিতার—হৃৎপ্রদেশে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র পেয়ে যাব? কিছু কবিতার ক্ষেত্রে যে পাব, তাতে সন্দেহ নেই। সেই ধরনের কবিতার ক্ষেত্রে পাব, শব্দ কিংবা অনুষঙ্গের অর্গল মুক্ত হবার সঙ্গে-সঙ্গে যার দুরূহতারও অবসান ঘটে। কবিতার অর্থানুধাবন সে-ক্ষেত্রে যেন চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলবার মতোই একটা ব্যাপার। তালা যখন খুলে যায়, কবিতার অবগুণ্ঠনও তখন খসে পড়ে, আর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যা লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ, নিমেষে আমরা তার সামীপ্যে এসে দাঁড়াই। কবিতা ও তার পাঠকের মধ্যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তখন আর থাকে না।

সুধীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা, বস্তুত, এই ধরনের কবিতা। আবেগবর্জিত না হয়েও তাঁর কবিতা যেহেতু ধোঁয়াটে ভাবালুতাকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি, বরং যুক্তির পারম্পর্য সমূহ রক্ষা করে তবেই সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে চেয়েছে, তাই তাঁর ব্যবহৃত নানা শব্দের অর্থ আর নানা অনুষঙ্গের তাৎপর্য যখন আমরা জেনে নিই, তাঁর অনেক কবিতাই তখন আর আমাদের কাছে তেমন কঠিন ঠেকে না, এবং তাঁর চিন্তার প্রবাহকে অনুসরণ করাও আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু এরই অন্যদিকে রয়েছে আর-এক ধরনের কবিতা। সে-ও কঠিন কবিতাই, তবে তার কঠিনতার প্রকৃতি একেবারে অন্যরকম। নিতান্ত শব্দ অথবা স্বদেশি-বিদেশি নানা নাম, ঘটনা আর অনুষঙ্গের কারণে নয়, আরও গভীর ও মৌলিক কারণে তার অর্থ অনুধাবন আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। যেসব শব্দ

দিয়ে গড়া হয়েছে তার শরীর, প্রায়-ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে, তার প্রতিটিই আমাদের চেনাজানা, বস্তুত আমরা নিজেরাই সেসব শব্দ নিয়ত ব্যবহার করে থাকি, উপরন্তু এমন কোনও নাম কিংবা অনুষঙ্গ সেখানে আমাদের চোখে পড়ে না, কারও কাছেই যা কিনা ধাঁধার মতো ঠেকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মর্মগ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না; বারংবার সেই কবিতা পাঠ করেও আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে, কবি সেখানে ঠিক কী বলতে কিংবা কীসের আভাস দিতে চাইছেন।

নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে নিভে যায়—তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে :
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে;
সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর...[৯]

জীবনানন্দের কবিতা থেকে তুলে-আনা এই লাইনগুলির মধ্যে এমন একটিও শব্দ নেই, যার অর্থ আমরা জানি না কিংবা যা আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কথাবার্তায় কদাচ ব্যবহৃত হয় না। অথচ লক্ষ করবার বিষয় এই যে, আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচিত, এবং প্রত্যেকের দ্বারাই প্রায়শ ব্যবহৃত, অত্যন্ত আটপৌরে কিছু শব্দের সমাহারও এক্ষেত্রে এমন এক অবগুণ্ঠন রচনা করেছে, আমাদের দৃষ্টি যাকে ভেদ করতে পারে না, এবং আমাদের বুদ্ধি যাতে প্রতিহত হয়। বারবার আমরা চেষ্টা করি সেই অবগুণ্ঠনের অন্তরালবর্তী অর্থের আভাস পেতে, এবং বারবার আমরা ব্যর্থ হই।

টেনেবুনে এই লাইনগুলির একটা অর্থ যে আমরা দাঁড় করাতে পারি না, তা অবশ্য নয়। প্রথম দুটি লাইন পড়ে আমরা ভাবতে পারি যে, নিতান্ত ব্যক্তিজীবন নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার পটভূমিকায় স্থাপনা করে সেই চরম দিনান্তের কথা এখানে বলা হচ্ছে, পিছনে তাকালে অসমাপ্ত নানা কাজের সঙ্গে-সঙ্গে নানা উল্লেখযোগ্য মানবিক কৃতিও যখন আমাদের চোখে পড়ে। তৃতীয় লাইনে এসে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এটা হয়তো সেই অবস্থার দৃষ্টান্ত, আক্রমণকারী ও আক্রান্তের ভূমিকা যেখানে পালটে যায়। এবং শেষ দুটি লাইন পড়ে আমরা ভাবতে পারি যে, 'সম্রাট' বলতে কবি আসলে সেই নিয়তির কথাই বুঝিয়েছেন, সাধারণ মানুষ যার

৯. 'সৃষ্টির তীরে', *সাতটি তারার তিমির*। জীবনানন্দ দাশ।

হাতে নিতান্ত ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নয়। তা নইলে আর কঙ্কাল থেকে সৈনিক হয়ে পুনশ্চ তাকে কঙ্কাল হতে হয় কেন? কিন্তু 'কঙ্কাল' শব্দটাকে দ্বিতীয় বার ব্যবহার করবার সময়ে কবি যে কেন তার আগে 'সচ্ছল' বিশেষণটিকে বসিয়ে দেন, তা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের অতৃপ্তিরও তাই অবসান ঘটে না। আমরা বুঝতে পারি যে, লাইনগুলির যে-অর্থ আমরা দাঁড় করিয়েছি, তা নেহাতই কষ্টকল্পিত, এবং বানিয়ে-তোলা সেই অর্থের মধ্যে অনেক ফাঁকফোকর থেকে যাচ্ছে।

এই যে ফাঁকফোকর, এগুলি থেকেই যাবে। অন্তত ততক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ না কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে আমরা মিলিয়ে নিতে পারব। মিলিয়ে নেওয়া কেন সম্ভব হয় না, সে-কথায় পরে আসছি। তার আগে বরং আর-একটা কথা বলে নিই।

ইতিপূর্বে আমরা শুনেছি যে, সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি। জীবনানন্দের এই যে মন্তব্য, জানতে আমাদের কৌতূহল হয় যে, এর অর্থটা ঠিক কী। তিনি কি কবি ও পদ্যকারদের দুই পৃথক এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে দেখাতে চান? নাকি, শুধুই পদ্যকার নয়, সর্বজনের থেকে আলাদা করে দেখাতে চান কবিদের? কিন্তু তার এই মন্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য যা-ই হোক, স্পষ্ট একটা সীমারেখা টেনে দিয়ে কবিদের তিনি যে সম্পূর্ণ পৃথক এক শ্রেণির শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, সেটা বুঝে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না।

এক্ষেত্রে আমাদের বলবার কথাটা এই যে, ঠিক এইভাবেই নিশ্চয় আরও নানা সীমারেখা টানা যায় কবিসমাজের আপন এলাকার মধ্যেও। বলা যায়, কবিরা অবশ্যই অন্যদের থেকে পৃথক গোত্রের মানুষ, কিন্তু তাঁরা নিজেরাও কিছু একে অন্যের সগোত্র নন। রবীন্দ্রনাথ আর মাইকেল কি একই গোত্রের কবি? কিংবা, ধরা যাক, জীবনানন্দ আর বুদ্ধদেব? আসল কথা, যাঁদের আমরা কবি বলে জানি, শব্দরুচি, বিষয়বস্তু, বর্ণনারীতি, বাগ্‌ভঙ্গিমা ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে যৎপরোনাস্তি বৈষম্য থাকা সম্ভব, এবং সেটা থাকেও।

আপাতত অবশ্য সেসব ব্যাপারের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না; শুধু মোটামুটি দুটি শ্রেণিতে তাঁদের বিভক্ত করে নিয়ে বলতে চাইছি যে, ক) কিছু কবি যেমন আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের অভিজ্ঞতার বৃত্তের ভিতর থেকেই খুঁজে নেন তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু, তেমন আবার খ) এমন-কিছু কবিও আমরা দেখতে পাই, যাঁদের দৃষ্টি হয়তো, সর্বদা না হোক, মাঝে-মাঝেই ছাড়িয়ে যায় সেই অভিজ্ঞতার বৃত্তটিকে।

এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণির কবিদের নিয়েই আমরা সাধারণত সমস্যায় পড়ি। তাঁদের

দৃষ্টি যখন বৃত্তটিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন তাঁদের কবিতার বিষয় কিংবা ভাববস্তুকে— সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা তো দূরের কথা— মোটামুটি শনাক্ত করাই আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। সেটাই স্বাভাবিক। একথা এই জন্য বলছি যে,কোনও কিছুকে শনাক্ত করতে হলে তার সঙ্গে একটা পূর্বপরিচয় থাকার দরকার হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই বিষয় কিংবা ভাববস্তু যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতার বৃত্তের বহির্ভূত এলাকা থেকে আহৃত, তাই তার সঙ্গে কোনও পূর্ব-পরিচয়ের অবকাশই আমাদের ঘটেনি। ফলত, যা দিয়ে নির্মিত হয়েছে তাঁদের কবিতার শরীর, সেই শব্দগুলিকে আমরা চিনতে পারি বটে, কিন্তু শব্দগুলি যা বলতে চায়, সেই ভাববস্তুকে তার স্বরূপে আমরা চিনে উঠতে পারি না।

প্রশ্ন উঠবে, সমকালীন সাধারণ অভিজ্ঞতার যে-বৃত্তের কথা আমরা বলছি, তারই ভিতর থেকে যাঁরা খুঁজে নেন তাঁদের কবিতার বিষয় বা ভাববস্তু, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণির কবিদের তুলনায় তাঁদের কবিকৃতির আবেদন অনেক স্বল্পায়ু কি না। অর্থাৎ সমকালীন পাঠকদের তুষ্টিসাধন কিংবা তৃপ্তিবিধান করেই ফুরিয়ে যায় কি না তাঁদের কবিতার আবেদন। এই যে প্রশ্ন, মোটামুটিভাবে এর একটা উত্তর আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি। অতীতকালের নানা শ্রেণির কবিকৃতির উপরে চোখ বুলিয়ে বলতে পারি, ফুরিয়ে যে যাবেই, এমন কোনও কথা নেই। তাঁদের মধ্যে অনেকের কবিতার আবেদন যেমন সমকালীন পাঠকসমাজের গণ্ডিটাকে কিছুতেই ছাড়িয়ে যেতে পারে না, তেমনই আবার অনেকের কবিতা পারেও।

বস্তুত, যেমন সমকালে তেমনই উত্তরকালেও আদৃত এমন অনেক কবির কথাই আমরা জানি, সমকালীন জনসমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, যন্ত্রণা, স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নভঙ্গকেই যাঁরা একান্তভাবে তাঁদের কবিতার বিষয় কিংবা ভাববস্তু হিসেবে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা অনেকেই তাঁদের কবিতার মধ্যে নিরন্তর ছায়াপাত করতে দিয়েছিলেন আপন কালের সেইসব রাষ্ট্রনৈতিক কিংবা সামাজিক ঘটনাকে, সমকালীন সাধারণ মানুষকে যা হয়তো তখন বিপুলভাবে আন্দোলিত করেছে, কিন্তু উত্তরকালের মানুষদের পক্ষে যার দ্বারা বিশেষ আন্দোলিত হবার কথা নয়। পরবর্তীকালের মানুষেরা যে তবু তাঁদের কবিতার দ্বারা অধিকৃত, গ্রস্ত হন, তার একটা বড়ো কারণ হয়তো এই যে, সেইসব কবিতার মধ্যে নিহিত থেকে যায় তাৎক্ষণিক অর্থের অতিরিক্ত আরও গভীর কিছু অর্থ; এবং সমকালের পাঠকেরা যে-ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক অর্থের নাগাল পেয়েই পরিতৃপ্ত, পরবর্তীকালের পাঠকদের কাছে সে-ক্ষেত্রে সেই গভীরতর অর্থগুলি ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। ফলে, অনেক কাল ধরেই টাটকা থেকে যায় সেইসব কবিতার সুবাস; অম্লান থেকে যায় তাদের আবেদন। এমনকি, তাদের রেলিভ্যান্স

কবিতার সুবাস; অম্লান থেকে যায় তাদের আবেদন। এমনকি, তাদের রেলিভ্যান্স কিংবা প্রাসঙ্গিকতাও সহসা ফুরিয়ে যেতে চায় না। কাল পালটায়। তার সঙ্গে পালটায় পরিস্থিতি। অথচ নবতর কালের নবতর পরিস্থিতিতেও তাদের প্রয়োগ-যোগ্যতা যেন একই রকমের অটুট থাকে।

দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণির কবিরা, সে-ক্ষেত্রে, সমকালের সমাদর বড়ো-একটা পান না। পেলেও নেহাতই মুষ্টিমেয় কিছু পাঠকের কাছে পান। এমন-কিছু পাঠকের কাছে, যাঁদের দৃষ্টি, ঠিক ওই কবিদের মতোই, আরও একটু দূরে নিবন্ধ। আমাদের, অর্থাৎ সাধারণ পাঠকদের, দৃষ্টি তো এই খণ্ডকালের গণ্ডির মধ্যেই আটকে থাকে। ফলত, তাঁদের কবিতার কোনও অর্থ খুঁজে না-পেয়ে ঘোর অস্বস্তি বোধ করি আমরা। কখনও মনে হয়, কাব্যরচনার অছিলায় আসলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জব্দ করবার এ এক কিম্ভুত চক্রান্ত; কখনও মনে হয়, এ আর কিছুই নয়, ভণ্ডামি।

কবিতারচনার নামে কেউ যে কখনও এই রকমের ভণ্ডামির খেলায় মাতেননি, তা অবশ্য নয়। আবার, অন্যদিকে, কিছু মানুষের দৃষ্টি যে—সাধারণ মানুষের দৃষ্টির তুলনায়—আর-একটু দূরে প্রসারিত হতে পারে, হয়ে থাকে, তা-ই বা কী করে অস্বীকার করব আমরা? কবির দৃষ্টি তো হতেই পারে। তাঁকে তো আমরা ক্রান্তদর্শী বলি; সুতরাং আমাদের তুলনায় তাঁর চক্ষু যে অনেক দূরে ধাবিত হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

সত্যি বলতে কী, দৃষ্টি যাঁর দূরকালে নিবদ্ধ, সেই কবির কথা যখন আমরা ভাবি, তখন আর-একটা সিদ্ধান্তেও স্বতই পৌঁছোতে হয় আমাদের। সেটা এই যে, দৃষ্টি তাঁর দূরে নিবদ্ধ বলেই নিশ্চয় এমন অনেক দৃশ্য কিংবা চিত্রও তাঁর চোখে পড়ছে, যা কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সেই দৃশ্য আসলে ভবিষ্যতের দৃশ্য।

না, তাঁকে 'জাদুকর' কিংবা 'গনতকার' বলা হচ্ছে না। আমাদের বলবার কথা এখানে শুধু এইটুকুই যে, তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতা যেহেতু আমাদের চেয়ে তীব্রতর, এবং তাঁর চিত্ত যেহেতু আমাদের চেয়ে আরও সেনসিটিভ বা সুবেদী, তাই বৃহৎভাবে প্রকট না-হওয়া পর্যন্ত যেসব লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে না, তা-ও হয়তো অনেকক্ষেত্রে উসকে দেয় কিংবা দীপিত করে তাঁর কল্পনাকে, এবং তারই থেকে তিনি অনুমান করে নেন কোনও দেশ কিংবা জনসমাজের ভবিষ্যৎ। এই যে 'অনুমান'-এর কথা আমরা বলছি, এ-ও আসলে এক ধরনের দেখা-ই, হয়তো আরও সত্য ও সার্থক দেখা, এবং, তাঁর মনশ্চক্ষে যা কিনা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে, অনাগত সেই ভবিষ্যতের ছবিটাকেই তিনি হয়তো আভাসিত করেন তাঁর কবিতায়।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে অনেককেই

আজকাল মাথা ঘামাতে দেখি। সামাজিক এই আময় নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই এখানে-ওখানে বিস্তর সেমিনার হচ্ছে; পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও কিছু কম হচ্ছে না। আলোচনা চলছে নির্লিপ্ত সেইসব মানুষকে নিয়ে, শারীরিকভাবে একটা মানবগোষ্ঠী কিংবা পরিবারের মধ্যে উপস্থিত থেকেও যাঁরা সেই গোষ্ঠী কিংবা পরিবারের ভালোমন্দের সঙ্গে যুক্ত কিংবা লগ্ন হয়ে নেই। বলা বাহুল্য, এটা একটা মস্ত সমস্যা। কিন্তু—বিনা নোটিসে—হঠাৎ একদিন এই সমস্যাটা যে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে প্রাচ্য পৃথিবীতে এসে আমাদের ঘাড়ে চেপেছে, তা-ও তো নয়। সমস্যাটা নিশ্চয় দিনে-দিনে ধীরে-ধীরে বিস্তৃত হয়েছে এই সমাজের শরীরে। কিন্তু প্রথম দিকে এতই অস্পষ্ট ছিল এর লক্ষণগুলি যে, ভালো করে সেগুলি আমাদের চোখেই পড়েনি।

সেটাই স্বাভাবিক। আমরা সাধারণ মানুষ; রোগের লক্ষণ যতক্ষণ না ব্যাপক হয়ে, প্রকট হয়ে দেখা দেয়, ততক্ষণ তা আমাদের চোখে পড়ে না।

কিন্তু কবির চিত্ত তো আমাদের চেয়ে আরও সুবেদী। তাই তাঁর চোখে পড়ে। এক্ষেত্রেও পড়তে পারত। ব্যাধিটা যখন সমাজশরীরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, তখনই এর একটা ছায়া সঞ্চারিত হতে পারত তার কবিতায়।

হয়নি, এমন কথা কিন্তু খুব জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। তাঁর অন্তর্ভূত 'বোধ' কবিতাটি নিশ্চয় আরও বছর কয়েক আগেই লেখা হয়ে থাকবে। সেই কবিতার মধ্যে হঠাৎ এই প্রশ্নটা যখন ঝিলিক মেরে ওঠে :

সকলের মাঝখানে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?

অন্তত তখন একটা ধাক্কা আমাদের বুকের মধ্যে লাগেই। প্রায় বিদ্যুচ্চমকের মতোই এই ভাবনাটাও তখন আমাদের চিত্তে এসে উঁকি মেরে যায় যে, আজকের এই যে বিচ্ছিন্নতাবোধ, আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেই একজন কবি হয়তো তাঁর এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে একে আভাসিত করেছেন। হতে পারে, এটা সেই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ, আপন-সময়-থেকে-এগিয়ে-থাকা কোনও শিল্পী কিংবা ভাবুক যার হাত থেকে কখনও পরিত্রাণ পান না। কিন্তু এই পঙ্‌ক্তিগুলি যখন পড়ি, আরও বৃহৎ একটি পটভূমিকাতেও এই ব্যাপারটাকে তখন আমরা দেখতে পাই। সত্যি বলতে কী, অ্যালিয়েনেশনের ব্যাধিটাকে নিতান্ত এক-মাত্রিক একটি সমস্যা বলেও তখন আর আমরা ভাবতে পারি না; আরও অনেক মাত্রা যোজিত হয় তার শরীরে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আজ না হয় এই পঙ্‌ক্তিগুলির ভিতর থেকে আমরা এই রকমের তাৎপর্য নিষ্কাশন করে নিচ্ছি,—সে-ক্ষেত্রে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমাদের সাধারণ পাঠকসমাজ এই পঙ্‌ক্তিগুলিকে অ্যালিয়েনেশনের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে পেরেছিলেন কি না। যদি না-পেরে থাকেন, তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেন-না, অ্যালিয়েনেশনের বীজ তখনও আমাদের সমাজে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল হয়তো, কিন্তু অসুখটা তখনও এত ব্যাপক আকারে দেখা দেয়নি যে, সেটা সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হবে এবং তাঁদের চিন্তাভাবনায় একটা মস্ত বড়ো জায়গা জুড়ে বিরাজ করবে। অর্থাৎ, সামাজিক যে পটভূমিকায় রেখে এই পঙ্‌ক্তিগুলিকে আজ আমরা বিচার করে দেখতে পারছি, সাধারণ একজন পাঠকের জীবনে সেই পটভূমিকাটাই তখন ছিল না।

শুধু জীবনানন্দ বলে কথা নেই, এমন আরও অনেক কবিরই নাম করা যায়, শব্দের কিংবা অনুষঙ্গের কোনও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর না-থাকা সত্ত্বেও সমকালীন সাধারণ পাঠকসমাজ যাঁদের, সব কবিতার না হোক, অনেক কবিতারই অর্থ ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি, অথচ পরবর্তীকালের পাঠকসমাজের কাছে যাঁদের সেইসব কবিতার অর্থ ধীরে-ধীরে পরতে-পরতে উন্মোচিত হয়েছে, এবং আরও অনেক কাল ধরেই হয়তো হতে থাকবে।

ব্যতিক্রম নন রবীন্দ্রনাথও। তাঁর এমন অনেক কবিতার কথাই তো আমরা জানি, সেকালের অনেক ধুরন্ধর সমালোচকও যার সম্মুখীন হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, অথচ একালের অনেক সাধারণ পাঠকের পক্ষেও যা থেকে কিছু-না-কিছু অর্থ এবং প্রচুর আনন্দ নিষ্কাশন করতে এমন-কিছু অসুবিধে হয় না। তাই বলে তাঁর সমস্ত কবিতারই সবটুকু অর্থ যে ইতিমধ্যে আমরা ধরতে পেরেছি, তা-ও হয়তো নয়। বরং সন্দেহ হয় যে, এমন কবিতাও অনেক লিখেছেন তিনি, যার মাত্র উপরকার স্তরের অর্থ হয়তো আমরা উপলব্ধি করেছি, কিন্তু তার অন্তরালেও রয়ে গিয়েছে আরও নানা স্তর, আরও নানা অর্থ। সেই অর্থগুলি হয়তো পরে কখনও ধরা পড়বে। হয়তো দেখা যাবে,প্রণয়-বিদ্বেষ-লোভ-বৈরাগ্য-আগ্রহ-অনাসক্তি-সাফল্য-ব্যর্থতা-সংবলিত এই যে জীবন আমরা যাপন করি, এরই সম্পর্কে অর্থবহ নানা ইঙ্গিত, নানা সংকেত নিহিত রয়েছে সেই কবিতায়। সেই ইঙ্গিত ও সংকেতের তাৎপর্য বুঝলে হয়তো আমরাই সবচেয়ে উপকৃত হতুম। কিন্তু আমরা বুঝিনি। কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে নিতে পারিনি আমরা।

কী বলব তাহলে আমরা কবিকে? আমরা কি বলব যে, যাতে তাঁর কবিতার মর্মগ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তার জন্য তাঁর দৃষ্টিকে আমাদের এই

খণ্ডকালের মধ্যেই তিনি আবদ্ধ রাখুন? এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার স্তরে যেটুকু ধরা পড়েছে, ছন্দে বেঁধে শুধু তারই কথা তিনি আমাদের শুনিয়ে যান?

বললেই যে তিনি তা করবেন, তা নয়। কিন্তু করলে যে তাতে আমাদেরই ক্ষতি, তা-ই-বা আমরা বুঝব না কেন? আমরা কেন এই সহজ সত্যটা কখনও উপলব্ধি করব না যে, এই ধরনের কবিদের ভূমিকা অনেকটা অগ্রবর্তী সৈনিকের মতো। আমাদের থেকে তাঁরা এগিয়ে রয়েছেন, এবং লক্ষ রাখছেন সেই পথের উপরে, যে-পথ দিয়ে গোটা সমাজ একদিন এগোবে।

আমরা তাঁদের পিছিয়ে আসতে বলব কেন? আমাদেরই উদ্দেশে দূর থেকে যে-ইঙ্গিত, যে-সংকেত তাঁরা পাঠাচ্ছেন, আমরা বরং তার তাৎপর্যকে, যতটা সম্ভব, বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

কবিতার যাঁরা সৎ পাঠক, সেই চেষ্টায় কখনও তাঁরা ক্লান্তি মানেন না।

গ্রন্থ-পরিচয়

কবিতার ক্লাস

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৭ [এপ্রিল ১৯৭০]। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬। দ্বাদশ সংস্করণ : মাঘ ১৪০৮ [জানুয়ারি ২০০২]। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। উৎসর্গ : শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশকালে ছিল না, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে পরবর্তী বিভিন্ন সংস্করণে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি নূতন রচনা যুক্ত হয়। সেগুলি হল *সব ছন্দই কি সিলেবিক, পদ ও যতি (যা পরে পরিবর্ধিত হয়* ও *পদ, যতি* ও *যতি*লোপ নামে পরবর্তী সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়), *গৈরিশ ছন্দ* ও *ছন্দের 'সহজ পাঠ'*। গ্রন্থটির *প্রথম সংস্করণের ভূমিকা* নিম্নরূপ :

"*আনন্দবাজার পত্রিকার* রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায়, বছর কয়েক আগে, 'কবিকঙ্কণ' ছদ্মনামে এই ক্লাস খুলেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, ছন্দের কয়েকটি মূল সূত্রকে—যতখানি সম্ভব—সহজ করে বুঝিয়ে বলব। ...এটি আসলে ছন্দের ব্যাকরণ-বই নয়, সেই ব্যাকরণ সম্পর্কে পাঠকের ভয় কাটাবার বই। ভয় কাটাতে গিয়ে আমার আলোচনার প্রাথমিক স্তরে তো বটেই, অন্যত্রও মাঝে-মাঝে লঘু পরিহাসের ছোঁয়া লাগাতে হয়েছে। দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে পুরীতে এসে সেই টুকরো আলোচনাকে মোটামুটি সম্পূর্ণ একটি চেহারা দেওয়া গেল।

"*কবিতার ক্লাস* যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, অনেকেই তখন বিভাগীয় সম্পাদকের বরাবরে চিঠি লিখে এই আলোচনা সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন। ... পত্রদাতাদের মধ্যে জিজ্ঞাসু পড়ুয়া, ড. ভবতোষ দত্ত ও কবি শ্রী শঙ্খ ঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।...

"বিভিন্ন ছন্দ ও পদ্যবন্ধের দৃষ্টান্ত হিসেবে যে-সব ছড়া কিংবা টুকরো কবিতা এ-বইয়ে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি আমারই লেখা।...

"এবারে প্রকাশ করা যেতে পারে, 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' আর-কেউ নন, স্বয়ং শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন; কবিতার ক্লাসে তাঁকেও যে আমি 'পড়ুয়া' হিসেবে পেয়েছিলাম, এইটেই আমার সবচাইতে বড় গর্ব।

"নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
"টুরিস্ট বাংলো, পুরী, ওড়িশা। ২৭ মাঘ, ১৩৭৬।"

কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৬। প্রকাশক : রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬/১ রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯। প্রথম পুনশ্চ-সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৯২। প্রকাশক: পুনশ্চ, ৯এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। প্রথম প্রকাশকালীন প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রথম পুনশ্চ-সংস্করণের প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী। উৎসর্গ : কাকলি ও কৃষ্ণরূপের জন্য।

গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশকালীন পাঠ ও পুনশ্চ-সংস্করণের পাঠ আদ্যন্ত অভিন্ন। একটি পার্থক্য অবশ্য চোখে পড়ে। রামায়ণী সংস্করণের জ্যাকেটে কবি শ্রী শঙ্খ ঘোষের একটি রচনার একাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। "গদ্যের কথা উঠলেই যখন নীরেন্দ্রনাথ বলেন—'গদ্য আমার মাতৃভাষা নয়', তখন আমার চমক লাগে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গদ্যে বাইরের কোনো জৌলুষ সহসা চোখে পড়ে না, মনে হয় না এর মধ্যে তেমন-কোনো শিল্প-আয়োজন আছে। আর এই আপাত-শিল্পহীনতাই তাঁর গদ্যের সবচেয়ে বড়ো শিল্প। যে দুর্লভ সৌজন্য আর নির্ভার প্রসাদ তাঁর গদ্যের গুণ, সেইটেই সঞ্চারিত হয়ে এসেছে তাঁর কবিতার মধ্যে। আর এইদিক থেকে বলা যায় যে, একটু ভিন্ন অর্থে, গদ্যই তাঁর গূঢ় মাতৃভাষা।" পুনশ্চ-সংস্করণের গ্রন্থে জ্যাকেট নেই, জরুরি এই মন্তব্যও—সম্ভবত সেই কারণেই—সেখানে বাদ পড়ে যায়। দুই সংস্করণেই গ্রন্থকারের যে মুখবন্ধ রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

"১৩৫৭ থেকে ১৩৮১, এই পঁচিশ বছরে, ভিতরের তাগিদে ও বাইরের তাড়নায়, গদ্যবন্ধে যা লিখেছি, এবং যা এখনও আমার অন্য কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি, তার থেকে বাছাই করে কিছু রচনাকে—পৃথক চারটি গুচ্ছে—এখানে কালানুক্রমিক সাজিয়ে দেওয়া হল।

"*সাহিত্যের ভূগোল* লেখাটি আমার স্বনামে প্রকাশিত হয়নি। ছদ্মনাম ছিল অলবেরুনি, এবং—বঙ্গভূমির বাইরে থেকে লেখা হচ্ছে, এই রকমের একটি ধারণা জাগিয়ে—পত্রাকারে ওটি রচনা করা হয়েছিল।

"*কবিতার দিকে* রচনাটির এক জায়গায়, প্রসঙ্গত, মন্তব্য করেছি যে, গদ্য আমার 'মাতৃভাষা' নয়। কিন্তু—কিছু-কিছু ভাবনা যেহেতু, তাদের প্রকাশনার মাধ্যম হিসেবে, গদ্যবন্ধই দাবি করে, তাই—মাঝেমধ্যে এই বি-ভাষার শরণ না-নিয়ে আমার গত্যন্তর থাকে না। বর্তমান গ্রন্থের সপক্ষে আমার অন্য-কোনও যুক্তি নেই।"

কবিতার কী ও কেন

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮২। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩। পঞ্চম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০৬। প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য। উৎসর্গ : অম্লানের জন্য।

প্রথম প্রকাশ থেকে চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত গ্রন্থের পাঠ অভিন্ন। পঞ্চম সংস্করণের পাঠে ইতস্তত ভাষাগত কিছু-কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। উৎসর্গপত্রে যে অম্লান নামটি দেখি, তিনি একালের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শ্রী অম্লান দত্ত। গ্রন্থটির ভূমিকা নিম্নরূপ :

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালার (১৯৭৫) সংকলন এই গ্রন্থ। বক্তৃতাগুলিকে—যার বিষয় ছিল কবিতা—গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

"বক্তৃতাগুলিকে তৈরি করে তুলবার সময় দরকারি নানা বইপত্রের জোগান দিয়ে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ রইলুম।

"বক্তৃতার দিনগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করেছিলুম, তার স্মৃতি এখনও আমাকে উন্মনা করে।

"কাব্যজিজ্ঞাসুদের কৌতূহল এই গ্রন্থপাঠে যদি ঈষন্মাত্রও তৃপ্ত হয়, তাহলে সেটাই হবে আমার পরিশ্রমের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

"নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
"১ জানুয়ারি, ১৯৮২।"



কবিতা কী?
কবিতা কেন?
কবিতা কোথায়?
কবিতা কীভাবে?
কবিতা থেকে প্রাপ্তিই বা কী?
কবিতা কেন কঠিন?
এমন প্রশ্নপথ ধরে কবিতার ভুবনের দিকে
যাত্রা করে এই সব গদ্য।
রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই
হোমার, প্লেটো, আরিস্টটল
বামনাচার্য, বিশ্বনাথ,
আনন্দবর্ধন, রাজশেখর হয়ে
সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে
এমনকি সাম্প্রতিকের
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও
সহযাত্রী হবেন সেই যাত্রাপথে।
কবিতার
শিল্প সত্তা ও কারিগরি নিয়ে
এই গদ্যসমগ্র আসলে
ক্রমশ প্রশিক্ষিত হওয়ারই আয়োজন।

ISBN - 978-81-7751-156-7

দাম : ১২৫ টাকা।